ভাষা-প্রকাশ

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪২

PRINTED IN INDIA

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, 48, HAZRA ROAD,
BALLYGUNGE, CALCUTTA

Reg. No. 1323 B.T.—May, 1942—I.

যাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায়

মাতৃভাষা বাঙ্গালা

বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ মহিমময় আসন পাইয়াছে,

যাঁহার দিব্য দৃষ্টি

বঙ্গভাষী জনগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই

উচ্চতম মানসিক সংস্কৃতির অধিকারিরূপে দেখিয়াছিল,

এবং

স্বীয় আরব্ধ কার্য

স্থলাভিষিক্ত সৎপুত্রদ্বারা

পরিসমাপ্তির পথে নীয়মান দেখিয়া

পরলোক হইতে যাঁহার প্রীতিস্মিত আশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে,

সেই প্রখ্যাতকীর্তি পুরুষসিংহ

স্বর্গত **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের** পুণ্য নামে

গৌড়বঙ্গভাষার এই ব্যাকরণ

গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল ॥

সূচী

সূচী ... ...

ভূমিকা ... ...

[১] প্রবেশক ১—২৭

[১.১] ভাষা ১

[১.২] ভাষা-লিখন ২

[১.৩] সাহিত্যের ভাষা ও কথিত ভাষা ৫

[১.৪] বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা ৫

[১.৪৪] বাঙ্গালা সাধু, চলিত ও প্রাদেশিক ভাষার নিদর্শন ৮

[১.৫] ব্যাকরণ ১০

[১.৬] ব্যাকরণের বিভাগ ১২

[১.৭] বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলী ১৪

[২] ধ্বনিতত্ত্ব ২৮—১৩৯

[২.১] উচ্চারণ-তত্ত্ব—বাঙ্গালার উচ্চারণ, বর্ণ-বিন্যাস ও বাঙ্গালা শব্দের সাধু উচ্চারণ ... ২৮—৬৯

[২.১১] বাঙ্গালা বর্ণমালা ও উচ্চারণ ২৮

[২.১২] বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের উচ্চারণ ৩২

[২.১৩] সানুনাসিক স্বর ৪১

[২.১৪] হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ৪২

পৃষ্ঠা

[২.১৫] দ্বিমাত্রিকতা ৪৫
[২.১৬] বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি বাগ্-যন্ত্রের সমাবেশ এবং বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগ ৪৬
[২.১৭] বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ ৫৯
[২.১৮] বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি উচ্চারণ-স্থান ৬১
[২.১৯] সংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ ৬৫
[২.২] প্রতিবর্ণীকরণ ৬৯
[২.২২] বাঙ্গালা নামের ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণের এবং ইংরেজী উচ্চারণের বাঙ্গালা ভাষায় অনুকরণ ... ৭৪
[২.২৩] ইংরেজী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ ... ৭৬
[২.২৪] ফারসী ও আরবী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ ৭৮
[২.৩] ঝোঁক বা স্বরাঘাত [বল বা শ্বাসাঘাত] ... ৮১
[২.৪] বাক্যের সুর বা উদাত্তাদি স্বর ৮৬
[২.৫] যতিচ্ছেদ-বিধি ৮৭
[২.৬] শীৎকার বা কাকুধ্বনি ৯০
[২.৭] ধ্বনি-তত্ত্ব—ধ্বনি-সমূহের ক্রিয়া ৯৩
[২.৭১] বাঙ্গালা উচ্চারণের ও ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ রীতি ৯৩
বিপ্রকর্ষ ৯৩
[২.৭১২] [২] শব্দের আদ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে স্বর-বর্ণ-যোজনা ৯৫
[২.৭১৩] [৩] স্বর-সঙ্গতি ৯৫

পৃষ্ঠা

[২.৭১৪] [৪] অপিনিহিতি ১০০
[২.৭১৫] [৫] অভিশ্রুতি ১০২
[২.৭১৬] [৬] য়-শ্রুতি ও (অন্তঃস্থ-)ব-শ্রুতি ... ১০৬
[২.৭১৭] [৭] শব্দের অভ্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লোপ-প্রবণতা ১০৭

[২.৭২] তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি ১০৮

[২.৭২১] [১] ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান ১০৮
[১ক] ণত্ব-বিধান ১০৮
[১খ] ষত্ব-বিধান ১১২
[২.৭২২] [২] গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ : অপশ্রুতি ... ১১৪
[২.৭২৩] [৩] সন্ধি ১১৮
স্বর-সন্ধির নিয়ম ১২০
স্বর-সন্ধির নিয়মের ব্যত্যয় ১২৪
ব্যঞ্জন-সন্ধি ১২৫
নিয়ম-বহির্ভূত সন্ধি ১৩৪
সন্ধি-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথা ... ১৩৫
সন্ধির পরিশিষ্ট : খাঁটী বাঙ্গালা মৌলিক সন্ধি ... ১৩৭

[২.৮] **ছন্দঃ** ১৩৮

[৩] রূপতত্ত্ব ১৪০—৪২৭

[৩.০১] শব্দ ; শব্দ-গঠন, শব্দের গঠন-মূলক শ্রেণী-বিভাগ ; মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ ১৪০

পৃষ্ঠা

[৩.০১১] শব্দ; শব্দ-সাধন বা শব্দ-গঠন; শব্দের গঠন-মূলক শ্রেণী; প্রকৃতি বা ধাতু; প্রাতিপদিক; পদ; প্রত্যয়; বিভক্তি; শব্দের অর্থ-মূলক শ্রেণী-বিভাগ; বাক্যস্থ বিভিন্ন প্রকারের পদ ১৪০
[৩.০১২] প্রকৃতি বা ধাতু; প্রাতিপদিক; পদ ... ১৪৩
[৩.০১৩] প্রত্যয়—[১] কৃৎ ও [২] তদ্ধিত... ... ১৪৬
[৩.০১৪] বিভক্তি—[১] শব্দ-বিভক্তি ও [২] ক্রিয়া-বিভক্তি ১৪৭
[৩.০১৫] শব্দের অর্থ-মূলক শ্রেণী-বিভাগ (যৌগিক বা যোগ শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ) ... ১৪৮
[৩.০১৬] বাক্য ও বাক্য-গত বিভিন্ন প্রকারের পদ ... ১৪৯
[১] নাম, সংজ্ঞা বা বিশেষ্য ১৫০
[২] বিশেষণ ১৫১
[৩] সর্বনাম ১৫১
[৪] ক্রিয়াপদ বা আখ্যাত ১৫২
[৫] অব্যয় ও অব্যয়-স্থানীয় পদ ১৫৩
[৩.০২] **শব্দ-গঠন—কৃৎ- ও তদ্ধিত-প্রত্যয়** .. ১৫৪
[৩.০২১] বাঙ্গালা (প্রাকৃত-জ) কৃৎ-প্রত্যয় ১৫৪
[৩.০২২] সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় ১৬৪
সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ ... ১৮২
[৩.০২৩] বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয় ১৮৩
[৩.০২৪] সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় ১৯২
[৩.০২৫] তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ ১৯৭
[৩.০২৬] বিদেশী তদ্ধিত (ফারসী) ১৯৭

পৃষ্ঠা

৩.০৩] উপসর্গ ২০০

[১] বাঙ্গালা উপসর্গ ২০০

[২] সংস্কৃত উপসর্গ ২০১

[৩] বিদেশী উপসর্গ ২০৪

[৩.০৪] সমাস ... ... ২০৫—২২৮

[১] সংযোগ-মূলক বা দ্বন্দ্ব-সমাস ২০৭

[২] ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস ... ২০৭

[৩] বর্ণনা-মূলক সমাস ২০৭

[৩.০৪১] সংযোগ-মূলক সমাস ২০৮

[ক] দ্বন্দ্ব-সমাস ২০৮

[খ] অলুক্-দ্বন্দ্ব ২১০

[গ] 'ইত্যাদি' অর্থে দ্বন্দ্ব-সমাস ২১০

[ঘ] সমার্থক দ্বন্দ্ব ২১১

[৩.০৪২] ব্যাখান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস ... ২১১

[ক] তৎপুরুষ ২১১

(১) কর্তৃ-বাচক, (২) কর্ম-বাচক, (৩) করণ-বাচক, (৪) উদ্দেশ্য-বাচক, (৫) অপাদান-বাচক, (৬) সম্বন্ধ-বাচক, (৭) স্থান-কাল-বাচক, (৮) উপপদ-তৎপুরুষ, (৯) নঞ্-তৎপুরুষ, (১০) অলুক্-তৎপুরুষ, (১১) প্রাদি-সমাস, (১২) নিত্য-সমাস, (১৩) সহসুপা বা সুপসুপা ২১১—২১৯

[খ] কর্মধারয় ২১৯

(১) সাধারণ কর্মধারয়, (২) মধ্যপদলোপী

পৃষ্ঠা

কর্মধারয়, (৩) উপমান-কর্মধারয়, (৪) রূপক-
কর্মধারয়, (৫) উপমিত-কর্মধারয় ... ২১৯—২২৩

[গ] দ্বিগু:সমাস ২২৩

[৩.০৪৩] বর্ণনা-মূলক সমাস ২২৩

[ক] ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি ২২৪

[খ] সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি ২২৪

[গ] ব্যতিহার-বহুব্রীহি ২২৪

[ঘ] মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ২২৪

বহুব্রীহির দৃষ্টান্ত ২২৫

[৩.০৪৪] সংস্কৃত পদের সমাস ২২৭

[৩.০৪৫] * অসংলগ্ন সমাস *—সংস্কৃত সমস্ত-পদের ভিন্ন
অংশের পৃথক্ লিখন ২২৭

[৩.০৫] শব্দদ্বৈত ২২৯

[৩.০৫১] দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ ২২৯

[৩.০৫২] অনুকার-বিকারময় শব্দদ্বৈতে ভাষার ইঙ্গিত ... ২৩২

[৩.০৬] শব্দ-রূপ—নাম-পর্যায় ... ২৩৪—৩০৩

[৩.০৬১] বিশেষ্যের শ্রেণী-বিভাগ ২৩৪

[৩.০৬২] লিঙ্গ ... ... ২৩৫—২৪৫

[৩.০৬৩] বচন ... ... ২৪৬—২৫৩

বহুবচন-জ্ঞাপক প্রত্যয়ের প্রয়োগ... ... ২৪৭

বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দাবলী ২৪৯

বিদেশী বহুবচন-প্রত্যয় ২৫৩

বিভক্তি-দ্বারা বহুবচন-প্রকাশ ২৫৩

পৃষ্ঠা।

[৩.০৬৪] পদাশ্রিত-নির্দেশক ২৫৪
[৩.০৬৫] শব্দ-বিভক্তি ও বিভক্তিবৎ ব্যবহৃত পদ ... ২৫৮
[১] যথার্থ বিভক্তি ২৫৯
[২] বিভক্তি-রূপে ব্যবহৃত পদ ২৬০
[৩.০৬৬] বাঙ্গালা শব্দ-রূপের বিভক্তি ইত্যাদি ... ২৬৩
[৩.০৬৭] বাঙ্গালায় আগত সংস্কৃত শব্দের প্রাতিপদিক ও সম্বোধনের রূপ ২৭২
বাঙ্গালায় প্রযুক্ত সংস্কৃত বিভক্তি ২৭৫
[৩.০৬৮] কর্মপ্রবচনীয় শব্দ, সম্বন্ধনীয়, অনুসর্গ বা পরসর্গ ২৭৭
[৩.০৬৯] কারক-বিভক্তির প্রয়োগ ২৭৯
[১] কর্তৃ-কারক ২৭৯
কর্তৃকারকের বিভক্তির প্রয়োগ ২৮১
[২] কর্ম-কারক ২৮৩
কর্মকারকের বিভক্তির প্রয়োগ ২৮৬
[৩] করণ-কারক ২৮৮
(১) সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণ ২৮৮
(২) উপায়াত্মক করণ ২৮৯
(৩) হেতুময় করণ ২৮৯
(৪) কালাত্মক করণ ২৮৯
(৫) উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণ ... ২৮৯
করণকারকের বিভক্তির প্রয়োগ ... ২৯০
[৪] সম্প্রদান-কারক ২৯২
[৫] অপাদান-কারক ২৯৩
[ক] আধার- বা স্থান-বাচক অপাদান ... ২৯৪

পৃষ্ঠা

[খ] অবস্থাত্মক অপাদান ২৯৫
[গ] কাল-বাচক অপাদান ২৯৫
[ঘ] দূরত্ব-বাচক অপাদান ২৯৫
[ঙ] তারতম্য-বাচক অপাদান ২৯৫
[৬] সম্বন্ধ-পদ ২৯৫
[৭] অধিকরণ-কারক ৩০০
[৮] সম্বোধন-পদ ৩০২

[৩.০৭] **বিশেষণ** ... ... ৩০৩—৩২০

[৩.০৭১] উদ্দেশ্য ও বিধেয় ৩০৪
[৩.০৭২] নাম-বিশেষণ ৩০৫
[১] গুণ- বা অবস্থা-বাচক ৩০৫
[২] উপাদান-বাচক ৩০৫
[৩] সংখ্যা- বা পরিমাণ-বাচক ৩০৫
[৪] পূরণ- বা ক্রম-বাচক ৩০৬
[৫] সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাত ৩০৬
সাধারণ বিশেষণ ৩০৬
(১) একপদময় বিশেষণ ৩০৬
(২) যৌগিক বিশেষণ ৩০৭
(৩) বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণ ... ৩০৮
[৩.০৭৩] ক্রিয়া-বিশেষণ ৩০৮
[৩.০৭৪] বিশেষণের লিঙ্গ-বিচার ৩১০
[৩.০৭৫] তারতম্য বা অতিশায়ন, অথবা বিশেষণের তুলনা ৩১০

পৃষ্ঠা

[৩.০৭৬] সংখ্যা-বাচক বিশেষণ—গণন-সংখ্যা ... ৩১৫
(ক) গুণিত-সংখ্যা-বাচক ৩২০
(খ) ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক ৩২০
(গ) ভগ্নাংশ-সংখ্যা ৩২০
[৩.০৮] **সর্বনাম** ... ... ৩২১—৩৪২
[৩.০৮১] (১) ব্যক্তি-বাচক বা পুরুষ-বাচক সর্বনাম ... ৩২২
[৩.০৮২] (২) উল্লেখ-সূচক বা নির্ণয়-সূচক সর্বনাম ... ৩৩২
[৩.০৮৩] (৩) সাকল্য-বাচক সর্বনাম ৩৩৪
[৩.০৮৪] (৪) সম্বন্ধ-, সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম... ৩৩৫
[৩.০৮৫] (৫) প্রশ্ন-সূচক সর্বনাম ৩৩৬
[৩.০৮৬] (৬) অনিশ্চয়-সূচক সর্বনাম ৩৩৭
[৩.০৮৭] (৭) নিজ- বা আত্ম-বাচক সর্বনাম... ... ৩৩৯
(৮) ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম ... ৩৪০
[৩.০৮৮] সর্বনামের বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ ৩৪০
[৩.০৮৯] সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ ... ৩৪১
[৩.০৯] **ক্রিয়া-পর্যায়** ... ... ৩৪৩—৪২৩
[৩.০৯১] ক্রিয়া-পদ ৩৪৩
[৩.০৯২] ধাতু ৩৪৪
[১] সিদ্ধ ধাতু ৩৪৪
[২] সাধিত ধাতু ৩৪৬
[৩] সংযোগ-মূলক ধাতু ৩৪৮
[৩.০৯৩] সমাপিকা- ও অসমাপিকা-ক্রিয়া ... ৩৫১
[৩.০৯৪] অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া—মুখ্য, গৌণ ও সমধাতুক কর্ম ৩৫৩

পৃষ্ঠা

[৩.০৯।৫] ক্রিয়ার প্রকার ৩৫৪
[৩.০৯।৬] বাচ্য ৩৫৬
[৩.০৯।৭] প্রয়োজক (প্রেরণার্থক, অথবা ণিজন্ত) ক্রিয়া, এবং নাম-ধাতু ৩৬২
[৩.০৯।৮] অসমাপিকা ক্রিয়া ৩৬৫
[৩.০৯।৯] ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ—কর্তৃবাচ্যে « -ইতে » ও কর্মবাচ্যে « -আ, -আনো » ৩৬৭
[৩.০৯।১০] উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া ৩৭০
[৩.০৯।১১] ভাব-বচন বা ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য-পদ ... ৩৭১
[৩.০৯।১২] কাল ও পুরুষ ৩৭২
[৩.০৯।১২।ক] বিভিন্ন কালের প্রয়োগ ৩৭৮
[৩.০৯।১২।খ] বাঙ্গালা সাধু-ভাষার কাল- ও পুরুষ-বাচক বিভক্তি ৩৮৩
অসম্পূর্ণ ধাতু ৩৯৩
[৩.০৯।১২।গ] চলিত-ভাষায় ক্রিয়ার রূপ ৩৯৬
[৩.০৯।১২।ঘ] সাধু- ও চলিত-মিশ্র ধাতু-রূপ ... ৪১৬
[৩.০৯।১৩] নঞর্থক ধাতু ৪১৭
[৩.০৯।১৪] যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া ৪১৯
[৩.০৯।১৫] সংস্কৃত ধাতু ৪২১
[৩.১০] অব্যয় ... ... ৪২৩—৪২৭

[৪] বাক্য-রীতি ৪২৮—৪৪২

[৪.১] উদ্দেশ্য ও বিধেয় ৪২৮
[৪.২] বাক্য-রচনায় লক্ষণীয় বিষয় ৪২৯

পৃষ্ঠা

[৪.৩] বাক্যের উক্তি-ভেদ ৪৩১
[৪.৪] বাক্যের রচনার প্রকার ৪৩২
সরল বাক্য ৪৩৩
মিশ্র বাক্য ৪৩৩
যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য ৪৩৫
[৪.৫] বাক্যে পদের ক্রম ৪৩৭

[৫] পরিশিষ্ট ৪৪৩—৫৪১

[৫.১] বাঙ্গালা ছন্দ ৪৪৪
[৫.১১] সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ৪৪৪
[৫.১২] ছন্দের বিভাগ ৪৪৯
[১] তান-প্রধান ছন্দ ৪৫২
[২] ধ্বনি-প্রধান ছন্দ ৪৫৯
[৩] বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ ... ৪৬২
[৫.১৩] কবিতার ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ... ৪৬৩
[৫.১৪] ব্রজবুলী ৪৬৪
[৫.২] শব্দার্থ-বিজ্ঞান (বাগর্থ) ৪৬৮
[৫.২১] শব্দের অর্থ-দ্যোতন-শক্তি ৪৬৮
[৫.২২] অর্থের পরিবর্তন ৪৭১
[৫.২৩] নিরর্থক ভাষা, বা ভাষার মুদ্রাদোষ ৪৭৩
[৫.৩] অলঙ্কার ৪৭৩
[৫.৩১] শব্দালঙ্কার ৪৭৪
[৫.৩২] অর্থালঙ্কার ৪৭৫

		পৃষ্ঠা
[৫.৩৩]	দোষ-বিচার	৪৮৪
	[ক] শব্দ-গত দোষ	৪৮৪
	[খ] অর্থ-গত দোষ	৪৮৬
	[গ] রস-গত দোষ	৪৮৬
[৫.৪]	**সংস্কৃত ধাতু ও তাহা হইতে জাত বাঙ্গালা তৎসম শব্দ**	৪৮৭
[৫.৫]	**সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দূ), ফারসী ও আরবী ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনা** ...	৪৯৫
[৫.৫১]	ঐতিহাসিক কথা	৪৯৫
[৫.৫১১]	সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী ...	৪৯৫
[৫.৫১২]	ফারসী	৪৯৮
[৫.৫১৩]	ইংরেজী	৫০০
[৫.৫১৪]	আরবী	৫০২
[৫.৫১৫]	বিভিন্ন বর্ণমালা	৫০৩
[৫.৫২]	সংস্কৃত ও বাঙ্গালা	৫০৫
[৫.৫৩]	ইংরেজী ও বাঙ্গালা	৫১১
[৫.৫৪]	ফারসী ও বাঙ্গালা	৫২১
[৫.৫৫]	হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দূ) ও বাঙ্গালা ...	৫৩০
[৫.৫৬]	আরবী ও বাঙ্গালা	৫৩৫

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণের জন্য বইখানি আদ্যন্ত পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনাত্মক-ভাষাতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক আমার সহকর্মী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় সংস্কৃত কৃৎ- ও তদ্ধিত-প্রকরণে কতকগুলি সংশোধন ও পরিপূরণ করিয়া আমায় বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। Stress Accent অর্থে 'ঝোঁক' বা 'স্বরাঘাত' স্থলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রস্তাবিত 'বল' বা 'শ্বাসাঘাত' শব্দ সমীচীনতর মনে হওয়ায়, পুস্তকের শেষ ভাগে ছন্দঃপ্রকরণে শেষোক্ত দুইটী শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। অধ্যাপক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ পি-আর-এস্ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া ছন্দঃপ্রকরণ পরিবর্ধিত এবং আংশিক ভাবে পুনর্লিখিত হইয়াছে; এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বিভিন্ন প্রকারের বাঙ্গালা ছন্দের আরও দুইটী নমুনা রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয়ের প্রধান প্রুফ-সংশোধক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় এবং প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এম্-এ যত্ন-সহকারে এবং পুস্তকখানির প্রতি বিশেষ মমতা-বোধের সঙ্গে প্রস্তুত দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রুফগুলি দেখিয়াছেন; ইঁহাদের ভাষাজ্ঞান ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি পুস্তকখানিকে অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটী-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত রাখিতে সহায়তা করিয়াছে। ইঁহাদের কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত উৎসাহের জন্য আমি সানন্দে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১ বৈশাখ ১৩৪৯,
১৪ এপ্রিল ১৯৪২

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় আট বৎসর হইল, "ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" লিখিতে আরম্ভ করি। অবসর-মত দুই-পাঁচ পৃষ্ঠা করিয়া লিখিয়া, প্রায় তিন বৎসর হইল বইখানি সম্পূর্ণ করি। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে বই ছাপাখানায় দেওয়া হয়; এবং অবশেষে ১৯৩৯ সালের অগস্ট মাসে মুদ্রণ-কার্য সম্পন্ন হইল।

"বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" বলিলে যাহা বুঝি, বইখানিতে তাহারই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার "সাধু" ও "চলিত" উভয়বিধ রূপই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষাগত সংস্কৃত-মূলক শব্দ লইয়াই বেশী কথা থাকে। আমি যথা-রীতি বাঙ্গালার সংস্কৃত শব্দাবলীর বিচার করিয়াছি, এবং সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ, ধ্বনি ও উচ্চারণ এবং ব্যাকরণ-ঘটিত বাঙ্গালার বিশিষ্ট বা স্বকীয় নিয়ম বা পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাস এবং ব্যাকরণ-বিষয়ে খাঁটী বাঙ্গালার স্বকীয় রীতির নির্দেশ না থাকিলে, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণকে সম্পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। প্রস্তুত পুস্তকে বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনা নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারের আধারেই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-গত বিশ্লেষণ ইহাতে করিবার চেষ্টা যথা-শক্তি করিয়াছি।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় দুই শত বৎসর হইতে চলিল, বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, পোর্তুগীস পাদ্রি মানোএল্ দা-আসসুম্প্‌সাম্-কর্তৃক। তাহার পরে অন্য বহু বিদেশী এবং দেশীয় পণ্ডিত

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও অনুবাদ-পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা এই বিষয়ে পূর্বাচার্য, এবং যাহারাই ইঁহাদের কৃতি আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই এই-সকল পূর্বাচার্যের নিকট অল্প-বিস্তর ঋণী থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমিও আমার পূর্বগামীদের কাহারও-কাহারও নিকট বহু স্থলে বিচার- ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির জন্য এবং উদাহরণের জন্য ঋণী। সমগ্র-ভাবে এই ঋণ প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে; আমি কেবল তাঁহাদের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক-প্রণয়ন-কালে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধুনাতন সহকর্মী প্রিয়বর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সংস্কৃত কৃৎ- ও তদ্ধিত-প্রত্যয়গুলির তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিয়া আমায় সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট অন্য দুই-একটী বিষয়েও আমি ঋণী। বাঙ্গালা ছন্দোবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের প্রযুক্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। ইঁহার সহিত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত বাঙ্গালা ছন্দঃ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। কবি ও সুসাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ৪৪৮-৪৪৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য হইতে গৃহীত অংশটুকু বিভিন্ন ছন্দে রচনা করিয়া দিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তক-প্রণয়নে ও মুদ্রণে নানা ত্রুটী-বিচ্যুতি রহিয়া গেল। মুদ্রণ-কার্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস ও তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-দ্বয় বিশেষ যত্ন করেন। ইঁহাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রধান প্রুফ-সংশোধক শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভাষাজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বইখানিকে যথাসম্ভব সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে সহায়তা করিয়াছে; ইঁহার সতর্ক দৃষ্টি অনেক ছোট-খাট ভুল হইতে গ্রন্থকারকে রক্ষা

করিয়াছে। ছাপাখানার অন্যতম বিভাগীয় প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়-ও এই বইয়ের খুঁটী-নাটী-ভরা অক্ষর-সংস্থাপন পরিপাটী-রূপে সম্পন্ন করাইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বই ছাপা হইবার পরে কতকগুলি ভুল চোখে পড়িয়াছে, সেগুলির সংশোধন পৃথক্ শুদ্ধিপত্রে নির্দিষ্ট হইল।

পরিশেষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা-বিভাগের অধুনাতন মুখ্যাধিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি প্রথম হইতেই এই পুস্তক-প্রকাশ-বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহার-ই আগ্রহে ইহার মুদ্রাপণ ও প্রকাশন সম্ভবপর হইল। বার বৎসরের অধিক হইল, ১৯২৬ সালে, "বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ" বিষয়ক আমার বৃহৎ ইংরেজী গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনে স্বর্গীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুকম্পাপূর্ণ উৎসাহ ও আগ্রহের কথা এখন স্মরণ-পথে উদিত হইতেছে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে, এবং এখনও যে সেই আদর্শ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুপ্রাণিত করিতেছে, ইহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা। স্বর্গত আশুতোষের নাম এই পুস্তকের সহিত জড়িত করিয়া, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা আমি কথঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীগণ মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও রাজভাষা তথা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ভাষা ইংরেজী ব্যতীত, হয় সংস্কৃত বা পালি, নয় আরবী ফারসী বা হিন্দুস্থানী (উর্দূ) পড়িয়া থাকে। অধ্যেয় অন্য ভাষাগুলির সহিত বাঙ্গালার তুলনা-মূলক বিচার, বাঙ্গালা তথা অন্য ভাষার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে উপযোগী হইবে

বলিয়া, পরিশিষ্টে এইরূপ কতকগুলি তুলনা-মূলক আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি ইস্কুল তথা কলেজের ছাত্রদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এইরূপ ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া আয়ত্ত করিতে দুই-তিন বৎসর লাগিবে। ইংরেজী ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক সময় ব্যয়িত হয়। প্রথম পাঠকালে, ক্ষুদ্র বর্জাইস্ অক্ষরে মুদ্রিত অংশগুলি বাদ দিলে চলিবে। পরে এগুলি আলোচনা করিলে, মাতৃভাষা-সম্বন্ধে পূর্ণতর ধারণা হইবে।

আলোচ্য বিষয়গুলির পরস্পরের সহিত সংযোগ বা সম্বন্ধ বিশদ করিবার উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন প্রসঙ্গ দশমিক সংখ্যা-গণনা-দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সূচীপত্র-দর্শনে এইরূপ দশমিক অঙ্কাবলীর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বুঝা যাইবে।

আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে মাতৃভাষা বাঙ্গালার পঠন-পাঠন যাহাতে প্রকৃষ্ট-রূপে সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলের-ই আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ছাত্রদের মধ্যে মাতৃভাষার আলোচনা যে ঐতিহাসিক-বিকাশ-নির্দিষ্ট ও যুক্তিতর্কানুমোদিত রীতিতে হওয়া উচিত, তাহার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। এই আগ্রহ ও উপলব্ধির দ্বারা চালিত হইয়া, যথা-জ্ঞান মাতৃভাষার এই ব্যাকরণখানি রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে এই বই ইস্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের উপকারে আসিলে, এবং মাতৃ-ভাষার প্রকৃতি- ও পরিস্থিতি-সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞান-অর্জনে তাহাদিগকে সাহায্য করিলে, আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি শং শব্দৈঃ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৪ শ্রাবণ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ
৯ অগস্ট ১৯৩৯

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাষা-প্রকাশ

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

[১] প্রবেশক

[১.১] ভাষা

[১.১১] মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা তাহার কণ্ঠ, নাসিকা, এবং মুখের অভ্যন্তরে স্থিত জিহ্বা প্রভৃতি বাগ্-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা সে প্রকাশ করিয়া থাকে। এক বা একাধিক ধ্বনির যোগে, বিশেষ-ভাব-প্রকাশক অর্থ-যুক্ত এক-একটী শব্দ (Word) বা পদ (Inflected Word) গঠিত হয়।

[১.১১১] বিভিন্ন দেশে ও সময়ে, ভিন্ন-ভিন্ন মানব-সমাজে, একই ভাব বা অর্থ জানাইবার জন্য, বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি- বা ধ্বনিসমষ্টি-যোগে নিষ্পন্ন শব্দ বা পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেমন, বাঙ্গালা « এ » (='ইহা'—একমাত্র ধ্বনিময় শব্দ), « পা » (=[প্+আ]—'চরণ'-অর্থে—দুই-ধ্বনি-নিষ্পন্ন শব্দ), « খায় » (=[খ্+আ+য়্]—তিন-ধ্বনি-নিষ্পন্ন পদ), « চলিতেছে » (=[চ্+অ+ল্+ই+ত্+এ+ছ্+এ]—আট-ধ্বনিময় পদ), « সত্য » (কলিকাতার উচ্চারণে [শোত্তো]=[শ্+ও+ত্ত্+ও], পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে [শইত্ত]=[শ্+অই+ত্ত্+অ]—চার-ধ্বনি-নিষ্পন্ন শব্দ); ইংরেজী this ('এই' বা 'ইহা'-অর্থে—th+i+s [দ্‌+ই+স্]—তিন-ধ্বনিময় পদ), foot ('চরণ'-অর্থে—f+oo+t [ফ্‌+উ+ট্‌]—তিন-ধ্বনিময় শব্দ), eats ('খায়'-অর্থে—ea+t+s, [ঈ+ট্‌+স্]—তিন-ধ্বনিময় পদ), is walking ('চলিতেছে'-অর্থে—i+s=z ও w+al=o+k+i+ng, [ই+জ়্] ও [উ+ও+ক্+ই+ঙ্]

—যথাক্রমে দুই- ও পাঁচ-ধ্বনিময় পদ-দ্বয়), truth ('সত্য'-অর্থে—t + r + u + th, [ট্‌ + র্‌ + উ + থ্‌] —পাঁচ-ধ্বনিময় শব্দ)।

[১.১২] বিশেষ কোনও মানব-সমাজে ব্যবহৃত এইরূপ শব্দের বা পদের সমষ্টি লইয়া, সেই সমাজের মধ্যে প্রচলিত ভাষা গঠিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে, জাতি- এবং ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙ্গালী জন-সমাজে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া বঙ্গভাষা বা বাঙ্গালা ভাষা গঠিত ; ইংলাণ্ডে, স্কট্‌লাণ্ডে ও আয়র্‌লাণ্ডে, এবং আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র ও কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে, ইংরেজ-জাতীয় ও অন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া তদ্রূপ **ইংরেজী ভাষা** ; এবং তিন হাজার বৎসর পূর্বে, প্রাচীন ভারতে আর্য-জাতির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া তদ্রূপ **প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা** (অথবা সংস্কৃত)।

[১.১৩] ভাষার সংজ্ঞা

[১.১৩১] মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।

দেশ-, কাল- ও সমাজ-ভেদে, ভাষার রূপ-ভেদ দেখা যায়।

[১.১৩২] মুখ্যতঃ মানুষের মুখের কথাকে অবলম্বন করিয়াই ভাষা ('কথা বলা'-র অর্থে সংস্কৃত « ভাষ্‌ » ধাতু হইতে ; Speech, Language)। ইঙ্গিত, স্পর্শ, মূক ও বধিরের হস্ত-সঙ্কেত, বংশী-ধ্বনি বা অন্য বাদ্য-ধ্বনির দ্বারা বিশেষ কোনও আজ্ঞা- বা সংবাদ-জ্ঞাপন, বিশেষ কোনও রঙের দ্বারা ভাব-প্রকাশ—অল্প-বিস্তর-ভাবে ভাব-দ্যোতনার সহায়ক হইলেও, যথার্থ-রূপে এগুলি 'ভাষা'-পদ-বাচ্য নহে।

[১.২] ভাষা-লিখন

[১.২১] কানে যে ভাষা শোনা যায়, সেই শোনা ভাষাকে চোখের সামনে প্রকাশ করার নাম লেখা। লেখার কার্যে, উচ্চারিত ও শ্রুত

বিশেষ কোনও ধ্বনির প্রতীক (Symbol)-রূপে বিশেষ কোনও চিহ্ন (Sign) ব্যবহার করা হয়।

[১.২১১] যেমন-যেমন ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়, সাধারণতঃ তেমন-তেমন তাহাদের প্রতীকগুলিও পর-পর লিখিত হয়; যথা, বাঙ্গালা হাত « হাত » (=[হ্+া=আ+ত=ত্]), ইংরেজী hand « হ্যান্ড্ » (=h+a+n+d, [হ্+অ্যা+ন্+ড্])।

[১.২১২] কখনও-কখনও এইরূপ হইয়া থাকে যে, কোনও ভাষার ধ্বনি-লিখনে, একই চিহ্ন-দ্বারা একাধিক ধ্বনি প্রকাশ করা হইয়া থাকে; যেমন, ইংরেজী a-দ্বারা « এ » (hate=হেই-ট্), « অ্যা » (hat=হ্যাট্), « আ » (hard=হা-র্ড্), « অ » (ball=ব-ল্) প্রভৃতি অনেকগুলি ধ্বনি দ্যোতিত হয়; বাঙ্গালা « জ » দ্বারা ইংরেজী j ও z, উভয়ের ধ্বনি দ্যোতিত হয়। আবার কখনও-কখনও এরূপ হয় যে, একাধিক চিহ্ন মিলিত-ভাবে একটীমাত্র সরল ধ্বনিকে প্রকাশিত করে; যেমন ইংরেজীতে sh (s ও h)-দ্বারা « শ্ »-এর ধ্বনি, nation শব্দে tio-দ্বারা « শ »-এর ধ্বনি, neigh শব্দে eigh-দ্বারা দীর্ঘ « এ »-কারের ধ্বনি, night শব্দে igh-দ্বারা সন্ধ্যক্ষর « আই »-এর ধ্বনি; বাঙ্গালায় « শ্ব » শব্দে, সংযুক্ত বর্ণ « স্+ব্ »-দ্বারা « শ্ »-এর ধ্বনি; « ক্ষমা » শব্দে, « ক্ষ » অর্থাৎ « ক্+ষ্ »-দ্বারা কেবলমাত্র « খ »-এর ধ্বনি; ইত্যাদি। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, প্রাচীন উচ্চারণ ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের পরিবর্তন সহজে করা হয় না, সুতরাং কাল-ক্রমে একটা অসঙ্গতি ঘটিয়া যায়।

[১.২১৩] আবার কখনও-কখনও এইরূপ হয় যে, দুইটি বিভিন্ন ধ্বনির বিভিন্ন চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ধ্বনি দুইটী পাশাপাশি আসিলে, নূতন চিহ্ন-দ্বারা তাহাদের মিলিত বা সংযুক্ত অবস্থান দেখানো হয়; যেমন, বাঙ্গালায় « ক্ » এবং « উ » মিলিয়া, « কউ » না হইয়া হইল « কু »; « হ্ » ও « ম » একত্র থাকিলে হইয়া যায় « হ্ম »; « ক্ » ও « ত » মিলিত হইয়া দাঁড়াইল « ক্ত »; « ক্ » ও « ষ » মিলিয়া « ক্ষ »; ইংরেজীর k+s বা g+z মিলিত হইয়া x; জাপানী বর্ণমালায় [ン]=« ন্ », [イ]=« ই », কিন্তু « ন্+ই » বা « নি »-র জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ একটী অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে—[ニ]। এইরূপ ব্যত্যয়ের কারণ—কোথাও-বা প্রাচীন সংযুক্ত বর্ণের বিকৃতি (যেমন, « ক্ষ », « ক্ত », « হ্ম » প্রভৃতিতে—« ক্ত »-এ « ক »-এর আকৃতি ও « ত »-এর পূর্ণ রূপ

দেখা যাইতেছে, « ক্ষ » এবং « হ্ম »-এর প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে « হ্ » ও « ম » এবং « ক্ » ও « ষ » পৃথক্-পৃথক্ ধরা যায়) ; আর কোথাও বা, মূলে অক্ষর-সৃষ্টি-কালেই, মিলিত-বর্ণের স্থলে নূতন বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল, সংযোগ করিয়া হয় নাই (বাঙ্গালার স্বর-বর্ণ « আ, ই, ঈ, উ, ঊ » প্রভৃতির ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত যুক্ত রূপের সম্বন্ধে, ইংরেজীর x-এর সম্বন্ধে, ও জাপানী বর্ণমালার যৌগিক রীতি-সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়)।

[১.২২] মানুষের মনের ভাব যেমন শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে, তেমনি কেবলমাত্র বস্তুর বা ক্রিয়ার অনুকারী চিত্র, অথবা ক্রিয়া বা মনোভাবের কল্পিত প্রতীক-দ্বারা লিখিত হইয়াও প্রকাশিত হইতে পারে ; যেমন, নীচের ছবিগুলির দ্বারা

যথাক্রমে, 'ঘোড়া', 'চক্ষু', 'অশ্রু' (অথবা 'অশ্রুপাত', অর্থ-প্রসারে 'রোদন', 'বেদনা' বা 'দুঃখ'), 'সূর্য' এবং 'গমন', এই বস্তু, ভাব ও ক্রিয়াগুলি প্রদর্শিত হইল ; তদ্রূপ, [*] দ্বারা 'তারা' বা 'ফুল', [+] দ্বারা 'যোগ করা'র ভাব, [÷] দ্বারা ভাগ করার ভাব, [√] দ্বারা 'মূল' বা 'ধাতু', [5] দ্বারা 'পঞ্চ সংখ্যা', [%] দ্বারা 'শত-করা', [=] দ্বারা 'সমতা', [½] দ্বারা 'দুইভাগের এক ভাগ, অর্ধ', ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে, এইরূপ চিত্র বা প্রতীক লিখিয়া, আমরা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি ; এইরূপ চিত্র-লিপি (Pictogram) ও ভাব-লিপি বা প্রতীক-লিপি (Ideogram), পদার্থ-দ্যোতক,—উচ্চারিত ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া নহে, একেবারে পদার্থকেই (বস্তু, ক্রিয়া, গুণ, ভাব প্রভৃতিকেই) অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান ; যে-কোনও জাতির হউন না কেন এবং যে-কোনও ভাষা বলুন না কেন, প্রতীকগুলির অর্থ-বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি, এই চিত্র ও প্রতীক দেখিয়া, ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন ; তাঁহার নিজের অথবা লেখকের কথিত বা উচ্চারিত ভাষায়,

এবং [*, +, ÷, √, 5, %, =, ½] প্রভৃতি চিত্র বা প্রতীককে তিনি যাহাই বলুন না কেন। প্রাচীনকালে মিসরীয়, কাল্দীয় এবং আমেরিকার আজ্‌তেক ও মায়া প্রভৃতি কতকগুলি জাতির মধ্যে এবং আধুনিক কালেও চীনাদের মধ্যে, যে লিখন-

প্রণালী প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা অনেকাংশে এই প্রকার ধ্বনি-নিরপেক্ষ, এবং পদার্থ-চিত্রময় বা ভাব প্রতীকময়। বাঙ্গালা, ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি লিখিত ভাষাগুলিতে ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালার প্রয়োগ আছে, সেগুলির অন্তর্নিহিত লিখন-পদ্ধতি, চীনা প্রভৃতি ভাষার ধ্বনি-নিরপেক্ষ চিত্র- ও ভাব-প্রতীক প্রধান লিখন-পদ্ধতি হইতে একেবারে পৃথক্।

[১.৩] সাহিত্যের ভাষা ও কথিত ভাষা

[১.৩১] যে-সমস্ত জন-সমাজে, প্রাচীন কাল হইতেই, তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষার চর্চা আছে ও সেই ভাষায় কাব্যাদি রচিত হয়, প্রায়ই তাহাদের ভাষার দুইটী রূপ পাওয়া যায় : একটী, তাহার লিখিত (অথবা মুখে-মুখে প্রচারিত) সাহিত্যের রূপ ; এবং আর একটী, তাহার মৌখিক অথবা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় কথোপকথনের রূপ। স্থান ভেদে এবং সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও উচ্চ-নীচ স্তর-ভেদে, ভাষার মৌখিক রূপের মধ্যেও আবার অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

[১.৩২] সাহিত্যের ভাষা সাধারণতঃ একটু প্রাচীন-পন্থী হইয়া থাকে; ভাষার প্রাচীন অবস্থায় ব্যবহৃত শব্দ ও রূপ প্রভৃতি ইহাতে একটু বেশী করিয়া রক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, একাধিক প্রাদেশিক ভাষার প্রভাবও সাহিত্যের ভাষায় দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন, বহু স্থলে এরূপ হইয়া থাকে যে, সাহিত্যের ভাষা যদি অধিক মাত্রায় প্রাচীনতার পক্ষপাতী হয় এবং মৌখিক ভাষা হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহা হইলে ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন করিয়া আবার নূতন একটী সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠে।

*[১.৪] বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা

[১.৪১] সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষাকে সাধু-ভাষা বলে। সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্য-লেখায়, চিঠি-পত্রাদিতে প্রায়শঃ এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়।

[১.৪২] জেলা- এবং বহু স্থলে মহকুমা-ভেদে, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আর সমস্ত ভাষার ন্যায়, বাঙ্গালা মৌখিক ভাষারও নানা রূপ আছে। তন্মধ্যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজ-কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ নগরী বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র-স্থান ছিল বলিয়া, এবং কলিকাতা নগরী বঙ্গদেশের (এবং ১৯১২ সালের শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের) রাজধানী থাকায় ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ষের কেন্দ্র হওয়ায়, এইরূপ ঘটিয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেষ-ভাবে **চলিত-ভাষা** বা **চল্‌তি ভাষা** বলা হয়; এবং অধুনা, সাহিত্যে সাধু-ভাষার পার্শ্বে, এই মৌখিক বা চলিত-ভাষার আধারের উপরে স্থাপিত আর একটী সাহিত্যিক ভাষা বিশেষ স্থান পাইয়াছে; সেই নূতন সাহিত্যিক ভাষাকেও **চলিত-ভাষা** বলা হয়।

[১.৪৩] অতএব, আজকালকার সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষার দুইটী রূপ: [১] সাধু-ভাষা, ও [২] চলিত ভাষা। আধুনিক বাঙ্গালার মুদ্রিত পুস্তক-পত্রিকাদি, গদ্য ও পদ্য, পড়িয়া বুঝিতে হইলে, এই দুই প্রকারেরই ভাষা-সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে হইলে, সাধু-ভাষা ভাল করিয়া জানা প্রথম আবশ্যক; বাঙ্গালা নাটক, উপন্যাস ও কবিতা লিখিতে হইলে, সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা উভয়েরই প্রয়োগ জানা আবশ্যক।

[১.৪৩১] সাধু-ভাষা সমগ্র বাঙ্গলা দেশের সম্পত্তি, ইহার আলোচনার একটী রীতি-মত প্রয়াস সর্বত্র প্রচলিত থাকায়, ইহাতেই লেখা এখন সকল বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ। এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি (বিশেষতঃ ক্রিয়াপদে) প্রাচীন বাঙ্গালার—তিন-চার শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার—রূপ; এই-সমস্ত রূপ সর্বত্র মৌখিক ভাষায় আর ব্যবহৃত হয় না।

আবার এই ভাষা মুখ্যতঃ পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীন মৌখিক ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব-বঙ্গেরও বহু রূপ এবং বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে। (সাধু-ভাষার শব্দ-রূপে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তিতে « -রে » ক্রিয়াপদের ঘটমান কাল-রূপে « -ইতেছে, -ইতেছিল », সামান্ত অতীতে « ইলাম »—এগুলি পূর্ব-বঙ্গের ভাষার রূপ)। সাধু-ভাষায়, সমস্ত প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত, সর্বজন-বোধ্য সংস্কৃত শব্দই বেশী করিয়া প্রযুক্ত হয়। ইহার বাক্য-রীতিও কতকটা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। মোটের উপর, সাধু-ভাষার যে একটী সহজ গাম্ভীর্য, আভিজাত্য এবং সৌষম্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

[১.৪৩২] চলিত-ভাষা কিন্তু ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থান-সমূহের মৌখিক ভাষার রূপান্তর বলিয়া, ইহার সহিত ঐ অঞ্চলের একটী বিশেষ যোগ আছে—সে-রূপ যোগ অন্য অঞ্চলের মৌখিক ভাষার সহিত ততটা নাই। ইহাতে ব্যবহৃত প্রাদেশিক শব্দাবলী, ইহার চটুল গতি, ইহার বিশিষ্ট বাক্য-ভঙ্গী—সমস্তই জীবন্ত। লেখায় ও কথোপকথনে ভাল-রূপে এই ভাষার প্রয়োগ করা, বাঙ্গালা দেশের অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে অনেক সময়ে শিক্ষা-সাপেক্ষ হইয়া থাকে।

[১.৪৩৩] সাহিত্যে বা কথোপকথনে, এই দুই ভাষার মিশ্রণ সম্পূর্ণ-রূপে বর্জনীয়—হয় বিশুদ্ধ সাধু-ভাষার প্রয়োগ করা উচিত; না হয় অন্য স্থানের প্রাদেশিক বা গ্রাম্য শব্দ, তথা সাধু-ভাষার বিশিষ্ট রূপ, এই উভয়েরই সহিত অ-বিমিশ্রিত, ভাগীরথী-তীরের মৌখিক ভাষার ব্যাকরণ-সম্মত ও বাক্য-ভঙ্গীর অনুমোদিত চলিত-ভাষার প্রয়োগ করা উচিত।

চলিত-ভাষা প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি ভাল-রূপে আয়ত্ত করা উচিত; নহিলে, যাহারা সহজ-ভাবে ঘরে এই ভাষা বলে, তাহাদের ভাষা-জ্ঞান-অনুসারে, নানা ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইবারই সম্ভাবনা

থাকে—চলিত-ভাষা প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী বহু লেখকের লেখা হইতে ইহা দেখা যায়।

[১.৪৪] বাঙ্গালা সাধু, চলিত ও প্রাদেশিক ভাষার নিদর্শন

সাধু-ভাষা—এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে বলিল (বা কহিল), "পিতঃ, আপনার সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দিউন (বা দিন্)।" তাহাতে তাহাদিগের (বা তাহাদের) পিতা নিজ সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

চলিত-ভাষা—একজন লোকের দুটী ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটী বাপকে ব'ললে, "বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাবো, তা আমাকে দিন্।" তাতে তাদের বাপ নিজের বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ-ক'রে (বেঁটে) দিলেন।

প্রাদেশিক ভাষা—ঢাকা (মাণিকগঞ্জ)—এক জনের দুইডি ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্ধে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার ভাগে যে বিত্তি-বেসাদ পরে, তা আমারে দেও।" তাতে তাগো বাপে তান বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্ধে বাইটা দিল্যান।

প্রাদেশিক ভাষা—মানভূম—এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মধ্যে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক, "বাপ হে, তোমার দৌলতের যা হিস্‌সা আমি পাবো, তা আমাকে দাও।" এতে তাদের বাপ আপন দৌলৎ তাদের মধ্যে বাখরা ক'রে দিলেক্।

প্রাদেশিক ভাষা—চট্টগ্রাম—উগ্‌গোয়া মাইন্‌ষের দুয়া পোয়া আছিল্। তার মৈদ্ধে ছোড়ুয়া তার ব-রে কইল, "বা-জি, অঁওনর্ সম্পত্তির মৈদ্ধে যেই অংশ আঁই পাইয়ুম্, হেইইন্ আঁরে দেওক্।" তখন্ তারার বাপ তারার মৈদ্ধে নিজের সম্পত্তি ভাগ করি দিল্।

প্রাদেশিক ভাষা—কোচবিহার—একজনা মান্‌সির দুই-কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্ধে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল্, "বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্, তাক্ তমোক্‌দেন।" তাতে উয়ার উয়ার মাল-মাত্তা দোনো বেটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল্।

[১.৪৫] বাঙ্গালা দেশের জন-সাধারণ-মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা বলিয়া এই ভাষার নাম « বাঙ্গালা ভাষা », সংক্ষেপে « বাঙ্গালা »। এই নামটীর নিম্ন-লিখিত বিভিন্ন বানান দেখা যায়—

দেশ-অর্থে	ভাষা-অর্থে	জাতি-অর্থে
বাঙ্গালা	বাঙ্গালা	(১) বাঙ্গালী, বাঙালী
বাঙ্গলা	বাঙ্গলা	=সাধারণ-ভাবে বঙ্গবাসী
বাংলা	বাংলা	(২) বাঙ্গাল, বাঙাল=বিশেষ-ভাবে
বাঙলা (বাং্লা)	বাঙলা (বাঙ্লা)	বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ-বাসী

[১.৪৫১] « বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাংলা, বাঙলা (বাঙ্লা) »; কোন্ বানান ঠিক ? শব্দটীর মূল হইতেছে সংস্কৃতে প্রাপ্ত শব্দ « বঙ্গ »; প্রাচীন কালে ইহার দ্বারা কেবল পূর্ব-বঙ্গকে বুঝাইত, এখনকার মত ব্যাপক-ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশকে বুঝাইত না। প্রাচীন কালে « রাঢ় » ও « সুহ্ম »-দ্বারা পশ্চিম-বঙ্গকে বুঝাইত; « কামরূপ » বা « প্রাগ্‌জ্যোতিষ » অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিম-আসামের সহিত উত্তর-বঙ্গ সংশ্লিষ্ট ছিল; উত্তর-মধ্য-বঙ্গের নাম ছিল « বরেন্দ্র », এবং দক্ষিণ-বঙ্গের ব দ্বীপের নাম ছিল « সমতট »; « বঙ্গদেশ » বা পূর্ব-বঙ্গের সহিত পার্থক্য জানাইবার জন্য, পশ্চিম-বঙ্গকে এবং কখনও-কখনও পশ্চিম-বঙ্গ ও বরেন্দ্র-ভূমিকে মিলিত-ভাবে, « গৌড়দেশ » বলা হইত; সারা বাঙ্গালার « গৌড় বঙ্গ » এই যুগ্ম বা মিলিত নাম প্রচলিত ছিল; 'বাঙ্গালী' অর্থে « গৌড়িয়া » শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বঙ্গভাষায় আছে; « গৌড়-জন », « গৌড়ীয় ভাষা », এই শব্দদ্বয়ও প্রযুক্ত হইত।

[১.৪৫২] « বঙ্গ »-শব্দের উত্তর, অধিবাসী-অর্থে « -আল » প্রত্যয় যোগে « বঙ্গাল »-শব্দ, পূর্ব-বঙ্গের অধিবাসিগণকে উল্লেখ করিতে ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম-অনুসারে, সংযুক্ত-বর্ণের পূর্বের স্বর-ধ্বনিকে দীর্ঘ করিয়া, পরে « বাঙ্গাল » (=বাঙ্‌গাল) এই রূপ দাঁড়াইল; পশ্চিম-বঙ্গে « ঙ্গ » অর্থাৎ « ঙ্+গ »-এর « গ »-কে বহু স্থলে উচ্চারণ করা হয় না, তাই পশ্চিম-বঙ্গে এই শব্দের বিকার দাঁড়াইল « বাঙাল্ »। গৌড় (পশ্চিম-বঙ্গ) ও পরে বঙ্গ (পূর্ব-বঙ্গ) ক্রমে তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইল, তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের নাম, « গৌড়-বঙ্গ » নামের পরিবর্তে, « বঙ্গালহ্ » রূপে গৃহীত হইল; তুর্কীরা এ দেশে রাজকার্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিত, ফারসীতে « ব-ঙ্গা-ল » শব্দটী « বঙ্গালহ (বা বঙ্গালা) » রূপ ধারণ করে। « গৌড়িয়া ও বাঙ্গাল » অর্থাৎ পশ্চিম ও

পূর্ব বঙ্গের বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট বিদেশীর দেওয়া এই নাম স্বীকৃত হইল, এবং দেশবাসীর মুখে ইহার রূপ দাঁড়াইল «বাঙ্গালা»। মধ্য-যুগের বঙ্গভাষার রূপ-হিসাবে, «বাঙ্গালা»-শব্দকে আধুনিক সাধু-ভাষার রূপ বলা যাইতে পারে। মৌখিক ভাষায় শ্বাসাঘাত বা বল বা ঝোঁক এই «বাঙ্গালা» শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর «-ঙ্গা-» হইতে আদ্য অক্ষর «বা-»-তে নীত হইলে, দ্বিতীয় অক্ষর দুর্বল হইয়া পড়িয়া, অবশেষে তাহার আ-কার ধ্বনিকে হারাইল, তাহার ফলে «বাঙ্গলা» বা «বাঙ্গ্‌লা»। ইহাই আজকালকার কথিত রূপ। পশ্চিম-বঙ্গে «ঙ্গ» অর্থাৎ «ঙ্‌গ»-এর «গ» লোপ পাওয়ায়, «বাঙ্‌লা» এই রূপের উদ্ভব; এবং অনুস্বারের ধ্বনি বাঙ্গালা ভাষায় «ঙ»-এর উচ্চারণের সহিত অভিন্ন হইয়া দাঁড়ানোর ফলে, «বাঙ্‌লা» শব্দকে «বাংলা» রূপে লেখা হয়। কিন্তু «বাঙালি—বাঙালী», এই শব্দ-দ্বয়ে অনুস্বার লেখা অসম্ভব। সুতরাং এগুলির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, অনুস্বার দিয়া «বাংলা» না লিখিয়া, চলিত-ভাষায় «বাঙলা (বা বাঙ্‌লা)» লেখাই ভাল।

[১.৪২৩] এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে অনুস্বারের যে উচ্চারণ ছিল (নিম্নে দ্রষ্টব্য), তাহার বিচার করিলে অনুস্বার-যুক্ত «বাংলা» শব্দের সংস্কৃত মতে উচ্চারণ দাঁড়ায় «বাঁলা»; উত্তর ভারতে এখন অনুস্বার-যুক্ত «বাংলা» উচ্চারিত হইবে «বান্‌লা» রূপে, দক্ষিণ-ভারতে «বাম্‌লা» রূপে। এই-সমস্ত কারণে, «ঙ»-দিয়া «বাঙ্‌লা» লেখাই যুক্তিযুক্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে—

«বাঙ্গালা»—সাধু-ভাষার পূর্ণ বা শুদ্ধ রূপ।

«বাঙ্গলা»—সাধু ভাষার আধুনিক ভগ্ন বা বিকৃত রূপ।

«বাঙ্গ্‌লা»—পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ-অনুযায়ী রূপ।

«বাঙলা (বাঙ্‌লা)»—পশ্চিম-বঙ্গের কথিত ভাষার ও তদনুসারে চলিত-ভাষার রূপ।

[১.৫] ব্যাকরণ

[১.৫১] যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটী আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে।

[১.৫২] বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই ভাষার স্বরূপটী সব দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধ-রূপে (অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সেই রূপে) ইহা পড়িতে ও লিখিতে ও ইহাতে বাক্যালাপ করিতে পারা যায়, সেইরূপ ব্যাকরণ বুঝায়।

[১.৫২১] ইহাই হইল সাধারণ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। এতদ্ভিন্ন, প্রাদেশিক বা সম্প্রদায়-নিবদ্ধ মৌখিক বাঙ্গালারও ব্যাকরণ হইতে পারে, যাহার দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক ভাষার আলোচনা করা যায়, এবং সেই ভাষা যাঁহারা বলেন, যথাসম্ভব তাঁহাদেরই ন্যায় বলিতে সাহায্য পাওয়া যায়।

[১.৫৩] 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হইতেছে 'বিশ্লেষণ' বি+আ+কৃ বা কর্+অন, অর্থাৎ 'বিশেষ এবং সম্যক্-রূপে বিশ্লেষণ করা'। ব্যাকরণ-বিষয়ক পুস্তক-অর্থে, কেবল 'ব্যাকরণ'-শব্দ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইংরেজী Grammar শব্দ, গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত, ইহার অর্থ 'শব্দ-শাস্ত্র'। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যাকরণের চর্চা হইয়া আসিতেছে; সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-রচনায়, প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ অপূর্ব চিন্তা, বিজ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের কথিত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাগুলির ব্যাকরণও বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে, মৌখিক ও অর্বাচীন ভাষা বলিয়া, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতেরা অবহিত হয়েন নাই।

[১.৫৪] বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সর্ব-প্রথম লেখেন একজন বিদেশীয়—পোর্তুগীস পাদ্রি মানোএল-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্ (Manoel da Assumpçam)—১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, এখন হইতে দুই শত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বোআ বা লিস্‌বন্ নগরীতে, রোমান অক্ষরে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়—তখন ছাপিবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষর তৈয়ারী হয় নাই। এই বইয়ে, ঢাকার ভাওয়াল-অঞ্চলে তখনকার দিনে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিদ্বান্ নাথানিএল ব্রাসি হাল্‌হেড্ (Nathaniel Brassey Halhed) হুগলী হইতে ইংরেজী ভাষায়

তাঁহার বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন ; এই বইয়ে বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ-কার্য হইয়াছিল। হালহেড্-এর পরে অনেক ব্যাকরণ লেখা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমে মনীষী রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন (১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বই প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়)।

[১.৬] ব্যাকরণের বিভাগ

[১.৬১] কোনও ভাষার ব্যাকরণে, নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি লইয়া সেই ভাষার স্বরূপের ও প্রয়োগের আলোচনা হইয়া থাকে—

১। ভাষার ধ্বনি (Sounds)-সম্পর্কীয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া, ইহার ধ্বনি-তত্ত্ব (Phonology) : ভাষা-গত ধ্বনিগুলির উচ্চারণ (Phonetics), ধ্বনিগুলির ক্রিয়া (Phonology) ; ভাষার ভদ্র বা শিষ্ট সমাজে প্রচলিত উচ্চারণ (Orthoëpy) ; ছন্দোবিধি (Metrics, Prosody) ; এবং ভাষা-লিখনে শুদ্ধ বর্ণ-বিন্যাস (Orthography), তথা লিখনে যতিচ্ছেদ-বিধান (Punctuation)—এই-সমস্ত বিষয় ধ্বনি-তত্ত্বের অন্তর্গত।

২। ভাষার শব্দের রূপ (Forms)-সম্পর্কীয় নিয়ম : রূপ-তত্ত্ব (Morphology) বা প্রক্রিয়া (Accidence), অথবা শব্দ- ও পদ-সাধন (Etymology, বা Affixation ও Inflexion) ; কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় (Primary and Secondary Formative Affixes), সমাস (Composition), সুপ্-তিঙ্ (Noun and Verb Inflexions), তথা অব্যয় বা নিপাত (Indeclinables, Particles)—এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা রূপ-তত্ত্বের অন্তর্গত।

৩। ভাষার বাক্য-গত শব্দের ক্রম (Word-Order) বা বাক্য-রীতি (Syntax) ; বাক্য-বিশ্লেষ (Analysis of Sentences) ইহার অন্তর্গত।

[১.৬২] উপরে যে ব্যাকরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে **বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ** (Descriptive Grammar)—বিশেষ কোনও কালে বা যুগে, কোনও একটী ভাষার রীতি ও প্রয়োগ বর্ণনা করা ইহার বিষয়; এবং ইহার উদ্দেশ্য—সেই বিশেষ কালের ভাষা যথাযথ ব্যবহার করিতে সাহায্য করা। বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ ব্যতীত, **ঐতিহাসিক ব্যাকরণ** (Historical Grammar) ও **তুলনা-মূলক ব্যাকরণ** (Comparative Grammar) আছে। এই দুই প্রকার ব্যাকরণের উদ্দেশ্য—ভাষা-গত আধুনিক বা কোনও নির্দিষ্ট যুগের প্রয়োগ (উচ্চারণ-রীতি, ধ্বনি-তত্ত্ব, প্রত্যয়াদি) আলোচনা করিবার কালে, সঙ্গে-সঙ্গে তত্তৎ বিষয়ের বিকাশ বিচার করা—ভাষার প্রাচীনতর অবস্থায় কি ছিল তাহার আলোচনা করা, এবং সম্পৃক্ত অন্য ভাষার প্রয়োগ ও রীতির সহিত মিলাইয়া দেখিয়া, আলোচ্য ভাষার রূপটীর উৎপত্তি ও বিকাশের ঐতিহাসিক (অর্থাৎ ক্রমাগত) ধারাটী বাহির করা। এতদ্ভিন্ন, **দার্শনিক-বিচার মূলক ব্যাকরণ** (Philosophical বা Psychological Grammar) আছে; ইহার উদ্দেশ্য—ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তা-প্রণালীটীকে ধরিবার চেষ্টা করা, এবং সেই চিন্তা-প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া, সাধারণ-ভাবে বা বিশেষ-ভাবে কি করিয়া ভাষার রূপের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহার বিচার করা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয় যে বাঙ্গালার বিশেষ্যের সম্বন্ধ-পদে «-র» বা «-এর» বিভক্তি যুক্ত হয়, সর্বনামে উত্তম-পুরুষে একবচনে «আমি» শব্দ বিদ্যমান, ক্রিয়ার অতীতে «-ইল-» প্রত্যয় যুক্ত হয়, এবং ক্রিয়ার বিশেষণে «হেন, যেন, কেন» প্রভৃতি পদের ব্যবহার আছে, ও বিশেষ-বিশেষ অর্থে এগুলি প্রযুক্ত হয়। এই প্রকার উপদেশ বা শিক্ষা, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। ঐতিহাসিক ও তুলনা-মূলক ব্যাকরণের প্রসাদে আমরা পূর্বোক্ত «-র, -এর», «-ইল-» প্রভৃতি প্রত্যয়ের উৎপত্তি বুঝিতে পারি,—কেমন করিয়া সংস্কৃতের সম্বন্ধ-পদ-বাচক বিভক্তি-সমূহের লোপ হইল, কেমন করিয়া প্রাকৃতে «কার্য» শব্দ হইতে উৎপন্ন «-কের» শব্দের ও তদনুরূপ «-কর» শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধ-পদে আসিয়া গেল, ও কি ভাবে এই «-কের» ও «-কর» হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় «-এর, -অর» দাঁড়াইল;—কেমন করিয়া সংস্কৃতের অতীত-কালের ক্রিয়াপদ-গুলি লোপ পাইল, «-ইত» বা «-ত» -প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ অতীত-কালে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, প্রাকৃতে এই «-ইত, -ত» প্রত্যয় «-ইঅ,-অ»-তে পরিবর্তিত হইল,

এবং প্রাকৃতের « -ইল্ল » প্রত্যয়, এই « -ইঅ, -অ »-তে যুক্ত হইতে লাগিল, ও পরে এই « *ইঅ-ইল্ল » হইতে ক্রমে বাঙ্গালার অতীত-কালের ক্রিয়ার চিহ্ন « -ইল- » প্রত্যয়ের উৎপত্তি ঘটিল (যেমন, « চলিত—চলিঅ—*চলিঅ-ইল্ল—*চলিল্ল—চলিল ») ; « হেন, যেন, কেন » প্রাচীন বাঙ্গালায় « এহেন, জেন্হ, কেন্হ » বা « এহেন, জেহেন, কেহেন » রূপে ছিল ; এবং বাঙ্গালার নিকট-আত্মীয় মৈথিলী ভাষার « এহন, জেহন, কেহন » -এর সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার রূপগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট বিদ্যমান ; ইহাদের মূল রূপ ছিল সংস্কৃতের « ঈদৃশ-, যাদৃশ-, কাদৃশ- » ; এই-সমস্ত বিষয়, ঐতিহাসিক ও তুলনা-মূলক ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। দার্শনিক-বিচার-মূলক ব্যাকরণে, সম্বন্ধ-পদের বা অতীত-কালের ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত চিন্তাধারার দার্শনিক আলোচনা করিয়া, ইহাদের যোগ্যতার বিচার হইয়া থাকে।

বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ—অর্থাৎ সাধারণ ভাবে 'ব্যাকরণ'—বলিলে, আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি—তাহা হইতেছে 'ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতি বা সাধন' (Art of Language) অথবা 'শব্দানুশাসন' (Regulations of a Language) ; ঐতিহাসিক ও তুলনা-মূলক ব্যাকরণ হইতেছে 'ভাষা-বিজ্ঞান' (Science of Language) ; দার্শনিক-বিচার-মূলক ব্যাকরণ হইতেছে 'ভাষা-বিষয়ক দর্শন' (Philosophy বা Psychology of Language)।

[১.৭] বাঙ্গালা ভাষার শব্দাবলী

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ—অর্থাৎ ইহার ধ্বনি-তত্ত্ব, রূপ-তত্ত্ব ও বাক্য-রীতি—আলোচনা ও অনুশীলন করিবার পূর্বে, এই ভাষার অন্তর্গত শব্দাবলী-সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাবশ্যক তথ্য জানা উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি নিম্নে আলোচিত বিভিন্ন পর্যায় বা শ্রেণীতে পড়ে।

[১.৭১] ১। **বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দ**—যেগুলিকে লইয়াই এই ভাষার বৈশিষ্ট্য—ইহার 'বাঙ্গালা-ত্ব'। এই শব্দগুলি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির সময় হইতেই এই ভাষায় বিদ্যমান আছে। ভারতের সুপ্রাচীন

কালে আর্য-জাতি যে ভাষায় কথা বলিতেন, ভারতীয় সেই 'আদি-আর্য-ভাষা' ('বৈদিক,' বা 'সংস্কৃত') বংশ-পরম্পরা-ক্রমে লোক-মুখে বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া, 'প্রাকৃত' রূপ ধারণ করিল ; আদি-আর্য-যুগের শব্দাবলী তাহাদের পূর্ব বিশুদ্ধি বা পূর্ণতা রক্ষা করিতে না পারিয়া, পরিবর্তিত হইয়া গেল ; এইরূপ পরিবর্তিত বা বিকৃত শব্দকে তদ্ভব শব্দ বলে ; « তদ্ভব, বা তদ্-ভব », অর্থাৎ « তৎ » ('তাহা,' অর্থাৎ মূল আর্য-ভাষা সংস্কৃত যাহার প্রকৃষ্ট রূপ) হইতে « ভব » (অর্থাৎ 'উৎপত্তি') যাহার— « তদ্ভব », অর্থাৎ আদি-আর্য-ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দ। যেমন « কৃষ্ণ »> « কণ্‌হ », « আবিশতি »> « আবিসদি, আইসই », « কার্য »> « কয্য, কজ্জ », « হস্ত »> « হত্থ » ইত্যাদি। এই রূপ আর্য-শব্দ ব্যতীত, প্রাকৃত ভাষাতে বহু অনার্য শব্দ ও অজ্ঞাত মূল শব্দ আসিয়া গেল,—এইরূপ শব্দকে দেশী শব্দ বলা হয় ; যথা, « পোট্ট » = 'পেট', « চঙ্গ » = 'ভাল', « ঢুণ্ট » = 'অন্বেষণ', « গোড্ড » = 'পা' ইত্যাদি। প্রাচীন-ভারতে, বিদেশীয়দের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে, দুই-দশটা বিদেশী শব্দও গ্রীক, প্রাচীন-পারসীক প্রভৃতি ভাষা হইতে প্রাকৃতে প্রবেশ লাভ করিল ; যথা, « দ্রম্ম » বা « দম্ম » (= 'মুদ্রা-বিশেষ' ; প্রাচীন গ্রীক drakhmē [দ্রাখ্‌মে] হইতে), « মোচিঅ » (= 'চর্মকার', প্রাচীন পারসীক mocak [মোচক্] হইতে, mocak অর্থে 'পাদত্রাণ, বুট্-জুতা') ইত্যাদি।

[১.৭১১] প্রাকৃতের এই সমস্ত « তদ্ভব », « দেশী » ও « বিদেশী » শব্দ, কাল-ক্রমে আরও পরিবর্তিত হইয়া, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে, বাঙ্গালা শব্দে পরিণত হইল ; এবং তখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব ঘটিল ; যেমন, « কৃষ্ণ »> « কণ্‌হ »> প্রাচীন বাঙ্গালা « কাণ্‌হ », মধ্য-যুগের বাঙ্গালা « কান », আদরে « -উ » এবং « -আই » প্রত্যয়-যোগে « কানু, কানাই » ; « আবিশতি »> « আইসই »> বাঙ্গালা « আইসে, আসে » ; « কার্য »> « কয্য, কজ্জ »> বাঙ্গালা « কাজ » ; « হস্ত »> « হত্থ »> প্রাচীন

বাঙ্গালা «হাথ», আধুনিক বাঙ্গালা «হাত্»; «পোট্ট»=বাঙ্গালা «পেট»; «চঙ্গ»>প্রাদেশিক বাঙ্গালা «চাঙ্গা»; «চুণ্ড»>বাঙ্গালা «চুঁড়»='খোঁজা'; «দম্ম»>বাঙ্গালা «দাম», মূল্য-অর্থে; «মোচিঅ» >বাঙ্গালা «মুচি»।

[১.৭১২] এইরূপ শব্দ হইতেছে খাঁটি বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দ, এবং (প্রাকৃতের «দেশী» ও «বিদেশী» শ্রেণীর শব্দ বাদে) এই শব্দগুলিকে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাচীন-আর্য-ভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে। এগুলিকে বাদ দিলে, বাঙ্গালা ভাষা চলে না বা থাকে না। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ সাধারণ বাঙ্গালা শব্দ এই প্রকারের; এবং প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা প্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিত ও বিভক্তি, এই-রূপে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত বা আদি-আর্য-ভাষা হইতে প্রাকৃত বা মধ্য-আর্য-ভাষা, প্রাকৃত হইতে নব্য আর্য-ভাষা বাঙ্গালা—ভাষার এই রূপ পরিবর্তনের স্রোতে বাঙ্গালায় যে উপাদান (শব্দ ও প্রত্যয়াদি) আসিয়াছে, তাহাকেই আমরা «খাঁটি বা মৌলিক বাঙ্গালা» বলিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ সমস্ত «তদ্ভব» শব্দ তো বটেই, প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত «দেশী» এবং «বিদেশী» শব্দগুলিকেও, এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, প্রাকৃত হইতে লব্ধ শব্দ ও খাঁটি বাঙ্গালা প্রত্যয়, উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দ সৃষ্টি করে, সেগুলিকেও এই পর্যায়ে ধরিতে হয়।

[১.৭১৩] বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ শব্দের নাম-করণ করা যায়—প্রাকৃত-জ শব্দ। সাধারণতঃ মূল সংস্কৃত বা আদি-আর্য-ভাষা হইতে আসিলেও, বহু শতাব্দীর পরিবর্তনে এগুলির রূপ বিশেষ-ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে, এবং বহু স্থলে ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার অথবা ঐতিহাসিক ও তুলনা-মূলক ব্যাকরণের সাহায্য না হইলে, এগুলির পরিবর্তনের গতি ধরা যায় না; আমাদের 'ঘরোয়া' এবং 'গাঁইয়া' বা 'গেঁয়ো' শব্দ, মানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,

সমাজ, সম্পর্ক, বৃত্তি, সাধারণ দৃশ্যমান প্রাকৃতিক বস্তু, পশু ও পক্ষী, এবং নিত্য-ব্যবহার্য বস্তু প্রভৃতির নাম, সাধারণ গুণ-বাচক বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক শব্দ, সর্বনাম, সাধারণ ক্রিয়া, সাধারণ অব্যয়, এবং প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি শব্দ ও শব্দাংশ, প্রায়শঃ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত—প্রাকৃত-জ শব্দ ; যথা :

মানব-দেহের অঙ্গাদি :—গা < গাত্র, হাত < হস্ত, পা < পাদ, প্রা-বাং মু < মুখ, মাথা < মস্তক, শির < শিরঃ, মুড়া < মুণ্ড-, চোখ < চক্ষুঃ, আঁখ < অক্ষি, কান < কর্ণ, নাক < *নক্ক (< নাস্ + -ক), দাঁত < দন্ত, কাঁধ < স্কন্ধ, আঙুল < অঙ্গুলি, বুক < বৃক্ক, কাঁখ < কক্ষ, জাঙ্ < জঙ্ঘা, পিঠ < পৃষ্ঠ ইত্যাদি।

সমাজ, সম্পর্ক, বৃত্তি :—মা < মাতা, ভাই < ভ্রাতৃ বা ভ্রাতা, বোন্ < বহিন < ভগিনী, পুত < পুত্র, ছেলে < ছালিআ < ছাবালিআ < শাব + -আল- + -ইক-, সৎমা < সপত্নী-মাতা, এয়ো < অহিবঅ < অবিধবা, মেয়ে < মাইআ < মাতৃকা, মামা < মাম-, খুড়া < খুল্লতাত < ক্ষুদ্র-তাত, দেওর < দেবর, ননদ < ননন্দা, ভাজ < ভ্রাতৃজায়া ; বিয়া < বিবাহ, ঘর < গৃহ, বাড়ী < বাটিকা < √বৃৎ, রায় < রাজা, বনুই < বলপতি ; বামুন < ব্রাহ্মণ, কামার < কর্মার, কুমার < কুম্ভকার, ছুতার < সূত্রকার—সূত্রধার, বাড়ুই < বর্ধকী, গোয়ালা < গোপাল-, রাখাল < রক্ষপাল, জেলে < জালিআ < জালিক-, চাষী < চাষ বা কর্ষ্ হইতে *চাষিক, কেওট < কেবট্ট < কৈবর্ত, সাঁওতাল < সামন্তপাল ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি :—ভুঁই < ভূমি, মাটী < মৃত্তিকা, পাহাড় < পাষাণ ; প্রা-বাং নই < নদী, সায়র < সাগর, দেয়া = 'মেঘ' < দেব ; চাঁদ < চন্দ্র ; প্রা-বাং সুজ < সূর্য ; তারা < তারকা, প্রা-বাং নখত্ত < নক্ষত্র- ; প্রা-বাং আগি < অগ্নি ; আঁধার < অন্ধকার ; আলো < আলোক ; বিজলী < বিদ্যুৎ- ; বাজ < বজ্র ; পুখুর < পুষ্করিণী ; সোনা < স্বর্ণ- ; রূপা < রৌপ্য- ; তামা < তাম্র ; লোহা < লৌহ- ; পলা < প্রবাল- ; চুন < চূর্ণ ; ভাত < ভক্ত ; মাস = মাংস < মাংস ; দুধ < দুগ্ধ ; শিং < শৃঙ্গ ; ঘী < ঘৃত, তেল < তৈল ; গাছ < গচ্ছ, পাতা < পত্র-, ফুল < ফুল্ল ; মাছ < মৎস্য ; পাখী < পক্ষিন্ ; পোক < পোক্ক ; ঘোড়া < ঘোটক- ; বাঘ < ব্যাঘ্র ; কুমীর < কুম্ভীর ; উদ = উদবিড়াল < উদ্র ; গো, ভাজন, গো সাপ < গোহ < গোধা, গোধিকা ; হাতী < হস্তিন্ ; উট < উষ্ট্র ; গাধা < গর্দভ ; ষাঁড় < ষণ্ড ; প্রা-বাং ছেলী < ছগল, ছগলিকা ; সালিক < সারিকা ; ঝিঁঝির < ঝিঞ্ঝিরী ; চড়াই, চড়ুই < চটক- ইত্যাদি।

নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি :—« কাপড় < কর্পট, ঘড়া < ঘট, ভাঁড় < ভাণ্ড ; প্রা-বাং সেজ < শয্যা, দেউটী < দীপবর্তিকা ; দাঁতন < দন্তধাবন, লাঠী < *লট্‌ঠিকা, কুড়ুল < *কুঠারিকা, দেরখো < দীপবৃক্ষ » ইত্যাদি।

সাধারণ গুণ-বাচক বিশেষণ :—« ভালো < ভদ্রক ; উঁচু < উচ্চ- ; কালো < কালক ; হলুদ < হরিদ্রা- ; সাচা < সত্য- ; মিছা < মিথ্যা- ; পাতলা < পত্র-ল- ; হালকা < লঘু ; মিঠা < মিষ্ট, মৃষ্ট- ; ভিজা < অভ্যক্ত, শুখা < শুষ্ক » ইত্যাদি।

সংখ্যা-বাচক শব্দ :—« এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ » ইত্যাদি ; « আধ < অর্ধ, সাড়ে < সার্ধ, আড়াই < অর্ধতৃতীয়, সওয়া < সপাদ » ইত্যাদি।

সর্বনাম :—« মুই < ময়া, আমি < অস্মে, অস্মাভিঃ ; তুই < ত্বয়া, তুমি < তুম্হে < যুষ্ম, যুষ্মাভিঃ ; সে (সে) < সঃ ; এই < এতদ্ ; কিসে < কস্য ; আপন < আত্মনঃ » ইত্যাদি।

সাধারণ ক্রিয়া :—« করে < করোতি, চলে < চলতি, খায় < খাদতি, নেয় < নেতি < নয়তি, দেয় < দেতি = দদাতি, পায় < *প্রাপতি—প্রাপ্নোতি, সাজে < সজ্জতে, জাগে < জাগতি, কিনে < ক্রীণাতি, দেখে < *দৃক্ষতি < দৃশ্, শুনে < শৃণোতি, পুছে < পৃচ্ছতি, হয় < ভবতি, আছে < অচ্ছতি < *অস্-চ্ছতি, নোয় < নমতি, নাচে < নৃত্যতি, যায় < যাতি, বয় < বহে < বহতি, শোয় < শয়তি, গায় < গাহে < গাথয়তি, রোয় < রোপয়তি » ইত্যাদি।

সাধারণ অব্যয় :—« আর < অপর, ও < উত, ভিতর < অভ্যন্তর, বাই চাই < বাহি তথাপি, না < ন, পর < উপরি, না (অবধারণে) < নাম » ইত্যাদি।

প্রত্যয়, বিভক্তি-আদির উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

[১.১১৪] বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শব্দ প্রাকৃত-জ শ্রেণীতে পড়ে। মূলে আদি-আর্য-ভাষা (বা সংস্কৃত) হইতে জাত হইলেও এগুলির রূপ-পরিবর্তন লক্ষণীয় ; এবং মধ্যকার প্রাকৃত রূপগুলি না দেখিলে, এই পরিবর্তন-ধর্ম অনুধাবন করা যায় না। বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ শব্দের সহিত এগুলির মূল-স্থানীয় সংস্কৃত শব্দের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শব্দের মধ্যকার « ক গ, চ জ, ত দ, প ব » লোপ পাইয়াছে ; « খ ঘ, থ ধ, ফ ভ » বাঙ্গালায় « হ »-তে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং আধুনিক বাঙ্গালায় এই « হ » প্রায়ই লোপ পাইয়াছে ; « ঙ ঞ ন ম » প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণের নাসিক্য বর্ণ, চন্দ্রবিন্দু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; শব্দগুলির অন্ত্য ও মধ্য স্বর-ধ্বনির সংক্ষেপের ফলে, এগুলির বাঙ্গালা রূপ সংস্কৃতের তুলনায় প্রায়ই বিশেষ ক্ষুদ্র বা খাটো হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু পরিবর্তন আছে, সেগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়। এই-সকল পরিবর্তন

সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ-বিশেষ নিয়ম-অনুসারে ঘটিয়াছে। সেই সব নিয়ম বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য। আবার বহু সরল শব্দে বিশেষ লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তন হয় নাই; যেমন, « জল, ফল, কাল (=সময়), জন, মানুষ, বা, চরণ, চলন, করণ » ইত্যাদি।

[১.৭২] ২। **সংস্কৃত উপাদান**। আদি-আর্য-ভাষা ভাঙ্গিয়া গিয়া মধ্য-আর্য বা প্রাকৃত ভাষায় পরিবর্তিত হইলেও, আদি-আর্য-ভাষার প্রধান সাহিত্যিক রূপ সংস্কৃতের চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের বাহন—ভারতীয় সংস্কৃতির বাহন; প্রাচীন কাল হইতেই প্রাকৃত ভাষা আবশ্যক হইলে সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষাও তাহার উৎপত্তি-কাল হইতেই তদ্রূপ সংস্কৃতের শব্দ-ভাণ্ডার হইতে আবশ্যক-মত শব্দ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালেও এই ব্যাপার চলিতেছে। সংস্কৃত হইতে আগত বহু বহু শব্দ বাঙ্গালায় আছে। « প্রাকৃত-জ » শব্দ হইতে এই শব্দগুলির পার্থক্য এই যে, প্রাচীন কাল হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার পরিবর্তন-শীল গতির মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া, প্রাকৃত-জ শব্দ সংস্কৃত হইতে বদলাইয়া, বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর এই-সকল সংস্কৃত শব্দ, সরাসরি সংস্কৃত ভাষার অভিধান বা অন্য পুস্তক হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের পরিবর্তনের রীতি-অনুযায়ী পরিবর্তন এগুলিকে স্পর্শ করে নাই, এবং প্রাকৃত শব্দ যে রীতিতে আবার পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালা হইয়াছে, সেই রীতিও এগুলির মধ্যে কার্যকর হইতে পারে নাই।

[১.৭২১] বাঙ্গালা ভাষায় আগত ও ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ কিন্তু সর্বত্র অবিকৃত নাই। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন বা আধুনিক উচ্চারণ ধরিয়া, বহু স্থানে এগুলি ঈষৎ বা বহুল পরিমাণে বিকৃত হইয়াছে; যেমন, সংস্কৃত হইতে গৃহীত « কৃষ্ণ » শব্দ অবিকৃত-রূপে (অন্ততঃ লেখায়) বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় « কৃষ্ণ » শব্দের একটী উচ্চারণ ছিল [ক্রেষ্ট]; এই উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া, « কৃষ্ণ » শব্দের বাঙ্গালায় একটী প্রচলিত

রূপ দাঁড়াইয়াছে «কেষ্ট»। ঐতিহাসিক ক্রমে লব্ধ প্রাকৃত-জ রূপ «কান, কানু, কানাই» («কৃষ্ণ > কণ্‌হ > কাণ্‌হ > কান») ও বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ-জাত রূপ «কেষ্ট»—এই দুইটীই মূল সংস্কৃত শব্দ «কৃষ্ণ» হইতে উদ্ভূত হইলেও, উভয়ে একেবারে পৃথক্—প্রথমটী («কান-») বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন স্তরের শব্দ, দ্বিতীয়টী («কেষ্ট») অর্বাচীন—সংস্কৃত হইতে ধার-করা শব্দের বিকৃত রূপ।

[১.৭২১] উচ্চারণে যাহাই হউক না কেন, অবিকৃত বানানে সংস্কৃত শব্দকে তৎসম শব্দ বলা হয় («তৎ-সম», অর্থাৎ «তৎ» কিনা 'তাহা', অর্থাৎ সংস্কৃতের, «সম» বা 'সমান'); এবং বিকৃত-সংস্কৃত বা বিকৃত-তৎসম শব্দকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলা হইয়া থাকে। «কৃষ্ণ» তৎসম শব্দ, «কেষ্ট» অর্ধ-তৎসম শব্দ।

বাঙ্গালায় আগত বহু সংস্কৃত তৎসম শব্দ এইরূপে বিকৃত হইয়া, অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত «গৃহিণী» হইতে, প্রাকৃতের মধ্য দিয়া তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ শব্দ «ঘরণী» হইয়াছে; ইহার পাশে শুদ্ধ তৎসম শব্দ «গৃহিণী»-ও বিদ্যমান; এবং «গৃহিণী» শব্দের উচ্চারণ-বিকারে «গিরিহিণী, গিরহিনী, গিন্নী» এবং পরে «গিন্নী, গিন্নি» শব্দ, বাঙ্গালায় প্রচলিত অর্ধ-তৎসম।

বহু-প্রচলিত এবং দৈনন্দিন জীবন-সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত শব্দ অনেক স্থলে অর্ধ-তৎসমে পরিবর্তিত হইয়াছে; যথা, «চন্দর (চন্দ্র; প্রাকৃত-জ—চাঁদ), সুয্যি (সূর্য; প্রাকৃত-জ রূপ—সূজ—প্রাচীন বাঙ্গালাতে পাওয়া যায়); নেমন্তন্ন (নিমন্ত্রণ;—সংস্কৃত 'নিমন্ত্র' হইতে প্রাকৃত-জ রূপ 'নেওত', প্রাদেশিক বাঙ্গালাতে মেলে); ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ); [illegible]; পরশ (স্পর্শ); বোষ্টম, বোষ্টুম (বৈষ্ণব); মোচ্ছব (মহোৎসব); মাশ্‌য় (মহাশয়); বদ্যি (বৈদ্য); পুরুত (পুরোহিত); ভক্‌তি (ভক্তি); পিরীত (প্রীতি)», ইত্যাদি। কথোপকথনের ভাষায় এইরূপ অর্ধ-তৎসম শব্দ খুবই ব্যবহৃত হয়; কাব্যের ভাষায় সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণকে ভাঙ্গিয়া লইয়া কোমল করিবার রীতি থাকায়, «মুরুখ (মূর্খ), বরষ (বর্ষ),

ধৈরজ (ধৈর্য), রতন (রত্ন), যতন (যত্ন), জোছনা (জ্যোৎস্না) প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম রূপ কবিতায় বেশী করিয়া আইসে।

[১.১২৩] অর্ধ-তৎসম শব্দে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণের অনেক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দেখা যায়—এগুলিও বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালার নিজস্ব শব্দ। প্রাকৃত-জ ও অর্ধ-তৎসম—এই দুইয়ে মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষার অর্ধেকেরও উপর উপাদান।

[১.১২৪] উচ্চ ভাব বা বিষয় অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে, তৎসম বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সাধু-ভাষায় এই শ্রেণীর শব্দ অধিক ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম শব্দ-সম্বন্ধে নিম্নে [১.৭৬] দ্রষ্টব্য।

[১.১৩] ৩। বিদেশী উপাদান। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির পরে, ভাষান্তর হইতে যে সব শব্দ আসিয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতেছে বাঙ্গালার বিদেশী উপাদান। অবশ্য, প্রাকৃত-যুগের কতকগুলি বিদেশী শব্দ বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে; এবং বাঙ্গালা ভাষার পূর্ব অবস্থায় বহু অনার্য (দেশী) শব্দকেও এক হিসাবে বিদেশী বলা চলে; কিন্তু এই-সব শব্দ, উত্তরাধিকার-সূত্রে আর্য শব্দাবলীর ন্যায় প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, এগুলিকে প্রাকৃত-জ আর্য শব্দের সহিত এক সঙ্গে ধরিয়া, বাঙ্গালার মৌলিক উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়,—আধুনিক কালে বাঙ্গালায় যে সব বিদেশী শব্দ আসিয়াছে, সেগুলির সঙ্গে এক কোঠায় এগুলিকে না ফেলাই উচিত।

[১.১৩১] বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল বিদেশী শব্দ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম স্থান হইতেছে ফারসী শব্দগুলির। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে, তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দের প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। ষোড়শ শতকের শেষ হইতে, বাঙ্গালা দেশ দিল্লীর মোগল সম্রাট্ কর্তৃক বিজিত হইয়া মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইবার পরে, ফারসী শব্দ খুব বেশী করিয়া বাঙ্গালায় আসিতে থাকে। এখন প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। ফারসী ভাষায় বিস্তর আরবী শব্দ আছে, এবং কিছু তুর্কী শব্দও আছে; ফারসীর মারফৎ

এগুলিরও কিছু-কিছু বাঙ্গালায় আসিয়াছে, এবং কার্যতঃ এগুলিকে ফারসী শব্দ বলিয়াই ধরিতে হয়। ফারসী শব্দের দৃষ্টান্ত—

রাজ-দরবার, যুদ্ধ ও শিকার-সংক্রান্ত শব্দ :—আমীর, ওমরা, উজীর, দেওয়ান, গোলাম, খান, তক্ত-তাউস, দরবার, দৌলত, ফকীর, বাদশা, মালিক, হুজুর; সোয়ার, সেপাই, কুচ, কাওয়াজ, কাবু, তাঁবু, তোপ, দুশমন, বাহাদুর, রসদ, রেসালা; শিকার, বাজ, ইত্যাদি।

আইন-আদালত, রাজস্ব ও শাসন-সংক্রান্ত শব্দ :—আদম-সুমারী, আবাদ, আসামী, এস্তেহারী, এজলাস, ওকালৎ, কসর, খাজনা, খারিজ, গোমস্তা, জমা, জমী, তহশীল, তালুক, দারোগা, দপ্তর, দাখিল, নিলাম, ফিরিস্তি, বীমা, মহকুমা, মোক্তার, রায়ৎ, শহর, সন, সরকার, হদ্দ, হিসাব, হিস্যা; আর্জি, অছিলা, আইন, আদালত, ইস্তফা, উকীল, এজাহার, কয়েদ, কসুর, কানুন, ক্রোক, জবানবন্দী, জজ, জারী, জেরা, তকরার, তামিল, দলীল, দস্তখত, নাবালক, নালিশ, পেশা, ফেরার, বাজেয়াপ্ত, মকদ্দমা, মুনসেফ, রদ, রায়, রুজু, শনাক্ত, সালিস, হক, হাকিম, হেফাজৎ ইত্যাদি।

মুসলমান ধর্ম-সম্বন্ধীয় শব্দ :—অজু, আউলিয়া, আল্লা, ইবলিস, ঈমান, ঈদ, কবর, কাফের, কাবা, কোরবানী, গাজী, জবাই, জেহাদ, জুম্মা, তোবা, দরগা, দরবেশ, দীন, গোর, নবী, নমাজ, নিকাহ, পয়গম্বর, বুজরুগ, মসজীদ, মোহরম, মোবারক, মোল্লা, শরিয়ৎ, শহীদ, শিরনী, শিয়া, হদীস, হালাল, হুরী ইত্যাদি।

মানসিক সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও কলা সংক্রান্ত শব্দ :—আন্দাজ, আওয়াজ, আমেজ, এলেম, কেচ্ছা, খৎ, গজল, কামিল, দুনিয়া, বাজে, মশায়েরা, সেতার, হরফ ইত্যাদি।

সাধারণ সমাজের অন্ন-বস্ত্র বিলাস, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ :—আতর, আয়না, আস্কারা, আঙ্গুর, আচার, আতস-বাজী, আরক, কাগজ, কুলুপ, কিংখাপ, কিশমিশ, কসাই, কাঁচি, খরমুজ, খাতা, খানসামা, খাসী, গজ, গোলাপ, চশমা, চাদর, চাপকান, চাবুক, চিক, চাকী, চাকা, জিন, জাজিম, তাকিয়া, তোষক, দস্তানা, দূরবীন, পোশাক, পর্দা, পাজামা, পোলাও, ফানুস, বরফ, বরফী, বাগিচা, বাদাম, বাবুর্চি, বুলবুল, মখমল, মলম, মশলা, মিস্ত্রী, মেজ, মোজা, রুমাল, রেশম, লেপ, রেকাব, রেশম, শাবাশ, শাল, শিশি, সিন্দুক, সোরাই, হাউই, হালুয়া, হুঁকা, হৌজ ইত্যাদি।

বিদেশী জাতির নাম-বাচক শব্দ :—আরব, আরমানী, ফিরিঙ্গি, ইহুদী, হাবশী ইত্যাদি। ('হিন্দু' বাস্তবিক ফারসী ; সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দের প্রাচীন-পারসীক বিকার-জাত।)

প্রাকৃতিক-বস্তু-বিষয়ক ও দৈনন্দিন জীবন-সম্পৃক্ত শব্দ :— « আব্‌, আওয়াজ, আব-হাওয়া, আসমান, আন্দাজ, ইয়ার, ওজন, কদর, কম, কাগজ, কারখানা, কোমর, খবর, খোরাক, গরম, গুজরান, চাদর, চাকর, জলদি, জানোয়ার, জাহাজ, জিন, তল্লাশ, তাজা, দখল, দম, দরকার, দরুন, দাগা, দামা, দোকান, নকল, নমুনা, নেহাৎ, পেশা, পছন্দ, পরী, ফুরসৎ, বজ্জাত, বন্দোবস্ত, বাহানা, বেকুব, মকবুল, মির্জা, মোরগ, মুলুক, রকম, রোশনাই, সাদা, সাফ, হাওয়া, হাজার, হজম, হুঁশিয়ার, হুজুর » ইত্যাদি।

তুর্কী শব্দ :— « আলখাল্লা, উর্দু, কাঁচি, কাবু, কোর্মা, খাতুন, খাঁ, খঞ্জর, গালিচা, চকমকি, চিক, চাকু, তবক, তুর্ক, দারোগা, বকশী, বাবুর্চি, বাহাদুর, বিবি, বেগম, মুচলেকা, লাশ, সওগাত » ইত্যাদি।

[১.৩২] ফারসীর পরে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে পোর্তুগীস-জাতীয় 'ফিরিঙ্গী'-গণের বাণিজ্য-উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন ও হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইহাদের বাসের ফলে, বাঙ্গালা ভাষায় পোর্তুগীস ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রবেশ-লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের মধ্য-ভাগে পোর্তুগীস ভাষার প্রভাব কমিয়া যায়। বাঙ্গালায় প্রায় এক শত পোর্তুগীস শব্দ আছে; যথা « ক্রুশ, গরাদিয়া, চাবি, জানালা, তোয়ালে, নিলাম, নোনা, পাউ-রুটি, পেঁপে, বালতি, [illegible], বোতাম, মিস্ত্রি, যীশু, সাবান » প্রভৃতি। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে, বাণিজ্য-হেতু বঙ্গদেশে আগত ফরাসী ও ডচ্‌ বা ওলন্দাজদের ভাষারও কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে; যথা—ফরাসী « কার্তুজ, [illegible], ওলন্দাজ, [illegible], কুপন » ইত্যাদি; ওলন্দাজ ভাষার—« ইস্কুপ, বোম (ঘোড়ার গাড়ীর), ত্রুপ বা তুরুপ, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন। 'চিঁড়িতন,' 'চিঁড়িয়া' বা 'চিঁড়িতন' শব্দটা [illegible]) »।

[১.৩৩] এতদ্ভিন্ন বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব এখন বাঙ্গালায় বিশেষ প্রবল—বিস্তর ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং আরও হইবে; জীবন-যাত্রার ও চিন্তা-জগতের নূতন নূতন বস্তু-সংক্রান্ত শব্দ এখন ইংরেজীর মারফৎ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙ্গালা তথা অন্য ভারতীয় ভাষাতে আসিতেছে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নানা ভাষার শব্দ, প্রথম ইংরেজীতে গৃহীত হইয়া, পরে ইংরেজী শব্দ-রূপেই বাঙ্গালায় আসিতেছে; যথা, « জেব্রা » (দক্ষিণ-আফ্রিকার) « ক্যাঙ্গারু » (অস্ট্রেলিয়ার), « কুইনাইন (কুইনীন) » (পেরু—দক্ষিণ-আমেরিকার) « [illegible], [illegible] » ([illegible]), « [illegible] বা [illegible] » ([illegible]), ম্যাজেন্টা » (ইতালীর), « [illegible] » ([illegible]), « [illegible] » ([illegible]) ইত্যাদি।

[১.৭৩] ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায়। ইহাদের কতকগুলি সরাসরি মূল ভাষা হইতে গৃহীত, কতকগুলি আবার ইংরেজী বা অন্য ভাষার সংবাদ-পত্র বা পুস্তকের ভিতর দিয়া আসিয়াছে; যথা, «বর্গী» (মারাঠী), «বাপু» (হিন্দী), «হরতাল» (গুজরাটী), «চেট্টি» (তামিল), «বোঙ্গা হাঁড়িয়া» (সাঁওতালী—কোল-শ্রেণীর ভাষা), «ফুঙ্গী, নাপ্পি» (বর্মী)। বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দগুলি, বহু স্থলে বিকৃত, বা বাঙ্গালার উচ্চারণ-অনুসারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে বিদেশী শব্দগুলিকে দুইটী শ্রেণীতে ফেলা যায়—'শুদ্ধ' ও 'পরিবর্তিত'। «লাট, ডাক্তার, হাসপাতাল, বাক্স, কৌঁসুলি» (=lord, doctor, hospital, box, counsel) পরিবর্তিত ইংরেজী শব্দের নিদর্শন; তদ্রূপ, মূল ফারসীর «খরিদ্দার» স্থলে «খদ্দের», «মজ্‌দূর» স্থলে «মজুর», «আলাহিদা» স্থলে «আলাদা», «জমীন্» স্থলে «জমি», পরিবর্তিত ফারসী শব্দের নিদর্শন।

[১.৭৪] ৪। এতদ্ভিন্ন, পূর্বোক্ত তিন প্রকারের শব্দের সংযোগে (compounded), বা এক শ্রেণীর শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে (affixed) সৃষ্ট, যে সমস্ত পদ বা অন্য শব্দ বাঙ্গালায় মিলে, সেগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার **মিশ্র শব্দ** (Hybrid Words, বা Hybrids) বলা যায়। উদাহরণ যথা—

সমস্ত পদ:—দেশী + বিদেশী—«রাজা-উজীর, হাট-বাজার, ধন-দৌলত, গোরা-বাজার, শাক-সব্জী»; বিদেশী + দেশী—«পাঁউ-রুটী, মাষ্টার মশাই, ডাক্তার বাবু, হেড-পণ্ডিত»; বিদেশী + বিদেশী—«হেড মৌলবী, পুলিশ-সাহেব, উকীল-ব্যারিষ্টার»। বিদেশী শব্দ + প্রাকৃতজ প্রত্যয়—«বাজার + -ইয়া > বাজারিয়া, বাজারে; মাষ্টার + -ঈ > মাষ্টারী»; তৎসম শব্দ + বিদেশী প্রত্যয়—«পণ্ডিত + -গিরি > পণ্ডিতগিরি; অস্ত্র + -দার > অস্ত্রদার»; বিদেশী শব্দ + তৎসম প্রত্যয়—«হিন্দু + -ত্ব > হিন্দুত্ব; স-বুট পদাঘাত; নিকাহ্‌ + -ইতা > নিকাহিতা বিবি; শহর বা সহর + -ইক (ক) = শাহরিক (নাগরিক এর অনুকরণে—রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত)»; অর্ধ-তৎসম শব্দ + প্রাকৃতজ প্রত্যয়—«গৃহিণী > গিন্নী + -পনা > গিন্নীপনা; বৈষ্ণব > বোষ্টম + -ঈ স্ত্রীলিঙ্গে > বোষ্টমী»; বিদেশী শব্দ + বিদেশী (অন্য ভাষার) উপসর্গ বা প্রত্যয়—«বে- (ফারসী) + টাইম (ইংরেজী) > বে-টাইম; বে- (ফারসী) + হেড (ইংরেজী) = বে-হেড; ডেপুটি-গিরি»; ইত্যাদি।

[১০৫] উপরের আলোচনা-অনুসারে, বাঙ্গালা ভাষার উপাদান শব্দাবলীর পারস্পরিক সম্বন্ধ নিম্ন-প্রদত্ত বংশ-লতিকা-ক্রমে দেখানো যাইতে পারে—

বাঙ্গালা শব্দ

- [১] উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাকৃত হইতে লব্ধ শব্দ—প্রাকৃত-জ
  - তদ্ভব [খাঁটী বাঙ্গালা]
  - প্রাচীন বা প্রাকৃত যুগের অর্ধ-তৎসম
  - দেশী
  - প্রাকৃত যুগের বিদেশী
- [২] ভাষান্তর হইতে গৃহীত বা উদ্ধৃত শব্দ (বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইবার পরে)
  - সংস্কৃত হইতে গৃহীত
    - শুদ্ধ সংস্কৃত [তৎসম]
    - বিকৃত সংস্কৃত [অর্ধ-তৎসম]
  - অন্যান্য (আধুনিক) ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত
    - হিন্দী, মারহাট্টী প্রভৃতি আর্য-ভাষার শব্দ
    - অনার্য ভাষার শব্দ—দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি
  - বিদেশীয় ভাষার শব্দ (নিম্নে দ্রষ্টব্য)

বিদেশীয় ভাষার শব্দ

(শুদ্ধ ও বিকৃত, উভয়বিধ রূপে)

- ফারসী
  - ফারসীর নিজস্ব শব্দ
  - আরবী হইতে গৃহীত
  - তুর্কী হইতে গৃহীত
- পোর্তুগীস ও অন্যান্য ইউরোপীয় (ডচ, ফরাসী প্রভৃতি)
- ইংরেজী
  - ইংরেজীর নিজস্ব শব্দ
  - নানা বিদেশী ভাষা হইতে গৃহীত ইংরেজী শব্দ

বাঙ্গালা সাধু-ভাষাতে তৎসম শব্দের সংখ্যা খুবই বেশী—শতকরা প্রায় ৪৫টি শব্দ এই শ্রেণীর। প্রাকৃত-জ ও অর্ধ-তৎসম শব্দ সাধারণ ভাব লইয়া; কিন্তু শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাবের বহু শব্দ বাঙ্গালায় আছে, সেগুলির প্রায় সবগুলিই তৎসম শব্দ। প্রাকৃত-জ এবং অন্য শ্রেণীর বিদেশী শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস জ্ঞান করিয়া আলোচিত হয় নাই, এবং এইগুলির সম্বন্ধে সকলে অবহিতও নহেন। অর্ধ-তৎসম শব্দ যে সংস্কৃত শব্দের বিকৃত রূপ, তাহা দর্শনমাত্রই বুঝা যায়।

[১.৭৬] সংস্কৃত ভাষা বিগত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতবর্ষের চিন্তা ও সভ্যতার সহিত একাত্মীভূত হইয়া আছে। প্রায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া, এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছে। নূতন যুগের নূতন ভাব, নূতন চিন্তাধারা, গভীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির কথা—এ-সব বিষয়ে কিছু বলিতে হইলেই, যেখানে পূর্ণ ভাব-দ্যোতক শব্দের আবশ্যকতা ঘটে, ভাষায় প্রচলিত প্রাকৃত-জ শব্দের সাহায্যে সেই আবশ্যকতা পূর্ণ করা সহজ-সাধ্য হয় না—প্রাকৃত-জ শব্দগুলি নূতন ভাব-প্রকাশের উপযোগী হয় না; এবং বিদেশী শব্দও বহু স্থলে ব্যবহার করিতে কেহ চাহে না। এই জন্য, আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির মূল-স্থানীয় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতের অক্ষয় ও অনন্ত ভাণ্ডার, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী (হিন্দী), পাঞ্জাবী মারহাট্টী, গুজরাটী, এবং তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ প্রভৃতি আর্য ও অনার্য ভারতীয় ভাষাসমূহের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের লোকের মনে যতই নূতন ভাব-সম্পদ্ আসিতেছে, ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা ততই বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। এবং তো ভারতের প্রাচীন ভাষা বলিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও ধর্মের বাহন বলিয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত শব্দাবলীর সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে; তদুপরি, সংস্কৃত ব্যাকরণের

কল্যাণে এগুলির ব্যুৎপত্তি সুনির্দিষ্ট, এবং এই ভাষার শব্দ-দ্বারা মনুষ্যের মনের উচ্চ চিন্তা অতি সূচারু-রূপে প্রকাশিত হইতে পারে; এই হেতু কাব্যোপযোগী ভাব-সমূহের প্রকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলিয়া, সকলেই সংস্কৃত শব্দাবলীর অত্যাবশ্যকতা এবং অপরিহার্যতা স্বীকার করেন। মাতৃভাষার আলোচনা-কারী বাঙ্গালীর কাছে, প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও ভাষাগত বিদেশীয় শব্দের প্রয়োগ সুপরিচিত; কিন্তু উচ্চভাব-দ্যোতক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সাধন, তাহার কাছে যত্ন করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু। সংস্কৃত ব্যাকরণ সুনিয়ন্ত্রিত বলিয়া, সেই ব্যাকরণ-অনুসারে সিদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে অশুদ্ধ-রূপে লিখিলে বা প্রয়োগ করিলে, ভাব-প্রকাশে বা অর্থ-গ্রহণে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে; এই জন্য এখানে নিয়মানুবর্তিতার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। এই-সব কারণে, তথা বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম শব্দাবলীর সংখ্যা-বাহুল্য ও সেগুলির প্রাধান্যের কথা চিন্তা করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায়, তৎসম শব্দগুলির সাধন- ও প্রয়োগ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। এই-সকল শব্দের বর্ণ-বিন্যাস-রীতি, এগুলির স্বর-বর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণের পরিবর্তন, এগুলির ব্যুৎপত্তি, ধাতু, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়—সমস্তই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে হইলেও, সেই-সকল নিয়ম বাঙ্গালা ব্যাকরণের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরা হয়।

[১.১৭] এই ব্যাকরণে, বাঙ্গালার নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি ও ধ্বনি-তত্ত্ব, রূপ-তত্ত্ব এবং বাক্য-রীতি আলোচিত হইয়াছে—যে-সমস্ত রীতি ও তত্ত্ব, প্রাকৃত-জ, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, বিদেশী ও মিশ্র নির্বিশেষে, সমস্ত বাঙ্গালা শব্দ-সম্বন্ধে প্রযোজ্য; এতদ্ভিন্ন, সঙ্গে-সঙ্গে বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দাবলীর সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী সাধন ও প্রয়োগ-ও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] ধ্বনিতত্ত্ব

[২.১] **উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)**—বাঙ্গালার উচ্চারণ (Pronunciation), বর্ণ-বিন্যাস (Orthography) ও বাঙ্গালা শব্দের সাধু উচ্চারণ (Orthoëpy).

বাঙ্গালা বর্ণমালা ও উচ্চারণ

[২.১১:] কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে (word-কে) বিশ্লেষ করিলে, আমরা কতকগুলি ধ্বনি (Sound) পাই।

[২.১১১] যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পূর্ণ- ও পরিস্ফুট-ভাবে উচ্চারিত হয়, এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহাকে **স্বর-ধ্বনি** (Vowel Sound) বলে; যেমন, « আ, অ্যা, এ, ও »।

[২.১১৩] যে ধ্বনি স্বর-ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট-রূপে উচ্চারিত হইতে পারে না, এবং সাধারণতঃ যে ধ্বনি অপর ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাকে **ব্যঞ্জন-ধ্বনি** (Consonant Sound) বলে; যেমন, « ক্, চ্, ড্, শ্ » ইত্যাদি। এগুলিকে প্রতি:যোগ্য করিয়া স্পষ্ট-রূপে উচ্চারণ করিতে হইলে, স্বর-ধ্বনির আশ্রয় লইতে হয়; যেমন, « ক » (= ক্ + অ), « কা » (ক্ + আ), « অক্ », « কি » (ক্ + ই), « চি » (চ্ + ই), « এচ », « আড্ », « ইশ্ » ইত্যাদি।

[২.১১৪] লিখন-কার্যে যে-সমস্ত চিহ্ন-দ্বারা এই-সকল ধ্বনির নির্দেশ করা হয়, সেগুলিকে বর্ণ (Letter) বলে ; যেমন, « অ, ই, ক, প, ল » ইত্যাদি। স্বরধ্বনি-দ্যোতক চিহ্নকে স্বর-বর্ণ (Vowel Letter) ও ব্যঞ্জনধ্বনি-দ্যোতক চিহ্নকে ব্যঞ্জন-বর্ণ (Consonant Letter) বলে।

[২.১১৫] কোনও ভাষা লিখিতে যে-সকল ধ্বনি-দ্যোতক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা

[২.১১৬] বাঙ্গালা বর্ণমালায় নিম্নে প্রদত্ত বর্ণগুলি আছে :

স্বর বর্ণ—অ, আ, ই, ঈ, ঋ, (ৠ, ঌ), এ, ঐ, ও, ঔ।

ব্যঞ্জন বর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; য, র, ল, ব ; শ, ষ, স, হ ; ড়, ঢ়, য় ; এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত, ং, ঃ।

[২.১১৭] ভাষার শব্দের বিশ্লেষণ দুই রকমে করিতে পারা যায় :

(১) শব্দের অন্তর্গত ধ্বনিগুলিকে ধরিয়া বিশ্লেষণ (Phonetic Analysis) ; যেমন, « রাখিল » শব্দ—ইহাতে « রা-খি-ল », এই তিনটী syllable বা অক্ষর পাই ; আবার অক্ষরগুলির বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায়—« ব্যঞ্জন ধ্বনি র্ + স্বর-ধ্বনি আ, দুইয়ে মিলিয়া 'রা' ; ব্যঞ্জন-ধ্বনি খ্ + স্বর-ধ্বনি ই = 'খি' ; ব্যঞ্জন-ধ্বনি ল্ + স্বর-ধ্বনি অ = 'ল' »। এই দিক্ ধরিয়া বিচার করিলে, ভাষার চরম বিশ্লেষে আমরা পাই কতকগুলি sound বা ধ্বনি—মানুষের কণ্ঠ ও মুখ-বিবরে বা নাসিকাভ্যন্তরে উচ্চারিত, বিশিষ্ট-রূপে শ্রুত ধ্বনি। একটী বা একাধিক ধ্বনি লইয়া, এক-একটী syllable বা অক্ষর গঠিত হয় ; « আ-সি-বে »—তিন অক্ষর ; « ব-স্তু » (বা « বস্-তু »)—দুই অক্ষর ; « কৃ-ষ্ণ » বা « কৃষ্-ণ »—দুই অক্ষর ; স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করিলে « অক্ষর » শব্দটি তিন অক্ষরের (« অ-ক্ষ-র »), আবার হসন্ত উচ্চারণ করিলে « অ-ক্ষর্ » (বা « অক্-খর্ ») দুই অক্ষরের। শব্দের

অক্ষরে বিশ্লেষণ দুই ভাবে হইতে পারে—হয় প্রতি অক্ষরের শেষে ব্যঞ্জন-ধ্বনি রাখিয়া, closed অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর করিয়া, নয় প্রতি অক্ষরকে যথা-সম্ভব open অর্থাৎ স্বরান্ত রাখিয়া; যেমন, «ধর্ম» বা «ধর্ম্ম» পদ—ইহার অক্ষর বিশ্লেষণ «ধর্—ম» (dhar—ma) রূপে করা যায়, আবার «ধ—র্ম» অর্থাৎ «ধ—র্ম্ম» (dha—rma) রূপে-ও করা যায়। শেষোক্ত (অর্থাৎ স্বরান্ত করিয়া উচ্চারণ করিবার) রীতি, সংস্কৃত উচ্চারণের; এবং তদবলম্বনে ভারতীয় বর্ণমালার প্রকাশের অনুযায়ী ভারতীয় রীতিতে, «ধর্-ম, ভক্-ত, সত্-য, মুদ্-গ, পদ্-ম» ইত্যাদি না লিখিয়া, আমরা লিখি স্বরান্ত করিয়া—«ধ-র্ম, ভ-ক্ত, স-ত্য, মু-দ্গ, প-দ্ম»; এবং প্রথমোক্ত (অর্থাৎ যথাসম্ভব ব্যঞ্জনান্ত করিয়া—ব্যঞ্জনবর্ণ যোগে অক্ষরকে বেষ্টিত করিয়া উচ্চারণ করার) রীতিটি বাঙ্গালা উচ্চারণের অনুযায়ী।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্লেষণ হইতেছে, শব্দ-স্থিত মূল অর্থ-দ্যোতক ধাতু ও ধাতুর অর্থে পরিবর্তন-আনয়নকারী প্রত্যয়াদির কার্য ধরিয়া বিচার করিয়া (Functional Analysis); যেমন, «রাখিল» পদে আমরা পাই «রক্ষণার্থক রাখ্ ধাতু + অতীত-কাল-বাচক প্রত্যয় -ইল্- + প্রথম-পুরুষ-বাচক প্রত্যয় বা বিভক্তি -অ, মিলিয়া—রাখ্ + ইল্ + অ»; তেমনি «আসিবে»-পদটীর বিশ্লেষণ এই রূপে হইবে—«আগমনার্থক ধাতু আস্ + ভবিষ্যৎ কাল-বাচক প্রত্যয় -ইব্- + তাহাতে প্রথম-পুরুষ-বাচক বিভক্তি -এ = আস্-ইব্-এ»।

প্রথম প্রকারের বিশ্লেষণ ধ্বনি-তত্ত্বের অন্তর্গত; দ্বিতীয়-প্রকারের, রূপ-তত্ত্বের অন্তর্গত।

[§ ১১৮] বাঙ্গালা বর্ণমালা, ভারতবর্ষের আর্য-ভাষার প্রাচীনতম লিপি ব্রাহ্মী-লিপি হইতে উদ্ভূত—খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোকের শিলালেখে এই লিপি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মী-লিপির প্রাচীন রূপ পরিবর্তিত হইয়া, বাঙ্গালা, দেবনাগরী, গুরুমুখী, তেলুগু ও কানাড়ী, গ্রন্থ, তামিল প্রভৃতি ভারতীয়, এবং বর্মী, শ্যামী ও কম্বোজদেশীয়, যবদ্বীপীয়, এবং তিব্বতী ও প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি বর্ণমালা—এগুলির উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মীর প্রাচীন রূপ একেবারে বদলাইয়া গেলেও, তাহার অন্তর্নিহিত রীতিটী এখনও অটুট রহিয়াছে। এই রীতির মূল কথা হইতেছে যে, ইহা অক্ষরাত্মক (syllabic), ইউরোপীয় রোমান লিপির মত ধ্বন্যাত্মক বা বর্ণাত্মক (alphabetical) নহে; যেমন, «বস্তু», «অত্যুক্ত»—এই দুইটী শব্দ; ধ্বনি-বিশ্লেষে দেখা যায় যে, এই দুইটী যথাক্রমে

«ম্+অ+ন্+উ» এবং «অ+ত্+য়্+উ+ক্+ত্+ই» এইরূপ চারটী ও সাতটী ধ্বনির সমষ্টি; রোমান-লিপিতে, উপরে বিবৃত প্রত্যেকটী ধ্বনি, পৃথক্-ভাবে লেখানো হইয়া থাকে—m-a-n-u = manu, a-t-y-u-k-t-i = atyukti; কিন্তু ভারতীয় লিপির রীতিতে লিখিত শব্দগুলি syllable বা অক্ষরে বিভক্ত হয়, প্রতি অক্ষরের মধ্যে একটী করিয়া স্বর-ধ্বনি নিহিত, শব্দের বা অক্ষরের আদিতে না থাকিলে স্বর-বর্ণ কখনও প্রকট করিয়া ভারতীয় লিপিতে লেখা হয় না, এই স্বর বর্ণ কখনও অপ্রকট-ভাবে, কখনও-বা সংক্ষিপ্ত-রূপে লিখিত হয় (কিন্তু রোমান লিপির মত সম্পূর্ণ প্রকট রূপে নহে); যেমন, «ম-নু» (অর্থাৎ যেন $m\text{-}^{n}_{u}$), «অ-ত্যু-ক্তি» (অর্থাৎ যেন $a\text{-}^{ty}_{u}\text{-}^{kt}_{i}$)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় বর্ণমালার রীতি-অনুসারে, শব্দের অভ্যন্তরে বা শেষে ব্যঞ্জনের পরে যদি স্বর বর্ণ আসে, তাহা হইলে স্বর-বর্ণের পূর্ণ-রূপকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, আশ্রিত ব্যঞ্জনের অঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হয়—তাহার পদতলে, শিরোদেশে বা পার্শ্বে নিলীন করানো হয়। ব্যঞ্জনের পরে ব্যঞ্জন আসিলে সেগুলিকে জুড়িয়া ও সেগুলির অংশ-বিশেষ লইয়া, নূতন 'সংযুক্ত ব্যঞ্জন' বর্ণের সৃষ্টি করা হয়।

[২১১৯] ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ধ্বনিগুলিকে প্রকাশ করিবার জন্য এই ব্রাহ্মী-লিপির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই লিপির বর্ণগুলি কেবল ভারতীয় ভাষারই উপযোগী ছিল। এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার কতকগুলি ধ্বনি বাঙ্গালা ভাষায় আর মিলে না—এগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু সেই-সকল ধ্বনির চিহ্ন-স্বরূপ বর্ণগুলি, বর্ণমালায় এখনও বিদ্যমান; যেমন, «ঋ, ণ, য»। ভাষার উচ্চারণে এই সকল বর্ণের ধ্বনি লুপ্ত হইলেও, সংস্কৃতের চর্চা কখনও লুপ্ত না হওয়ায়, বর্ণমালায় এই সকল বর্ণের স্থান চিরকাল ধরিয়া পণ্ডিতেরা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে গতানুগতিকতা বা চিরাগত ধারা হিসাবে এগুলি বর্জিত হয় নাই। আবার নূতন ধ্বনির উদ্ভব বাঙ্গালায় হইয়াছে, এবং কোথাও-বা নূতন বর্ণ সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে; যেমন, «ড»-এ বিন্দু «ড়»; কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ করা হয় নাই—হয় পুরাতন বর্ণের সাহায্যেই, নয় একাধিক বর্ণ জুড়িয়া, সংস্কৃতে অজ্ঞাত ও প্রাচীন ভারতীয় বর্ণমালায় অনির্দিষ্ট এই-সমস্ত ধ্বনি প্রকাশ করা হয়; যেমন, বাঙ্গালার «অ্যা» ধ্বনি—হয় «এ»-কারের সাহায্যে, না হয় «অ্যা, এ্যা, য্যা, ্যা» প্রভৃতি নব-সৃষ্ট সংযুক্ত বর্ণ-দ্বারা, এই 'বাঁকা' এ-কারের ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয়।

[২.১২] বাঙ্গালা স্বরবর্ণের উচ্চারণ

[২.১২১] ব্যঞ্জন বর্ণের পরে থাকিলে, স্বর-বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। কেবল অ-কারের জন্য কোনও বিশেষ সংক্ষিপ্ত রূপ নাই—অ-কার ব্যঞ্জন-বর্ণের গাত্রের মধ্যে যেন নিলীন থাকে; এবং « ্ »-চিহ্নকে ব্যঞ্জন-বর্ণের নিম্নে বসাইলে, এই অ-কারের লোপ বিজ্ঞাপিত হয়; « ্ »-চিহ্নের নাম **হসন্ত** বা **বিরাম**। যে শব্দের অন্তে **হল্** অর্থাৎ হসন্ত-যুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে, তাহাকে **হলন্ত** শব্দ বলে।

অন্য স্বর-বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ—« আ=া; ই=ি; ঈ=ী; উ=ু, ু, ু; ঊ=ূ, ূ; ঋ=ৃ; ৯=ৢ; এ=ে; ঐ=ৈ; ও=ো; ঔ=ৌ »।

অ—« অ »-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়: [১] সাধারণ উচ্চারণ—অনেকটা ইংরেজী law, all, caught-এর স্বর-ধ্বনির মত; যেমন, « কথা, চল, অধীর » ইত্যাদি; ইহাই বাঙ্গালা « অ »-এর স্বকীয় উচ্চারণ; [২] ও-কারবৎ উচ্চারণ—সাধারণতঃ পরবর্তী অক্ষরে « ই » বা « উ » ধ্বনি থাকিলে বা য-ফলা বা « ক্ষ » (বাঙ্গালা উচ্চারণে [খ্য]) থাকিলে, অ-কার ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়; যেমন, « অতি [=ওতি], বধূ [=বোধূ] »; « সে করে », কিন্তু « আমি করি [=কোরি] »—ই-কার থাকায়, এখানে অ-এর ও-ধ্বনি; « চলুক [=চোলুক] »; « সত্য [=শোত্তো] », « তাৎপর্য [=তাৎপোর্‌জো] » ইত্যাদি।

যেখানে « অ »-কার, 'না' এই অর্থে শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কিন্তু পরে « ই » বা « উ » থাকিলেও, ইহার ও-উচ্চারণ হয় না; যেমন, « অ-সুর, অ-ধীর, অ-নিত্য, অ-কূল, অ-তুল » (শেষোক্ত শব্দ ব্যক্তি-বিশেষের নাম রূপে ব্যবহৃত হইলে, উচ্চারণে [ওতুল] হয়); তুলনীয়—« অধির অধরের অধির চুলির » = [ওধির্ অধরের অধির চুলির], অর্থাৎ 'ঘোড়ের কম্পনায় চঞ্চল ফিন্‌কি')।

চলিত-ভাষায় পদের অন্তস্থিত অ-কার সাধারণতঃ ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়; যেমন, « ভাল, কাল, বড়, ছোট, যত, তত, ঘন, হ'ল, হ'ত, তুমি কর, খাওয়ান » = [ভালো, কালো বড়ো, ছোটো, জতো, ততো, ঘনো, হোলো হোতো, করো, খাওয়ানো]। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহাকে ছোট (সাধারণতঃ দুই-অক্ষরময়) অক্ষর-সমষ্টিতে ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়, এবং এইরূপ অক্ষর-সমষ্টির শেষ অক্ষরে « অ » থাকিলে, সেই « অ »-এর ধ্বনি ও-কারবৎ হয়; যেমন, « অনবরত » = [অনো-বরো-তো]। উচ্চারিত শব্দে দুই অক্ষরের শেষের অক্ষরে « অ » থাকিলে, তাহা ও-বৎ হয়; « অনল » = [অনোল্], ইংরেজী number « নম্বর » = [নম্বোর্], « পিতল » = [পিতোল, পেতোল] ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ণ- বা ন-কারান্ত একাক্ষর শব্দে « অ »-এর উচ্চারণ ও-কার হয়; যেমন, « পণ (= [পোন্], পরিমাণ), মন, বন, ধন, জন »; কিন্তু « পণ (= প্রতিজ্ঞা), রণ, গণ, শণ, সন »-এর বেলায় শুদ্ধ « অ » হয়।

[ক] অ-কারের প্রাচীন (সংস্কৃত) উচ্চারণ ঠিক আধুনিক কালের বাঙ্গালা « অ »-এর মত বা ও-কারের মত ছিল না। ইহার আদি উচ্চারণ ছিল, আ-কারের হ্রস্ব রূপ; এই জন্য সংস্কৃত ভাষায়, দীর্ঘ হইলে, « অ »-এর পরিণতি হইত আ তে। বাঙ্গালায় কিন্তু « অ, আ » উচ্চারণে বিভিন্ন, একটা অপরটির হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহে। বাঙ্গালায় « অ »-এরও দীর্ঘ উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে; যেমন, « জল, বর » [জ—ল্, ব—র্] প্রভৃতি একাক্ষর শব্দে অ-কার দীর্ঘ; কিন্তু দুই অক্ষর বা তাহার বেশী অক্ষরের শব্দে, অ-কার হ্রস্ব; যেমন, « জলা, বরা, অমরা »। সংস্কৃতে « আ » সর্বত্র দীর্ঘ ছিল, কিন্তু বাঙ্গালায় « আ »-এর হ্রস্ব ধ্বনিও আসিয়া গিয়াছে—একাক্ষর শব্দে বাঙ্গালা « আ » দীর্ঘ; যেমন, « রাম, ধার » = [রা—ম্, ধা—র্]; কিন্তু একাধিক অক্ষরের শব্দ হইলে « আ » হ্রস্ব হয়; যেমন, « রামা, ধারা, তাহারা »। সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষা অনুসারে, আমরা « অ »-কে « আ »-এর হ্রস্ব বলিতে অভ্যস্ত হইলেও, বাঙ্গালায় « অ »-কার ও « আ »-কারের উচ্চারণ-গত এই মৌলিক পার্থক্যটুকু আমরা অনুভব করিয়া থাকি। সেই হেতু আমরা বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের নাম পড়িবার কালে, « হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ », « হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ » বলিয়া থাকি, কিন্তু « হ্রস্ব অ, দীর্ঘ আ » বলি না—বলিতে যেন বাধে, আমরা বলিয়া থাকি, « স্বরে অ, স্বরে আ »।

[খ] আধুনিক বাঙ্গালায় শব্দের অন্তের « অ »-কার (যাহা ব্যঞ্জন-বর্ণের সাথে লীন

হইয়া অদৃশ্য-রূপে থাকে তাহা) বহুশঃ অনুচ্চারিত থাকে—শেষ বর্ণটা হসন্ত-রূপে উচ্চারিত হয়; যথা, «রাম, হাত, কান, ধান, কাল, সলিল, মাতুল» ইত্যাদি। এক সময়ে, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, এইরূপ সমস্ত শব্দ বাঙ্গালায় স্বরান্ত করিয়া উচ্চারিত হইত; যেমন, «রাম্-অ, হাত্-অ বা হাথ্অ, কান্অ, ধান্অ, কাল্অ, সলিল্অ, মাতুল্অ»; এখনও উড়িয়াতে এইরূপ স্বরান্ত করিয়াই উচ্চারণ করে। বাঙ্গালায় অন্ত্য «-অ» কোথায় উচ্চারিত হইবে না, এবং কোথায়-বা হইবে, ইহা বিশেষ ভাবে জানিয়া লইতে হয়। প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দে আজকাল অনেক লেখক ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত অন্ত্য «অ»-কারকে পুরাপুরি ও-কার (ো) রূপে লিখিয়া, ইহার অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন; যেমন «কাল=কাল্ (সময়), কাল=কালো (কৃষ্ণবর্ণ)»; «বার=বার্ (দিন, সময়), বার=বারো (দ্বাদশ) ('কা'ল রবিবার যখন সন্ধ্যাকাল, কালো কাকটা তখন বারো বার এসেছিল')»; «পাঠান্ (তিনি প্রেরণ করেন), পাঠান্ (আফগান-জাতীয়), পাঠানো (=প্রেরিত)»; «মত=মত্ (অভিমত), মত=মতো, মতন (ন্যায়, সদৃশ); তুই ফেল্ [=ফ্যাল্], তুমি ফেল [=ফ্যালো]; করিব, চলিত রূপ ক'র্‌ব=ক'র্‌বো» ইত্যাদি। প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও বিদেশী শব্দে, আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঠিক-মতন উচ্চারণ করিয়া যাই,—বানানে ও-কার না লিখিয়া «অ»-কার রাখিয়া দিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না—যদিও ও-কার লিখিলে নিশ্চিত-রূপে উচ্চারণটা ধরা যায়।

বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ শব্দে বা পদে, কতকগুলি বিশেষ স্থলে ও প্রত্যয়ে, অন্ত্য «-অ» কার উচ্চারিত হয়; যথা, [১] কতকগুলি বিশেষণে: «ভাল, বড়, ছোট, খাট, কাল, ধল» ইত্যাদি; সর্বনাম-জাত বিশেষণে: «এত, অত, তত, যত, কত; হেন, যেন, কেন»; [২] «মত (-মন্ত-প্রত্যয় হইতে)»; [৩] সংখ্যা-বাচক শব্দে: «এগার, বার, তের, পনের, ষোল, সতের, আঠার»; [৪] «-আন» প্রত্যয়ে: «করান, বা করানো»; [৫] দ্বিরুক্ত বিশেষণে এবং অনুকার-শব্দে: «মর-মর, কাঁদ-কাঁদ, ধর-ধর, ছল-ছল ('কর্-কর্, ছল্-ছল্' ইত্যাদিও আছে)»; [৬] ক্রিয়ায়: অতীতে «-ইল» বা «-ল», ভবিষ্যতে «-ইব, -ব», নিত্যবৃত্ত অতীতে «-ইত, -ত», অনুজ্ঞায় «-অ»।

তৎসম শব্দেও অনেক সময়ে সন্দেহ থাকে। তৎসম শব্দের অন্ত্য «-অ»-কারের উচ্চারণ-সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম দেওয়া গেল—

তৎ-সম শব্দে সাধারণতঃ অন্ত্য « -অ »-কারের লোপ হয় ; যেমন, « বিচার, বিচরণ, বর্ধন, ধীর, প্রবীর, অনুপম, অসুর, নিমন্ত্রণ » ইত্যাদি। কিন্তু—

[১] অন্ত্য অক্ষরে সংযুক্ত-বর্ণ অর্থাৎ দুইটী বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন একত্র থাকিলে, « -অ »-কারের লোপ হয় না ; যেমন, « ভক্ত, চিহ্ন, শ্লাঘা, সূর্য, চন্দ্র, পূর্ব, বিজ্ঞ, অঙ্ক » ইত্যাদি। অন্ত্য অক্ষরের পূর্বে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলেও « -অ »-কার রক্ষিত হয় ; যথা, « হংস, বংশ, দুঃখ »।

[২] বিশেষ্য শব্দের অন্ত্যাক্ষরে « হ » থাকিলে, « -অ »-এর লোপ হয় না ; যেমন, « বিবাহ, স্নেহ, দেহ, বিদ্রোহ, অনুগ্রহ » ইত্যাদি।

[৩] বিশেষণ শব্দের শেষ অক্ষরে « ঢ়, য় » থাকিলে, অন্ত্য « -অ »-কারের লোপ হয় না ; যথা, « দৃঢ়, গাঢ়, রূঢ়, মূঢ় ; দেয়, পেয়, বিধেয়, নেয়, নির্ণেয় » ইত্যাদি।

[৪] « -ত » ও « -ইত » প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে « -অ »-কার লোপ পায় না : « পুলকিত, গত, নত, মত, রত, অনূদিত, অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত, গীত, নীত, রক্ষিত, পীত » ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ শব্দ বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হইলে « অ »-কারের লোপ হয় ; যথা, « গীত, মত, বিহিত, নিশ্চিত, আঘাত, ব্যাঘাত, পালিত্ (পদবী—কিন্তু 'পালিত পুত্র'), রক্ষিত্ (পদবী, কিন্তু 'রক্ষিত অর্থ') »। দুই-এক স্থলে কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় বিকল্পে ঘটিতে দেখা যায় ; যথা, « গর্হিত বা গর্হিত্ ; বঞ্চিত বা বঞ্চিত্, পশ্চিত বা পশ্চিত্ »।

[৫] « -তর, -তম »-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ-পদে, বহু স্থলে « -অ »-কার লুপ্ত হয় না : « উচ্চতর, প্রিয়তম » (কিন্তু « উত্তর, উত্তম, প্রিয়তম » প্রভৃতিতে অনুচ্চারিত)।

সাধারণ-ভাবে, যে-সকল তৎসম শব্দ কথোপকথনের ভাষায় তেমন বেশী করিয়া ব্যবহৃত হয় না, সেগুলির অন্ত্য « -অ » লোপ পায় না ; যেমন, « নগ, নব (কিন্তু নব্, রব্), ভব, মম, সম, শম, দম, দ্রোণ, ত্রণ (ত্রণ্), বৃষ, কৃশ, তৃণ (তৃণ্), মৃগ » ইত্যাদি। শব্দের প্রথম অক্ষরে « ঐ » ও « ঔ » থাকিলে, যদি এই দুই স্বর-ধ্বনিকে একাক্ষর করিয়া উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে অন্ত্য « -অ »-কারের লোপ হয় না ; যথা, « তৈ-ল, শৈ-ল, মৌ-ন, গৌ-ণ », অ-কারান্ত ; কিন্তু « ঐ, ঔ »-কে ভাঙ্গিয়া দুই অক্ষর « অ-ই, অ-উ » করিয়া লইলে, অন্ত্য « -অ »-কারের লোপ হয় ; যথা, « ত-ইল্, শ-ইল্, ম-উন্, গ-উন্ » ইত্যাদি।

সমাস-নিবদ্ধ পদে, প্রথম শব্দের অন্ত্য « অ »-কার সাধারণতঃ উচ্চারিত হয় ;

যেমন, « পদ-সেবা, রণ-তরী, জন-সমাজ, পণ-হস্ত, চিকুর-ভার, লাব-বীর, গীত-গোবিন্দ, ভার-বাহী (বিকল্পে লাব্-বীর্, গীত্-গোবিন্দ, ভার্ বাহী) » ইত্যাদি।

« নিজ » শব্দ চলিত-ভাষার অ-কারান্ত, [নিজ্-অ]; কিন্তু বহু স্থলে, বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গে, ইহা হসন্ত [নিজ্]-রূপে উচ্চারিত হয়; অ-কারান্ত উচ্চারণই অনুসরণীয়।

লুপ্ত অ-কার—সংস্কৃতে বহু স্থলে সন্ধি হইলে, অ-কারের লোপ হয়। এই লুপ্ত অ-কারের জন্য একটী অক্ষর আছে—« ঽ »; পাঠ-কালে ইহা উচ্চারিত হয় না, তবে ইহার অবস্থানের দ্বারা পূর্বে যে একটা অ-কার ছিল তাহা জানানো হয়; যথা, « ততঃ + অধিক = ততোঽধিক », উচ্চারণে [ততোধিক]।

আ—ইহার উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী father, calm শব্দের a-র মত। সংস্কৃতেও এই উচ্চারণ ছিল। বাঙ্গালায় বহু শব্দে « আ » হ্রস্ব করিয়া উচ্চারিত হয়; যেমন, « রাম [রা – ম্] »—এখানে আ-কার দীর্ঘ; « রামা »—এখানে আ-কার অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব।

ই, ঈ—হ্রস্ব ও দীর্ঘ—« দিন-দিন » (হ্রস্ব) এবং « দিন » ও « দীন » (দীর্ঘ) শব্দের মত। [নিম্নে 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর' শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।]

উ, ঊ—হ্রস্ব ও দীর্ঘ—যথাক্রমে « রূপা » ও « রূপ » শব্দের « উ »-ধ্বনির মত। [নিম্নে 'হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর' শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।]

ঋ, ৠ—বাঙ্গালায় এই দুইটীর উচ্চারণ « রি, রী »। ব্যঞ্জন-বর্ণ « র »-এ « ই »-কার যোগে নিষ্পন্ন এই সংযুক্ত ধ্বনিদ্বয়কে স্বর-বর্ণ বলিয়া ধরা হইয়াছে কেন? প্রাচীন কালে সংস্কৃতে এই দুইটীর উচ্চারণ ছিল—অন্য কোনও স্বরধ্বনির সাহায্য না লইয়া, স্বর-ধ্বনি-রূপে ব্যবহৃত « র্ » ধ্বনি: সংস্কৃত « কৃত » শব্দের উচ্চারণ ছিল [কৃর্-ত] বা [ক্র্-ত], kr-ta; এখানে « কৃ » অর্থাৎ [কৃর্] একটী syllable বা অক্ষর, এই অক্ষরে ব্যঞ্জন-ধ্বনি হইতেছে « ক্ », এবং « ক্ », পরবর্তী « র্ »-কেই

আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান ;—ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বর-স্থানীয় বলিয়া, প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই « র্ »-এর জন্য একটী পৃথক্ বর্ণ, « ঋ », স্থির করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকারের স্বরবর্ণ রূপে প্রযুক্ত « র্ » বা « ঋ »-এর ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই বটে, কিন্তু অন্য বহু ভাষায় আছে ; যেমন স্কট্‌ল্যাণ্ডে প্রচলিত প্রাদেশিক ইংরেজীতে thunder, number প্রভৃতি শব্দে এইরূপ « র্ » বা « ঋ » স্বর মিলে—number = [nam-br], [নম্‌ব্‌র্, বা নম্‌-বৃ], thunder = [than-dr] = [থান্‌-ড্‌র্, থান্‌-ডৃ] ; ফরাসীতে মিলে, যেমন chambre (='ঘর, প্রকোষ্ঠ'), উচ্চারণে দুই অক্ষর [শাঁ-ব্‌র্ = শাঁ-বৃ]। সংস্কৃত « ঋ »-এর এই উচ্চারণ পরে পরিবর্তিত হয়, ইহাতে একটী স্বর-বর্ণের আগম ঘটে ; বাঙ্গালাদেশে ও উত্তর-ভারতে [রি], উড়িষ্যায়, মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণ-ভারতে [রু] (« কৃষ্ণ » শব্দ উড়িয়া উচ্চারণে [ক্রুষ্ণ])।

দীর্ঘ « ৠ »—এই « ঋ » বা « র্ » ধ্বনির দীর্ঘ বা প্রলম্বিত রূপ মাত্র।

পুরাতন বাঙ্গালায় « ঋ »-এর উচ্চারণ কেবল [রি] ছিল না,—[রি, ইর্ ; রে, এর্ ; র, অর্ ; রো, ওর্]—এতগুলি হইত (প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে, এই-সব উচ্চারণ ধরিয়া, « অমৃত » স্থলে [অম্রত, এমর্ত, অমের্ত, অম্রেত], « ঘৃত » স্থলে [ঘ্রত, ঘর্ত], « পৃথক্ » স্থলে [প্রথক্] ইত্যাদি শুনা যায়)। প্রাচীন বাঙ্গালায় « ঋ » অর্থাৎ [রি]-ধ্বনির সহিত র ফলার অদল-বদল হইত,—« ঋ-কার » ও « র-ফলা » উভয়ই [রি, ইর্ ; রে, এর্ ; র, অর্ ; রো, ওর্]-রূপে উচ্চারিত হইত ; এই জন্য « প্রদীপ, ক্রমে-ক্রমে, ব্রত, নিমন্ত্রণ » প্রভৃতি র-ফলা-যুক্ত শব্দ, উচ্চারণে শুনায় [পৃদীপ বা প্রিদীপ ; কের্মে-কের্মে ; বেব্রত বা বৃত ; নিমন্ত্র্ণ (ইহার বিকারে 'নেমন্তন্ন')] ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায়, বর্ণমালার বাহিরে, স্বর-বর্ণ « ঋ, ৠ »-র অস্তিত্ব নাই ; কেবল বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম শব্দের বানানে যথারীতি « ঋ », কচিৎ « ৠ » লিখিত হয় ; যেমন, « ঋষি, ঋণ, ঋগ্বেদ, পিতৃব্য, সুকৃতি, ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৄণ » ইত্যাদি। অনেক সময়ে বিদেশী শব্দে, লিখন-সংক্ষেপের জন্য « রি » অথবা র-ফলার পরে ই-কার না লিখিয়া, কেবল « ঋ »-দ্বারা কাজ চালানো হয় ; যেমন, « মৃদা—খ্রিদা বা মীর্দা ;

বৃটিশ—ব্রিটিশ; খৃষ্ট—খ্রীষ্ট বা খ্রিষ্ট »। ঋ-কারের মূল উচ্চারণ স্মরণ করিয়া বিদেশী শব্দে এ ভাবে « ঋ » ব্যবহার করা অনুচিত; নিখিল ভারতের সহিত ঐক্য রক্ষা করিয়া, « র » বা র-ফলা ব্যবহার করাই উচিত; এই জন্য « ব্রিটিশ, খ্রীষ্ট, প্রিভি-কাউন্‌সিল, ক্রিকেট » প্রকৃষ্ট বর্ণ-বিন্যাস; « বৃটিশ, খৃষ্ট, পৃভি-কাউন্‌সিল্, কৃকেট » প্রভৃতি সর্বথা বর্জনীয় (« খৃষ্ট » কিন্তু বাঙ্গালায় বহু-প্রচলিত)—উড়িয়া বা মহারাষ্ট্রীয়ের মুখে এগুলির উচ্চারণ দাঁড়াইবে [ক্রুটশ্, খ্রুষ্ট্, প্রুভিকাউন্‌সিল্; ক্রুকেট্]।

প্রাকৃত-জ ও অর্ধ-তৎসম শব্দে « ঋ »-এর প্রয়োগ নাই।

লিখন কালে ছাত্রগণ প্রায়ই « ঋ » স্থানে « ৠ » লেখে: « ঋষি » স্থানে « ৠষি », « ঋণ » স্থলে « ৠণ » ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক।

ঌ—« ঌ »-এর অনুরূপ ধ্বনি, বাঙ্গালায় নাই, সংস্কৃতেও খুব কম প্রযুক্ত। বাঙ্গালায় এই বর্ণের নাম « লি », অর্থাৎ « ল্ + ই »। সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ ছিল, অক্ষর-সাধক স্বরবর্ণবৎ—« ল্ »; যথা, « কৢপ্ত »—[ক্ল্-প্ত, বা ক্ল্-প্-ত], klp-ta।

ইংরেজীর little শব্দে দুইটী syllable বা অক্ষর—li—tl [লি—টু্ল্]; প্রথম অক্ষর li [লি]-তে « ল্ » হইতেছে ব্যঞ্জন এবং « ই » স্বর, ও দ্বিতীয় অক্ষর tl [ট্ল্]-এ « ট্ » হইতেছে ব্যঞ্জন ও « ল্ » হইতেছে স্বর; এই স্বরবর্ণ-স্থানীয় « ল্ » এবং সংস্কৃতের « ঌ » অভিন্ন; little=[লি-টৢ]। তদ্রূপ bottle=[ব-টৢল্=ব-টৢ], uncle=[আংকৢ]।

কেবল বর্ণমালায় একটী সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, অপর স্বরধ্বনিগুলির দীর্ঘ রূপের ন্যায়, দীর্ঘ « ৡ »-কারও দেখা যায়; সংস্কৃতেও ইহার প্রচলন নাই।

এ—এই বর্ণের দুইটী উচ্চারণ—[১] সোজা বা সরল উচ্চারণ, ইংরেজী (স্কট-ইংরেজী) cake, bake প্রভৃতি শব্দের a-র উচ্চারণের সহিত তুলিত হইতে পারে, যেমন, « দেশ, মেষ, নিমেষ, অবশেষ » ইত্যাদি;

ইহাই এই বর্ণের মূল ধ্বনি। [২] বাঁকা বা বিকৃত উচ্চারণ—« 'অ্যা' » ইংরেজী (দক্ষিণ-ইংলাণ্ডের ভদ্র উচ্চারণে) cat, bat-এর a-র মত; যেমন, « এক, একা, দেখেন—[অ্যাক্, অ্যাকা, দ্যাখেন] » ইত্যাদি; এই দ্বিতীয় উচ্চারণ বাঙ্গালায় উদ্ভূত, সংস্কৃতে বা প্রাকৃতে ইহা ছিল না।

পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ « এ » ও « 'অ্যা' » এই উভয় ধ্বনির অভাব দৃষ্ট হয়—উভয়ের স্থলে, এই দুই ধ্বনির মাঝামাঝি একটী-মাত্র বিশিষ্ট ধ্বনি শুনা যায়।

ঐ—এটী একটী সংযুক্ত বা যৌগিক স্বর-ধ্বনি অথবা সন্ধ্যক্ষর (Diphthong): বাঙ্গালায় ইহা যেন « ও+ই » এই দুই ধ্বনির পর-পর দ্রুত উচ্চারণের ফল; যথা, « ঐক্য, চৈতন্য, ধৈর্য, বৈদেশিক »।

সংস্কৃতে কিন্তু ইহার উচ্চারণ ছিল « আ+ই=আই »। এই জন্য সংস্কৃতের « নৈ+অক—নায়ক, অর্থাৎ নাই+অক—নাইঅক, নায়ক »।

প্রাকৃতজ ও বিদেশী শব্দের « অই, অয় » বা « ওই »-কে সংক্ষেপের জন্য অনেক সময়ে « ঐ » লেখা হয়; যথা, « দৈ, খৈ, কৈ-মাছ, তৈয়ারী, কৈসর-এ-হিন্দ » ইত্যাদি।

ও—ইংরেজী (স্কট-ইংরেজী) robe, boat প্রভৃতি শব্দের o, oa-র সহিত ইহার উচ্চারণের মিল আছে; যথা, « রোগ, রোগা, শোক, পুরোহিত, ভোগ, যোগ, বিয়োগ, বোন্ » ইত্যাদি।

ঔ—এটীও একটী সংযুক্ত স্বর-ধ্বনি (Diphthong); ইহার বাঙ্গালা উচ্চারণ « ও+উ »; যথা, « যৌবন, কৌরব, সৌরভ, দৌড় »।

সংস্কৃতে ইহার উচ্চারণ কিন্তু ছিল « আ+উ=আউ »; এই জন্য সংস্কৃতে « গৌ+ঈ—গাবী, অর্থাৎ গাউ+ঈ—গাউঈ—গাবী (এখানে ব হইতেছে অন্তঃস্থ ব, সংস্কৃত উচ্চারণ-মত w), নৌ+ইক, অর্থাৎ নাউ+ইক—নাবিক, নাবিক »।

প্রাকৃতজ বিদেশী শব্দের « অউ, অও » বা « ওউ »-কে সংক্ষেপে

বহু স্থলে « ঔ »-কার দিয়া লেখা হয়: « বৌ—বউ, মৌ—মউ, জৌ—জউ, নৌ-রোগ, শৌখীন (< ফারসী-আরবী শৌকীন) » ইত্যাদি।

[২.১২৩] বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বর-বর্ণের সংখ্যা তেরটী (৯-কে ধরিলে চৌদ্দটী), কিন্তু সাধু ও চলিত বাঙ্গালায় বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্বর-ধ্বনি (কলিকাতা-অঞ্চলের ভদ্র ভাষায়) মাত্র এই সাতটী: [অ, আ, ই, উ, এ, 'অ্যা', ও]।

উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য International Phoretic Association-এর দ্বারা ব্যবহৃত ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালায়, এই সাতটী ধ্বনি যথাক্রমে [ɔ, a, i, u, e, æ, o]-রূপে লিখিত হয়।

[২.১২৪] এই স্বর ধ্বনিগুলির সমবায়ে, নানা সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর, সংযুক্ত বা মিশ্র অথবা যৌগিক স্বর-ধ্বনির উদ্ভব হয়; তন্মধ্যে মাত্র দুইটীর জন্য বর্ণ, বাঙ্গালা বর্ণমালায় মিলে: « ঐ—[ওই], ঔ—[ওউ] »। অবশিষ্ট যৌগিক স্বর-ধ্বনির জন্য পৃথক্ বর্ণ নাই, এগুলির মৌলিক বর্ণগুলিকে (একক, অথবা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া) পাশাপাশি লিখিয়া, এগুলিকে প্রকাশ করা হয়। **চলিত-ভাষায় এরূপ ২৫টী যৌগিক স্বর-ধ্বনি আছে; যথা—**

« ইয়ে, ইএ [ie]—বিয়ে; ইআ [ia]—ইয়ার; ইও, ইয়, ইয়ো [io]—দিও, প্রিয়, নিয়ো [dio, prio, nio]; ইউ [iu]—শিউ, মিউ-মিউ; এই [ei]—সেই, খেই; এআ [ea]—খেয়া, কেয়া; এও [eo]—চেও = চাহিও; এউ [eu]—কেউ, ঘেউ-ঘেউ; এয়্, অ্যায়্ [æe]—দেয় = ছায়্; অ্যাও [æo]—ম্যাও; আই [ai]—যাই, খাই; আয়্ [ae]—যায়, পায়; আও [ao]—যাও, খাও; আউ [au]—লাউ দাউ; অয়্ [ɔe]—হয়, নয়; অআ, অওয়া [ɔa]—নওয়া = নয়া; অও [ɔo]—হও, কও, বও; ওই, ঐ [oi]—কই, ঐ; ওয়্ [oe]—শোয়ে, খোয়; ওআ, ওয়া, [oa]—খোয়া, ধোয়া; ওউ, ঔ [ou]—বউ, মৌ; উই [ui]—দুই; উয়ে [ue]—দুয়ে = দুহিয়া; উআ [ua]—ধুয়া, কুয়া; উও, উয়ো [uo]—ধুয়ো। »

দ্রুত উচ্চারণে, পূর্বোক্ত স্বর-ধ্বনিগুলি যৌগিক-স্বর-ধ্বনি হইয়া যায়; আবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে, দুইটি পৃথক্ স্বর-রূপেই প্রতিভাত হয়।

[২.১২৫] তিনটী স্বর-ধ্বনির মিশ্র বা যৌগিক স্বর-ধ্বনিও (Triphthongs) বাঙ্গালায় সম্ভব; যথা, তিনটী ধ্বনির: « ইয়েই [iei]; ইয়েও [ieo]; ইয়াএ [iae]; এইয়ে [eie]; এইও, এইয়ো [eio]; এয়াও [eao]; এওই [eoi]; এউও [euo]; অ্যায়েই [æei]; অ্যাওই [æoi]; আইয়ে [aie]; আইও [aio]; আয়েই [aei]; আওই [aoi]; আউই [aui]; অএই [ɔei]; অওই [ɔoi]; অয়ও, অয়েও [ɔeo]; ওইয়ে [oie]; ওয়েই [oei]; ওয়েও [oeo]; ওয়াই [oai]; ওয়াএ [oae]; ওউই [oui]; উইয়ে [uie]; উইও [uio]; উয়েই [uei]; উয়েও [ueo]; উয়াএ [uae]; উয়াও [uao]; উওএ [uoe] »।

[২.১২৬] চারিটী স্বর-ধ্বনির সমাবেশ (Tetraphthongs): « এওয়াই [eoai], এওয়াএ [eoae], আওয়াই [aoai], আওয়াএ [aoae]; অআইও [ɔaio] »; এবং পাঁচটী স্বর-ধ্বনির সমাবেশ (Pentaphthongs): « অওয়াইও [ɔoaio], আওয়াইও [aoaio] »-ও মিলে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে « ও » এবং « এ » ব্যঞ্জন-বর্ণের কার্য করে বলিয়া, এগুলিকে সব সময়ে সত্যকার মিশ্র বা যৌগিক স্বর বলা চলে না।

[২.১২৭] একটী স্বর-ধ্বনি পর পর দুই বার, অবিকৃত বা অমিলিত ভাবে, বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা, « ইই [i-i] »—« নিইই—আমি তো নিইই »; « ওও [o-o] »—« খোও »; « এএ [e-e] »—« খেয়ে [খেএ] = খাইয়া »।

[২.১২৮] একটী সরল অথবা যৌগিক স্বর-ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া, শব্দে প্রযুক্ত এক-একটী অক্ষর (Syllable) হয়। অক্ষরের আদিতে ও অন্তে ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকিতে পারে; অক্ষর স্বরান্ত (Open) বা ব্যঞ্জনান্ত (Closed) হয়; যথা « এ; ও; স্রো; কে; ভাই, দই, কেউ (ই, উ—ব্যঞ্জন ধ্বনির ন্যায় প্রযুক্ত); কান্; ত্যাগ্; এক্ টা; চন্দ্র = চন্-দ্র »; ইত্যাদি।

[২.১৩] সানুনাসিক স্বর (Nasalised Vowels)

[২.১৩১] স্বর-বর্ণ উচ্চারণ-কালে মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে, ফুস্‌ফুস্ কণ্ঠ স্থিত শ্বাস-নালী হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া মুখ দিয়া নির্গত হয়। সঙ্গে-সঙ্গে যদি নাসিকা-পথ দ্বারাও বায়ু বহির্গত হইতে পায়, তাহা হইলে স্বর-ধ্বনি সানুনাসিক- অথবা অনুনাসিক-ধ্বনি যুক্ত হয়।

বাঙ্গালায়, « ँ » (চন্দ্রবিন্দু) এই চিহ্ন-দ্বারা স্বরবর্ণের সানুনাসিক ভাব প্রদর্শিত হয় ; যথা, « আ—আঁ ; পাক—পাঁক ; তাহার—তাঁহার » ইত্যাদি। সমস্ত বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনি (সরল ও যৌগিক), সানুনাসিক-ভাবে উচ্চারিত হইতে পারে ; যথা, « অঁ—সঁপে ; আঁ—চাঁদ ; ই, ঈঁ—ইঁদুর, সিঁধ=[সীঁধ্] ; উঁ, ঊঁ—ছুঁই, ছুঁচ ; এঁ—হেঁকে ; 'অ্যাঁ'—পেঁচ—[প্যাঁচ্], পেঁচা=[প্যাঁচা] ; ওঁই, আঁও, এঁই, অ্যাঁও » ইত্যাদি।

[২.১৩২] শব্দ-মধ্যে « ঙ, ঞ, ণ, ন, ম » প্রভৃতি নাসিক্য ধ্বনি থাকিলে, নিকটবর্তী স্বর-ধ্বনিও বাঙ্গালার উচ্চারণে অনুনাসিক-ভাবগ্রস্ত হয় ; যথা, « মা »—বাঙ্গালা উচ্চারণে [ম্—আ] নহে, [ম্-আঁ, মাঁ] ; « নাম » = [ন্-আম্] নহে, [ন্-আঁম্, নাঁম্] ; ইত্যাদি।

[২.১৩৩] বহু ভাষায় সানুনাসিক স্বর-ধ্বনি নাই। ইংরেজীতে সানুনাসিক নাই, কিন্তু ফরাসীতে সানুনাসিকের বিশেষ প্রাচুর্য—ইংরেজেরা সেই জন্য সাধারণতঃ সানুনাসিক ফরাসী শব্দের উচ্চারণ ঠিক-মতন করিতে পারে না। বাঙ্গালার প্রাদেশিক রূপে, বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গে বহু স্থলে, সানুনাসিক উচ্চারণ—হয় অজ্ঞাত, না হয় অল্প-প্রচলিত। কিন্তু সাধু ভাষা ও চলিত-ভাষা উভয়েই সানুনাসিক ধ্বনি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, এবং শব্দের অর্থের পার্থক্য, শব্দস্থ স্বর-ধ্বনির সানুনাসিকত্বের উপরে অনেক সময়ে নির্ভর করে ; যেমন, « পাক—পাঁক ; কাদা—কাঁদা ; কাসা—কাঁসা ; তার—তাঁর ; খা—খাঁ ; পা—পাঁ » ইত্যাদি। এই জন্য এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত—বিশেষতঃ যাঁহাদের অভ্যস্ত প্রাদেশিক উচ্চারণে সানুনাসিক ধ্বনি নাই, তাঁহাদের পক্ষে।

[২.১৩৪] শব্দের মধ্যে সানুনাসিক অক্ষর থাকিলে, সাধারণতঃ সানুনাসিকত্ব, স্বরাঘাত-যুক্ত প্রথম অক্ষরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে ; যেমন, « (সংস্কৃত) সংক্রম > (প্রাকৃত) সংকম, সংকৰ > (বাং) সাকো > সাঁকো ; তাই+কর > তাহাঁর > তাঁহার ; বাম > বাওঁ > বাঁও, বাঁ ; তুমি > তুইঁ > তুঁই ; গোস্বামী > গোসাইঁ > গোঁসাই » ইত্যাদি।

[২.১৪] হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর (Short and Long Vowels)

[২.১৪১] অনেক ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে অর্থের পার্থক্য নির্ভর করে ; যেমন, ইংরেজীতে, kin [খিন্]—হ্রস্ব-ই—অর্থ 'সম্পর্ক', keen [খী—ন্]—দীর্ঘ-ঈ—অর্থ 'তীক্ষ্ণ' ; সংস্কৃত

« দি-ন (=দিবস), দী—ন (=দরিদ্র) »। বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-বর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে না। স্বর-ধ্বনির হ্রস্বতা- বা দীর্ঘতা-সম্বন্ধে বাঙ্গালা উচ্চারণে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সমগ্র শব্দটীর দৈর্ঘ্যের সহিত তদন্তর্গত স্বর-ধ্বনির দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বিজড়িত। Mono-syllabic অর্থাৎ একাক্ষর পদ, সাধারণতঃ বাঙ্গালায় দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয়: « দিন ('দিবস'), দীন ('দরিদ্র'), দিন (='দিউন, আপনি দান করুন'), দীন ('মুসলমান ধর্ম') »—এই চারিটী একাক্ষর শব্দের উচ্চারণ এক প্রকারের,—একক অবস্থিত বা উচ্চারিত হইলে, চারিটীই দীর্ঘ করিয়া উচ্চারিত হয়; কিন্তু একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে আসিলে, এই শব্দের ই-ধ্বনি দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব হইয়া দাঁড়ায়; যথা, « দিন-কাল; দীন-দুঃখী; বইটা আমায় দিন্ তো; দীন-দুনিয়ার মালিক »। তদ্রূপ—« এক » [অ্যা—ক্]—একাক্ষর এই শব্দে 'বাঁকা' এ-কার দীর্ঘ, কিন্তু « একা, একটা » প্রভৃতি একাধিক অক্ষরের পদে, এ-কার হ্রস্ব; « জল »—এখানে অ-কার দীর্ঘ, [জ—ল্], কিন্তু « জলা, জলটুকু »—এখানে অ-কার হ্রস্ব।

[২.১৪২] বাঙ্গালা ছন্দে এই জন্য স্বর-ধ্বনির হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধরা নহে, একই স্বর-ধ্বনি অবস্থান-গতিকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। সংস্কৃতে « আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ » সর্বদা দীর্ঘ; বাঙ্গালায় এগুলি হ্রস্বও হয়, দীর্ঘও হয়; তদ্রূপ সংস্কৃতে « অ, ই, উ, ঋ » সদা হ্রস্ব, কিন্তু বাঙ্গালায় এগুলি দীর্ঘও হয়।

« সম্মুখ সমরে পড়ি' বীর-চূড়ামণি »—

এখানে « সমরে » শব্দের এ-কার, « চূড়া » শব্দের ঊ-কার ও আ-কার—তিনটীই হ্রস্ব; সংস্কৃতে এইরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না—সবকয়টীকে টানিয়া দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইত। আবার « সম্মুখ » শব্দটীকে তিন অক্ষরের [সম্-মু-খ-] করিয়া না পড়িয়া, দুই অক্ষরের [সম্-মুখ্]

করিয়া পড়িলে, « মু »-এর উ-ধ্বনি, « খ »-এর অ-কারের লোপকে পূরণ করিবার জন্য, দীর্ঘ হইয়া উচ্চারিত হয়। আবশ্যক-মত পরবর্তী অক্ষরের লোপকে পূরণ করিয়া লইবার জন্য, পূর্ব অক্ষরের দীর্ঘীকরণ ঘটে ; ঐ অক্ষরের স্বর ধ্বনি দীর্ঘ হইয়া যায় ; এবং একাক্ষর শব্দ স্বতন্ত্র অবস্থিত হইলে (অর্থাৎ বাক্যের আর দুই-একটী শব্দের সহিত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত না হইলে), দীর্ঘ স্বর-যুক্ত হইয়া থাকে। বাক্যাংশের দৈর্ঘ্যের সহিত সেই বাক্যাংশের মধ্যে নিহিত অক্ষর-সমূহের স্বর ধ্বনির দৈর্ঘ্যের পরিমাণ জড়িত। এতদ্ভিন্ন, খাঁটি বাঙ্গালায় হ্রস্ব-দীর্ঘের বিশেষ রীতি আর নাই।

[২.১৪৩] সাধু-ভাষার সংস্কৃত-শব্দ-বহুল রীতিতে লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার সময়ে, সংস্কৃত শব্দে স্বরের দৈর্ঘ্য কচিৎ রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সর্বত্র নহে ; এই দীর্ঘীকরণকে পদে-পদে বাঙ্গালা উচ্চারণ-রীতির অধীন রাখা হয়। ধীর-গম্ভীর-ভাবে পাঠ করিলে, খাঁটী বাঙ্গালা পদেও অন্ত্য স্বর দীর্ঘ করিয়া পড়া হয়। কিন্তু এই রীতি, সাধারণ কথিত বাঙ্গালার নিয়মের বিরোধী।

[২.১৪৪] বাঙ্গালা উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘের এই পার্থক্য রক্ষিত না হওয়ার কারণে, বাঙ্গালা বানানেও এ বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই ; যথা, « একটি—একটী ; হাতি—হাতী ; ঘড়ি—ঘড়ী ; চুন—চূন ; সুতা—সূতা ; দীঘি—দিঘী—দীঘী »। এ জন্য প্রায়ই হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ-র অদল বদল দেখা যায়, বিশেষতঃ শব্দের শেষে। হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যেখানে বানানে শব্দের উৎপত্তির অনুযায়ী দীর্ঘ ঈ বা দীর্ঘ-ঊ পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় সেখানে হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ মিলে ; যেমন, « মাটি (হিন্দী 'মাটী, মিট্টী'), ঘি (হিন্দী 'ঘী'), মতি ('মুক্তা' -অর্থে, হিন্দী 'মোতী'), বাবু (হিন্দী 'বাবূ'), লোক (হিন্দী 'লোক'), » ইত্যাদি। বাঙ্গালার প্রাকৃত-জ শব্দের বানানে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই-ঈ এবং উ-ঊ-র স্থিরতা নাই ; বিদেশী শব্দ সম্বন্ধেও তাহাই—সাধারণতঃ লেখায় হ্রস্ব অক্ষরই বেশী প্রযুক্ত হয়, দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার খুবই বিরল ; যথা, « ফারসি—ফারসী ; হিন্দু (শব্দটী ফারসী—মূল ফারসী রূপ-অনুসারে 'হিন্দূ' হওয়া উচিত) ; আমির—আমীর ; দর্জি—

কস্তুরী ; হুমায়ুন—হুমায়ূন ; যীশু—যিশু ; এঞ্জিন—ইঞ্জিন » ইত্যাদি। অর্ধ-তৎসম শব্দের বেলায়ও স্থির নিয়ম নাই ; যেমন, « গিরি—গিন্নী ; পিরীস, পিরিস, পিদ্দিম » ইত্যাদি। কেবল তৎসম শব্দে, মূল সংস্কৃত-অনুযায়ী হ্রস্ব বা দীর্ঘ বানান রাখিবার চেষ্টা হয় ; এবং সাধারণতঃ লেখকগণ তৎসম শব্দ সম্বন্ধেই যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

[২.১৩] দ্বিমাত্রিকতা (Dimetrism, Bimorism)

ইহা বাঙ্গালা চলিত-ভাষার উচ্চারণের একটী বৈশিষ্ট্য। দুই মাত্রা—অর্থাৎ « চ-ল » এই দুইটী অক্ষর সহজ-ভাবে উচ্চারণ করিবার কালে যতটুকু সময় লাগে, বাঙ্গালা চলিত-ভাষার শব্দগুলি আপনাহিলা উচ্চারিত হইলে, সাধারণতঃ ততটুকু সময়ের দৈর্ঘ্য মানিয়া চলিতে চায়। এই জন্য তিন বা চারি মাত্রার শব্দ হইলে, সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই অক্ষরের বা মাত্রার শব্দ করিয়া লইবার প্রয়াস চলিত-ভাষায় দেখা যায় : « চলিয়া > চ'লে, রাখিলাম > রাখ্-লাম্ » ইত্যাদি। এই হেতু একাক্ষর শব্দ, স্বতং পৃথক্-ভাবে উচ্চারিত হইলে, বাঙ্গালায় কখনও হ্রস্ব হয় না, দ্বিমাত্রিক বা দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয় ; যথা, « রা-ম »—দুইটী হ্রস্ব অক্ষর (syllable)-যুক্ত পদ, দ্বিমাত্রিক ; এবং « রা—ম্ », দীর্ঘ এক-অক্ষর-যুক্ত পদ, একাক্ষর কিন্তু দ্বিমাত্রিক। বর্ণের নাম, একাক্ষর « ক—, খ—, গ— », এবং দ্ব্যক্ষর « ক-কার, খ কার, গ-কার » প্রভৃতি, —উভয়ই দ্বিমাত্রিক। সুদীর্ঘ বা অনেকাক্ষর শব্দকে যথাসম্ভব দুই অক্ষরের বা দুই মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া লওয়ার দিকে চেষ্টা হয় ; যেমন, « অপরাজিতা », পূর্ণ উচ্চারণে « অ-প-রা-জি-তা » (৫ অক্ষর), কিন্তু চলিত কথায়, ফুলের নাম-হিসাবে, « অপ্-রা-জি-তা » (২+২=৪ অক্ষর, দুই দ্বিমাত্রিক খণ্ডে বিভক্ত) ; « ভাগিনের »—(৪ অক্ষর), চলিত ভাষায় « ভাগ্-নে » (২ অক্ষর)। বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যয়াদি যুক্ত হইলে, শব্দ-গুলিকে এই ভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হয় ; যথা, « পাগল » (২ অক্ষর— « পা-গল্ »), স্ত্রীলিঙ্গে « পা-গ-লী » (৩ অক্ষর) স্থলে উচ্চারণে « পাগ্-লী (২ অক্ষরের) ; « কটক » (২ অক্ষর)—বিশেষণে « কটকী » স্থলে, উচ্চারণে « ক'ট্-কী » ; « হলুদ », বিশেষণ « হলুদিয়া » (৪ অক্ষর) স্থলে « হ'ল্-দে » (২ অক্ষর) ; এরূ-বার « বাইগণ », বিশেষণ « বাইগণিয়া » (৫ অক্ষর—বাই-গ-ণি-য়া), সংক্ষেপে « বেগুনে » ও পরে « বেগ্-নে » (২ অক্ষর) ; « ফেলিয়া দাও » (সাধু-ভাষায়—পাঁচ অক্ষর) > « ফেলে দাও » (৩ অক্ষর) > « ফেল্-দাও » (দ্রুত উচ্চারণে, চলিত-ভাষায়—২ অক্ষর)।

[২.১৬] বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি বাগ্‌-যন্ত্রের সমাবেশ (Position of the Vocal Organs in pronouncing the Bengali Vowels), এবং বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির শ্রেণী-বিভাগ (Classification of the Bengali Vowel Sounds)

[২.১৬১] সাধু-বাঙ্গালার ও চলিত-বাঙ্গালার সাতটী স্বর-ধ্বনি — অ, আ, ই, উ, এ, 'অ্যা', ও — এগুলির উচ্চারণের সময়ে মুখাভ্যন্তরে জিহ্বার অবস্থান, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

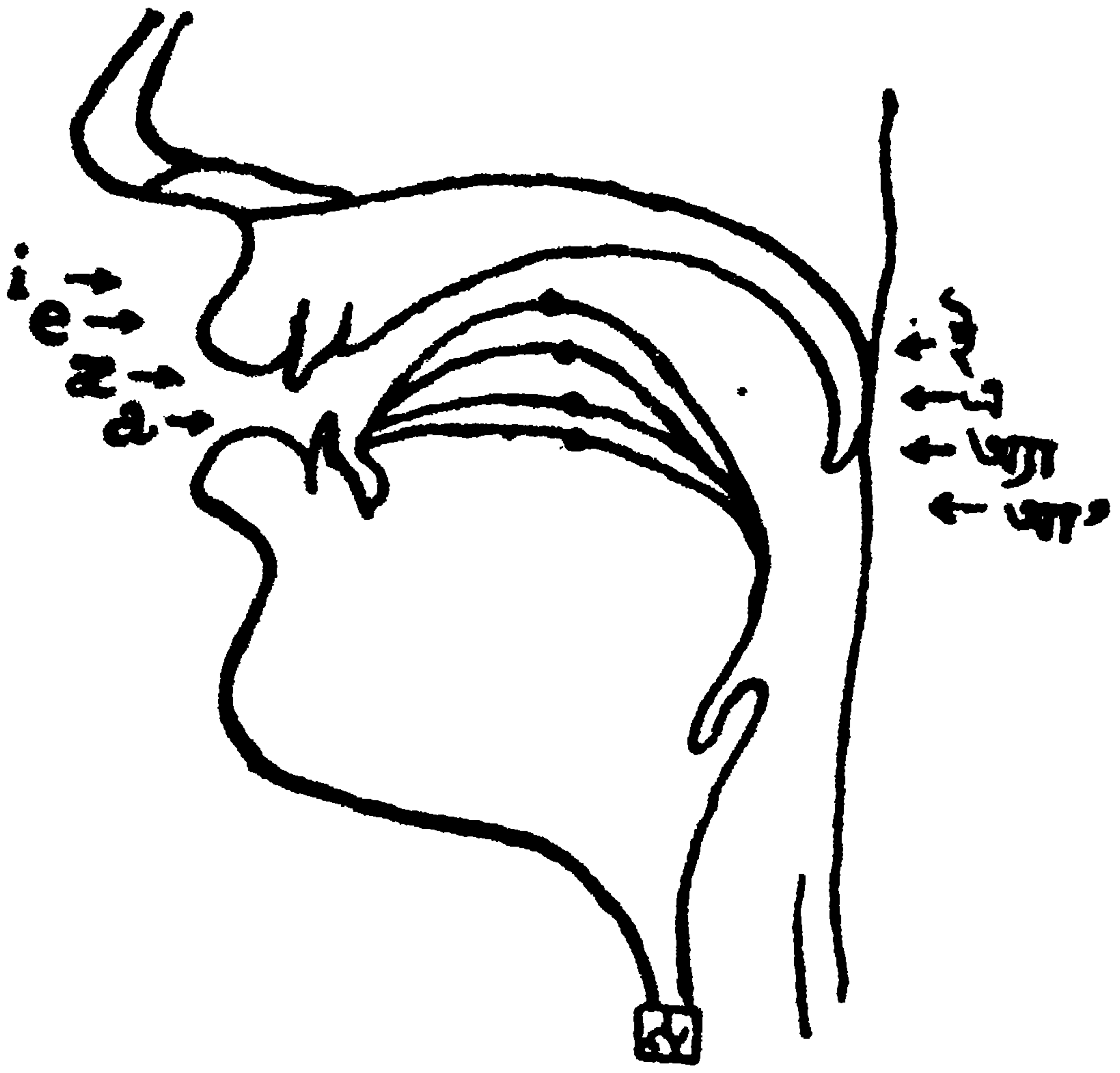

জিহ্বা সম্মুখভাগে দন্তের দিকে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বর ধ্বনি—
[ই, এ, 'অ্যা', আ'—i, e, æ, a]

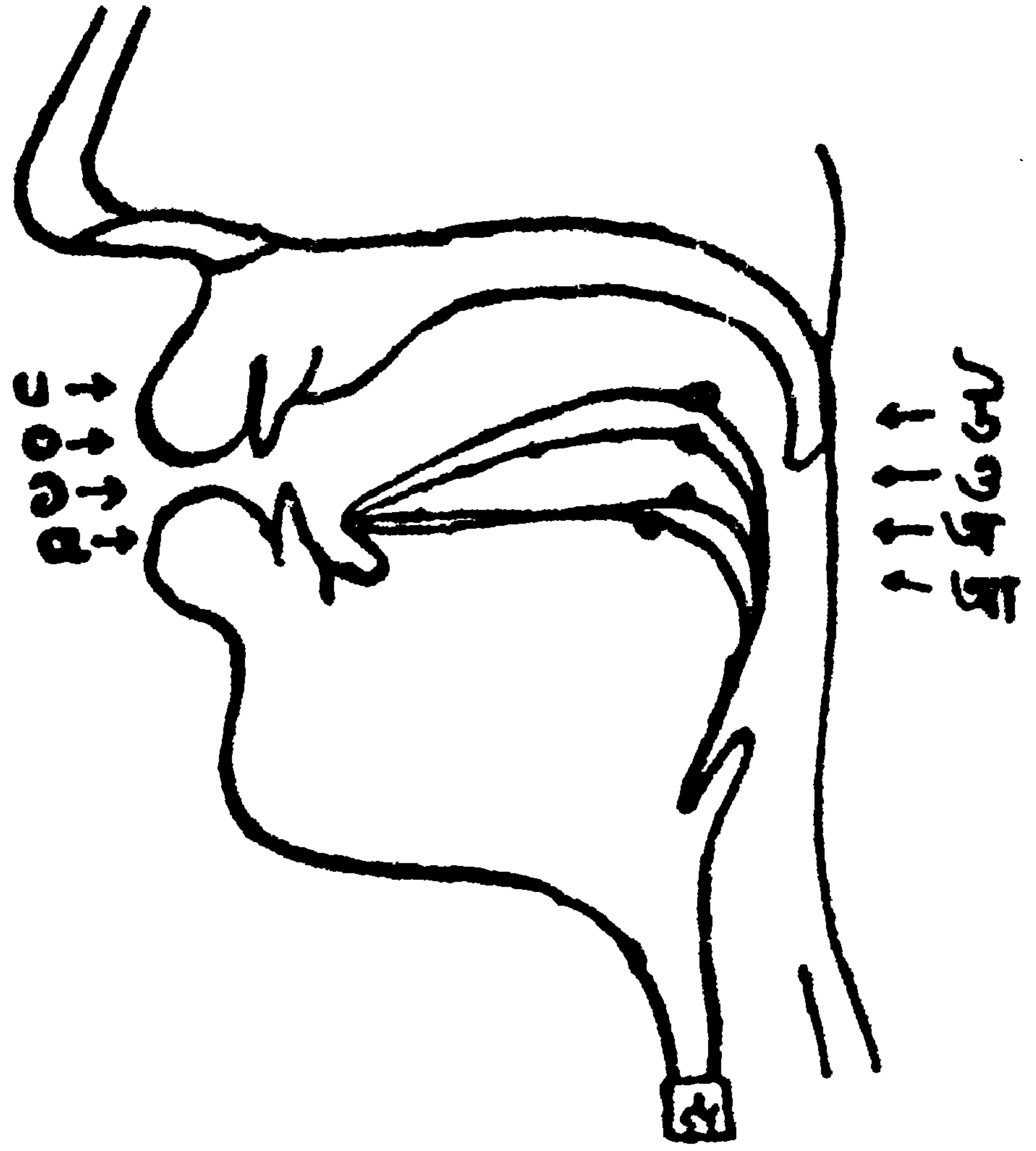

জিহ্বা পশ্চাতে কণ্ঠের দিকে আকর্ষিত করিয়া উচ্চারিত স্বর-ধ্বনি—
[আ, অ, ও, উ—a, ɔ, o, u]

[ক] ই (ঈ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা আগাইয়া আইসে, ও উচ্চে অগ্র-তালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পহুঁছে। এ-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান, ই-কারের মত সম্মুখে, কিন্তু একটু নীচে; 'অ্যা'-কারের বেলায় আরও নীচে। [ই (ঈ), এ, 'অ্যা']—এগুলির উচ্চারণ-হেতু জিহ্বা তালুর দিকে প্রসৃত হয় বলিয়া, এগুলিকে 'তালব্য' (Palatal) স্বর-ধ্বনি বলা হয়; জিহ্বা আগাইয়া সম্মুখ ভাগে চলিয়া আইসে বলিয়া, এগুলিকে 'সম্মুখস্থ স্বর-ধ্বনি' (Front Vowels) বলা যায়। [এ] ও ['অ্যা']-র উচ্চারণে, জিহ্বার পশ্চাদংশ কতকটা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, এই হেতু এই দুইটীকে 'কণ্ঠতালব্য স্বর, (Palato-guttural Vowels) বলা হয়। ই (ঈ) কারের বেলায় জিহ্বা উচ্চে থাকে; অতএব ইহাকে 'উচ্চাবস্থিত সম্মুখস্থ স্বর-ধ্বনি' (High Front Vowel) বলা চলে; [এ] তদ্রূপ 'মধ্যাবস্থিত' (Mid Front Vowel), এবং ['অ্যা'] 'নিম্নাবস্থিত সম্মুখস্থ' (Low Front Vowel)। এই সম্মুখাবস্থিত স্বর-ধ্বনিগুলির উচ্চারণ-কালে, অধরোষ্ঠ প্রসৃত হয়; এই জন্য ইহাদিগকে 'প্রসার-যুক্ত' বা 'প্রসৃত' স্বর-ধ্বনি (Spread Vowels) বলা যায়।

[খ] উ (ঊ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা পিছাইয়া আইসে, ও পশ্চাত্তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি উঠে; ও-কারের উচ্চারণে জিহ্বা আর একটু নিম্নে আইসে, এবং অ-কারের বেলায় আরও নিম্নে। মুখের পশ্চাৎ বা অভ্যন্তর ভাগে জিহ্বার আগমনের কারণ, এই ধ্বনিত্রয়কে 'পশ্চাদ্ভাগস্থ স্বর-ধ্বনি' (Back Vowels) বলে। এগুলির মধ্যে [উ (ঊ)] 'উচ্চাবস্থিত' (High Back), [ও] 'মধ্যাবস্থিত' (Mid Back), এবং [অ] 'নিম্নাবস্থিত' (Low Back)। এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণে ওষ্ঠাধর প্রলম্বিত হইয়া বর্তুল বা গোল আকার ধারণ করে, এই জন্য এগুলিকে Labial বা 'ওষ্ঠ্য' এবং Rounded বা 'বর্তুল' ধ্বনি বলা যায়। ও-কার এবং অ-কারের উচ্চারণে, জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকর্ষিত হয় বলিয়া এই দুইটীকে 'কণ্ঠৌষ্ঠ্য' (Labio-guttural) ধ্বনিও বলা যায়।

[গ] বাঙ্গালা আ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণ-ভাবে শায়িত অবস্থায় থাকে, বরং একটু কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাকে সাধারণতঃ 'কণ্ঠ্য-ধ্বনি' (Guttural Sound)-ই বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটী 'নিম্নাবস্থিত' (Low) এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি (অথবা কেন্দ্রস্থানীয়) অংশেই অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে 'কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত' (Low Central) ধ্বনি বলা যায়। মুখ-বিবর উন্মুক্ত বা বিবৃত থাকে বলিয়া ইহাকে 'বিবৃত' (Open) ধ্বনিও বলা হয়।

[খ] এই 'কেন্দ্রীয়' আ-কার ভিন্ন, বাঙ্গালার প্রাদেশিক উচ্চারণে আর এক প্রকার সম্মুখে বা মুখাগ্রভাগে উচ্চারিত 'আ'-ধ্বনি আছে, ইহাকে 'তালব্য আ' (Palatal 'a') বলা যায়; 'কল্য'-অর্থে « কা'ল » শব্দে, ও তদনুরূপ শব্দে, এই তালব্য আ-কার মিলে; শব্দের প্রাচীন রূপে একটী ই-কার বিদ্যমান ছিল, সেই ই-কারের লোপের সঙ্গে-সঙ্গে, আ-কারের উচ্চারণের এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে; যথা, সংস্কৃত « কল্য » > প্রাকৃত « কল্লিং » > প্রাচীন বাঙ্গালা « কালি » > মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় « কাইল্ » (এই উচ্চারণ এখনও বাঙ্গালা দেশে বহু স্থলে বিদ্যমান) > আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গালা « কা'ল, কাল্ » (তালব্য আ); কিন্তু কণ্ঠ্য-আ-কার যুক্ত « কাল » শব্দের অর্থ 'সময়, মৃত্যু'। তদ্রূপ—« চাল = চাল-চলন (কণ্ঠ্য আ), চা'ল বা চাল (তালব্য আ < « চাইল, চাউল »); ইত্যাদি। বিশেষ-ভাবে এই প্রকারের 'তালব্য' আ-কারকে জানাইতে হইলে, « আ' (া') » এবং « আ় (া়) »—এই চিহ্নদ্বয়ের একটী ব্যবহৃত হয়। চলিত-ভাষায় এই তালব্য আ-কার নাই, সর্বত্রই কণ্ঠ্য আ-কার ই উচ্চারিত হয়।

[২.১৬২] বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির উচ্চারণ-সঙ্গত বর্গীকরণ—

	সম্মুখাবস্থিত Front (প্রসৃত Spread)	কেন্দ্রীয় Central (বিবৃত Open)	পশ্চাদবস্থিত Back (বর্তুল Rounded)
উচ্চ High	ই (ঈ) [i]		উ (ঊ) [u]
উচ্চ-মধ্য High-Mid	এ [e]		ও [o]
নিম্ন-মধ্য Low Mid	'অ্যা' [æ]		অ [ɔ]
নিম্ন Low	(আ', আ় [a]) (প্রাদেশিক ভাষায়)	আ [ɑ]	

পূর্বে ৪৬ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মুখাভ্যন্তরের দুইটী চিত্রে, বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনির উচ্চারণে মুখের ভিতরে জিহ্বার আপেক্ষিক অবস্থান, পর-পৃষ্ঠে প্রদত্ত চিত্রের দ্বারা প্রণিধান করা সহজ হইবে, এবং উচ্চারণ-সঙ্গত বর্গীকরণ বুঝা যাইবে।

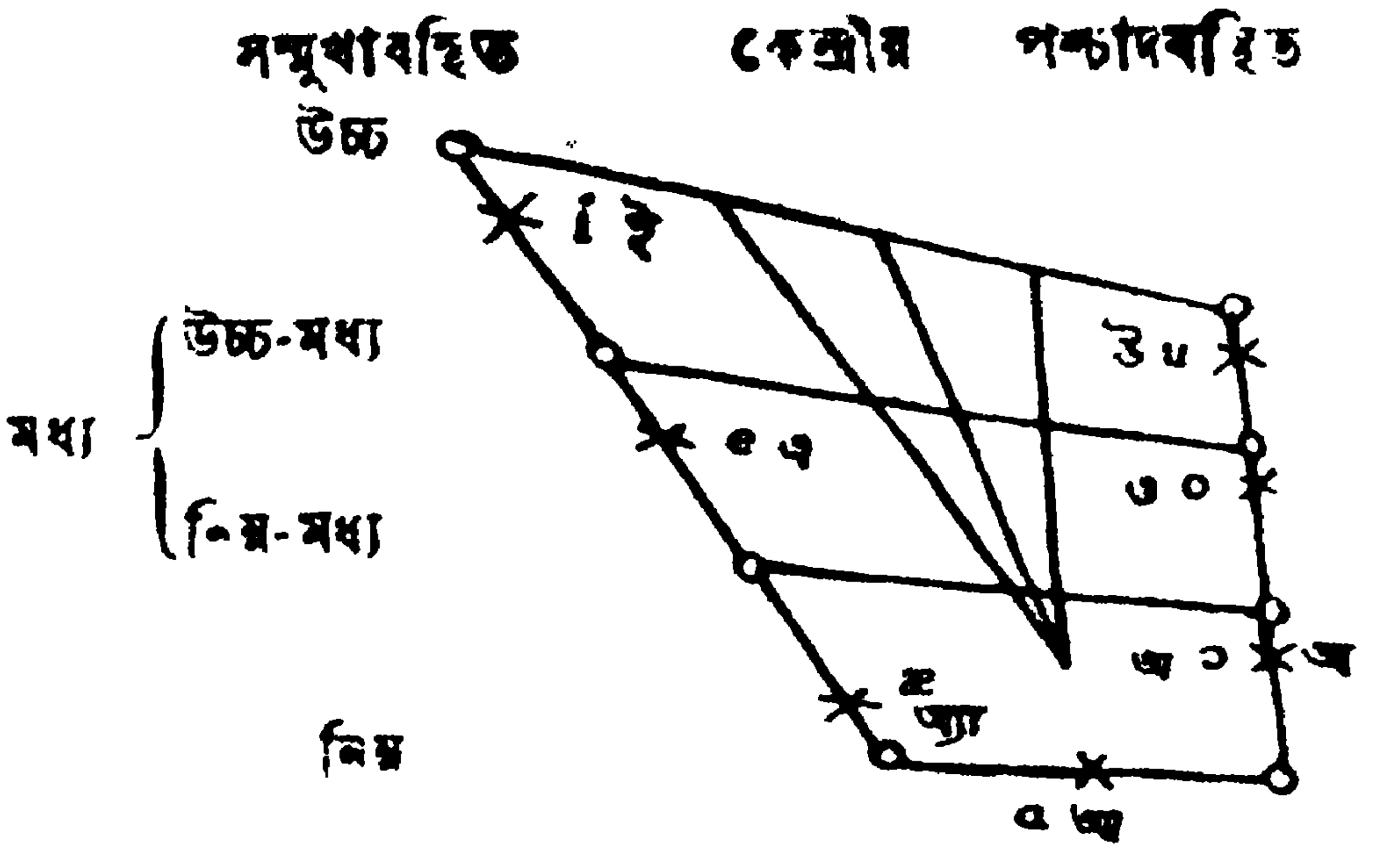

[২.১৭] বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ

[২.১৭১] সংস্কৃত (এবং বাঙ্গালা) বর্ণমালায়, « ক » হইতে « ম » পর্যন্ত পঁচিশটী বর্ণকে **স্পর্শ-বর্ণ** (Stops, Occlusives) বলে ; এগুলির উচ্চারণে, জিহ্বার কোনও অংশের সহিত কণ্ঠ ও তালুর, কিংবা ওষ্ঠে ও অধরে স্পর্শ হয়। স্পর্শবর্ণগুলি আবার উচ্চারণ-স্থান (অর্থাৎ স্পর্শের স্থান)-অনুসারে পাঁচটী বর্গ বা শ্রেণীতে পড়ে। উচ্চারণ-স্থান এইগুলি— কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ ; [১] **ক-বর্গ বা কণ্ঠ্য বর্ণ** (Gutturals, Velars)—« ক, খ, গ, ঘ, ঙ » ; [২] **চ-বর্গ বা তালব্য বর্ণ** (Palatals) —« চ, ছ, জ, ঝ, ঞ » ; [৩] **ট-বর্গ বা মূর্ধন্য বর্ণ** (Cerebrals, Cacuminals বা Retroflex Sounds)—« ট, ঠ, ড, ঢ, ণ » ; [৪] **ত-বর্গ বা দন্ত্য বর্ণ** (Dentals)—« ত, থ, দ, ধ, ন » ; এবং [৫] **প-বর্গ বা ওষ্ঠ্য বর্ণ** (Labials)—« প, ফ, ব, ভ, ম »। প্রত্যেক বর্গে পাঁচটী করিয়া বর্ণ বা ধ্বনি ; এগুলির মধ্যে, বর্গের শেষ বর্ণ-কয়টী (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) **নাসিক্য-ধ্বনি**—এগুলির উচ্চারণ-কালে মুখের অভ্যন্তরে বা ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ ঘটিয়া থাকে, এবং মুখ-বিবরস্থ বায়ু, মুখ-পথ দিয়া বাহির হইতে না পারিয়া, নাসিকা দিয়া নিঃসৃত হয়। প্রতি বর্গের আর চারিটী বর্ণের মধ্যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ টী যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয়টীতে

প্রাণ- বা নিঃশ্বাস (অর্থাৎ হ-কার-জাতীয় ধ্বনি)-যোগে সৃষ্ট হয়; এই জন্য এগুলিকে **মহাপ্রাণ** (Aspirate) ধ্বনি বলে; যথা—« খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ; থ, ধ; ফ, ভ »। (« খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ »-কে যেন « ক্‌হ, গ্‌হ, চ্‌হ, জ্‌হ, ট্‌হ, ড্‌হ, ৎহ, দ্‌হ, প্‌হ, ব্‌হ »-রূপে বিশ্লিষ্ট করা যায়।) বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনিগুলিতে এই প্রাণ (Aspiration) নাই, এ জন্য ইহাদিগকে **অল্পপ্রাণ** (Unaspirated) ধ্বনি বলে; যথা—« ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব »। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গাম্ভীর্যহীন; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের এবং পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ গম্ভীর। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে, কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে স্থিত Vocal Chords বা স্বরোৎপাদক স্থিতিস্থাপক পিশিত-খণ্ডের কম্পন হয়; এই কম্পনটুকু প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে **অঘোষ-বর্ণ** (Voiceless বা Unvoiced Sounds) অথবা **শ্বাস-বর্ণ** (Breath Sounds, Hard Sonnds বা Tenues) বলে; এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণকে **ঘোষ-বর্ণ** (Voiced Sounds) বা **নাদ-বর্ণ** (Soft Sounds বা Mediae) বলে।

উচ্চারণ-স্থান	অঘোষ (Voiceless) (১)	(২)	ঘোষ (Voiced) (৩)	(৪)	(৫)
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ	ক [k]	খ [kh]	গ [g]	ঘ [gh]	ঙ [ṅ]
তালু	চ [c]	ছ [ch]	জ [j]	ঝ [jh]	ঞ [ñ]
মূর্ধা	ট [ṭ]	ঠ [ṭh]	ড [ḍ]	ঢ [ḍh]	ণ [ṇ]
দন্ত	ত [t]	থ [th]	দ [d]	ধ [dh]	ন [n]
ওষ্ঠ	প [p]	ফ [ph]	ব [b]	ভ [bh]	ম [m]

« য (=য়, অর্থাৎ 'ইঅ'), র, ল, ব (ইহার মূল উচ্চারণ ছিল ইংরেজী w-এর মত, অর্থাৎ 'উঅ') »—স্পর্শ-বর্ণ ও উষ্ম-বর্ণের 'অন্তঃ' বা মধ্যে আসে বলিয়া এগুলিকে অন্তঃস্থ-বর্ণ বলে। এগুলির ইংরেজী নাম Semi-vowels অর্থাৎ অর্ধ-স্বর (য, ব), ও Liquids অর্থাৎ তরল-স্বর (র, ল) ; এই অক্ষরগুলির অন্তর্নিহিত অ-কারকে বাদ দিলে যথাক্রমে স্বরধ্বনি « ই (=য়্), ঋ (=র্), ঌ (=ল্), উ (=ব্, w) » মিলিবে।

« শ, ষ, স, হ »—এগুলিকে উষ্ম-বর্ণ বলে। 'উষ্ম' শব্দের অর্থ 'নিঃশ্বাস'—যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ এগুলির উচ্চারণ প্রলম্বিত করা যায় ; যেমন—« ইশ্‌শ্‌শ্‌...... » ; কিন্তু নাসিক্য ভিন্ন অন্য স্পর্শবর্ণগুলিকে এরূপে প্রলম্বিত করা যায় না ; যেমন—« ইক্ ; ইট্ ; ইব্ »। উষ্ম-বর্ণের ইংরেজী নাম Spirant অর্থাৎ 'নিঃশ্বসিত' বা 'নিঃশ্বাসাশ্রয়ী'।

কলিকাতা-অঞ্চলের উচ্চারণে, সাধু- ও চলিত-বাঙ্গালার শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত মহাপ্রাণ বর্ণগুলির অল্পপ্রাণ-রূপে উচ্চারিত করিবার দিকে একটা প্রবণতা আছে ; যথা—« মুখ—মুক, দেখতে—দেকতে, রথযাত্রা—রত্‌যাত্রা, বাঁধা—বাঁদা, মাথা—মাতা, বাঘ—বাগ, আঠা—আটা, দৃঢ়—দ্রিড়ো » ইত্যাদি। অন্ততঃ শব্দের মধ্যস্থিত স্বরান্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির যথাযথ উচ্চারণ বাঞ্ছনীয়।

☞ পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায়, ঘোষ মহাপ্রাণ-ধ্বনির উচ্চারণ বিশুদ্ধ-ভাবে করা হয় না—« ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ »-এর উচ্চারণে, « গ, জ, ড, দ, ব »-এর পরে প্রাণ বা হ-কার যোগ করা হয় না (হ-কারের নিজস্ব ধ্বনিও পূর্ব-বঙ্গে অজ্ঞাত) ; মহাপ্রাণ বর্ণের স্থানে পূর্ব বঙ্গের কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ কণ্ঠের অভ্যন্তরস্থ glottal passage অর্থাৎ শ্বাস-নালী বা শ্বাস-পথকে চাপিয়া বা রুদ্ধ করিয়া « গ, জ, ড, দ, ব » উচ্চারণ করা হয় (pronounced with glottal closure, 'শ্বাস-নালীয়'- বা 'কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র')। এই হেতু, পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীদের কানে পূর্ব-বঙ্গবাসীর উচ্চারিত « ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ » কতকটা যেন বিকৃত « গ, জ, ড, দ, ব »-এর মত লাগে। কেবল পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষার ব্যবহারে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ উচ্চারণ শিক্ষা-সাপেক্ষ।

[২.১৭২] বাঙ্গালার বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণ-আলোচনা—

ক-বর্গ—« ক, খ, গ, ঘ, ঙ »। জিহ্বার মূল বা পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা

কণ্ঠের দিকে তালুর কোমল অংশে স্পর্শ করিয়া, এই বর্গের ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়।

ঙ বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী sing শব্দের . . ।

প্রাচীন বাঙ্গালায় «ঙ» আবার সানুনাসিক অন্তঃস্থ ব (বা w)-এর মত—উঁঅ-র মত—উচ্চারিত হইত; সেই জন্য এই বর্ণের বাঙ্গালা নাম «উঁঅ» বা «উঁঅা»।

চ-বর্গ—«চ, ছ, জ, ঝ, ঞ»। জিহ্বার মধ্য-ভাগ-দ্বারা তালুর সম্মুখ বা কঠিন অংশে স্পর্শ করিয়া, এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণ করা হয়।

☞ বাঙ্গালা «চ, ছ, জ, ঝ»-এর উচ্চারণ ইংরেজী ch বা tch, ch-h বা tch-h, j বা dg, ও jh বা dge-h-এর মত। চ-বর্গের এইরূপ উচ্চারণ এখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষায় প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব- ও উত্তর-বঙ্গে, এই বর্ণগুলির উচ্চারণ একেবারে পৃথক্। «চ»-এর উচ্চারণ ইংরেজী ch বা tch-এর মত না হইয়া, ইংরেজী ts এর মত হয়; «ছ», মহাপ্রাণ «চ» অর্থাৎ «চ্‌হ্» বা ch-h না হইয়া, ইংরেজীর s-এর ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় (অর্থাৎ ইহা স্পর্শ মহাপ্রাণ হইতে উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে); «জ» তদ্রূপ ইংরেজী j-র মত না হইয়া, dz বা z-এর মত হয়; এবং «ঝ», j-h-এর মত না হইয়া, চাপা গলায় উচ্চারিত dz-এর মত হয়। পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রগণের পক্ষে বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত চ-বর্গের উচ্চারণ বিশেষ যত্ন করিয়া আয়ত্ত করা উচিত; প্রাদেশিক উচ্চারণ অনেক সময়ে ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী ভাষার উচ্চারণেও সংক্রামিত হইয়া থাকে—watch-কে [wats], church-কে [ˈsarts], college-কে [kŏledz] বা [kŏlez], judge-কে [zaz] বলা হয়, এবং এই প্রকার কদুচ্চারণ খুবই শুনা যায়।

☞ চ-বর্গের এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলির পশ্চিম-বঙ্গে ও প্রায় সমগ্র ভারতে প্রচলিত উচ্চারণ, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে শুদ্ধ ও শিক্ষিত উচ্চারণ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, এ বিষয়ে সকলের অবহিত হওয়া আবশ্যক।

«ঞ»-র উচ্চারণ সানুনাসিক «য়ঁ» অর্থাৎ «ইঁঅ»-র মত; এই জন্য ইহার নাম «ইঁঅ»। এই বর্ণ সাধারণতঃ চ-বর্গের বর্ণগুলির পূর্বে অবস্থান করে; তখন বাঙ্গালায় উহার উচ্চারণ দন্ত্য-ন-কারবৎ হয়; যেমন—«পঞ্চ =[পন্‌চ], অঞ্জলি—[অন্‌জোলি], বাঞ্ছা—[বান্‌ছা], ঝঞ্ঝা—[ঝন্‌ঝা]»।

অন্যত্র « য়ঁ »-র মত উচ্চারণ : « মিঞা—মিয়াঁ »। সংস্কৃত « যাজ্ঞা » শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা উচ্চারণ [জাঁচিঙা], আধুনিক [জাচ্‌না]। « জ+ঞ—জ্ঞ »-এর উচ্চারণ বাঙ্গালায় [গঁ্য]।

☞ বাঙ্গালার « চ, ছ, জ, ঝ »-এর আধুনিক উচ্চারণ (ch, chh, j, jh-এর মত উচ্চারণ), বিশুদ্ধ স্পর্শ-ধ্বনি নহে ; বিশুদ্ধ স্পর্শ-ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, ইহা প্রলম্বিত করা যায় না—« ইক্‌, ইট্‌, ইব্‌ » ইত্যাদিতে যেমন দেখা যায়—[ক্‌, ট্‌, ব্‌] প্রভৃতি স্পর্শ ব্যঞ্জন-ধ্বনির দীর্ঘীকরণ সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঙ্গালা « চ, ছ, জ, ঝ »-কে প্রলম্বিত করা যায়—« ইচ্‌ »-কে ইচ্ছামত [ইচ্‌শ্‌শ্‌……]-রূপে প্রলম্বিত করা যায়—একটা [শ্‌শ্‌] ধ্বনি শেষে আসে ; « ইজ্‌……»-কেও তেমনি প্রলম্বিত করা যায়, একটা zh-জাতীয় ধ্বনি শেষে আসে। প্রকৃত পক্ষে, আধুনিক বাঙ্গালা চ-বর্গ স্পৃষ্ট ধ্বনি নহে, ঘৃষ্ট অর্থাৎ জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই, উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণ-জাত ধ্বনি (Affricates)।

প্রাচীন কালে সংস্কৃতে, « চ, ছ, জ, ঝ »-র উচ্চারণ, আধুনিক উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ-রূপে অন্য ধরণের ছিল ; প্রাচীন উচ্চারণে এগুলি বিশুদ্ধ স্পর্শ বর্ণ ছিল—জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিনাংশের ঊর্ধ্বভাগ স্পর্শ করিত মাত্র ; ধ্বনিগুলিকে অন্যান্য স্পর্শ-ধ্বনির ন্যায়ই প্রলম্বিত করা সম্ভব ছিল না ; এই স্পৃষ্ট উচ্চারণ ক্ষণমাত্র-ব্যাপী হইত, ও কতকটা [ক্য, খ্য, গ্য, ঘ্য]-র মত শুনাইত ; « ইচ্‌=[ইক্য] ; ইছ্‌=[ইখ্য] ; ইজ্‌=[ইগ্য] ; ইঝ্‌=[ইঘ্য] »।

আধুনিক ভারতীয় উচ্চারণে « চ, জ »-প্রভৃতিতে এই উষ্ম অংশের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া, International Phonetic Association-এর ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালায়, ঘৃষ্ট-ধ্বনি-দ্যোতক « চ, জ »-এর প্রতিবর্ণ তৈয়ারী করা হইয়াছে—[cʃ, ɟʒ], অর্থাৎ স্পর্শ ধ্বনি [c, ɟ]-এর সঙ্গে উষ্ম [ʃ, ʒ] (sh, zh) ধ্বনির যোগ প্রদর্শিত করা হইয়াছে।

ট-বর্গ—« ট, ঠ, ড, ঢ, ণ » : এগুলির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্র-ভাগকে প্রতিবেষ্টিত করিয়া (অর্থাৎ উল্‌টাইয়া), মূর্ধা অর্থাৎ তালুর শীর্ষদেশের সন্নিকটে (আধুনিক বাঙ্গালা উচ্চারণে, আরও একটু নীচে), তালুরকঠিন অংশে স্পর্শ করিতে হয়। মূর্ধন্ বা মূর্ধা দেশে স্পর্শ হয় বলিয়া এগুলিকে **মূর্ধন্য বর্ণ** (Cerebrals) বলে ; ('মূর্ধন্য'-র অন্য ইংরেজী প্রতিশব্দ Cacuminal)। জিহ্বাগ্রকে উল্‌টাইয়া লইয়া উচ্চারণ করা,

মূর্ধন্য বর্ণগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ ; এই জন্য ইহাদিগকে Retroflex বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলা হয়।

☞ ইংরেজীর t, d ধ্বনি ঠিক আমাদের মূর্ধন্য « ট, ড » নহে ; ইংরেজীর ধ্বনি দুইটী আমাদের কানে আমাদের মূর্ধন্য « ট, ড »-র মত লাগিলেও, t d তিনটী বিষয়ে মূর্ধন্য বর্ণ হইতে পৃথক্ ; ইংরেজী t, d-তে [১] জিহ্বার অগ্রভাগ উলটানো হয় না, [২] স্পর্শ-স্থান মূর্ধা নহে, মূর্ধার বহু নিম্নে দন্তমূলের উপরিভাগে (Alveolum বা Teeth-ridge-এ) ; এবং [৩] জিহ্বাগ্রকে সূক্ষ্মাকার করিয়া, বিস্তৃত না করিয়া, দন্তমূলের উপরে স্পর্শ করিতে হয়। বস্তুতঃ, কানে আমাদের « ট, ড »-এর মত শুনাইলেও, ইংরেজীর দন্তমূলীয় t, d আমাদের দন্ত্য « ত, দ »-এর সহিত সগোত্র, মূর্ধন্য « ট, ড »-এর সহিত নহে।

শব্দের মধ্যভাগে ও অন্তে « ড, ঢ » বাঙ্গালায় « ড়, ঢ় » হইয়া যায়। সংস্কৃতে « পীড়া », « মূঢ় » প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ছিল [পী-ডা, মূ-ঢ]। আধুনিক ভাষার এই বিকৃত উচ্চারণ, « ড, ঢ »-এ বিন্দু যোগ করিয়া দ্যোতিত হয়। বিন্দু-যুক্ত « ড়, ঢ় » বর্ণদ্বয় বাঙ্গালায় নূতন—প্রাচীন বাঙ্গালায় বা তৎপূর্বেকার বর্ণমালায় নাই।

« ড় »-এর উচ্চারণে, জিহ্বাগ্রকে প্রতিবেষ্টিত করিয়া ট-বর্গের উচ্চারণ-স্থানে স্পর্শ-পূর্বক, জিহ্বাগ্রের অধোভাগ-দ্বারা দন্তমূলে (উপরের দন্ত-পঙ্ক্তির পশ্চাদ্ভাগে স্থিত উচ্চ বা স্ফীত অংশে) তাড়ন বা আঘাত করিতে হয়। « ড় » ক্ষণিক ধ্বনি। জিহ্বার অধোভাগ-দ্বারা দন্তমূল-তাড়ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া, এই ধ্বনিকে তাড়ন-জাত (Flapped) ধ্বনি বলা যায়। ইহার মহাপ্রাণ রূপ হইতেছে « ঢ় »।

☞ পূর্ব-বঙ্গে সাধারণতঃ, এবং পশ্চিম-বঙ্গের কোনও-কোনও স্থলে, « ড় র-এর মত উচ্চারিত হয়। ইহার ফলে অনেক সময়ে লেখায় « ড় » ও « র »-এর বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে—« ঘর ছাড়া » স্থলে « ঘড় ছারা » লেখা দেখা যায়। « পড়া—পরা ; কড়া—করা ; বাড়ী (বাড়ি)—বারি ; তাড়া—তারা ; হাড়—হার ; মড়—মর » প্রভৃতি শব্দ-মধ্যে, « ড় » বা « র »-এর পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হয়। যাঁহাদের প্রাদেশিক

উচ্চারণে « ড় »-এর বিশুদ্ধ ধ্বনি নাই, সাধুভাষানুমোদিত « ড় »-এর উচ্চারণ- এবং বানান-বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

মূর্ধন্য « ণ »-এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় লুপ্ত—সংস্কৃত শব্দে, এবং কচিৎ প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দে « ণ » লিখিত হইলেও, বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য « ন »-র উচ্চারণ হইতে অভিন্ন ; যথা—« রণ, চরণ, পুরাণ, করুণা ; কাণ, পাণ, বাণান, সোণা (=কান, পান, বানান, সোনা) ; কোরাণ, ফর্মাণ, নর্মাণ, রিপণ, জার্মেণী (কোরান্ বা কুর্'আন্, ফর্মান্, নর্মান্, রিপন্, জর্মানী) » ইত্যাদি। কেবল « ট, ঠ, ড, ঢ »-র পূর্বে, ণ-কারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—« ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ »-তে জিহ্বা উল্টাইয়া মূর্ধন্য-স্থানে মূর্ধন্য ণ-কার ধ্বনিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালীর কাণে তাহা দন্ত্য ন-কারের মত শোনায়। বিশুদ্ধ মূর্ধন্য ণ এর ধ্বনি কানে কতকটা [ড়ঁ]-এর মত শোনায়।

☞ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে অবস্থিত « মূর্ধন্য ণ »-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত—এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে—নিম্নে 'ণত্ব-বিধান' দ্রষ্টব্য।

ত-বর্গ—« ত, থ, দ, ধ, ন »। জিহ্বার অগ্রভাগকে পাখার মত প্রসারিত করিয়া, তদ্দ্বারা উপরের দন্ত-পঙ্ক্তির পশ্চাদ্দিকে নিম্নভাগে স্পর্শ করিয়া ত-বর্গের উচ্চারণ হয়। দন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ হয় বলিয়া, এগুলির নাম দন্ত্য বর্ণ (Dentals)। কেবল দন্ত্য ন-র উচ্চারণে সাধারণতঃ জিহ্বাগ্রভাগ দন্ত-পঙ্ক্তির একটু ঊর্ধ্বে কোনও স্থানে ঠেকে, কিন্তু « ত, থ, দ, ধ »-এর পূর্বে থাকিলে (« ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ »-তে), ন-কারের উচ্চারণে দন্তোপরি জিহ্বার স্পর্শ হয়।

প-বর্গ—« প, ফ, ব, ভ, ম »। এগুলির উচ্চারণে ওষ্ঠ ও অধর পরস্পরের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, এই জন্য এগুলিকে ওষ্ঠ্য বর্ণ (Labials) বলে।

☞ মহাপ্রাণ « ফ » ও « ভ »-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ « প্+হ, ব্+হ »—ইংরেজীর loop-hole, club-house-এর p-h ও b-h এর মত। « প্রফুল্ল, প্রভা » প্রভৃতি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ যেন—[প্রপ্হুল্ল, প্রব্হা]। বাঙ্গালায় কিন্তু « ফ » ও « ভ » আর বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ধ্বনি নাই, Spirant বা উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে কতকটা ইংরেজী f ও v-র মত (International Phonetic Association-এর ধ্বনি-

দ্যোতক বর্ণমালায়, বাঙ্গালার উষ্ম ওষ্ঠ্য « ফ, ভ »-এর প্রতিবর্ণ হইতেছে [φ] ও [β]) শুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট « ফ, ভ »-কে প্রলম্বিত করা যায় না, এগুলি ক্ষণস্থায়ী ধ্বনি—[ইফ্ = iph, ইভ্ = ibh]-কে টানিয়া দীর্ঘ করা যায় না, « ফ্ » [p-h] « ভ্ » [b-h] বলিয়াই থামিতে হয়; কিন্তু উষ্ম উচ্চারণে প্রলম্বিত করা যায়—[ইফ্‌ফ্‌……… (= iffff……), ইভ্‌ভ্‌……(ivvv……)]। এইরূপ উষ্ম উচ্চারণ বাঙ্গালায় খুবই শোনা যায় বলিয়া, ইংরেজীতে বাঙ্গালা নাম ও শব্দ লিখিবার কালে, « ফ, ভ স্থলে » ph, bh না লিখিয়া, অনেকে f, v লেখেন; « ফণী, ফটিক, প্রফুল্ল, প্রভাত, সভা, শোভা » Fani, Fotic, Profullo, Provat, Sava বা Sova, Shova (এগুলির স্থলে Phani, Phatik, Praphulla, Prabhat, Sabha, Sobha বা Shobha লেখাই ঠিক—ইহাতে সংস্কৃতের তথা ভারতের অন্য প্রদেশের সহিত যোগ থাকে, বাঙ্গালার মত উচ্চারণেও ব্যাঘাত হয় না)।

অন্তঃস্থ বর্ণ—« য, র, ল, ব »।

« য »—এখন এই বর্ণ উচ্চারণে বাঙ্গালায় « জ » হইতে অভিন্ন। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণ ছিল « ইঅ », প্রাকৃতে ও তদনুসারে বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়াছে « জ »। পুরাতন বাঙ্গালায় আবার « য » বাঙ্গালার অ-কারের জন্যও ব্যবহৃত হইত—পুঁথিতে « যক্ষ, যবণ, যতিশএ—অক্ষ, অবণ, অতিশয় » ইত্যাদি বানান মিলে; অন্য স্বর-ধ্বনিতেও খামখা « য » জুড়িয়া দেওয়া হইত—যেমন « যুত্তম—উত্তম »। য-কারের প্রাচীন উচ্চারণ « ইঅ »-কে জানাইবার জন্য, আধুনিক যুগে বাঙ্গালায় বিন্দু-যুক্ত « য় » অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।

☞ তৎসম শব্দের বানানে « জ য » -এর পার্থক্য সাবধানতার সহিত রক্ষা করা উচিত।

কোনও ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসিলে, « য » (বা « য় ») নিজ রূপ পরিবর্তিত করিয়া « ্য » (য-ফলা) রূপ ধারণ করে; যথা—« সত্-য = সত্য, বাক্-য = বাক্য »। বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনের পরে য-ফলা আসিলে, ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির 'দীর্ঘ উচ্চারণ' বা দ্বিত্ব-ভাব হয়, এবং য-ফলা-যুক্ত অক্ষরের পূর্ব অক্ষরে অ-কার থাকিলে, উচ্চারণে সেই অ-কার ও-কার হইয়া যায়; যথা—« পথ্য = [পোত্‌থ], হত্যা = [হোৎত্যা] » ইত্যাদি। (এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালায় ও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় য-ফলার উচ্চারণ-সম্পর্কে নিম্নে 'অপিনিহিতি' দ্রষ্টব্য)।

« র »—জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করিয়া, তদ্দ্বারা দন্তমূলে একাধিক বার দ্রুত আঘাত করিয়া « র » -ধ্বনির উৎপত্তি হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলিয়া এই ধ্বনিকে কম্পন-জাত (Trilled) ধ্বনি বলা যায়। (ইংরেজীর r, বাঙ্গালা « র » হইতে বিশেষ পৃথক্)।

« ল »—জিহ্বাগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকাইয়া রাখিয়া, জিহ্বার দুই পাশ দিয়া মুখ-বিবর হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া, ল-কারের উচ্চারণ হয়। দুই পাশ দিয়া বায়ু নিষ্কাশিত হয় বলিয়া ইহাকে পার্শ্বিক (Lateral) ধ্বনি ব…

ল-কারের পরেই « ত, থ, দ, ধ » বা « ট, ঠ, ড, ঢ » আসিলে, পরবর্তী দন্ত্য বা মূর্ধন্য বর্ণের প্রভাবে, এগুলির উচ্চারণ-স্থান একটু পরিবর্তিত হয়; যেমন—« আলতা (=আল্‌তা), হ'লদে » শব্দে ল-কার দন্তে উচ্চারিত হয়; আবার « উল্‌টা, পাল্‌টা, লাল ডাক-গাড়ী » প্রভৃতি শব্দে বা শব্দ-সমষ্টিতে, ইহা মূর্ধন্য-ল রূপে উচ্চারিত হয়।

« ব »—এই বর্ণ (অন্তঃস্থ ব), ও বর্গীয় « ব », বাঙ্গালায় আকৃতিতে ও উচ্চারণে এক্ষণে অভিন্ন কিন্তু প্রাচীন কালে এ দুইটীর রূপ ও ধ্বনি উভয়ই পৃথক্ ছিল: বর্গীয় ব=b, অন্তঃস্থ ব=উঅ, w। দেবনাগরীতে এখনও এই ধ্বনি- ও রূপ-গত পার্থক্য রক্ষিত আছে—পেট-কাটা ব=বর্গীয় ব=b, ৱ=অন্তঃস্থ ব=w (v) তদ্রূপ, আসামীতে « ব »=বর্গীয় ব=b, « ৱ »=অন্তঃস্থ ব=w। সংযুক্ত-বর্ণে ব্যঞ্জনের পরে ব-ফলা-রূপে সাধারণতঃ এই অন্তঃস্থ ব-ই আসে; ব-ফলা বাঙ্গালায় উচ্চারিত হয় না, কেবল পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-ভাব ঘটায়; আদ্য অক্ষরে ব-ফলা থাকিলে তাহার উচ্চারণ-ই হয় না; যথা—« পক্ব=[পক্‌ক], অদ্বয়=[অদ্দয়্]; স্বত্ব—[শৎত], দ্বিত্ব—[দিৎত] » ইত্যাদি। « জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল—[জিউহা, আওহান্, বিউহল্] »—এখানে অন্তস্থ ব-এর w-বৎ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়; এই প্রকার শব্দের আবার [জিব্‌ভা, আব্‌ভান্, বিব্‌ভল্] উচ্চারণও আছে—সে উচ্চারণ প্রাচীন বাঙ্গালার বা প্রাকৃতের অনুরূপ।

অন্তঃস্থ ব-এর আর একটী উচ্চারণ সংস্কৃতে বিদ্যমান ছিল,—সেটা হইতেছে দন্তোষ্ঠ উষ্ম ঘোষ ধ্বনি—উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিয়া উচ্চারণ; ইংরেজী v-র ধ্বনি ইহাই। এই ধ্বনি-অনুসারে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নামে ইংরেজীতে v দিয়া অন্তঃস্থ-ব-কে লেখা হয়—« বিদ্যাসাগর Vidyasagara, বিবেকানন্দ Vivekananda, বিক্রম Vikrama, বিজয় Vijaya, বিশ্বভারতী Visva-bharati »।

☞ অন্তঃস্থ ব বা w-এর জন্য বিশেষ বর্ণ বাঙ্গালা বর্ণমালায় না থাকিলেও, ধ্বনিটী বাঙ্গালা ভাষায় আছে, এবং এই ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় « ওয় »-রূপে (প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দে) লিখিত হয়; যথা—« পাওয়া » = pāwā, « এডুওয়ার্ড » = Edward, « ওয়াকিফ্‌-হাল » = wākif-hāl, « নাম-কে-ওয়াস্তে » = nām-kē-wāstē ইত্যাদি।

উষ্ম-বর্ণ—« শ, ষ, স, হ »।

« শ, ষ, স »—এই তিনটী ধ্বনির উচ্চারণ এখন বাঙ্গালায় এক—ইংরেজীর sh-এর মত। শিশ্-দেওয়ার ধ্বনির সহিত এগুলির সাদৃশ্য আছে বলিয়া, এগুলিকে Sibilant বা শিশ্-ধ্বনি বলা যায়। প্রাচীন কালে এগুলির পৃথক্-পৃথক্ উচ্চারণ ছিল; « শ » (তালব্য)—ইংরেজী issue [= ishyu] শব্দের অনুরূপ-ভাবে উচ্চারিত হইত (জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিনাংশের সন্নিকটে আসিত), « ষ » (মূর্ধন্য) অন্য মূর্ধন্য বর্ণের মত জিহ্বাগ্রকে উল্টাইয়া লইয়া উচ্চারিত sh-এর ধ্বনি ছিল, এবং « স » (দন্ত্য) ইংরেজী sing, sang, sung-এর s-এর মত ছিল (পূর্ব-বঙ্গে উচ্চারিত « ছ »-এর ধ্বনি ও সংস্কৃত দন্ত্য « স »—এই দুইয়ের উচ্চারণ এক)। « সবিশেষ » শব্দটী বাঙ্গালীর মুখে এখন shŏ-bi-shesh : প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণে sa-wi-śē-ṣa ছিল। এখন কেবল « ত, থ, ন, র, ল »-এর পূর্বে আসিলে, « শ, স »-এর দন্ত্য-স-(s)-ধ্বনি বাঙ্গালায় শোনা যায়; যথা—« শ্রী = উচ্চারণে srī (shrī নহে), শ্লীল = slīl (shlīl নহে), স্নান = snān (shnān নহে), সমস্ত = shŏ-mo-sto (shomoshto নহে) »।

« শ, ষ, স »—এগুলি অঘোষ ধ্বনি; এগুলির ঘোষবৎ রূপ সংস্কৃতে নাই, অন্য ভাষায় আছে। « শ »-এর ঘোষ রূপ, zh-জাতীয় ধ্বনি (ইংরেজী pleasure, measure,

leisure শব্দে শুনা যায়—[plezhar, mezhar, lezhar] ইত্যাদি) ; « ষ »-এর ঘোষ রূপ, অনুরূপ আর এক প্রকার zh-ধ্বনি, জিহ্বা উল্‌টাইয়া উচ্চারিত হয়, তামিল ও মালয়ালম্‌ ভাষায় এই ধ্বনি মিলে ; এবং দন্ত্য « স »-এর (s-এর) ঘোষ রূপ হইতেছে z—এই z-ধ্বনি বাঙ্গালায় আজকাল শোনা যায়—বিশেষতঃ বিদেশী নাম ও শব্দে—এবং সাধারণতঃ জ-এর বিকল্পে বা বিকারে এই ধ্বনির উৎপত্তি বলিয়া, বাঙ্গালায় « জ »-দ্বারাই ইহা দ্যোতিত হয় ; যথা—« মেজদা = mezda ; নিউ-জিল্যাণ্ড = New Zealand, জুলু = Zulu » ইত্যাদি।

« হ »—কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন হ-কার, উষ্ম ঘোষবর্ণ—যতক্ষণ শ্বাস থাকে, ততক্ষণ « শ, ষ, স »-এর মত ইহাকেও প্রলম্বিত করা যায়: « হ্‌হ্‌হ্‌হ্‌… »।

☞ পূর্ব-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় হ-কারের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হয় না—প্রলম্বনশীল কণ্ঠ্য উষ্ম-ধ্বনির পরিবর্তে, পূর্ব-বঙ্গে কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত শ্বাস-পথ চাপিয়া উচ্চারিত এক প্রকার স্পৃষ্ট ধ্বনি (Glottal Stop) উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনিকে « ' » রূপে লেখা যায় ; যথা—« হাত » স্থলে ['আৎ], « হয় » স্থলে ['অয়], « হরি » স্থলে ['অরি], « হাসি » স্থলে ['আইস্‌], « হিন্দু » স্থলে ['ইন্দু] ইত্যাদি। সাধু- বা চলিত-ভাষার ব্যবহার-কালে পূর্ব-বঙ্গের এই প্রাদেশিক উচ্চারণ বর্জন করিয়া, শুদ্ধ « হ » বলা উচিত।

অনুস্বার—« ং »। সংস্কৃতে, ইহা যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে (বা পরে) আসিয়া বসিত, সেই স্বর-বর্ণকে এই বর্ণ আংশিক-ভাবে সানুনাসিক করিত। বাঙ্গালায় কিন্তু অনুস্বারের উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে « ঙ্‌ » (কিন্তু হিন্দীতে, উত্তর-ভারতে, « ন্‌ » ; দক্ষিণ-ভারতে « ম্‌ » ; « সংস্কৃত » শব্দটার প্রাচীন উচ্চারণ ছিল [সঁস্‌ক্রুত্‌] ; বাঙ্গালায় [শঙ্‌শ্‌ক্রিতো] বা [শঙোশ্‌ক্রিতো] ; হিন্দীতে [সন্‌স্‌ক্রিৎ], দক্ষিণ-ভারতে [সম্‌স্‌ক্রুত])। বাঙ্গালায় « ং » ও « ঙ » উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, একের বদলে অন্যের ব্যবহার খুবই সাধারণ ; যথা—« বাংলা—বাঙ্‌লা ; রং, রঙ্‌—রঙের ; ভাং—ভাঙড় » ইত্যাদি।

বিসর্গ—« ঃ »। ইহা এক প্রকার « হ »-এর ধ্বনি। সাধারণ « হ » হইতেছে ঘোষ ধ্বনি, « ঃ » তাহার অনুরূপ অঘোষ ধ্বনি। এই ধ্বনি সংস্কৃত শব্দে প্রায়ই মিলে, আর বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র বিস্ময়াদি-

প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায় ; যথা—« আঃ, উঃ, ওঃ » ইত্যাদি। সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে, পদের অন্তে থাকিলে, বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে ; যেমন—« বিশেষতঃ » = [বিশেষত', বিশেষতো] ; পদের মধ্যে থাকিলে, বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করিয়া দেয় ; যেমন— « দুঃখ », উচ্চারণে [দুক্‌খ], « অধঃপতন », উচ্চারণে [অধপ্‌পতন] ; ইত্যাদি। এই হেতু, ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব-ভাব কখনও-কখনও বিসর্গ দিয়া লেখা হয় ; যথা—« মুফস্‌সল = মফঃসল বা মফঃস্বল ; মুজফ্‌ফরপুর = মজঃফরপুর » ইত্যাদি।

অনুস্বার ও বিসর্গকে 'অযোগবাহ' বর্ণ বলে, কারণ অন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত ইহাদের যোগ কল্পিত হয় নাই, ইহারা যেন স্বর- ও ব্যঞ্জন-মালার বাহিরে অবস্থান করে ; তথাপি এই দুইটী, উচ্চারণে নানারূপ পরিবর্তন-কার্য নির্বাহে সাহায্য করে। এতদ্ভিন্ন, বিসর্গ পূর্ব-স্থিত স্বর-ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়া উচ্চারিত হয়, পূর্ব-স্বরের উচ্চারণ-স্থান-অনুসারে ইহারও পরিবর্তন হয় বলিয়া, ইহার নাম 'আশ্রয়স্থান-ভাগী' ; যেমন—« আঃ » —এখানে কণ্ঠ-স্বর আ-এর পরে আছে বলিয়া, বিসর্গের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ্য, এবং অনেক সময়ে কানে ইহা [আঃ > আখ্‌খ্‌...... —'খ্‌' এখানে ফারসীর ﺥ 'খে' অক্ষরের ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে] এইরূপ শুনায় ; তদ্রূপ « ইঃ »—এখানে তালব্য ই-কারের আশ্রয়ে আসিয়া, বিসর্গ তালব্য ধ্বনি « শ্‌ »-তে সহজেই পরিবর্তিত হইয়া যায়—[ইঃ > ইশ্‌শ্‌......] ; এবং « উঃ »—এখানে ওষ্ঠ্য উ-কারের প্রভাবে বিসর্গ (বা ৳, উষ্ম ফ-তে পরিবর্তিত হয়—[উঃ > উফ্‌ফ্‌......] ইত্যাদি।

চন্দ্রবিন্দু—« ঁ »। এই চিহ্ন স্বর-ধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে : « আ—আঁ, পাক—পাঁক » ইত্যাদি। (পূর্বে দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৪১-৪২, [২.১৩] 'সানুনাসিক স্বর'।)

[২.১৭৩] ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব-ভাব বা দীর্ঘীকরণ

(Doubling or Lengthening of Consonant Sounds)

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা যায়। এই দীর্ঘ উচ্চারণ, অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া উচ্চারণ-স্থানে জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্র

স্থাপিত করিয়া রাখা—সাধারণতঃ 'দীর্ঘ উচ্চারণ' বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণ টীকে দুই বার লিখিয়া, এই দীর্ঘ উচ্চারণ প্রদর্শিত হয়। বস্তুতঃ, ধ্বনিটীর দুই বার উচ্চারণ হয় না। « মত্ত » শব্দে, বাস্তবিক পক্ষে « মত্/ত » বা « মত্—ত » এইরূপ দ্বিত্ব-ভাবে বা পৃথক্-রূপে উচ্চারিত দুইটী ত-কার নাই—দন্তে জিহ্বাগ্র বেশীক্ষণ ধরিয়া লাগাইয়া রাখিয়াই এই « ত্ত »-এর উচ্চারণ হয়, এবং ইহা দীর্ঘ « ত »-এর-ই উচ্চারণ। তদ্রূপ « অশ্ব = [অশ্‌শ্] »—এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া তালু-স্থানে জিহ্বার অবস্থানের ফলে দীর্ঘ [শ্‌শ্] ধ্বনি ; « ফুল্ল »—এখানেও তাহাই।

বাঙ্গালায় স্বর-বর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র নহে, শব্দের দৈর্ঘ্য এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের উপরে বাঙ্গালার স্বর-ধ্বনির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। বাঙ্গালায় ব্যঞ্জন-বর্ণের দৈর্ঘ্যের কিন্তু স্বতন্ত্রতা আছে। ব্যঞ্জন-ধ্বনি দীর্ঘ বা হ্রস্ব হওয়ার উপরে (অর্থাৎ দ্বিত্ব বা একক থাকার উপরে), শব্দের অর্থ নির্ভর করে ; যথা—« মালা », একক বা হ্রস্ব « ল », অর্থ 'ফুলের হার' (বা 'নারিকেল মালা'), কিন্তু « মাল্লা », দীর্ঘ « ল » বা দ্বিত্ব « ল », অর্থ 'নৌকার মাঝী-মাল্লা' ; « আটা »—হ্রস্ব « ট », অর্থ 'গোধূম-চূর্ণ', « আট্টা »—দীর্ঘ « ট »—অর্থ 'অষ্ট খণ্ড', বা 'আট ঘটিকা' ; « কাঁচা »—'অপক্ক', « কাঁচ্চা »—'তৌল- বা পরিমাণ-বিশেষ' ; « ফুলো »—'স্ফীত', « ফুল্ল, ফুল্ল »—'প্রফুল্ল', অথবা 'স্ফীত হইল' ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় বিশেষ জোর দিয়া বলিতে হইলে, কচিৎ শব্দ-স্থিত ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে দীর্ঘ বা দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয় ; যথা—« সকলে—সক্কলে ; সবাই—সব্বাই ; তখনি—তক্ষনি (তক্‌খনি) ; জলে জলময়—জলে একেবারে জলময় ; কিছু না—কিচ্ছু না » ইত্যাদি।

[২.১৮] বাঙ্গালা ব্যঞ্জন-বর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি উচ্চারণ-স্থান (Points of Articulation within the Vocal Organs in pronouncing the Bengali Consonants)

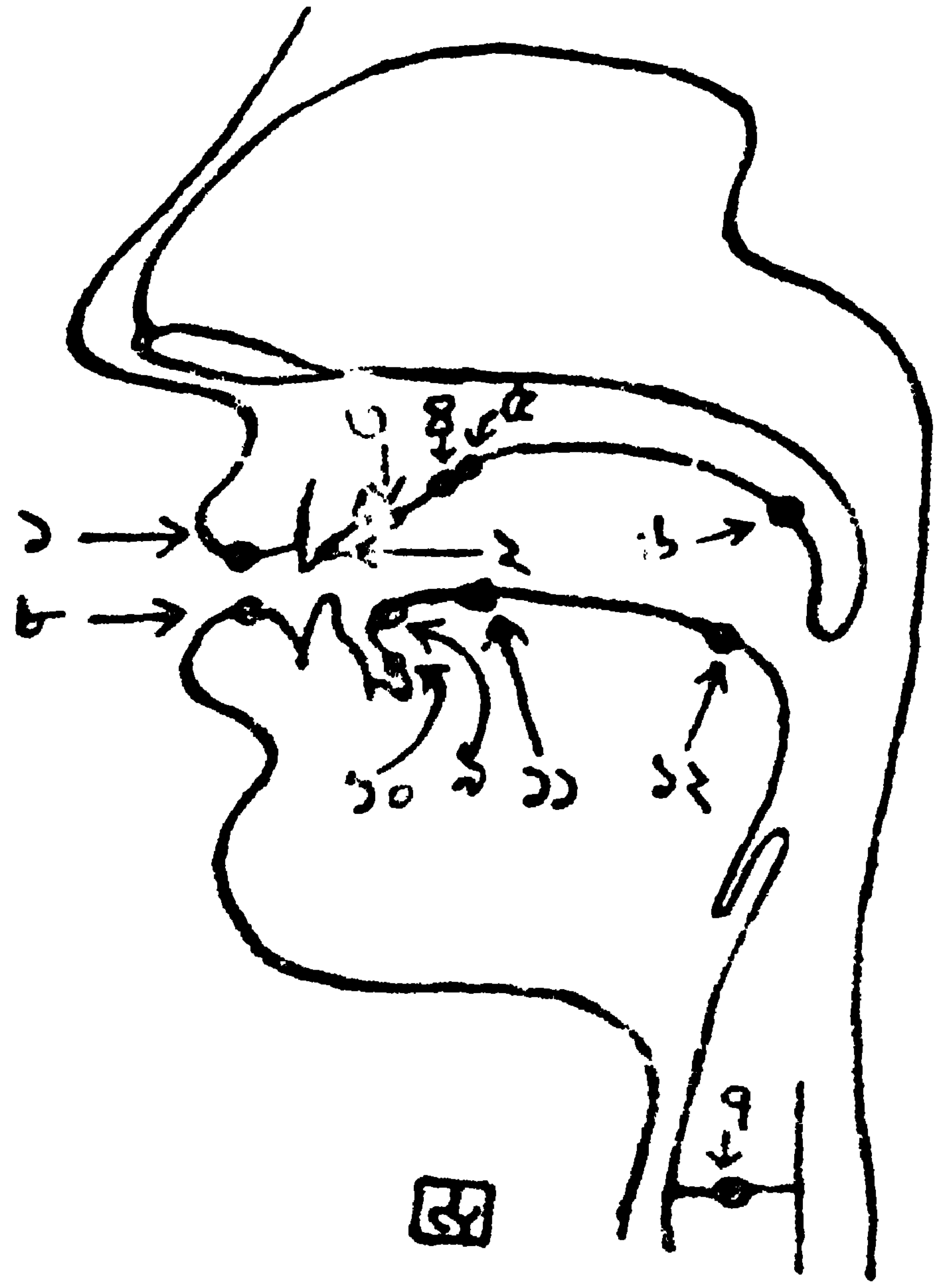

বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থান :—(১) ওষ্ঠ, (২) দন্ত, (৩) দন্তমূল, (৪) কঠিন তালু—সম্মুখ ভাগ, (৫) কঠিন তালু—পশ্চাদ্ভাগ (মূর্ধা), (৬) কোমল তালু, তন্নিম্নে অলিজিহ্বা বা আ'লজিভ, (৭) কণ্ঠস্থ শ্বাস-নালী-পথ, (৮) অধর, (৯) জিহ্বাগ্রমুখ, (১০) জিহ্বার অধোভাগ, (১১) জিহ্বাগ্র, (১২) জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ (জিহ্বামূল)।

বাঙ্গালা ভাষার (চলিত-ভাষার উচ্চারণে) ধ্বনি-সমূহ—

International Phonetic Association-এর ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণমালায় এই ধ্বনিগুলির জন্য যে সকল অক্ষর নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

[ক] উচ্চারণ-স্থান-অনুসারে—

[১] কণ্ঠ্য—ঃ, হ [h, ɦ] ;

[২] জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালু-জাত—ক, খ, গ, ঘ, ঙ [k, kh, g, gɦ, ŋ] ;

[৩] তালব্য বা অগ্রতালু-জাত—চ, ছ, জ, ঝ, শ [ʧ, ʧh, ʤ, ʤɦ, ʃ] ; অন্তঃস্থ য—y [ĕ] ;

[৪] মূর্ধন্য (বা প্রতিবেষ্টিত)—ট, ঠ, ড, ঢ [ṭ, ṭh, ḍ, ḍɦ] ;

[৫] মূর্ধন্য ও দন্তমূলীয়—ড়, ঢ় [ṛ, ṛɦ] ;

[৬] দন্তমূলীয়—র, ল, স (s), জ (z), ন [r, l, s, z, n] ;

[৭] দন্ত্য—ত থ দ ধ [t, th, d, dɦ] ;

[৮] ওষ্ঠ্য—প, ফ, ব, ভ, ম [p, ph, b, bɦ, m] ; ফ, ভ, (f, v—জাতীয় ধ্বনি) [φ, β] ; অন্তঃস্থ ব—ওয়্—w[ŏ] ।

[খ] উচ্চারণ-রীতি-অনুসারে—

[১] স্পৃষ্ট :—

অল্পপ্রাণ—ক গ, ট ড, ত দ, প ব ;

মহাপ্রাণ—খ ঘ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ ;

[২] ঘৃষ্ট :—অল্পপ্রাণ—চ জ ; মহাপ্রাণ—ছ ঝ ;

[৩] নাসিক্য—ঙ, ন, ম ;

[৪] পার্শ্বিক—ল ;

[৫] কম্পন-জাত—র ;

[৬] তাড়ন-জাত—অল্পপ্রাণ ড়, মহাপ্রাণ ঢ় ;

[৭] উষ্ম—(তালব্য ও দন্ত্য) শ (স), জ (=z) ; (ওষ্ঠ্য) ফ, ভ [φ β] ; (কণ্ঠ্য) হ, ঃ [ɦ, h] ;

[৮] অর্ধ-স্বর—য়, ওয় (y, w) ।

বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান

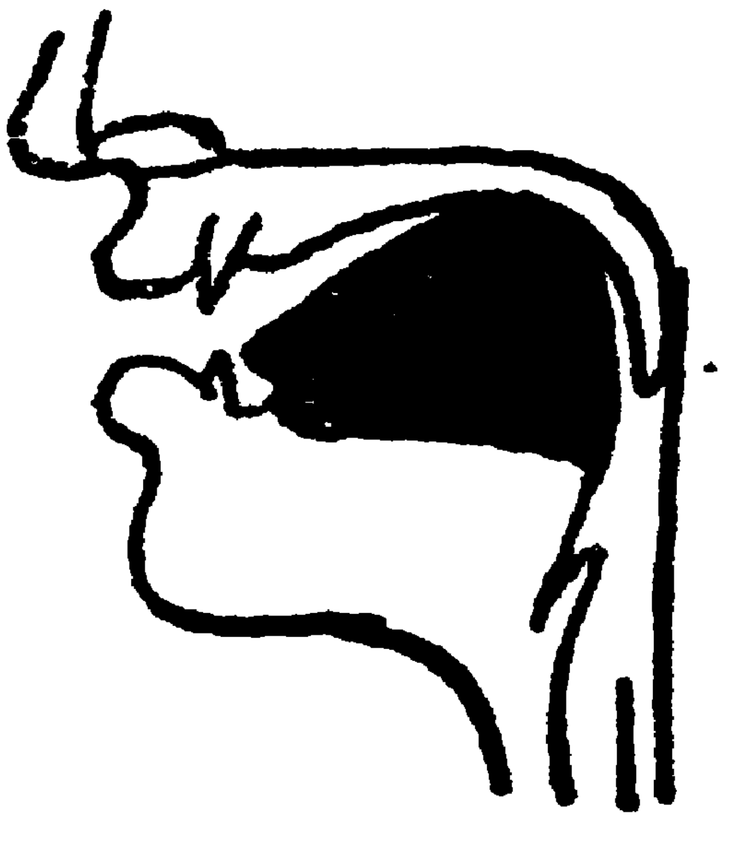

[ক, খ, গ, ঘ]

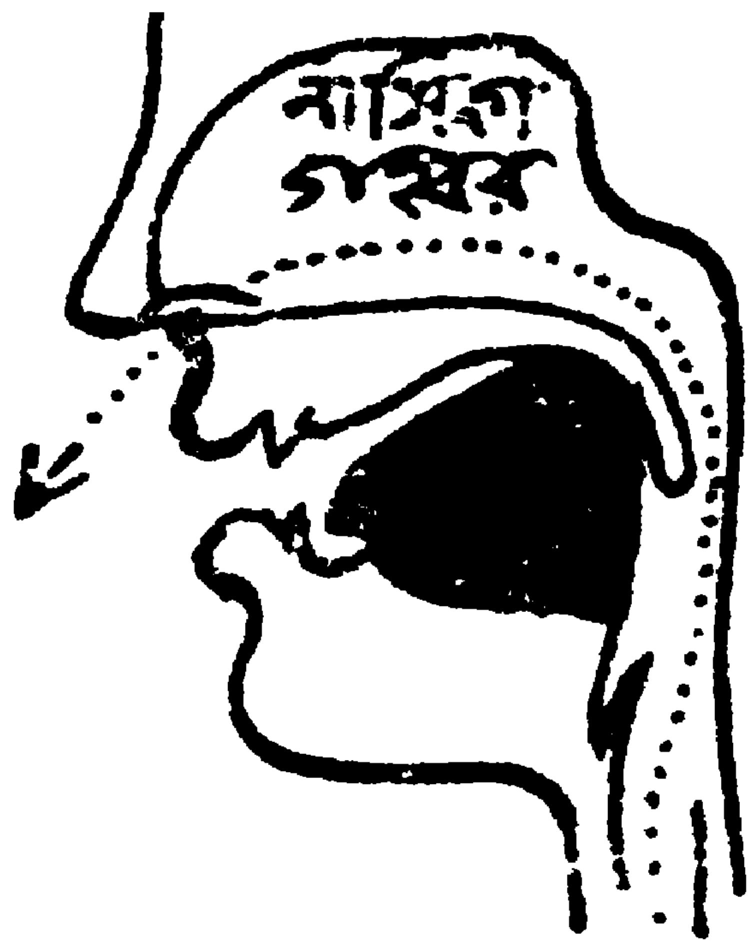

[ঙ]

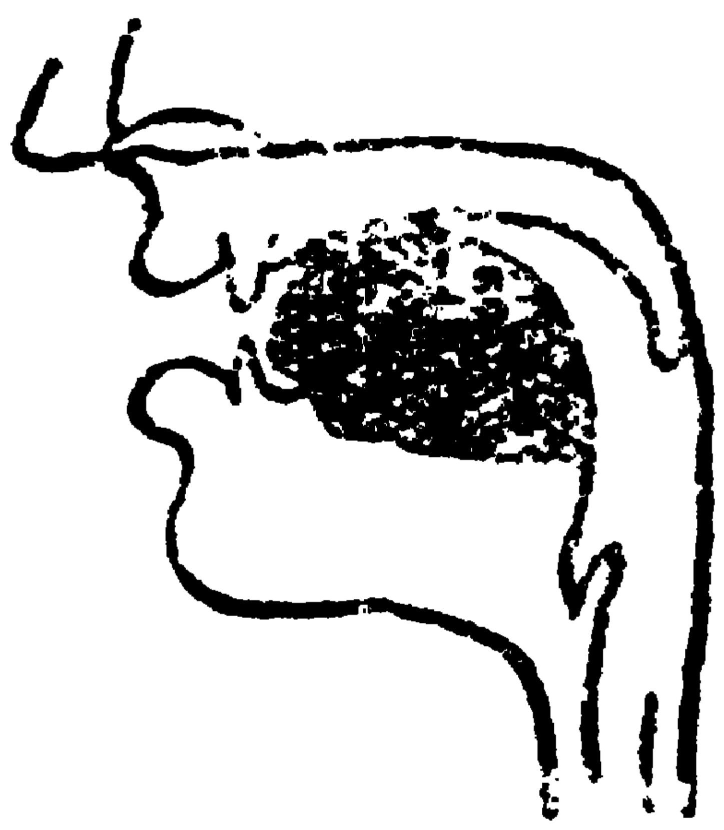

[চ, ছ, জ, ঝ]

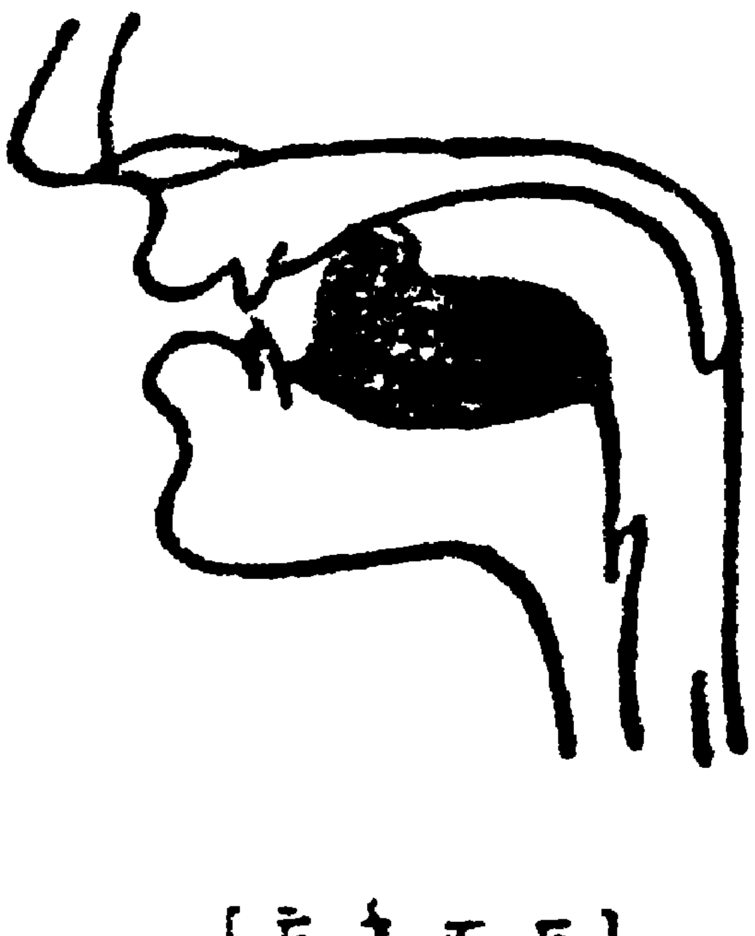

[ট, ঠ, ড, ঢ]

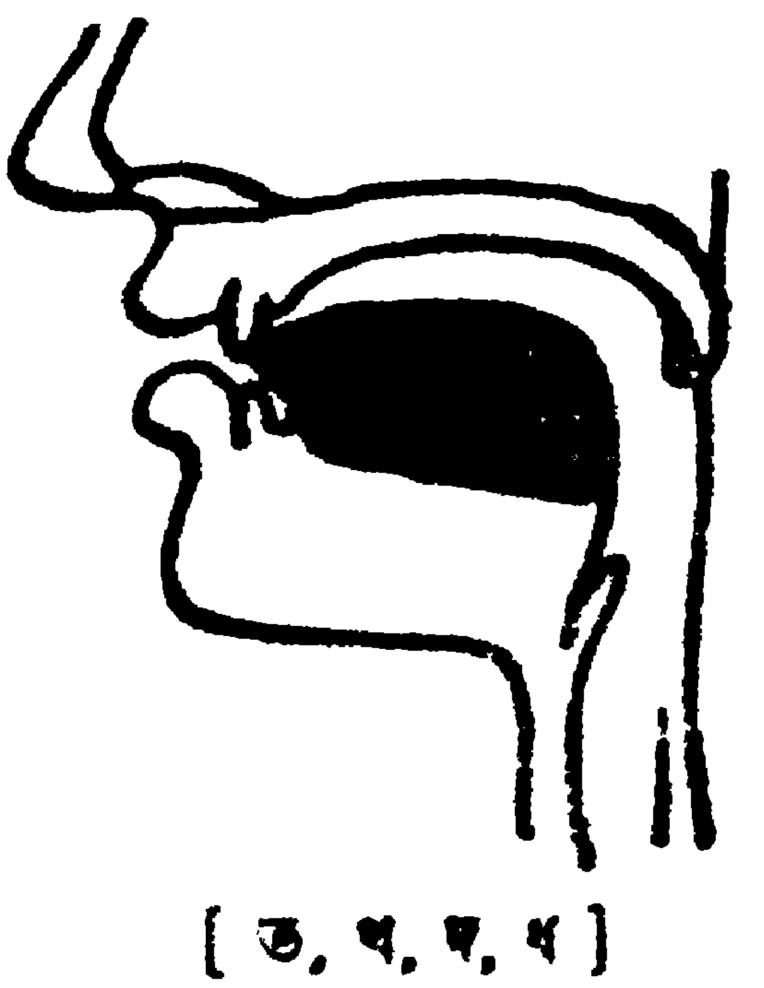

[ত, থ, দ, ধ]

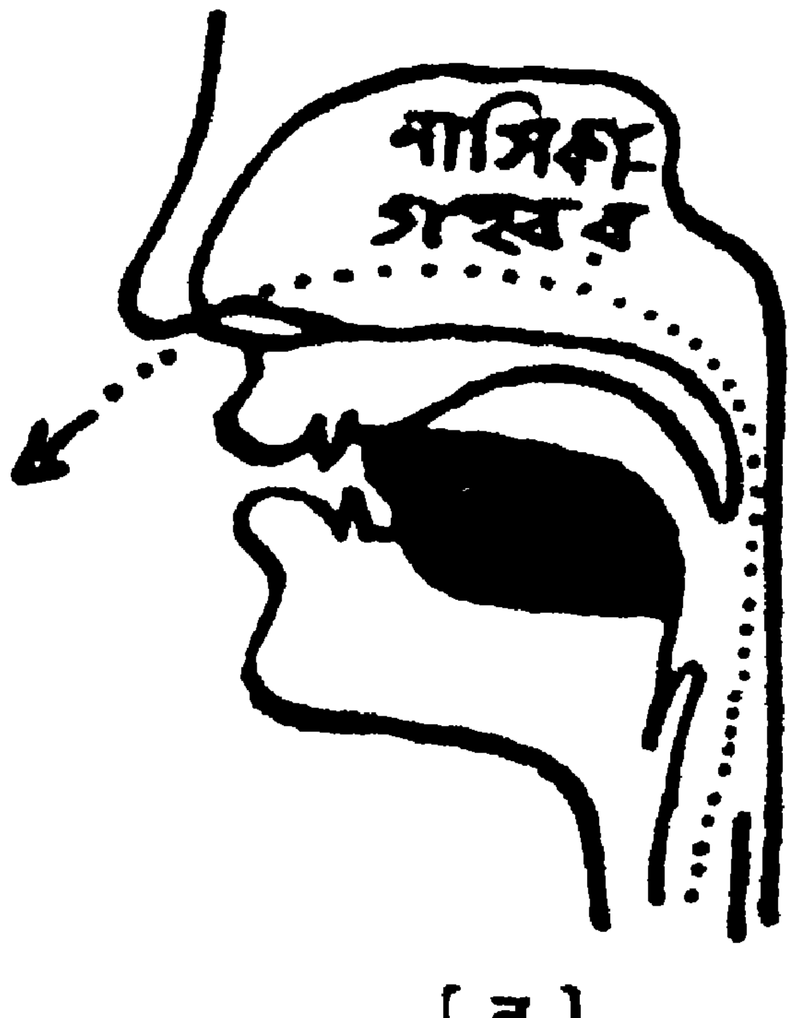

[ন]

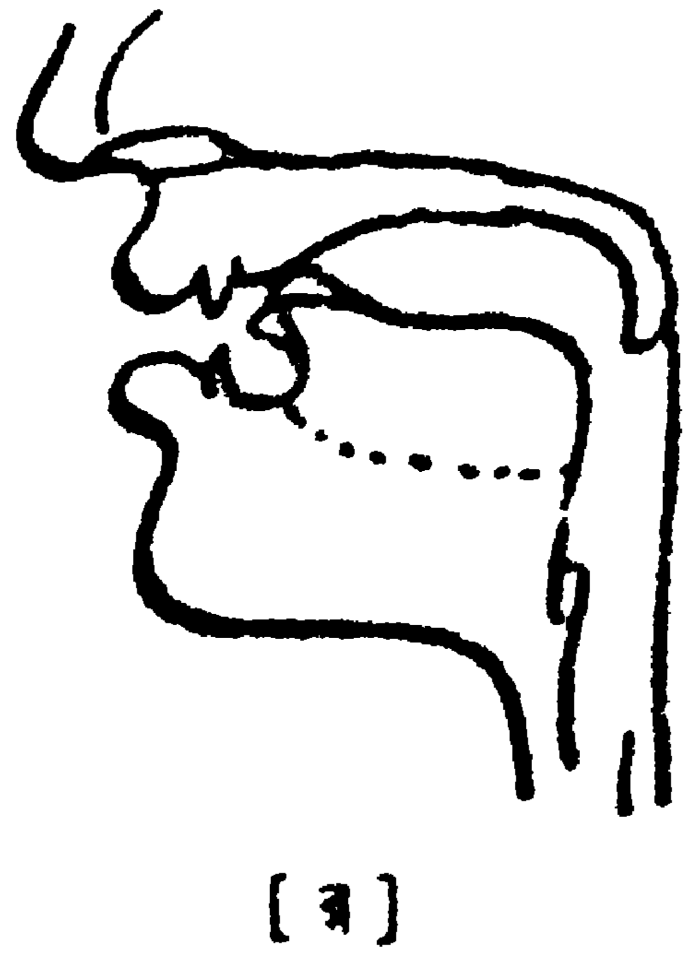

[র]

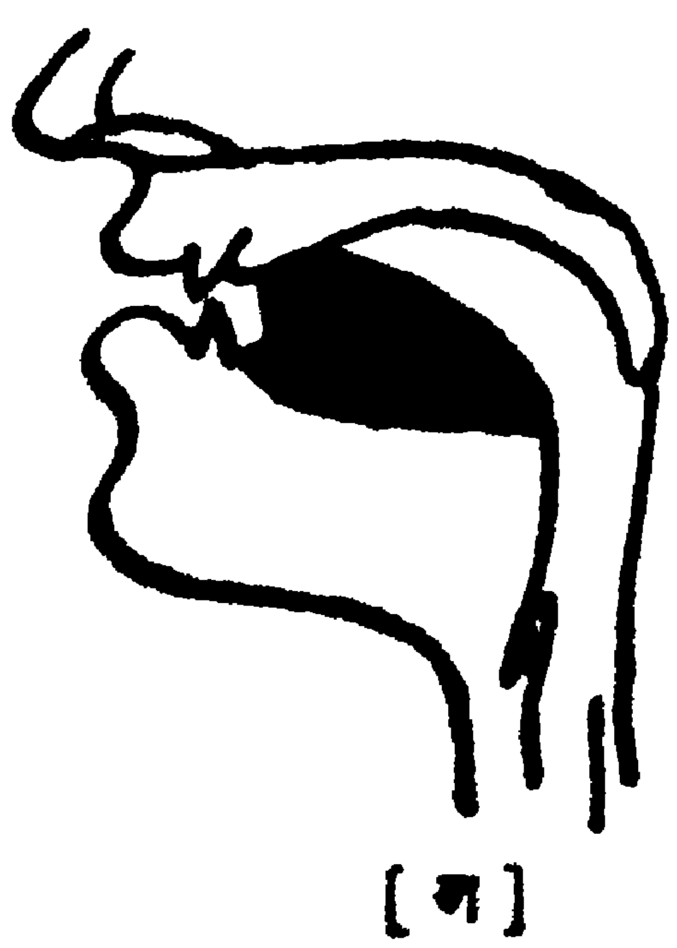

[ল]

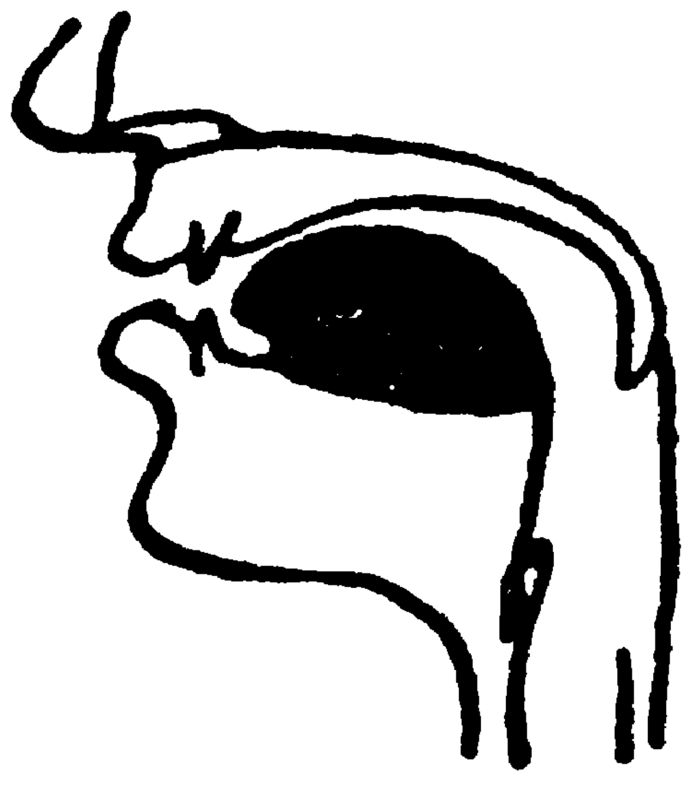
[শ]

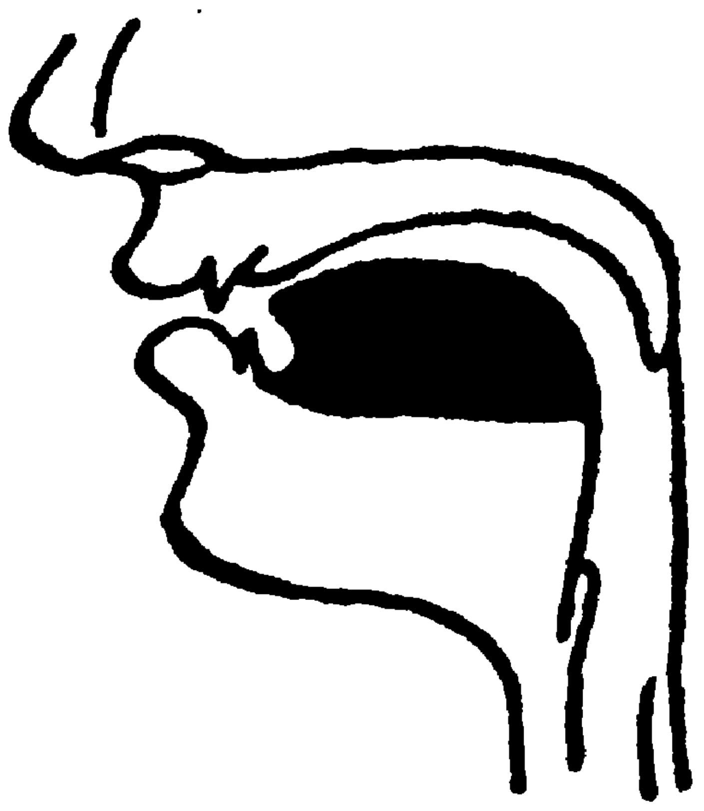
[স = s]

[২.১৯] সংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ (Compound বা Conjunct Consonants)

[২.১৯১] দুইটী বা ততোধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনির মধ্যে স্বর-ধ্বনি না থাকিলে বাঙ্গালায় ঐ ব্যঞ্জন-ধ্বনির দ্যোতক বর্ণ দুইটীকে জুড়িয়া, একত্র লেখা হয় ; যেমন—« আপ্ত »—এখানে « প »-এর নীচে « ত » লিখিয়া সংযুক্ত বর্ণ « প্ত »-এর সৃষ্টি করা হইয়াছে ; হসন্ত চিহ্ন দিয়া « আপ্‌ত »-ও লেখা যাইত ; কিন্তু সুপ্রাচীন কাল হইতে, দেবনাগরী, বাঙ্গালা প্রভৃতি বর্ণমালার আদি জননী ব্রাহ্মী বর্ণমালাতেও, হসন্ত দিয়া না লিখিয়া, সংযুক্ত করিয়া লিখিবার রীতি প্রচলিত থাকায়, উত্তরাধিকার-সূত্রে বাঙ্গালা বর্ণ-মালাতেও সংযুক্ত-বর্ণের ধারা আসিয়া গিয়াছে। নীচে সেগুলির একটী তালিকা দেওয়া হইল। অধুনা-প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা সংযুক্ত-বর্ণের সহিত মূল বর্ণের কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না ; বহু শত বৎসর ধরিয়া এই সংযুক্ত অক্ষরগুলি লিখিত হইয়া আসার ফলে এইরূপ হইয়াছে।

[২.১৯২] দুইটী সংযুক্ত-বর্ণ-সম্বন্ধে একটু বিশেষ মন্তব্য আবশ্যক।—« ক্ষ » : মূলে এটী « ক্ » ও « ষ্ »-এর সংযোগে জাত ; ইহার প্রাচীন (অর্থাৎ আদি-আর্য বা সংস্কৃত যুগে) উচ্চারণ ছিল [ক্‌ষ] : « লক্ষ = [লক্‌ষ], রক্ষা = [রক্‌ষা] »। বাঙ্গালায় কিন্তু ইহার উচ্চারণ হয় [খ্য]—

« লক্ষ—লখ্য—[লোক্‌খো] (পশ্চিম-বঙ্গে), [লইক্‌খ্য] (পূর্ব-বঙ্গে); রক্ষা—রখ্যা=[রোক্‌খ্যা] (পশ্চিম-বঙ্গে), [রইক্‌খ্যা] (পূর্ব-বঙ্গে) » ইত্যাদি। « জ্ঞ » : মূলে এটী « জ্‌ » ও « ঞ্‌ » যোগে গঠিত সংযুক্ত-বর্ণ, প্রাচীন উচ্চারণ ছিল [জ্‌ঞ] (যেমন সংস্কৃত সন্ধিতে দেখিতে পাওয়া যায়—« তৎ+জ্ঞানম্‌—তজ্‌ জ্ঞানম্‌ », অর্থাৎ [তজ্‌-জ্‌ঞানম্‌])। এখন বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ [গ্যঁ] : « বিজ্ঞ—বিগ্যঁ=[বিগ্‌গঁ] ; জ্ঞান= [গ্যাঁন] ; আজ্ঞা—[আগ্যাঁ]—পশ্চিম-বঙ্গে [আগ্‌গ্যাঁ, আগ্‌গেঁ], পূর্ব-বঙ্গে [আইগ্‌গ্যা] » ইত্যাদি।

[২.১৯৩] সংযুক্ত-বর্ণের প্রথমে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ, অথবা « শ, ষ, স », এবং শেষে ম-কার থাকিলে, ঐ ম-কার চন্দ্রবিন্দুবৎ উচ্চারিত হয় ও পূর্বের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় (কচিৎ ম-কারের পুরাপুরি লোপও হয়): যথা—« রুক্মিণী=[রুক্‌কিঁনি], মহাত্মা—[মহাৎতাঁ] ([মহাৎমা] উচ্চারণ ইংরেজী বা হিন্দীর অনুকরণে, ইহা খাঁটী বাঙ্গালা উচ্চারণ নহে), পদ্ম—[পদ্‌দ] বা [পদ্দো], ভীষ্ম=[ভীশ্‌শঁ], শ্মশান=[শঁশান্‌] বা [শশান্‌], অকস্মাৎ=[অকোশ্‌শাঁৎ] » ইত্যাদি।

[২.১৯৪] বর্ণের পরে « র » আসিলে, এই « র » তাহার পায়ের তলায় বসিয়া « ্র » (র-ফলা) রূপ ধরে ; পূর্বে আসিলে « ´ » (রেফ) রূপ ধারণ করিয়া মাথার উপরে বসে। রেফের পরে « শ, ষ, স, হ » ব্যতীত কতকগুলি বর্ণের বানানে দ্বিত্ব হয়, কিন্তু উচ্চারণে নহে ; যথা—« ধর্ম্ম=[ধর্‌-ম] ; কার্য্য=কার্য=[কার্‌-য, কার্‌-জ], ঊর্দ্ধ=ঊর্‌-ধ্ব] » ইত্যাদি। র-ফলার পূর্বেকার ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিন্তু দ্বিত্ব হয়, যদিও এ ক্ষেত্রে লেখায় তাহার কোনও আভাস থাকে না : যথা—« বিক্রয়= [বিক্‌ক্রয়্‌] ; অপ্রতুল=[অপ্‌প্রোতুল্‌], নম্র—[নম্‌ম্র] » ইত্যাদি। ল-কারের পূর্বেকার ব্যঞ্জনেরও তদ্রূপ দ্বিত্ব-উচ্চারণ হয় : যথা—« অম্ল= [অ ম্‌ম্ল] ; শুক্ল=[শুক্‌ক্ল] » ইত্যাদি।

[২.১৯৫] দুইটা মহাপ্রাণ বর্ণ দ্বিত্ব করিলে সংযুক্ত বর্ণ হয় না—মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ রূপই উচ্চারণ ও লেখা উভয়েই আইসে : যথা—« বর্ধমান » শব্দে « র্ধ »-কে দ্বিত্ব করা হয়, « র্ধ্ধ » লিখিয়া নহে, কিন্তু « র্দ্ধ » অর্থাৎ « র্দ্‌ধ » লিখিয়া ; « সখ্য, পথ্য »—উচ্চারণে [সোখ্‌খ, পোথ্‌থ] নহে, কিন্তু [সোক্‌খ, পোত্‌থ] ।

[২.১৯৬] দুইয়ের অধিক বর্ণেও মিলিয়া সংযুক্ত ব্যঞ্জন সৃষ্টি করে। আ-কার, উ-কার প্রভৃতি স্বরধ্বনি সরল বর্ণের মত যথারীতি সংযুক্ত-বর্ণেও যুক্ত হয়। যেখানে সংযুক্ত-বর্ণ লেখার সুবিধা হয় না বা ছাপার হরফে পাওয়া যায় না, সেখানে হসন্ত-চিহ্ন দিয়া কাজ চালানো হইয়া থাকে।

আদ্য-অক্ষর-অনুসারে বাঙ্গালা বর্ণমালার সংযুক্ত ব্যঞ্জন :—

« ক : ক্ক ক্ট ক্ট্র ক্ত ক্ত্য ক্ত্ব ক্ত্র ক্ন ক্ম ক্য ক্র ক্ল ক্ব ক্ষ ক্ষ্ম ক্ষ্ণ ক্ষ্ম ;

খ : খ্য খ্র ;

গ : গ্ন গ্দ গ্ধ গ্ন (গ্‌+ণ, গ্‌+ন—বাঙ্গালায় এই দুইটার রূপ এক, উচ্চারণও এক ; সংস্কৃত-মতে « ভগ্ন (ভাঙ্গা) » শব্দে দন্ত্য ন, « রুগ্ণ (রোগা, রুগ্ন) » শব্দে মূর্ধন্য ণ) গ্ম গ্য গ্র গ্র্য গ্ল গ্ব ;

ঘ : ঘ্ন ঘ্য ঘ্য ঘ্র ঘ্র ঘ্ব ;

ঙ : ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ;

চ : চ্চ চ্ছ চ্ছ্র চ্ছ্ব চ্ঞ চ্য চ্র চ্ল চ্ব ;

ছ : ছ্য ছ্র ছ্ব ;

জ : জ্জ জ্ঝ জ্জ্ব জ্ঞ জ্ঞ্য জ্য জ্র জ্ল জ্ব ;

ঝ : ঝ্য ;

ঞ : ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ;

ট : ট্ক ট্ট ট্ম ট্য ট্র ট্ল ট্ব ;

ঠ : ঠ্য ;

ড : ড্গ ড্ড ড্য ড্র ড্ল ড্ব ;

ঢ : ঢ্য ঢ্র ;

ণ: ণ্ট ণ্ঠ ণ্ঠ্য ণ্ড ণ্ড্র ণ্ঢ ণ্ণ ণ্য ণ্ব;

ত: ৎক ত্ত ত্ত্য ত্ত্র ত্ত্ব ত্থ ত্ন ৎপ ৎফ ত্ম ত্ম্য ত্য ত্র ত্র্য ত্রু ত্ব;

থ: থ্য থ্ব থ্র;

দ: দ্গ দ্ব দ্দ দ্ধ দ্ধ্ব দ্ন দ্ন্য দ্ম (দ্য) দ্র দ্রু দ্ব;

ধ: ধ্ন ধ্য ধ্র ধ্ন্ব ধ্ব (ধ্ব);

ন: ন্ত ন্ত্য ন্ত্ব ন্ত্র ন্থ্য ন্থ ন্দ ন্দ্য ন্দ্র ন্দ্র্য ন্ধ্য ন্ধ, ন্ধ্য ন্ধ্র ন্ন ন্ম ন্স ন ন্ব;

প: প্ত প্ফ প্ন প্য প্র প্ল প্স;

ফ: ফ্য ফ্র;

ব: ব্জ ব্দ ব্ধ ব্ধ্ব ব্ব ব্ড, ব্য ব্র ব্ল ব্ব (=বর্গীয় ব+অন্তঃস্থ ব);

ভ: ভ্য ভ্র ভ্ন ভ্ব;

ম: ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম ম্য ম্র ম্ল ম্ব;

য: য্য য্ব;

র: র্ক (র্ক্ক) র্ক্ষ র্ক্ষ্য র্খ র্গ (র্গ্য) র্ঘ র্চ (র্চ্চ) র্ছ (র্চ্ছ) র্জ (র্জ্জ) র্ঝ (র্জ্ঝ) র্ণ (র্ণ্য) র্ত (র্ত্ত) র্থ (র্থ্য) র্দ (র্দ্দ) র্ধ (র্দ্ধ) র্ধ্ব (র্দ্ধ্ব) র্ন র্প (র্প্য) র্ফ র্ব (র্ব্ব) র্ভ (র্ভ্ভ) র্ম (র্ম্ম) র্য (র্য্য) র্ল (র্ল্ল) র্ব (র্ব্ব) র্শ র্ষ র্হ (এগুলি আবার ব-ফলা-যুক্ত হইতে পারে);

ল: ল্ক ল্গ ল্ট ল্প ল্ব ল্ম ল্য ল্ব;

ব: ব্য ব্র ব্ল ব্ব;

শ: শ্চ শ্ছ শ্ন শ্ম শ্ব শ্র শ্ল শ্ব;

ষ: ষ্ট ষ্ট্য ষ্ট্র ষ্ঠ ষ্ঠ্য ষ্ঠ্ব ষ্ঠ্য ষ্ণ ("ষ্ণ" প্রাচীন বাঙ্গালা উচ্চারণে ছিল « ষ্‌ট্‌ », এক্ষণে « ষ্‌ণ » বা [শ্‌নে]) ষ্ণ্য ষ্প ষ্ম ষ্ব;

স: স্ক স্খ স্ত স্থ স্ন স্প স্ফ স্ম স্য স্র স্ল স্ব; (স্ট=স্‌ট—নূতন সংযুক্ত-বর্ণ)।

হ: হ্ন হ্ণ হ্ম হ্য হ্র হ্ল (হ্ল) হ্ব (« হ্য » = [জ্ঝ]; অন্যত্র উচ্চারণে হ-কার পরবর্তী ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে আইসে: হ্ল—[ল্‌হ], হ্ম—[ম্‌হ])।

☞ সংযুক্ত-বর্ণ-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। বর্ণগুলির কোন্‌টা কোন্‌টার পরে আসে, তাহা বিচার করিয়া, সংযুক্ত-বর্ণের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ ছাত্রগণ « ক্ষ » ও « ক্ষ্ম », « ক্র » (=ক্‌+র) ও « ত্রু » (=ত্‌+র্‌+উ), « স্ক » ও « স্ম », « গ্ম » ও « জ্ঞ », « হু » ও « হৃ »—এইগুলির মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলে।

[২.২] প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration)

আজকাল বহু বিদেশী নাম ও শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় স্থান পাইয়াছে ও পাইতেছে। বহু ফারসী (ও আরবী) শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে, এবং উচ্চারণে ও লেখায় এগুলি একেবারে বাঙ্গালা শব্দ বনিয়া গিয়াছে। তদ্রূপ, কতকগুলি ইংরেজী নাম ও শব্দ বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। যে-সকল বিদেশী শব্দ সাধারণ্যে প্রচলিত, যেগুলির উচ্চারণ বাঙ্গালার অনুযায়ী, ও বানান সেই উচ্চারণের প্রতীক,—বিশুদ্ধ বিদেশী উচ্চারণ যেখানে অজ্ঞাত, সেখানে সেই শব্দগুলিকে, মূল বিদেশী ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ ধরিয়া নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যকতা নাই। এক কথায়, naturalised বা জাতিতে-প্রবিষ্ট শব্দে, বাঙ্গালায় প্রচলিত বানান-ই বজায় রাখিতে হইবে। যেমন ফারসী « জমীদার (জ়মীন্‌-দার নহে), বরাদ্দ (বর্‌-আওর্দ্‌ নহে), সালিস (আরবী উচ্চারণ ধরিয়া « থ়ালিথ় » নহে, বা ফারসী ও উর্দু উচ্চারণকে, পূর্ব-বঙ্গের চলিত ভাষার প্রাপ্ত বাঙ্গালা ছ-অক্ষরের গ্রাম্য উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া লিখিবার চেষ্টায়, « ছালিছ » নহে); হাসপাতাল (হস্‌পিট্‌ল্‌ নহে), আপিস (অফিস্‌ নহে), লাট (লর্ড নহে), মাষ্টার (মাস্টার নহে), খ্রীষ্ট (ক্রাইস্‌ট্‌ নহে) »। কিন্তু যেখানে শব্দ নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে, কিংবা ভূগোল ও ইতিহাসের আলোচনার জন্য বিদেশী নাম বাঙ্গালা অক্ষরে যথাযথ বা উচ্চারণ-অনুসারে লেখার আবশ্যকতা আসিতেছে, সেখানে যথা-সম্ভব বিদেশী উচ্চারণ-অনুসারে বাঙ্গালা অক্ষরে বিদেশী নামের প্রতিলিপি বা প্রতিবর্ণীকরণ হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কার্যকর নিয়ম করিতে হইলে, আলোচ্য বিদেশী ভাষার ও বাঙ্গালার ধ্বনিগুলির এবং উভয় ভাষার বর্ণবিন্যাস-রীতির একটু তুলনা-মূলক আলোচনার আবশ্যক।

[২.২১] [ক] রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা নামের প্রতিবর্ণীকরণ

অধুনা প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া রোমান অক্ষরের প্রসার—ইউরোপীয় সভ্যতার বাহন-স্বরূপ ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয়, জরমান প্রভৃতি ভাষার প্রভাবে। ডাক-ঘরের মারে,

রেল-স্টেশনের নামে, সর্বত্র রোমান অক্ষরে, বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় নামের প্রতিলিপি দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নিয়মানুবর্তিতা আবশ্যক। খাস ইংরেজী ভাষাতে রোমান বর্ণের (স্বর ও ব্যঞ্জনের) যে ধ্বনি, তদনুসারে পূর্বে প্রত্যক্ষরীকরণ হইত। আজকাল কিন্তু একটী আন্তর্জাতিক রীতি অবলম্বিত হয়—কেবল ইংরেজীর উচ্চারণ ধরিয়া রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় নাম লেখা হয় না। নিম্নে বাঙ্গালা নামের রোমান প্রতিবর্ণীকরণ-বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইল।—

বাঙ্গালা অক্ষর « অ »—রোমান প্রত্যক্ষর সাধারণতঃ a : দুই-একটী প্রাকৃত-জ শব্দে অ-কার স্থলে o লেখা চলিতে পারে, কিন্তু অন্যত্র, বিশেষতঃ সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী নামের রোমান বানানে, অ-কার স্থলে a-ই ব্যবহার করা উচিত—o মোটেই নহে ; যথা—« প্রমথ Pramatha (Promotho নহে), প্রবোধ Prabodh (Probodh নহে), প্রিয় Priya (Preo, Prio নহে), প্রফুল্ল Praphulla (Profullo নহে), মণি Mani (Moni নহে), অমিয় Amiya (Omio নহে), শঙ্কর Sankar বা Shankar (Shonkor, Shanker, Sunker নহে), মহেন্দ্র Mahendra (Mohendro নহে), মহামহোপাধ্যায় Mahamahopadhyaya (Mohamohopadhyaya নহে), অতীন্দ্র Atindra (Otindro নহে) ; বশীরুদ্দীন Bashiruddin (Bochiruddin নহে), শহীদুল্লাহ Shahidullah (Shohidulla নহে), কেরামত আলী Keramat Ali (Keramot Ali নহে), আব্দুল হক Abdul Haqq (Abdul Hoque বা Huque নহে) » ইত্যাদি। কিন্তু « ননী, কড়ি, মতি—মোতি » প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃত-জ নামে, o চলিতে পারে : যথা—« ননীগোপাল Nonigopal, পাঁচকড়ি Panchkori, মতিলাল Motilal » ইত্যাদি।

অ-কারের জন্য u লেখা পুরাতন ইংরেজী রীতি ছিল, এখন ইহা বর্জিত : « মল্লিক Mallik (Mullick নহে), তারক Tarak (Taruck নহে), চরণ Charan (Churan, Churn নহে) ; সফদর জঙ্গ Safdar Jang (Sufdur Jung নহে), হক Haqq (Huque ঠিক নহে) »।

« আ »—a বা ā (সর্বত্র) ; আ-কারের জন্য পূর্বে ইংরেজীতে o, au, aw লেখা হইত ; এখন তাহা বর্জনীয় ; যথা—« পাল Pal (Paul নহে), কালীচরণ দাস Kalicharan Das (পুরাতন পদ্ধতির Collychurn Doss ঠিক নহে) ; দাঁ Dan, লাহা Laha, সাহা Saha (পুরাতন বানান Dawn, Law=লা, Shaw=শা—এখন বর্জিত হওয়া উচিত, কিন্তু এগুলি বহুশঃ ব্যবহৃত হয়) »।

« ই, ঈ »—i সর্বত্র (i=ই, ī=ঈ) : ঈ স্থলে ee লিখিবার আবশ্যকতা নাই। « ই, ঈ (ি, ী) » নামের শেষে থাকিলে, অনেক সময়ে y-রূপে লেখা হয় ; ইহা ভুল, কারণ y কেবল « য »-এর ও য-ফলার জন্য ব্যবহৃত হয় : « সুধীর=Sudheer নহে, Sudhir ; রবি=Rabi (Roby নহে) ; সুমতি Sumati, অনাদি Anadi, মাইতি Maiti (Mytee নহে), চৌধুরী Chaudhuri, আলী Ali, ফৈজী Faizi (Sumoty, Anady, Maity, Chowdhury, Aly, Faizy বা Fyzee নহে) »। ই- বা ঈ-র জন্য e লেখা ঠিক নহে— « বিহারী=Behari, বিনয়=Benoy, বিজয় Bejoy, নীরদ Nerode, বিজলী Bejoly, প্রিয় Preo » বর্জনীয়—Bihari, Binay, Bijay, Nirad, Bijali, Priya শুদ্ধ বানান।

« উ, ঊ »—u (উ=u, ঊ=ū) : পূর্বে ইংরেজীতে oo লিখিত হইত, আজকাল প্রায় সর্বত্রই u ব্যবহৃত হইয়া থাকে, oo এখন অপ্রচলিত হইয়াছে। « হিন্দু Hindu (Hindoo নহে), কুণ্ডু Kundu (Coondoo, Kundoo নহে) ; আবু Abu, মহমুদ Mahmud (Mahmood নহে), পাণ্ডুয়া Pandua (পুরাতন বানান Pundooah ঠিক নহে), উমেশ Umes বা Umesh (Woomesh ঠিক নহে) »।

« ঋ »—ri : « ঋতেন্দ্র Ritendra, সুকৃতি Sukriti »।

« এ »—e (ey, ay ঠিক নহে) : « দেশবন্ধু=Desabandhu বা Deshbandhu ; দে De (Dey, Day নহে), সেন Sen (Seyne নহে) ; শের Sher »। আরবী-ফারসী নামে, মূল ভাষার বানান বা উচ্চারণ ধরিয়া, বাঙ্গালা এ-কার স্থলে ai লেখা চলিতে পারে ; যথা—« হোসেন Hosain, বা হুসেন Husain ; শেখ Shekh (বা Shaikh) » ইত্যাদি।

« ঐ »—ai (oi, oy বা y নহে) : « কৈলাস Kailas (Kylash, Koylash, Koilas নহে), ত্রৈলোক্য Trailokya (Troilucko নহে), মৈত্র Maitra (Moitro নহে), বৈকুণ্ঠ Baikuntha (Boicoonto বা Bycoonto নহে) ; সৈফুদ্দীন Saifuddin, জৈনুল আবেদিন Zainul Abidin (Soifuddin, Joynal Abidin নহে) »।

« ও »—o : « গোপেন্দ্র Gopendra, সরোজ Saroj, মনোজ Manoj, মনোমোহন Manomohan ; গোলাম Golam (বা Ghulam=ঘুলাম), মোহম্মদ Mohammad (বা Muhammad=মুহম্মদ) »। একাক্ষর বাক্যে, বা বাক্যের শেষ অক্ষরে, ও-কার আসিলে, ইংরেজীর সাধারণ শব্দের বানান অনুকরণ করিয়া শেষে একটা অনুচ্চারিত e লেখা যুক্তিযুক্ত নহে, যদিও বহু ক্ষেত্রে এই e লেখা হয় : « বোস=Bose, সোম= Some, হোম=Home (এই প্রকারের কতকগুলি বানান চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু ঠিক

বানান Som অনেকে লিখেন) ; অশোক = Asok, বা Ashok (প্রাচীন স্বরান্ত উচ্চারণে Asoka) ; ফিরোজ = Firoz (Pheroze নহে), বিনোদ = Binod (Benode, Benud নহে), নীরদ = Nirad (Nerode নহে) »।

« ঔ »—au (ow, ou নহে) : « মৌলিক Maulik, ভৌমিক Bhaumik (Mowlick, Bhowmick নহে), কৌশল্যা Kausalya বা Kaushalya, গৌড় Gaur (Gauḍa—সংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া) ; শৌকৎ Shaukat, রৌশন Raushan, জৌহর Jauhar » ইত্যাদি।

« ক খ গ ঘ ঙ »—k kh g gh n (ṅ) : « ঙ » আলাহিদা থাকিলে ng লেখা হয় : « রঙীন Rangin, বাঙলা Bangla »। « ক »-এর জন্য c বা ck লেখা উচিত নহে : « কার্তিক Kartik (Kartick নহে), সাতকড়ি Satkari বা Satkori (কড়ি স্থানে cowrie লেখা ঠিক নহে) »। আরবী-ফারসী নামে কোনও-কোনও শব্দে « ক » ও « গ » আরবীর q ও gh-এর (ق 'কাফ্' ও غ 'ঘয়ন্' বর্ণের) প্রতিবর্ণ, সেই জন্য ইংরেজীতে মূল আরবী ধরিয়া বহু মুসলমান নামে q ও gh লেখা হয় : « হক Haqq, ইস্হাক Is-haq, ফকীর Faqir, কানুনগো Qanungo, মকবুল Maqbul, গোলাম Gholam, গরীব Gharib, আগা Agha, মোগল Mughal (পুরাতন ইংরেজী বানান Mogul সুপ্রচলিত), আব্দুল গনি Abdul Ghani, গফুর Ghafur » ইত্যাদি।

« চ ছ জ ঝ ঞ »—ch chh j jh n (ñ) : « চন্দ্র Chandra, ছায়া Chhaya, জ্যোতিষ Jyotish, ঝাউতলা Jhautala (Jhowtollah নহে), পঞ্চানন Panchanan » ইত্যাদি। « মিঞা = মিয়াঁ = Miyan »। ফারসী ও আরবী নামে যেখানে বাঙ্গালা « জ »-দ্বারা ঐ দুই ভাষার z-ধ্বনি প্রকাশিত হয়, রোমান প্রতিলিপিতে সেখানে z লেখা উচিত ; যথা—জাফর Jafar, জমাদী অল্-আওঅল Jamadi al-Awwal, রমজান Ramzan (Ramazan), আব্দুল জব্বার Abdul Jabbar, রজ্জাক Razzaq » ইত্যাদি। (রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত অথবা ভারতীয় অন্য ভাষার বই আগাগোড়া প্রতিলিপি করিবার সময়ে, কিংবা ঐ সকল ভাষার বচন উদ্ধার করিয়া দিবার সময়ে, সাধারণতঃ c দ্বারা « চ » এবং ch দ্বারা « ছ » নির্দিষ্ট হয় : « চন্দ্র = candra, চিত্রা = citrā, চঞ্চল = cañcala, ছত্রপতি = Chatrapati, ছান্দোগ্য = Chāndogya » ইত্যাদি।)

« ট ঠ ড ঢ ণ »—ṭ ṭh ḍ ḍh ṇ, বা বিন্দুযুক্ত অক্ষরের অভাবে t th d dh n : « অটল Aṭal, ঠাকুর Ṭhākur (পশ্চিমের উচ্চারণের ইংরেজী অনুকরণ, Tagore রূপ গ্রহণ করিয়াছে), ইড়া Iḍā, নারায়ণ Nārāyaṇa » ইত্যাদি।

« ত থ দ ধ ন »—t th d dh n : « দ্ধ »=ddh : « সিদ্ধান্ত Siddhanta, বুদ্ধ = Bud.:ha (Sidhanta, Budha, ভুল) » ।

« প ফ ব ভ ম »—p ph b bh m.

☞ « ফ ভ »-এর জন্য, আরবী-ফারসী নাম ব্যতীত অন্যত্র, ph bh লেখা উচিত, কদাচ f v নহে : « ফণীন্দ্র Phanindra (Fanindra নহে), বিভূতি Bibhuti (Bivuti নহে), মহাভারত Mahabharata (Mohavarot নহে), প্রভা প্রতিভা প্রভাত Prabha Pratibha Prabhat (Prova Protiva Provat নহে), ভদ্রলোক Bhadralok (Vadralogue নহে) ; ফকীর Fakir বা Faqir, মোস্তফা বা মুস্তাফা Mustafa, আফতাব Aftab, মুজফ্ফর Muzaffar, ফখ্রুদ্দীন Fakhruddin, মৌলবী বা মৌলভী Maulavi, [illegible] বা গজনভী Ghaznavi » ইত্যাদি । কিন্তু « সোভান= সুবহান=Sobhan বা Subhan (Shovan নহে) » ।

« য য় ল ব »—আদ্য « য »=j বা y : « যোগেশ Yoges, Jogesh ; যোগী Yogi, Jogi » ; « য (য়) » পদ-মধ্যে বা অন্তে=y : সহায় Sahay, অভয় Abhay, অক্ষয় Akshay, আদিত্য Aditya, মাণিক্য Manikya, অমূল্য=Amulya (Omullo নহে) » । ফারসী-আরবী নামে : « ইয়াসিন=Yasin, ইয়াকুব=Yakub (Easin, Eacoob নহে), হুমায়ুন=Humayun » ইত্যাদি ।

« র »=r ; « ল »=l ; « ল্ল »=ll (ly নহে) ; « ব »=b : আবার বহু সংস্কৃত শব্দে ও নামে সংস্কৃতে অন্তঃস্থ ব-এর v উচ্চারণ-অনুসারে, « ব »-স্থানে v লেখা হয় । বাঙ্গালায় b, v দুইই লেখা চলে ; যেখানে শব্দটীর বাঙ্গালা উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, সেখানে b ; আবার যেখানে শব্দটীর সংস্কৃত উচ্চারণের দিকে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক-ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়, সেখানে v ; যেমন « শিব Siva, বরেন্দ্র Barendra (বা Varendra), বটকৃষ্ণ Bata-(বা Vata)-krishna, বিপিনবিহারী pin-bihari বা Vipin-vihari, বিনোদিনী Binodini (Vinodini) ; বিবেকানন্দ Vivekananda, বিচিত্রা Vichitra, বিদ্যাভবন Vidya-bhavana, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব Prachyavidya-maharnava, কাব্যবিশারদ Kavya-visarada ; বন=Vana, Van বা Ban (Bon বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিয়া) » ইত্যাদি । ব-ফলা=w : « বিশ্বাস Biswas (Visvasa—সংস্কৃত উচ্চারণে), অদ্বৈত Adwaita, তত্ত্বভূষণ Tattwa-bhushana » ইত্যাদি ।

« শ ষ স » ; « শ »=ś, বা অভাবে s (অথবা sh) ; « ষ »=ṣ, বা sh ; « স » =s : « শ্রীশ Sris বা Shrish (Seris, Srish, Shrees নহে) ; শশিভূষণ Sasibhushan (Shasibhusan নহে) ; ষষ্ঠী Shashthi » । দ্রষ্টব্য—« রমেশচন্দ্র (রমেশ্চন্দ্র নহে) = Rameśacandra, Rames-chandra বা Rames Chandra (পুরাতন বানানে Romesh Chunder) ; কিন্তু জ্যোতিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র = Jyotishchandra, Harish-chandra (একশব্দ-রূপে লিখিত), দীনেশচন্দ্র = Dines-chandra বা Dines Chandra » ইত্যাদি।

« হ, ঃ »—উভয়ই h ; (ঃ = ḥ) ; « ং » = n (ng ঠিক নহে) : « সুধাংশু সিংহ Sudhansu Sinha » ।

« ঁ » = n ; « পাঁচুগোপাল = Panchugopal, দয়ালচাঁদ = Dayalchand, রাইচাঁদ = Raichand ; খাঁ = Khan, মিয়াঁ = Miyan » ।

« ক্ষ » = ksh : « ক্ষিতিমোহন Kshitimohan » ; « জ্ঞ » = jn ; « জ্ঞানরঞ্জন Jnan Ranjan » ।

[২.২২] [খ] বাঙ্গালা নামের ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণের এবং ইংরেজী উচ্চারণের বাঙ্গালা ভাষায় অনুকরণ

☞ বাঙ্গালা বা অন্য ভারতীয় ভাষার নাম বা শব্দগুলির ইংরেজী বানান বা কদুচ্চারণের অনুকরণে, বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন-কালে বিকৃত করিয়া বলা, অথবা লিখন-কালে বিকৃত বানানে লেখা, অতি-অবশ্য পরিহর্তব্য। ইংরেজেরা আমাদের দেশের নাম বা শব্দের উচ্চারণ ঠিক-মত করিতে পারে না ; এবং অনেক সময়ে বাঙ্গালা বানানের যথাযথ প্রতিবর্ণীকরণও ঠিক হয় নাই। অনেকে অনবধানতা-বশতঃ, অথবা অন্য ইংরেজী শব্দের সংযোগে, ইংরেজী-রূপ-প্রাপ্ত সেই সকল বাঙ্গালা নাম বা শব্দ ইংরেজীরই অনুকরণ করিয়া বলেন ও লেখেন। এরূপ করা বাঙ্গালা ভাষার উপর অত্যাচার ; এবং ইহা মাতৃভাষা-সম্বন্ধে শিষ্টতার অভাবের পরিচায়কও বটে। « কলিকাতা » শব্দের চলিত-ভাষায় রূপ « ক'লকাতা [কোল্‌কাতা, কোল্‌কেত্তা] » অথবা প্রাদেশিক বাঙ্গালা রূপ [কইল্‌কাতা] না বলিয়া, Calcutta [ক্যাল্‌কাটা] (পূর্ব-বঙ্গে আবার ইহা ক্রমশঃ [ক্যাল্‌কাডা] হইয়া দাঁড়ায়।) ; « বাঁধি » না বলিয়া বা না লিখিয়া,

ইহার ইংরেজী অনুকরণ Contai-এর বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ করিয়া, [কণ্টাই] লেখা ও বলা ; « শক্তিগড় »-স্থলে তদ্রূপ Saktigarh [সাক্‌টিগার] বা [সাক্‌টি] বলা ; « চট্টগ্রাম (বা চাটিগাঁ অথবা চাটগাঁ) »-স্থলে Chittagong [চিটাগঙ্] বলা বা লেখা ; « বনগাঁ »-স্থলে Bongong [বঙ্গঙ্], « মেদিনীপুর »-স্থলে Midnapore [মিড্‌নাপুর্], « বালেশ্বর »-স্থলে Balasore [ব্যালাসোর্], « কটক »-স্থলে Cuttack [কাটাক্], « বোম্বাই »-স্থলে Bombay [বম্বে], « মান্দ্রাজ »-স্থলে Madras [ম্যাড্রাস্], « মথুরা »-স্থলে Muttra [মাট্‌রা], « কন্যাকুমারী »-স্থলে Comorin [কমোরিন্], « হরিদ্বার »-স্থলে Hardwar [হার্ড্‌ওয়ার্], « বর্ধমান »-স্থলে Burdwan [বার্ড্‌ওয়ান্] « সংস্কৃত »-স্থলে Sanskrit [স্যান্‌স্ক্রিট্] (অথবা কলিকাতার ছাত্রদের মুখে শ্রুত [স্যাংস্কীট্]) ; », « আরবী »-স্থলে Arabic [অ্যারেবিক্] (বিদেশী নামের মধ্যে « রুষদেশ »-স্থলে Russia [রাশা], « চীন »-স্থলে China [চায়না], « পারস্য »-স্থলে Persia [পার্শিয়া] প্রভৃতি)—কথন ও লিখন, উভয় ক্ষেত্রেই এইরূপ বর্বরতা-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

নিম্ন-লিখিত উপাধিগুলির প্রয়োগ-কালেও, মূল বাঙ্গালা রূপের ইংরেজী কদুচ্চারণ অথবা ইংরেজী বানানের বাঙ্গালা প্রতিলিপিও লিখন ও কথোপকথন উভয়-ক্ষেত্রেই সর্বথা বর্জনীয় :—« চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় »—সাধু-ভাষার সংস্কৃতীকৃত রূপ (সংক্ষেপে « চট্ট, মুখো, বন্দ্যো, গঙ্গো ») ; প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ, « চাটুর্জ্যা, মুখুর্জ্যা, বাঁড়ুর্জ্যা, গাঙ্গুলী » চলিত-ভাষায় « চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে (বা চাটুর্জ্যে, মুখুর্জ্যে, বাঁড়ুর্জ্যে), গাঙ্গুলি » রূপে প্রচলিত ; এগুলির ইংরেজী অনুকরণ Chatterji (বা Chatterjee, Chatarji, Chatterjea), Mukherji (বা Mookerjee, Mukharji, Mukerjea ইত্যাদি), Banerji (Banerjee, Banarji, Banerjea ইত্যাদি), ও Ganguli (Gangooly) ; বাঙ্গালা ভাষায় পুরা সংস্কৃত রূপ « চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় » লেখায় অসুবিধা হইলে, চলিত-ভাষার রূপ « চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, গাঙ্গুলি » ব্যবহার করা উচিত—বাঙ্গালা ভাষায় কথা-বার্তায় বা লেখায় [চ্যাটার্জি বা চ্যাটার্জি, মুখার্জি, ব্যানার্জি, গ্যাঙ্গোলী] প্রভৃতি ইংরেজীর অনুকরণ, ভাষা-গত বর্বরতা বা অশিষ্টতা বিধায়, সর্বতোভাবে বর্জনীয়। তদ্রূপ—« ঠাকুর » স্থলে ইংরেজী Tagore-এর নকলে বাঙ্গালায় [টেগোর], « মিত্র » স্থলে Mitter [মিটার], « বসু বা বোস্ » স্থলে Basu [বাসু, বাসু] (যথা—« ইনি হচ্ছেন মিস্টার বাসু »),

« দাঁ » স্থলে Dawn [ডন্], « পাল » স্থলে Paul [পল্], « রায় » Ray স্থলে Roy [রয়], অথবা Ray-এর ইংরেজী উচ্চারণে [রে], « নন্দী » স্থলে Nandy [ন্যাণ্ডি], « দত্ত » স্থলে Dutt [ডাট্] বা Datta [ড্যাটা] প্রভৃতি পরিত্যাজ্য।

[২.২৩] ইংরেজী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ

ইংরেজী শব্দের ধ্বনি বুঝিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে প্রতিলিপি করিতে হইবে—ইংরেজী বর্ণের ঠিক বাঙ্গালা প্রতিবর্ণ সম্ভব নহে, কারণ ইংরেজীতে একই ধ্বনি নানাবিধ উপায়ে লিখিত হইয়া থাকে, এবং একই বর্ণ অবস্থা-ভেদে বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়।

ইংরেজীতে « ই » ধ্বনি ও « উ » ধ্বনি হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় রূপেই মিলে, হ্রস্ব বা দীর্ঘ অনুসারে অর্থের পার্থক্য হয়, অতএব বাঙ্গালায় « হ্রস্ব ই, উ » এবং « দীর্ঘ ঈ, ঊ » যথাযথ ব্যবহার করা উচিত; যথা pit « পিট্ », peet « পীট্ »; sick « সিক্ », seek « সীক্ »; city = « সিটি » (সীটী নহে), seat = « সীট্ » (সিট বা শিট নহে); rood « রুড্ », rude « রূড » ইত্যাদি। ইংরেজী শব্দের « এ, ও, অ (হ্রস্ব ও দীর্ঘ), অ্যা (হ্রস্ব), আ (দীর্ঘ), ই ঈ, উ ঊ »—এই ধ্বনি কয়টি মোটামুটী ভাবে বাঙ্গালায় লেখা কঠিন নহে।

ইংরেজী দীর্ঘ « এ » বাস্তবিক পক্ষে সংযুক্ত-ধ্বনি—দক্ষিণ ইংলাণ্ডের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ইহা সন্ধ্যক্ষর « এই » রূপে উচ্চারিত হয়—এই জন্য rail, mail, train-কে অনেকে « রেইল, মেইল, ট্রেইন » রূপে লেখেন। হ্রস্ব « ও » ইংরেজীতে প্রায় মিলে না—« ও » সর্বত্র দীর্ঘ, এবং দক্ষিণ-ইংলাণ্ডে এই দীর্ঘ « ও »-কারের উচ্চারণ আবার কতকটা « ওউ »-এর মত; যথা, boat = « বোউট্ »। দক্ষিণ-ইংলাণ্ডের « এই, ওউ » এই উভয় স্থলে, স্কটলাণ্ড্ ও অন্যত্র প্রচলিত ইংরেজীর উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় সাধারণভাবে « এ » এবং « ও » লিখিলেই চলিবে: যথা, cake = « কেক », mail boat = « মেল-বোট », coat = « কোট »। এতদ্ভিন্ন আর দুইটী স্বর-ধ্বনি ইংরেজীতে আছে, যে দুইটীর অনুরূপ ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই। এ দুইটীর একটী but, cut, son, monk প্রভৃতি শব্দে পাওয়া যায়; বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ইহাকে « আ »-রূপে লেখা হয়; এ ক্ষেত্রে « অ্য » লিখিলে ভাল হয় « monk = ম্যঙ্ক্, sun = স্যন্, son = স্যন্ » ইত্যাদি। আর একটী ধ্বনি আছে—bird, colonel (= kŭrnel), her প্রভৃতি শব্দে সেটী পাওয়া

যায়, ইহা হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়বিধ (হ্রস্ব ধ্বনি—যেমন China শব্দের a, again শব্দের প্রথম a) রূপে মিলে ; এই ধ্বনিকে বাঙ্গালায় যথাযথ নির্দেশ করা কঠিন, সাধারণতঃ ইহা « অ »-রূপেই লিখিত হয়—এখানেও অগত্যা « অ » দিয়া লিখিতে পারা যায় (sun-এর « অ », bird-এর « অ » অপেক্ষা অধিকতর বিবৃত) ।

ইংরেজীতে যে কয়টি সংযুক্ত স্বর-ধ্বনি পাওয়া যায়, সে কয়টীকে লইয়াও গোল নাই : যথা, « আই, আউ, অয়্ বা অই, ইয়া, এয়া, উঅ বা উয়া » ।

ব্যঞ্জন-ধ্বনি : « b=ব ; c=ক, স ; ch=চ, ক, কচিৎ শ ; d=ড (বা ড.) ; dg=জ ; f=ফ (ফ.) ; g=গ, জ ; h=হ ; j=জ ; k=ক ; l=ল ; m=ম ; n=ন ; p=প ; q=ক ; r=র (দক্ষিণ-ইংলাণ্ডের ভদ্র উচ্চারণে, পদান্তস্থিত ও পদ-মধ্যে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থিত r উচ্চারিত হয় না, কিন্তু স্কট্‌লাণ্ডে ও অন্যত্র হয় ; বাঙ্গালায় এ ক্ষেত্রে r-কে বর্জন না করিয়া, « র » দিয়া লেখাই উচিত : Lord Birkmyre =লর্ড ব্যর্কমায়র্) ।

s=স—যেখানে s-এর নিজ দন্ত্য স-এর উচ্চারণ বিদ্যমান, সেখানে কখনও তালব্য শ বা মূর্ধন্য ষ লেখা উচিত নহে ; কিন্তু যেখানে s ইংরেজীতে sh-এর মত উচ্চারিত হয়, সেখানে « শ » লিখিতে পারা যায় : যেমন « Asia=এশিয়া (Russia=বাঙ্গালায় 'রুষদেশ',—'রাশিয়া' বা 'রাশ্যা' না লেখাই ভাল) » । s=z=জ বা জ. ; sh=শ ; এই sh-এর ধ্বনি আবার -tion অক্ষরেও আসে ; এই ধ্বনিকে কখনও স-দিয়া লেখা উচিত নহে ; « Shakspere বা Shakespeare=শেক্‌স্পিয়র (সেক্সপিয়ার, সেক্ষপীর নহে), suit-case=সুট্-কেস্ (শুট্ কেশ্ নহে), Townshend=টাউন্‌শেণ্ড্ (টাউনসেণ্ড নহে), Sheffield=শেফীল্ড্ » ইত্যাদি । ইংরেজীর st বাঙ্গালায় « স্‌ট্ (স্ট) » হওয়া উচিত, কিন্তু বাঙ্গালায় « ষ্ট » ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সংযুক্তবর্ণ « স্ট » না মিলিলে যথা-সম্ভব, « স্‌ট্ » ব্যবহার করিলে ভাল হয় ; « East Bengal=ঈস্‌ট্ বেঙ্গল (« ঈষ্ট »-রূপে লিখিলে ইংরেজী স্বর-ধ্বনি ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি দুইয়েরই লিখনে দুইটী ভুল হয়), chemist কেমিস্‌ট্ » ইত্যাদি ।

t=ট (বা ট.) ; th=থ (বা থ.), দ (বা দ.) ; v=ভ (ভ) ; w=ও্ ; x=ক্‌স্, গ্‌জ্ ; ব্যঞ্জন বর্ণ y=য়্, ইয়্ ; z=জ (জ.) ; zh-এর ধ্বনি, ইংরেজীতে pleasure, measure, leisure শব্দে মিলে, বাঙ্গালায় ঠিক-মত লিখিতে গেলে « ঝ (বা ঝ.)» দিয়া লেখা উচিত ।

[২.২৪] ফারসী ও আরবী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ

ফারসীর ধ্বনি বাঙ্গালায় লিখিবার রীতি নিম্নে প্রদর্শিত হইল। আরবী উচ্চারণ ধরিয়া আরবী নাম লেখা যায়, কিন্তু সে উচ্চারণ সাধারণতঃ এ দেশে কেহ বুঝিবে না—তথাপি আরবীর উচ্চারণ-অনুসারে আরবী বর্ণ বাঙ্গালায় প্রতিবর্ণীকরণের সহজ পদ্ধতিও নির্দিষ্ট হইল।

আরবী ফারসীর হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ এবং হ্রস্ব উ ও দীর্ঘ ঊ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহিত হইতে পারা যায়, এবং মূলানুসারে বাঙ্গালায় « ই, ঈ, উ, ঊ » ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না—বিশেষতঃ ইতিহাসাদিতে আরবী ও ফারসী ভাষা হইতে গৃহীত মুসলমান নাম লিখনের বেলায়। আরবী ও ফারসীতে j ও z দুইটী ধ্বনি আছে; বাঙ্গালায় z-এর জন্য বিশেষ অক্ষর নাই, জ-দ্বারা j ও z দুইয়েরই ধ্বনি নির্দিষ্ট হয়। আবার পূর্ব-বঙ্গে জ-এর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্র dz বা z। এই জন্য বিশেষ অসুবিধা হয়—« Sirāj = সিরাজ, Razzāq = রজ্জাক, jahāz = জাহাজ (পশ্চিম-বঙ্গে jahaj ও পূর্ব-বঙ্গে zahaz রূপে উচ্চারিত), mijāz = মেজাজ (পশ্চিম-বঙ্গে [mejaj], পূর্ব-বঙ্গে [mezaz]), Jabbār = জব্বার, zabr = জবর » ইত্যাদি। এই জন্য কেহ-কেহ প্রস্তাব করেন, আরবী-ফারসী নামে j-এর ধ্বনি থাকিলে বাঙ্গালায় বর্গীয় « জ » লেখা, এবং z-এর ধ্বনি থাকিলে অন্তস্থ « য » লেখা; « j = জ », « z = য »—এই ভাবে বিনা ঝঞ্ঝাটে দুইটীর পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অসুবিধাও আছে।

আরবী-ফারসীতে s (= ص س ث), এবং sh (= ش), এই দুইটী শিশ্‌ধ্বনি আছে। ش = sh-এর জন্য « শ » ব্যবহার করা উচিত—সর্বত্র; এবং s-এর ধ্বনির জন্য, সংস্কৃতের ও ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রয়োগের অনুরূপ « দন্ত্য স »-র ব্যবহারই কর্তব্য। যেমন—« Shah = শাহ, Sharif = শরীফ, Musharraf = মুশর্‌রফ, Murshid = মুর্শিদ, Danishmand = দানিশ্‌মন্দ; Sanaullah = সনাউল্লাহ, Osman = ওস্‌মান, Sultan = সুলতান, Sufi = সূফী, Asghar = অস্‌গর্‌, Nasiruddin = নাসিরুদ্দীন » ইত্যাদি। « স = s », « শ = sh »—ইহা সহজ-বোধ্য, এবং সাধু ও চলিত বাঙ্গালায় ও সমগ্র ভারতবর্ষের অনুমোদিত রীতি। পূর্ব-বঙ্গের বহু মুসলমান লেখক, পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত « ছ »-এর s—এই প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া, আরবী-ফারসীর s অর্থাৎ ص س ث স্থানে বাঙ্গালায় « ছ » ব্যবহার করিয়া থাকেন—« ছানাউল্লা, ওছমান, নাছিরুদ্দীন,

ছোলতান, খাদেমুল্-এন্ছান » ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-তত্ত্বের দিকে এবং বাঙ্গালা বর্ণমালার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই প্রকারে « ছ »-এর প্রয়োগ অত্যন্ত আপত্তি-জনক। পুরাতন বাঙ্গালায় যত আরবী-ফারসী নাম ও শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সর্বত্রই s-এর ধ্বনি বাঙ্গালায় দন্ত্য « স »-রূপে লিখিত হইয়াছে; প্রাচীন সাহিত্যে ইহার ভূরি-ভূরি উদাহরণ আছে; « গয়াসদ্দীন, নসরত শাহ, হসেন, সিরাজ, সোলেমান » প্রভৃতি বানানে তাহা স্পষ্ট—« গয়াছদ্দীন, নছরত, হছেন, ছিরাজ, ছুলেমান » আমরা পাই না। বাঙ্গালায় সর্বজন-প্রচলিত ফারসী-আরবী শব্দেও « স » পাই, « ছ » প্রায় নাই-ই: যথা—« সনদ, সন, সাল, সরাই, সেপাই, সাবেক, সুরকি, সাজা, সালিস, সান (সানের মেঝে'), সরহদ্দ, মফঃস্বল, সানকী, সবুর, সহি, খানসামা, তমঃসুক, মুসলমান, রসদ, আসমান, খাসী » ইত্যাদি। « ছ » লেখায়, পশ্চিম-বঙ্গে « মুসলমান »-এর পার্শ্বে « মোছলমান » বানান হইতে কথ্য-ভাষায় « মোচোরমান » [mochorman] শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, « কিস্‌সা (kessa, qissa) » শব্দটী « কেচ্ছা » [kechchha] হইয়াছে, « মরসিয়া » (marsiya) শব্দের « মরছিয়া » বানানে « মর্চে' » [morche] রূপ দাঁড়াইয়াছে, « মিসিল (misl) » শব্দ « মিছিল » [michhil] হইয়াছে, « ওয়াসিলা » (wasila) শব্দ « অছিলা » [achhila], « পসন্দ » (pasand) « পছন্দ » [pachhanda] হইয়াছে, « অক্‌সর (akthar > aksar) » দাঁড়াইয়াছে « আকছার » [akchhar] রূপে, « তসর্‌রুফ » (tasarruf) হইয়া দাঁড়াইয়াছে « তছরূপ » [tochhrup]; এবং « ছোলতান, এন্ছান, মার্ছিয়া, ছালাম, ছাহেব, ছাদাত » প্রভৃতি শব্দের « ছ »-দিয়া বানান, চলিত-ভাষা ব্যবহার-কারী অনভিজ্ঞ পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানদের মুখে Chholtan, Enchhan, Marchhiya, Chhalam, Chhaheb, Chhadat রূপে ধ্বনিত হয়,—ও শুনা যায় না।

সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার ও বর্ণমালার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এ ক্ষেত্রে « ছ » না লিখিয়া, « স » লেখাই সমীচীন। এতদ্ভিন্ন, মূল আরবীতে ث, س, ص, তিনটীরই উচ্চারণ পৃথক্ পৃথক্; ث-এর আরবী উচ্চারণ হইতেছে দন্ত্য-স-ঘেঁষা উষ্ম « থ. » —ইংরেজী think, thing-এর th-এর মত; এবং ص কতকটা « শ » বা sw-এর মত; কেবল س হইতেছে খাঁটী « দন্ত্য স »। ذ, ز, ض, ظ—এগুলির উচ্চারণ, ফারসী ও উর্দুতে z-হইলেও, আরবীতে এক নহে; আরবীতে ز-এর উচ্চারণ হইতেছে z, আরগুলির

উচ্চারণ « ধ. », « দ » ও « দ্ব » জাতীয়। বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ যখন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা সম্ভব হইবে না, তখন « ছ » ব্যবহার-দ্বারা বিদেশী নামে cbh ও s-এর গোলমাল সৃষ্টি করায় কোনও সার্থকতা নাই।

আরবী-ফারসী বর্ণ	ফারসী ও উর্দু উচ্চারণ-অনুসারে	মূল আরবী উচ্চারণ-অনুসারে
ا آ	অ, আ	অ, আ
ء (হাম্‌জ.া)	’অ [’]	’অ [’]
ب	ব	ব
پ	প	(আরবীতে নাই)
ت	ত	ত
ث	স [« ছ » নহে]	থ (থ.)
ج	জ	জ
چ	চ	(আরবীতে নাই)
ح	হ	হ (হ্ব, হ.)
خ	খ (খ.)	খ (খ.)
د	দ	দ
ذ	জ (জ.)	ধ (ধ.)
ر	র	র
ز	য বা জ (জ.)	য বা জ (জ.)
ژ	ঝ (ঝ.)	(আরবীতে নাই)
س	স [« ছ » নহে]	স [« ছ » নহে]
ش	শ [« স » নহে]	শ [« স » নহে]
ص	স [« ছ » নহে]	স্ব [« ছ » নহে]
ض	য বা জ (জ.)	দ্ব
ط	ত	ত্ব

আরবী-ফারসী বর্ণ	ফারসী ও উর্দু উচ্চারণ-অনুসারে	মূল আরবী উচ্চারণ-অনুসারে
ظ	য বা জ (জ়.)	জ় (য্)
ع	‘	‘
غ	ঘ (ঘ়. বা গ়.)	ঘ (ঘ়.)
ف	ফ (ফ়.)	ফ (ফ়.)
ق	ক (ক়)	ক (ক়.)
ک	ক	ক
گ	গ	(আরবীতে নাই)
ل	ল	ল
م	ম	ম
ن	ন	ন
و	ওয় (ব), ও, উ	ব, ও (ব্যঞ্জন-বর্ণ)
ہ	হ	হ্
ي	য়, এ, ঈ	য় (ব্যঞ্জন-বর্ণ)
ـَ, ـِ, ـُ	অ, ই (এ), উ (ও)	অ, ই, উ
آ, اِي, اُو	আ, ঈ, ঊ	আ, ঈ, ঊ
اَی, اَو	অয়্, অও	অয়্, অও (অব্)

[২.৩] ঝোঁক বা স্বরাঘাত (Stress বা Respiratory Accent)

• [২.৩১] কোনও ভাষার Sentence বা বাক্যের উচ্চারণ-কালে, সেই বাক্যের অন্তর্গত পদ-সমূহের মধ্যে কতকগুলি পদ একটু বিশেষ জোরের

সহিত উচ্চারিত হয়। এই জোর, পদের কোনও একটী Syllable বা অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া থাকে। এই জোরকে **স্বরাঘাত** বা **ঝোঁক** অথবা **বল** (Stress বা Respiratory Accent) বলা হয়। (নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে, যে অক্ষরে স্বরাঘাত বা বল পড়ে, সেই অক্ষর মোটা হরফে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং অক্ষরটীর পূর্বে «'» চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।) বাঙ্গালার সাধু-ভাষায়, এবং বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায়, এই জোর পদের আদ্য অক্ষরেই সাধারণতঃ পড়িয়া থাকে; যেমন—«'আছে (আ'ছে নহে); 'গোসাঁই (হিন্দীতে ঝোঁক দ্বিতীয় অক্ষরে—গু'সাঈঁ); 'দেবতা বা 'দেব্‌তা; 'ক'র্‌ছে; 'স্বাধীন; 'অবলম্বন; 'খরিদ্দার; 'রেলগাড়ী» ইত্যাদি। শব্দগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থান করিলে, এই আদ্য অক্ষরের উপরে বল বা স্বরাঘাত পড়ে; কিন্তু বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, শব্দের স্বকীয় বল বহুশঃ খর্ব হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায়, এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য পূর্ণার্থ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কতকগুলি খণ্ডে, (ইংরেজীতে যাহাকে Breath Group অর্থাৎ **একনিঃশ্বাসময় পর্ব**, বা **শ্বাস-পর্ব**, অথবা Sense Group অর্থাৎ **পূর্ণার্থক পর্ব** বা **অর্থ-পর্ব** বলে) এইরূপ খণ্ডে বাক্য বিভক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ এক-একটী খণ্ডে—শ্বাস-পর্বে বা অর্থ-পর্বে—একাধিক শব্দ বা পদ থাকে। পর্বান্তর্গত এই শব্দ বা পদগুলিতে, এগুলির নিজস্ব স্বরাঘাত অব্যাহত থাকে না। বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে, আদ্য শব্দের আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত পড়ে; পর্বস্থিত অন্য শব্দের স্বরাঘাত লোপ পায়—মাত্র আদ্য শব্দে একটী স্বরাঘাত সমগ্র শ্বাস- বা অর্থ-পর্ব-মধ্যে মিলে। যেমন এই বাক্যটী—«আমাদের সঙ্গে আরো অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল।» পৃথক্‌-পৃথক্‌ ধরিলে, এই বাক্যের প্রত্যেকটী শব্দের আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বিদ্যমান; কিন্তু বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত হওয়ায়, কতকগুলি শব্দ, অবস্থা-গতিকে পড়িয়া, নিজ-নিজ স্বরাঘাত বর্জন করিয়াছে; ঐ বাক্যটী নিম্ন-লিখিত কয়টী বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে

স্বাভাবিকভাবেই বিভক্ত হয়, এবং প্রত্যেক বাক্য-খণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থ শব্দের আদ্য অক্ষরে মাত্র ঝোঁক পড়ে; যথা—« 'আমাদের সঙ্গে | 'আরো অনেক যাত্রী | 'মন্দিরের মধ্যে | 'প্রবেশ ক'রেছিল ||»।

ইংরেজীর স্বরাঘাত-পদ্ধতির সহিত বাঙ্গালার এ বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়—ইংরেজীর Particle ও Preposition অর্থাৎ অব্যয়, নিপাত ও কর্মপ্রবচনীয় ব্যতীত, অন্য শব্দগুলিতে সাধারণতঃ আদ্য অক্ষরে ঝোঁক বা বল পড়ে; এবং বাক্যে ব্যবহৃত হইলেও, প্রত্যেক শব্দটীর স্বকীয় বল বা স্বরাঘাত অব্যাহত থাকে; যেমন উপরের বাঙ্গালা বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ করিলে, দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বিশিষ্টার্থ শব্দেই স্বরাঘাত বিদ্যমান—'Many 'other 'pilgrims 'entered the 'temple ('came in'side the 'temple) with 'us। চলিত-বাঙ্গালায় «হাওয়া» শব্দ এবং «উত্তুরে'» শব্দ স্বতন্ত্র-ভাবে উচ্চারিত হইলে, প্রত্যেকটীর প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়ে—« 'হাওয়া; 'উত্তরে»; কিন্তু একত্র করিয়া বলিলে, এই দুইটী শব্দে মিলিয়া একটী বাক্য-খণ্ড হয়, « 'উত্তুরে' হাওয়া», এবং এই বাক্য-খণ্ডে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে মাত্র স্বরাঘাত হয়; দুইটী শব্দেই স্বরাঘাত দিলে—যেমন 'উত্তুরে 'হাওয়া»,—বাক্য-খণ্ডটী বাঙ্গালীর কানে বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্তু ইংরেজীর 'North ও 'Wind উভয় শব্দের স্বরাঘাত, শব্দদ্বয়কে মিলিত করিয়া the 'North 'Wind বলিলেও, লোপ পায় না।

[২.৩২] বাঙ্গালায় বাক্য বা বাক্য-খণ্ডই স্বরাঘাত নির্দেশ করিয়া দেয়, ইংরেজীতে প্রত্যেক শব্দ স্বতন্ত্র থাকে। বাঙ্গালা বাক্যের শ্বাস-পর্ব বা অর্থ-পর্ব-গুলি যেন কতকগুলি একান্নবর্তী পরিবার—মাথার উপরে কর্তা, স্বরাঘাত রূপ মর্যাদা তাঁহারই, এবং পরে কতকগুলি অক্ষর বা পদ, স্বরাঘাত-বিষয়ক নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য বা স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া থাকে; কিংবা যেন কতকগুলি রেল-গাড়ীর সমষ্টি, স্বরাঘাত-যুক্ত প্রথম অক্ষর

যেন ইঞ্জিন-গাড়ী, বাক্য-খণ্ডের অন্য অক্ষরগুলিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে ; আর ইংরেজীর বাক্য যেন সিপাহীদের কুচ করিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, প্রত্যেক প্রধান শব্দের বল বা স্বরাঘাত বন্দুকের উপরে সঙ্গীনের ন্যায় নিজ স্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান, কেহ কাহারও অধীন নহে।

[২.৩৩] বাঙ্গালা স্বরাঘাত-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই :—

[১] স্বতন্ত্র-ভাবে উচ্চারিত শব্দের আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বা ঝোঁক পড়ে।

[২] বাঙ্গালা বাক্য, এক- বা একাধিক-শব্দ-যুক্ত বাক্যাংশে, বা বাক্য-খণ্ডে, অথবা পর্বে, বিভক্ত হয় ; সাধারণতঃ প্রতি পর্বের অর্থ সম্পূর্ণ, এবং এক-নিঃশ্বাসে ইহা উচ্চার্য ; এইরূপ প্রত্যেক বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে মাত্র একটী করিয়া স্বরাঘাত পাওয়া যায় ; এই স্বরাঘাত বাক্য-খণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আদ্য অক্ষরের উপরই হইয়া থাকে, এবং বাক্য-খণ্ডের অন্তর্গত অন্য শব্দ তাহাদের নিজ-নিজ পৃথক্ স্বরাঘাত হারায়।

স্বরাঘাত বিশেষ প্রবল করিবার চেষ্টায়, কচিৎ অক্ষরস্থ স্বর-ধ্বনির পরের ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করা হয় ; যথা—‘কখনও না’—‘কক্‌খনও না (’কক্ষনো না) ; সবাই—’সব্বাই ; জলময়—জ’লম্ময় ’ ইত্যাদি।

[২.৪] বাক্যের সুর বা উদাত্তাদি স্বর (Pitch Accent, Musical Accent বা Intonation)

[২.৪১] পূর্বোক্ত বল বা স্বরাঘাত, বাক্য-উচ্চারণ-কালে অক্ষর-বিশেষের উপরে শক্তি-প্রয়োগের ফল। এইরূপ স্বরাঘাত ভিন্ন, ভাষার আর এক প্রকার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য আছে—কণ্ঠ-স্বরের উচ্চ বা নিম্ন গতিকে অবলম্বন করিয়া এই বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় আদি-আর্য অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায় এই-রূপ কথার সুর বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল—শব্দের

অক্ষর-বিশেষ, উঁচু বা বড় সুরে বলা হইত, অন্য অক্ষর নীচু সুরে বলা হইত। বৈদিক ভাষায় কণ্ঠ-স্বর সাধারণতঃ তিন প্রকারের উঁচু-নীচু সুরে ফিরিত—[১] উচ্চ স্বর বা আরোহী সুর—ইহার নাম ছিল **উদাত্ত স্বর** (High Pitch বা Rising Pitch), [২] নিম্ন স্বর—ইহার নাম ছিল **অনুদাত্ত স্বর** (Low Pitch), এবং [৩] উচ্চ হইতে নিম্নগামী সুর বা অবরোহী স্বর—ইহার নাম ছিল **স্বরিত স্বর** (Combined Rise and Fall)।

[২.৪২] বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকারের সুর বা উদাত্তাদি স্বর, অথবা কণ্ঠ-স্বরের উন্নয়ন ও অবনমন, সাধারণতঃ একক শব্দ বা অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া হয় না—কেবল মাত্র সমগ্র বাক্যেই সার্থক-ভাবে ব্যবহৃত হয়। বল বা ঝোঁকের বদলে সুর দিয়া যদি বাঙ্গালা শব্দ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে তাহা বড়ই হাস্যকর লাগিবে : «তুমি»—এই শব্দে «তু» এই অক্ষরের উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক না দিয়া, যদি এই অক্ষরকে উদাত্ত স্বরে বলা যায়—তাহা হইলে «তুমি» এইরূপ উঁচু হইতে নীচু সুরে উচ্চারণ ক'রলে, ঠিক বাঙ্গালার মত উচ্চারণ হয় না। সমগ্র বাক্যকে অবলম্বন করিয়া কিন্তু সুরের প্রয়োগ আছে; যেমন—সাধারণ অনুজ্ঞা-বাচক বাক্য, «তুমি যাবে»।—এখানে সুরের বৈচিত্র্য নাই; কিন্তু প্রশ্ন-সূচক বাক্য, «তুমি যাবে?»—এখানে «তুমি» শব্দটী উঁচু সুরে বলা হয়, «যাবে»-র «যা-» অক্ষর খুব নীচু সুরে বলা হয়, আবার «-বে» অক্ষরের বেলায় সুর বেশ উঁচুতে উঠে। চিত্রের দ্বারায় এই দুই বাক্যের সুর-সমাবেশ দেখাইতে পারা যায়—

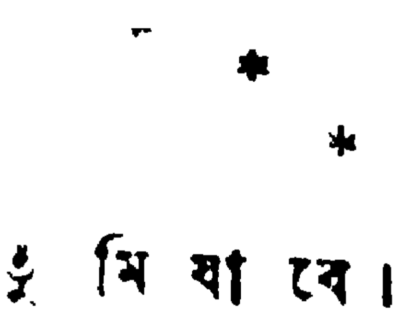

—এখানে «তু» হইতে আরম্ভ করিয়া সুরের ক্রমিক অবনমন।

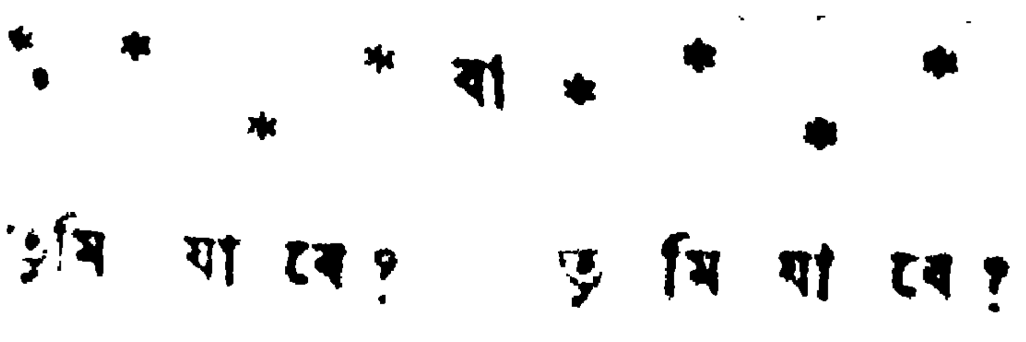

—এখানে «মি» হইতে «যা-»-তে অবনমন, পরে আবার «-বে»-তে উন্নয়ন।

সাধারণ বাক্য, প্রশ্ন-সূচক বাক্য, হর্ষ-বিস্ময়াদি-দ্যোতক বাক্য—এই বিবিধ প্রকারের বাক্য-সমূহে, বাক্য-গত উদাত্তাদি স্বর, একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয়। স্বর-অনুসারে বাক্য উচ্চারণ করার উপরে, অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ নির্ভর করে ; যথা—

* * * * * *

তো মার মা কি 'দে বেন ?

* * * * * *

তো মা র মা 'কি দে বেন ?

* * * * * *

তো মার 'মা 'কি দে বেন ?

* * * * * *

তো মার 'মা 'কি দে বেন ?

[২.৪৩] দুই-একটী অব্যয়-শব্দে সুর যোগ করিয়া, বাক্যের সুরের মত সার্থকতা আনা হয় ; যথা—অব্যয় শব্দ [হ্‌], ইহাকে « হুঁ » রূপে লেখা হয় ; সুর-অনুসারে ইহার অর্থ পরিবর্তিত হয় ; যথা—

« ´হুঁ »—উচ্চ হইতে উন্নীয়মান সুর = প্রশ্নে ;

« `হুঁ »—উচ্চ হইতে অবনীয়মান সুর = 'তা বটে' এই অর্থে ;

« ˎহুঁ »—নিম্ন হইতে অবনীয়মান ও প্রলম্বিত সুর = 'বেশ, দেখা যাবে', বা 'বটে, দেখে নেবো' এই অর্থে ;

« ˇহুঁ »—উচ্চ হইতে ঈষৎ অবনমন ও পুনরায় উন্নয়ন = 'বটে, কিন্তু—' এই অর্থে ;

« হুঁ (বা হুঁ—:)»—আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ = আপত্তি- বা বিরক্তি-বাচক।

তদ্রূপ, « হাঁ »—উচ্চ হইতে উন্নীয়মান = প্রশ্নে ;

« ¯হাঁ »—উচ্চ সমরেখ সুর = স্বীকারে ;

« হাঁ (বা হাঁ—:)»—আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ = অবাদরে।

[২.৫] যতিচ্ছেদ-বিধি (Punctuation)

[২.৫১] লিখিত ভাষা হইতেছে মুখ-নিঃসৃত কথিত ভাষার প্রতিরূপ। কথিত ভাষায় ঝোঁক ও সুরের দ্বারা, উচ্চারিত বাক্যের অর্থ বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন, কথোপকথনে বক্তার স্বল্প- বা দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী বিশ্রান্তিও বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করিতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ লেখায় ঝোঁক ও সুরের নির্দ্দেশ করা হয় না—কিন্তু প্রশ্ন এবং হর্ষ-বিস্ময়াদি বিশেষ ভাব, যেখানে কণ্ঠস্বর বা সুরের পরিবর্ত্তন সাতিশয় প্রবল, তাহা জানাইবার জন্য লেখায় দুই-একটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; এবং স্বল্প বা দীর্ঘ বিশ্রান্তিও, অর্থ-গ্রহণের সুবিধার জন্য, ছেদ-চিহ্ন-দ্বারা জানানো হয়।

[২.৫২] আজকাল বাঙ্গালা লেখায় নিম্নে-প্রদত্ত চিহ্নগুলি, যতি অথবা বাক্য-মধ্যে বিরাম প্রভৃতি জানাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই চিহ্ন-মধ্যে প্রায় সবগুলিই ইংরেজী হইতে গৃহীত। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে কেবল এক দাঁড়ি «।» ও দুই দাঁড়ি «॥» ব্যবহৃত হইত, অন্য কোনও ছেদের রেওয়াজ ছিল না। বাক্যস্থ শব্দাবলীর মধ্যেও সব সময়ে ফাঁক রাখিয়া লেখা হইত না, একটানা লিখিয়া যাওয়া হইত।

« মহাভারতের কথা—অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥ »—

এই পয়ারটী সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রূপেই লিখিত হইত :—

« মহাভারতেরকথাঅমৃতসমান।কাশীরামদাসকহেশুনেপুণ্যবান॥ »

[২.৫৩] আধুনিক বাঙ্গালা যতি-চিহ্ন—

« , »—কমা (Comma) বা পাদচ্ছেদ: পাঠ-কালে যেখানে স্বল্প বিশ্রাম আবশ্যক, সেখানে এই চিহ্ন দেওয়া হয়।

« ; »—**সেমিকোলন (Semi-colon) বা অর্ধচ্ছেদ** : যেখানে কমা অপেক্ষা একটু অধিক বিশ্রান্তি আবশ্যক, সেখানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

« : »—**কোলন (Colon) বা ছেদ-চিহ্ন** : অল্প বিশ্রান্তির পরেই, বিষয়ান্তরের অবতারণা জানাইবার জন্য, বা পূর্ব প্রস্তাবের পরিণতি- অথবা তাহার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্য, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

« । »—**দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ** : যেখানে একটী পূর্ণ বাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ হয়, সেখানে দাঁড়ি দেওয়া হয়। কবিতায় পয়ারাদি ছন্দে শ্লোক বা স্তবকের প্রথম ছত্রের শেষে দাঁড়ি বসানো হয়।

« ॥ »—**দুই দাঁড়ি** : ছন্দোবিশেষে যে ছত্রে অন্ত্যানুপ্রাসের পূর্তি থাকে, সেখানে ব্যবহৃত হয়।

« ? »—**প্রশ্ন-চিহ্ন** : যেখানে প্রশ্ন করা হয়, সেখানে বাক্য-শেষে এই চিহ্ন লেখা হইয়া থাকে। এই চিহ্ন-দর্শনে পাঠক স্বাভাবিক-ভাবে স্বর-ভঙ্গী-দ্বারা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করিয়া দিতে পারেন। [কোনও বক্তব্য বিষয়ে লেখকের কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, সন্দিগ্ধ শব্দের পূর্বে (বা পরে) বন্ধনীর মধ্যে (?) এই প্রশ্ন-সূচক চিহ্নও দেওয়া হয়।]

« ! »—**বিস্ময়- বা ভাব-দ্যোতক চিহ্ন** : বিস্ময়, আনন্দ, শোক, ভয় প্রভৃতি চিত্তের আবেগ প্রদর্শন করিবার জন্য, বাক্য-শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন করিতে হইলেও, যাহাকে সম্বোধন করা হইতেছে তাহার নামের বা তাহার উদ্দেশে ব্যবহৃত পদের পরে, এই চিহ্নও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

« — » —**ড্যাশ্ (Dash) বা বাক্য-সঙ্গতি-চিহ্ন** : বক্তব্যকে বিশদ করিবার জন্য, ব্যাখ্যাত করিবার জন্য, বা প্রসঙ্গের প্রতিষেধক কিছু উল্লেখ করিবার জন্য, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। আগে ও পিছনে দুইটী ড্যাশ্ দিয়া বাক্য-উদ্ধারক চিহ্নের কার্যও হয়।

« - »—**হাইফেন (Hyphen) অর্থাৎ পদ-সংযোগ বা শব্দ-বিশ্লেষ-চিহ্ন** : শব্দের অংশগুলি বিশ্লেষ করিয়া দেখাইবার জন্য, অথবা একাধিক পদ যেখানে মিলিয়া একটি শব্দ সৃষ্টি করে, সেখানে পদগুলির সংযোজন দেখাইবার জন্য, « - » হাইফেন ব্যবহৃত হয়।

« : — »— **কোলন-ড্যাশ্‌** : প্রসঙ্গের দৃষ্টান্তের অবতারণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

« ' ' », বা « " " »—**উদ্ধার-চিহ্ন** : অন্যের উক্ত বাক্য, অথবা কোনও বিশিষ্ট শব্দের প্রতি, পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রযুক্ত হয়।

« [ ], ( ), { } »—**ব্র্যাকেট (Brackets) বা বন্ধনী** : বক্তব্যের মধ্যে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা, কিংবা বিরোধী বা বিকল্পে কোনও উক্তি, অথবা শব্দান্তর, বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে লিখিয়া, বাক্যের প্রবাহ হইতে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানো হয়।

«... », « * * * * »—**বর্জন-চিহ্ন** : উক্তির মধ্যে কোনও শব্দ ও বাক্য বাদ দিলে, কিংবা অনুল্লিখিত রাখিলে, একাধিক বিন্দু বা তারকা-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

« ' »—**উপরে-লেখা কমা বা 'ইলেক'** : শব্দের কোনও অংশ বর্জিত হইলে, বর্জন-স্থানে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। অন্ত্য অ-কার উচ্চারিত হইলে, অনেকে এই চিহ্নও ব্যবহার করেন ; যথা—« যাবে ত' ? »।

যতিচ্ছেদ চিহ্ন ব্যতীত, অন্য বহু সংকেত-চিহ্ন আছে। সবগুলির উল্লেখ এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তবে নিম্নের এই কয়টী প্রয়োজনীয়।

« > »—**পরিণতি-দ্যোতক বা পরবর্তি-রূপ-দ্যোতক চিহ্ন** : ইহাকে « হইতে » বা « পরে » বলিয়া পড়া যাইতে পারে। « রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে » (« রাখিয়া » হইতে « রাইখ্যা », তাহা হইতে « রেখে » ; কিংবা, « রাখিয়া », পরে « রাইখ্যা », পরে « রেখে »)।

« < »—উৎপত্তি-দ্যোতক বা পূর্ববর্তি-রূপ-দ্যোতক চিহ্ন : « পূর্ব-রূপ », « পূর্বে », বা « তৎপূর্বে » বলিয়া পড়া যাইবে। « রেখে< রাইখ্যা < রাখিয়া »—(« রেখে »-র পূর্ব-রূপ « রাইখ্যা », তাহার পূর্ব-রূপ « রাখিয়া »; কিংবা, « রেখে », পূর্বে বা তৎপূর্বে « রাইখ্যা », তৎপূর্বে « রাখিয়া »)।

« √ »—ধাতু-দ্যোতক : « কর্ ধাতু= √কর্ »; তদ্রূপ « √খা, √দে, √নে, √বল্ »।

« = »—তুল্যতা-দ্যোতক। « তুল্য » বা « সমান », অথবা « মিলিয়া » বলিয়া পড়া যাইবে।

« +, −, ×, ÷ »—যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগ-দ্যোতক।

« * »—সম্ভাব্য মূল-রূপ-দ্যোতক চিহ্ন। আধুনিক কোনও শব্দের মূল বা পূর্বরূপ যাহা কোনও বইয়ে পাওয়া যায় না কিন্তু অনুমিত হয়, তাহা জানাইতে হইলে « * » চিহ্ন ইহার পূর্বে বসে; যেমন—« সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ > * সঞ্চ > বাঙ্গালা সাঁচা » (= সম্ভাব্যরূপ সঞ্চ)।

« /৭, ৭ »—আঁজি বা গণেশের আঁকড়ী—এটী একটী প্রাচীন চিহ্ন, দেবনাগরী গুরুমুখী প্রভৃতি বর্ণমালায়ও মিলে, অধুনা অনেকটা অপ্রচলিত। এই চিহ্ন দিয়া পত্রাদি আরম্ভ হইত—ইহা ওঁ-কারের (পরব্রহ্মের নাম-দ্যোতক শব্দের), অথবা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতীক (৭ = দেবনাগরীর १ = ১)। কাহারও-কাহারও মতে ইহা গণেশ-দেবতার প্রতীক, গণেশের চিত্র বা প্রতিমূর্তি-স্থলে গণেশের হস্তিমুণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ, « ৭ »; কিন্তু এই মত ঠিক মনে হয় না।

[২.৬] শীৎকার বা কাকু-ধ্বনি (Clicks)

[২.৬১] এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির আলোচনা হইয়াছে। এই-সকল ধ্বনির নির্দেশের জন্য বর্ণ আছে, এগুলির মিলনে শব্দ সৃষ্ট হয়। বর্ণাত্মক ধ্বনি

ব্যতিরেকে, এরূপ বহু ধ্বনি আছে, যেগুলি মানব-কণ্ঠে সম্ভবে না—মানব-কণ্ঠ-জাত ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ-দ্বারা সে-সব ধ্বনি লেখা সহজ-সাধ্য নহে ; যেমন বাঁশীর শব্দ, তবলার বোল, পাখীর ডাক, ঝরনার জল পড়ার শব্দ, রেল-গাড়ীর গতি-ধ্বনি ইত্যাদি। জগৎ জুড়িয়া এরূপ লক্ষ লক্ষ ধ্বনি বিদ্যমান। মানব-কণ্ঠে এগুলির অনুকরণের চেষ্টা হয় মাত্র। « পোঁ, ধিন্-তা-তা-ধিন্, টাগ্‌ডুমাডুম, কুউ, খটাখট্, ঝম্‌ঝম্ » প্রভৃতি নানা প্রকার **অনুকার-শব্দ** (Onomatopoetic Words) অন্যান্য ভাষার মত বাঙ্গালাতেও আছে, এবং বাঙ্গালায় এগুলির বিশেষ প্রয়োগ পাওয়া যায়।

[২ ২২] স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি ভিন্ন, মানব-কণ্ঠে আরও কতকগুলি ধ্বনি হয়, আমরা কথা-বার্তায় সেগুলি খুবই প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সেগুলিকে লেখায় প্রকাশ করিবার জন্য বর্ণ আমাদের বর্ণমালায় নাই। « অ আ, ক খ » প্রভৃতি বর্ণ-দ্বারা যে সমস্ত ধ্বনি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি উচ্চারণে, কণ্ঠ হইতে মুখবিবর ও নাসিকার পথে বায়ু বাহিরে নির্গত হয়। এগুলি ভিন্ন, বাহির হইতে বায়ু মুখবিবরে আকর্ষণ করিয়া কতকগুলি ধ্বনি আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি। সঙ্গে-সঙ্গে জিহ্বা, মুখের অভ্যন্তরে, তালুর সম্মুখ-ভাগ বা পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করে, এবং কণ্ঠের দিকে জিহ্বা আকষিত হয়। দুঃখ, বিস্ময়-আদি প্রকাশ করিতে, এই সকল ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার ধ্বনিকে **শীৎকার** বা **শীৎকৃত** বা **কাকু-ধ্বনি** বলা যায় ; এগুলির ইংরেজী নাম Click।

বাঙ্গালায় এই কয়টী শীৎকার-ধ্বনি মিলে—

১। **ওষ্ঠ্য শীৎকার-ধ্বনি** (Labial Click)—এটীকে সাধারণতঃ « চুমকুড়ি » বলে ; চুম্বন-কালে ওষ্ঠদ্বয়-পথে বায়ু মুখের ভিতর প্রবেশ-কালে এই ধ্বনি নির্গত হয়। পাখী পড়াইতে, ঘোড়া-গোরু থামাইতে বা টাগ্রা করিতে, এই ওষ্ঠ্য শীৎকার প্রযুক্ত হয়। এই ওষ্ঠ্য শীৎকার উচ্চারণ-কালে ঠোঁট দুইটী গোলাকার করিয়া করা হয় ; এই জন্য ইহাকে **বর্তুল ওষ্ঠ্য শীৎকার** (Rounded Labial Click) বলা যায়। এতদ্ভিন্ন, ঠোঁট দুইটীকে প্রসারিত করিয়া এক প্রকার ওষ্ঠ্য শীৎকার-ধ্বনি হয়—করুণা বা খেদ বা মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে প্রযুক্ত হয় ; ইহাকে **প্রসারিত ওষ্ঠ্য শীৎকার** (Spread Labial Click) বলা যায়। কেহ-কেহ এই ধ্বনিকে বাঙ্গালা লিপিতে « প্‌চ্ » এই-রূপে লিখিবার প্রয়াস করিয়াছেন।

২। **দন্ত্য শীৎকার** (Dental Click)—মুখ-বিবর-দ্বারা বায়ু আকর্ষ-

কালে, দন্তে বা দন্তমূলে জিহ্বা-দ্বারা পুনঃপুনঃ আঘাত করিলে, এই ধ্বনির উদ্ভব হয়। বিরক্তি, অসম্মতি ও অপ্রীতির ভাব প্রকাশ করিতে এই শীৎকার-ধ্বনির প্রয়োগ হয়; যেমন—হঠাৎ সাদা কাপড়ে কালি পড়িয়া গেলে, বা কেহ অপ্রত্যাশিত-ভাবে কোনও ভুল বা অন্যায় করিয়া ফেলিলে। ইংরেজীতে ইহাকে tut tut রূপে লেখা হয়। ওষ্ঠ বর্তুল বা প্রসারিত করিয়া ইহাকে উচ্চারণ করা হয়।

৩। **মূর্ধন্য শীৎকার** (Cerebral বা Retroflex Click)—জিহ্বাগ্র প্রতিবেষ্টিত করিয়া বা উল্টাইয়া এই ধ্বনির উচ্চারণ করা হয়। ঘোড়ার টপক্ বা দ্রুতগতিতে খুরের ধ্বনি জানাইবার জন্য, এই শীৎকার প্রযুক্ত হয়। ইহার উচ্চারণে ওষ্ঠাধর বর্তুলাকার বা প্রসারিত করা যায়।

৪। **তালব্য শীৎকার** (Palatal Click)—তালুতে জিহ্বার মধ্যভাগ-দ্বারা প্রহার করিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ঘোড়া গোরু ইত্যাদি চালাইতে বা দ্রুতগমনে উৎসাহিত করিতে, ইহার প্রয়োগ হয়। অন্য শীৎকার ধ্বনির ন্যায় এই ধ্বনিতেও ওষ্ঠদ্বয়ের আকুঞ্চন- ও প্রসারণ-অনুসারে দুই প্রকারের বৈশিষ্ট্য শোনা যায়।

এতদ্ভিন্ন, **কণ্ঠ্য** প্রভৃতি অন্য কয়েক রকমের শীৎকার-ধ্বনি আছে, সেগুলি কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে ব্যবহৃত হয় না। দক্ষিণ-আফ্রিকার বাণ্টু এবং বুশ্‌ম্যান ও হটেণ্টট গোষ্ঠীর কতকগুলি ভাষায় এই শীৎকার-ধ্বনিগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এবং ভাষায় অন্য ধ্বনির মত প্রযুক্ত হয়, আর পাঁচটা সাধারণ ধ্বনির সহিত মিশিয়া এগুলি শব্দে ব্যবহৃত হয়।

[২.৬৩] কেবল মাত্র বায়ু আকর্ষণ করিয়া, মুখের অভ্যন্তরে কোনও প্রকার সংস্পর্শ বা সংঘাত না করিয়া, আমরা অন্য দুই-একটী ধ্বনি প্রয়োগ করিয়া থাকি। গায়ে আলপিন ফুটিয়া গেলে, বা জ্বালা করিলে, আমরা ওষ্ঠদ্বয় বর্তুলাকার করিয়া হাওয়া টানিয়া লইয়া এক প্রকার ধ্বনি করিয়া থাকি; এবং ইহাকে এক প্রকার ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলা যায়; এবং খুব ঝাল লাগিলে, আমরা ল-কার উচ্চারণের মত জিহ্বাকে মাঝে রাখি, ও পাশ দিয়া হাওয়া টানিয়া লই—ইহা এক-প্রকার পার্শ্বিক ধ্বনি। কেবল এই প্রকারে হাওয়া টানিয়া লইয়া যে-সকল ধ্বনি হয়, সেগুলিকে Inverse বা **আশ্বসন জাত (উষ্ম)** ধ্বনি বলা যায়।

[২.৭] ধ্বনি-তত্ত্ব—ধ্বনি-সমূহের ক্রিয়া (Phonology—Behaviour of Sounds)

[২.৭১] বাঙ্গালা উচ্চারণের ও ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ রীতি

নিম্নে বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশেষ উচ্চারণ-রীতির আলোচনা করা যাইতেছে। সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা-ভাষার গতি সম্যক্-রূপে ধরিতে গেলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সকল শ্রেণীর (বিশেষতঃ অর্ধ-তৎসম ও বিদেশী) শব্দের পরিবর্তনের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, নিম্নে আলোচিত কয়েকটী উচ্চারণ-রীতির সম্যক্ প্রণিধান আবশ্যক।

[১] স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ; [২] শব্দের অন্তে, সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে স্বর-বর্ণ-যোজনা; [৩] স্বর-সঙ্গতি; [৪] অপিনিহিতি; [৫] অভিশ্রুতি; [৬] য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি; [৭] শব্দের অভ্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লোপ-বিষয়ে প্রবণতা।

[২.৭১১] [১] স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis বা Vowel Insertion)

উচ্চারণ-সৌকর্যার্থ, সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভাঙ্গিয়া উহাদের মধ্যে স্বর-ধ্বনি আনয়ন করাকে **স্বর-ভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** বলে। বিপ্রকর্ষ প্রাকৃত-যুগেও ছিল; যথা—সংস্কৃত «স্নেহ» হইতে প্রাকৃত তদ্ভব «ণেহ», প্রাকৃত অর্ধ-তৎসম «সিণেহ»; সংস্কৃত «রত্ন», প্রাকৃত তদ্ভব «রত্ত», প্রাকৃত অর্ধ-তৎসম «রতন, রদন, রয়ণ»; সংস্কৃত «পদ্ম», প্রাকৃত তদ্ভব «পোম্ম», অর্ধ-তৎসম «পদুম, পউম»। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই প্রকার স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষের রীতি সাতিশয় প্রবল ছিল। বাঙ্গালা কবিতার

ভাষায় এইরূপ বিপ্রকর্ষের বহুল প্রচার আছে—বিপ্রকর্ষ-জাত অর্ধ-তৎসম শব্দে কবিতার ভাষা ভরপুর। গ্রাম্য উচ্চারণেও বিপ্রকর্ষ-রীতি বিশেষ প্রবল; প্রায়ই সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে এই-রূপে ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়।

স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষে বিভিন্ন স্বর-বর্ণের আগম হয়।

অ-কারের আগম—« রত্ন—রতন; কর্ম ধর্ম মর্ম—করম, ধরম, মরম; চন্দ্র—চন্দর; সূর্য—সূরজ, ধৈর্য—ধৈরজ; চক্র—চক্কর (চলিত-ভাষায়); জন্ম—জনম; লুব্ধ—লুবধ; মুগ্ধ—মুগধ; ভক্তি—ভকতি; মূর্তি—মূরতি; পূর্ব—পূরব; গর্জে—গরজে; নির্মল—নিরমল; শুদ্ধ—শুবধ, তবধ।»; বিদেশী শব্দ—ফারসী «shahr শহ্‌র্—শহর [shŏhŏr]; zakhm জ়খ্‌ম্—জখম [jŏkhŏm]; sharm শর্ম্—সরম (শরম—'লজ্জা'); hazm হজ্‌ম্—হজম [hŏjŏm]; chashm চশ্‌ম্—চশম; mard মর্দ্—মরদ» ইত্যাদি; ইংরেজী « mutton=[mătn, মাট্‌ন্]—মটন; guard—গারদ »; ইত্যাদি।

ই-কার: « শ্রী—ছিরি; হর্ষ—হরিষ; বর্ষণ—বরিষণ; প্রীতি—পিরীতি, পিরীত; স্নান—সিনান; মিত্র—মিত্তির, ইন্দ্র—ইন্দির (চলিত-ভাষায়)» ইত্যাদি; ফারসী—« fikr ফিক্র্—ফিকির; zikr জ়িক্র্—জিকির, জিগির; nirkh নির্খ্—নিরিখ» ইত্যাদি; ইংরেজী film, clip—চলিত উচ্চারণে « ফিলিম্; কিলিপ্ »।

উ-কার: « দুর্যোগ—দুরুযোগ; পদ্মিনী—পদুমিনী; মুগ্ধ, লুব্ধ—মুগুধ, লুবুধ; রাজপুত্র—রাজপুত্তুর, শূদ্র—শূদ্দুর (চলিত ভাষায়); ভ্রূ—ভুরু; মুক্তা—মুকুতা; শুক্রবার—শুকুরবার (চলিত-ভাষায়)» ইত্যাদি; ফারসী—« burj বুর্জ্—বুরুজ; mulk মুল্‌ক্—মুলুক; Turk তুর্ক—তুরুক; quill কুফ্‌ল্>*কুল্‌ফ্—কুলুপ »; ইংরেজী « flute ফ্লুট্—ফুলুট, brush ব্রাশ্—বুরুশ, blue ব্লু—বুলু »।

এ-কার : « গ্রাম—গেরাম ; শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ » ; ফারসী « sirf সির্ফ—সেরেফ » ; পোর্তুগীস « prego প্রেগু—পেরেক » ; ইংরেজী « glass গ্লাস্—গেলাস » ।

ও-কার - « শ্লোক—শোলোক ; ফারসী murgh—মোরোগ, মোরগ » ।

বাঙ্গালায় ঋ-কার (অর্থাৎ 'রি') ব্যঞ্জন-বর্ণের পরে আসিলে (র-ফলা ও হ্রস্ব-ই যুক্ত) সংযুক্ত-বর্ণের মত উহা উচ্চারিত হয়—এখানেও বিপ্রকর্ষ দেখা যায় ; যথা—« তৃপ্ত—তিরপিত ; কৃপা—কিরিপা ; সৃজিল—সিরজিল» ইত্যাদি ।

[২.৭১২] [২] শব্দের অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরে স্বর-বর্ণ-যোজনা

বাঙ্গালা ভাষায় শব্দের অন্তে দুইটী ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে না ; হয় উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া লইয়া স্বর-বর্ণের আগম করিয়া বিপ্রকর্ষ করিতে হয়, না হয় উহাদের শেষে একটী স্বর-ধ্বনি যোগ করিতে হয়, তখন শেষের দুইটী ব্যঞ্জন এই স্বর-ধ্বনির উপর যেন ভর দিয়া দাঁড়ায় । « ধর্ম্, চন্দ্র্, সূর্য্ (dharm, chandr, suryy) » প্রভৃতি হিন্দীর মত উচ্চারণ, বাঙ্গালায় অজ্ঞাত ; হয় « ধর্ম, চন্দ্র, সূর্য (dhormo, chondro, shurjo) » না হয় « ধরম্, চন্দর্, সুরয্ » —ইহাই বাঙ্গালার রীতি । এই জন্য ইংরেজীর bench, desk, list, box, বা ফারসীর narm, garm, pasand, *shinākht* প্রভৃতি বাঙ্গালায় অন্ত্য স্বর-যোগে অথবা বিপ্রকর্ষ-দ্বারা দাঁড়াইয়াছে, « বেঞ্চি (benchi), ডেস্ক (deskо), বাক্স (baksho), লিষ্টি (lishti), নরম (norom), গরম (gorom), পছন্দ (pochhondo), শনাক্ত (shonakto) » ।

[২.৭১৩] [৩] স্বর-সঙ্গতি (Vowel Harmony)

কখনও-কখনও সাধু-ভাষায়, এবং বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায়, পরের বা পূর্বের স্বর-ধ্বনির প্রভাবে পদ-স্থিত অন্য অক্ষরের স্বর-ধ্বনির প্রকৃতি অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থান পরিবর্তিত হইয়া যায় । উচ্চারণ-গত এই বৈশিষ্ট্যকে বাঙ্গালা ভাষার স্বর-সঙ্গতি বলা যায় । এরূপ স্বর-সঙ্গতি সংস্কৃতে নাই,

কিন্তু তেলুগু, তুর্কী প্রভৃতি নানা ভাষায় আছে। অনেক স্থলে স্বর-সঙ্গতি পূর্ব-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় উচ্চারণের অনুরূপ নহে বলিয়া, এ সম্বন্ধে পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রগণের অবহিত হওয়া উচিত।

এই সকল পরিবর্তনের মূল কথা এই—'উচ্চ' স্বর-ধ্বনির প্রভাবে, 'নিম্ন' ও 'মধ্য' স্বর-ধ্বনি, এক ধাপ করিয়া উপরে উঠিয়া আসে, এবং তদনুরূপ 'নিম্ন' ও 'মধ্য' স্বরধ্বনির প্রভাবে 'উচ্চ' স্বর-ধ্বনি এক ধাপ নীচে নামিয়া আসে। (পূর্বে ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে উচ্চ-মধ্য-নিম্ন ও সম্মুখাবস্থিত-কেন্দ্রীয়-পশ্চাদবস্থিত-নির্বিশেষে স্বর-ধ্বনির পারস্পরিক সমাবেশ দ্রষ্টব্য।)

বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-সঙ্গতির উদাহরণ—

[ক] পরবর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি

[১] পরবর্তী syllable বা অক্ষরে « ই » বা « উ », বা « য-ফলা », কিংবা « জ্ঞ, ক্ষ (= গ্যঁ, খ্যঁ) » থাকিলে, পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ « ও » হইয়া যায় ; « ও »-তে উচ্চারণের এই পরিবর্তন কিন্তু বানানে ধরা হয় না, « অ »-ই লিখিত হইয়া থাকে ; যথা—« অতি [= ওতি], অমুক [ওমুক], বস্তু [বোস্তু], বন্ধুক [বোন্ধুক্], চলি [চোলি] (কিন্তু « চলে, চলা » প্রভৃতি রূপে অ-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে), চলুন [চোলুন], সমীর [শোমির], গন্ধুর [গোন্ধুর], কবুল [কোবুল], পথ্য [পোৎথ], হত্যা [হোৎত্যা], দৈবজ্ঞ [দোইবোগ্গ্যঁ], লক্ষ [লোক্খ] » ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে আদ্য অ-কার, 'না'-অর্থে শব্দের অংশ-রূপে যুক্ত হয়, সেখানে এই অ-কার, ও-কারে পরিবর্তিত হয় না ; যেমন—« অধীর, অসুখ, অন্যায়, অজ্ঞ, অক্ষম » ইত্যাদি (বিশেষণ-রূপে এগুলি কখনও [ওধীর্, ওশুখ্, ওন্যায়্, ওগ্গোঁ, ওক্খোম্] রূপে উচ্চারিত হয় না)।

[২] পরবর্তী syllable বা অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের ই-কার উচ্চারণে [এ] হইয়া যায় ; যথা—« গিল্ »

ধাতু—« গিল্+আ » > « গিলা » > « গেলা », « গিল্+এ » > « গিলে » > « গেলে »; কিন্তু « গিল্+ই » > « গিলি », « গিল্+উক্ » > « গিলুক্ »; তদ্রূপ « মিশ্ » ধাতু—« মেশে, মেশা; মিশি, মিশুক্ »; « লিখ্ » ধাতু—« লেখে; লিখি » ইত্যাদি। সংস্কৃত « দীপবর্তিকা » > প্রাকৃতে « দীববট্টিআ » > প্রাচীন-বাঙ্গালায় « « দীঅটী » > « দেঅটী, দেওটী » > « দেউটী » (অ-কারের প্রভাবে « দী » অক্ষরের ই-কার এ হইল, এবং পরে « টী »-এর ঈ-কারের প্রভাবে পূর্বের ও-কারের উ-তে উন্নয়ন—[৫] নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

[৩] পরবর্তী অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী উ-কারের উচ্চারণ « ও » হইয়া যায়; যেমন—« শুন্ » ধাতু : « শুন্+আ » > « শুনা » > « শোনা », « শুন্+এ » > « শুনে » > « শোনে », « শুন্+ও » > « শোনো », কিন্তু « শুন্+ই » > « শুনি », « শুন্+উক্ » > « শুনুক্ » ইত্যাদি। তদ্রূপ « দুহ্—দুহা > দোহা, দোয়া; দুহে > দোহে, দোয়; দুহি > দুই; দুহুক্ > দু'ক্ » ইত্যাদি।

[৪] পরবর্তী অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণ 'বাঁকা এ', অর্থাৎ [অ্যা], হইয়া যায়; কিন্তু পরে « ই, উ » থাকিলে, এ-কারের নিজস্ব উচ্চারণ অব্যাহত থাকে; যথা—« দেখ্ ধাতু—দেখ্+আ > দেখা [দ্যাখা], দেখ্+এ—দেখে [দ্যাখে], দেখ্+ও বা অ—দেখো, দেখ [দ্যাখো]; কিন্তু দেখ্+ই—দেখি, দেখ্+উক্—দেখুক্ »; « এক—[অ্যাক্], একা [অ্যাকা], একটা [অ্যাক্‌টা] », কিন্তু « একটী, একটু »-তে ই ও উ থাকায়, এ-র ধ্বনি অবিকৃত।

[৪ক] কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পরবর্তী অক্ষরে « ই » বা « উ » থাকিলে, পূর্বের এ-কারকে টানিয়া ই-কারের উচ্চারণে উন্নীত করা হয়; যেমন—« দে (ধাতু) » + « এ » — « দেএ, দেয় » — [দ্যায়]; « দে+

ও » > « দেও » > [দ্যাও], পরে « দাও » ; কিন্তু « দে + ই » > « দেই », পরে « দিই, দি' » ; « দেশী » > « দিশি » ; « দিয়াছিল > দিয়েছিল > দিয়িছিল, দিছিল > দিছ্‌ল » (শেষোক্ত উচ্চারণটী অতি আধুনিক ; 'দ্বিমাত্রিকতা'র ফল) ; « মেশামেশি > মেশামিশি » ; « গিয়াছি > গিয়েছি > গিইছি > গিছি ('গেছি' রূপও শোনা যায়) » ইত্যাদি।

[৫] পরবর্ত্তী অক্ষরে « আ, এ, ও, অ » থাকিলে, পূর্ববর্ত্তী ও-কারের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে ; কিন্তু « ই, উ » থাকিলে, ও-কার উ-কারে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« শো » ধাতু—« শো + আ > শোয়া ; শো + এ > শোএ, শোয় ; শো + ও > শোও ; কিন্তু শো + ই > শোই > শুই, শো + উক্ > শোউক্ > শুউক্ > শু'ক্ » ; « ঘোড়া + স্ত্রী-প্রত্যয় -ঈ » > « ঘোড়ী » -স্থলে « ঘুড়ী » ; « গোলা + ক্ষুদ্রত্ববাচক প্রত্যয় -ই » > « গোলা » -স্থলে « গুলি » ; তদ্রূপ—« পোথা—পুথী, ছোঁড়া—ছুঁড়ী, নোড়া—নুড়ী » ; « পুরোহিত > পুরোইত > পুরুইত > পুরুৎ » ; « আমোদ + ইয়া > আমোদিয়া > আমুদে' » ; « নিয়োগী > নেওগী > নেউগী » (কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত উচ্চারণে) ইত্যাদি। পরে য-ফলা থাকিলে, এই য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের প্রভাবে আগের অক্ষরের ও-কার-ও উ-কারে পরিবর্তিত হয়—বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায় ; যথা—« যোগ্য—যোগ্‌ইয় > যুগ্যি [জুগ্‌গি] ; পোষ্য > পোষ্‌ইয় > পুষ্যি [পুশ্‌শি] » ইত্যাদি।

[৬] তিন বা তিনের অধিক অক্ষরের শব্দে যদি শেষে « ই, ঈ » থাকে, তাহা হইলে পদ-মধ্যস্থিত « অ » বা « আ », « উ »-তে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« এখন + ই > এখনি > এখুনি ; আঠ-পহরিয়া > আট-পউরে' ; উড়ানী > উড়োনী > উড়ুনি ; কুড়ানী > কুড়ুন ; সংস্কৃত ছাদনিকা > প্রাকৃত ছাঅনিআ > ছাঅনী > ছাউনী ; ঠাকুরাণী > ঠাকুরোণী > ঠাকরুইন্ > ঠাকরুন ; প্রাচীন বাঙ্গালা তেন্তলী > পূর্ব-বঙ্গে তেন্তুইল্, চলিত-ভাষায় তেঁতুল ; দীপবর্তিকা > দীবঅট্টিআ > দীঅটী > দেঅটী.

দেওটী, দেউটী ; নখহরণিকা > নহহরণিআ > নহরণী > নরুন ; পিঠালী > পিঠোলী > পিঠুলী ; শেফালিকা > শেহালিআ > শেহালী > শিউলি ; চাকর + ভাবে-ঈ > চাকুরী ; বাদল + ক্ষুদ্রার্থে -ঈ > বাদুলী ; নাটক + -ইয়া > নাটকিয়া > নাটুকে' ; নগর, শহর + -ইয়া > নগরিয়া, শহরিয়া > নগুরে', শহুরে' » ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

[খ] পূর্ববর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি

[১] শব্দ-মধ্যে প্রথমে ই থাকিলে, শেষ অক্ষরের আ-কার ই-কারের প্রভাবে এ-কারের উচ্চারণ-স্থানে আকৃষ্ট হইয়া, এ-তে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« ইচ্ছা—ইচ্ছে ; মিথ্যা—মিথ্যে ; মিছা—মিছে ; ভিক্ষা—ভিক্ষে ; পিসা—পিসে ; মিঠা—মিঠে ; আজিকার, কালিকার>আজকের, কালকের ; দিলাম—দিলেম ; ছিলাম—ছিলেম ; করিতাম—করিতেম, ক'রতেম ; করিনা—করিনে ; পরিষ্কার—(*পইর্‌ষ্কার—*পইষ্কার)—[প'ষ্কের্‌, পোশ্‌কের্‌] (কলিকাতার গ্রাম্য উচ্চারণে) ; হিসাব—হিসেব ; খরীদার—(*খইর্‌দার—*খইদ্দার)—খ'দ্দের [খোদ্দের্‌] ; বুনিয়াদ—বোনেদ ; বিলাত —বিলেত ; পিপা—পিপে ; ফিতা—ফিতে » ইত্যাদি ।

[২] আগে উ-কার বা উ-কার থাকিলে, শেষের « আ » ও-কার হইয়া যায় ; যথা —« পূজা—পূজো ; তুলা—তুলো ; রূপা—রূপো ; মূলা—মূলো ; ধুলা—ধুলো ; খুড়া—খুড়ো ; চূড়া—চূড়ো ; শুখা—শুখো ; দুয়ার—দুয়োর —দোর ; শূয়ার—শূয়োর—শোর ; জুআ—জুও—জো ; হুঁকা—হুঁকো ; মুসলমান নামে 'উল্লা(হ্‌)', পশ্চিম-বঙ্গে বহু স্থলে 'উল্লো'—বাহাউল্লাহ্‌—বাহুল্য (= বাহুল্লো) » ইত্যাদি ।

দ্রষ্টব্য—কলিকাতা-অঞ্চলের ভাষায় প্রচলিত উচ্চারণে « টা—টো—টে » লক্ষণীয় :—« একটা—একটী ; (দুইটা—দু'টা—) দুটো ; (তিনিটা—'তিন্‌টা—) তিন্‌টে ; (চারিটা—চাইর্‌টা—) চারটে » ।

[৩] দুই অক্ষরের শব্দে, দ্বিতীয় অক্ষরে অ-কার থাকিলে, চলিত-ভাষায় সাধারণতঃ এই «অ» পূর্ণ ও-কার রূপে, বা ঈষৎ ও-কারবৎ উচ্চারিত হয়; যথা—«রতন, কম্বল, গরব, অর্জন, সকল, বরণ, বর্জন, ভারত, কাঁদন, মঙ্গল, নিয়ম, বিষম, সুজন, পূরণ, বৃহৎ, বেদন, কৈতব, মোহন, গোবর, লোটন, সৌরভ, গৌরব; ডজন, বোতল, মোরগ, ডবল, গজল, নম্বর, মোটর (=মটোর)» ইত্যাদি।

[২.৭১৪] [৪] অপিনিহিতি (Epenthesis)

শব্দের মধ্যে «ই» বা «উ» থাকিলে, সেই «ই» বা «উ»-কে আগে হইতেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতি বাঙ্গালার একটী বৈশিষ্ট্য। এই রীতির নাম-করণ হইয়াছে অপিনিহিতি। এই রীতি বাঙ্গালা ভাষায় মধ্য-যুগ হইতেই (চতুর্দশ শতক হইতেই) বিশেষ প্রবল-ভাবে দেখা যায়। য-ফলায় যে ই-ধ্বনি আছে, তাহাও প্রকট ই-কার হইয়া, এই রীতি-অনুসারে পূর্বে আইসে। অপিনিহিতি এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিল, এখন পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় ইহা প্রায় অবিকৃত-ভাবেই সংরক্ষিত আছে। পশ্চিম-বঙ্গের ভাষায়—কথোপকথনের চলিত-ভাষায় তথা সাধু-ভাষার শিষ্ট উচ্চারণে—অপিনিহিতি এখন আর শোনা যায় না; হয় অপিনিহিত «ই» বা «উ» লুপ্ত হইয়াছে, না হয় এই «ই» ও «উ»-কে অবলম্বন করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে আর একটী নূতন উচ্চারণ-রীতি, অভিশ্রুতি, আসিয়া গিয়াছে (অভিশ্রুতি-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য)।

অপিনিহিতি সাধু-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত—ই-কারের অপিনিহিতি: «রাখিয়া=রাখ্-ই-য়া > রাইখ্-ই-য়া (খ-এর পরে অবস্থিত ই-কারের আগেই খ-এর উচ্চারণ) > রাইখ্যা (পুরাতন-বাঙ্গালায় ও আধুনিক পূর্ব-বঙ্গে) > রেখ্যা, রেখ্যে > রেখে»; «আলিপনা

> আইল্‌পনা > আ'লপনা » ; « কাল+ইআ=কালিয়া > কাইলিয়া> কাইল্যা>কেলে » ; « আজি, কালি>আইজ্‌, কাইল্‌>আ'জ, কা'ল » ; « রাতি > রাইত > রা'ত, রাইতের বেলা=(কলিকাতা-অঞ্চলে) রেতের বেলা » ; « গাঁঠি > গাঁইঠ্‌ > গাঁঠ, গাঁইঠের কড়ি=গেঁঠের কড়ি » ; « জালিয়া > জাইল্যা > জেলে » ইত্যাদি।

উ-কারের অপিনিহিতি : অপিনিহিত উ-কার সাধারণতঃ পরে ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া যায় : « সাথ্‌+উয়া>সাথুয়া>সাউথুআ> সাইথুআ>সেথো » ; « জলুয়া>জউলুয়া>জইলুয়া>জ'লো [জোলো] » ; « দদ্রূ>প্রাকৃত দদ্দূ>দাদু>দাউদ>দা'দ » ; « সাধু>সাউধ>সাইধ্‌— সাধুয়ের > সাউধের > সাইধের > সেধের » ; « মাঝুয়া > মাউঝুয়া > মাইঝুয়া > মেঝো, মেজো » ইত্যাদি।

য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি এখন পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে বিশেষ-রূপে বিদ্যমান : « সত্য, কন্যা, কাব্য, যোগ্য, কার্য বা কার্য্য », অর্থাৎ [সৎতিয়, কন্‌নিয়া, কাব্‌বিয়, যোগ্‌গিয়, কার্‌ইয় বা কার্‌জিয়], পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে [শইত্ত, কইন্না, কাইব্ব, জোইগ্গ, কাইর্জ]। সংযুক্ত বর্ণদ্বয় « ক্ষ, জ্ঞ » উচ্চারণে [খ্য, গ্যঁ] বলিয়া, ইহাদের বেলায়-ও ই-কারের অপিনিহিতি হয় : « লক্ষ=লখ্য [লইক্‌খ] ; যজ্ঞ=জগ্যঁ [জইগ্গঁ] »।

দ্রষ্টব্য—« ব্রাহ্ম » শব্দ কলিকাতার উচ্চারণে [ব্রাম্‌হো] অথবা [ব্রাম্‌মো] (ঠিক যেন « ব্রাম্য »), কিন্তু য-ফলা-যুক্ত শব্দ-অনুমানে, পূর্ব-বঙ্গে অপিনিহিতি-যুক্ত রূপ [ব্রাইম্ম] শোনা যায়।

☞ অপিনিহিতি ঠিক ই-কার বা উ-কারের আগম নহে— অনেকাক্ষর শব্দে এই স্বর-বর্ণ যথাস্থানেই থাকে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব হইতেই যেন ইহার আবাহন ঘটিয়া, অধিকন্তু পূর্বের অক্ষরে ই-কার বা উ-কারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একাক্ষর শব্দে এই স্বর-বর্ণের স্বস্থান হইতে পূর্বে আনয়ন ঘটে।

[২.৭১৩] [৩] অভিশ্রুতি (Umlaut, Vowel Mutation)

« ই » এবং « উ » (বা « উ » হইতে জাত « ই »), অপিনিহিত হইলে পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এখনও অব্যাহত থাকে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে (বিশেষতঃ চলিত-ভাষায়) এই « ই » ধ্বনি, একাক্ষর শব্দে সাধারণতঃ লোপ পাইয়া থাকে, এবং একাধিক অক্ষরময় শব্দে পূর্ব-স্থিত স্বর-ধ্বনিকে প্রভাবান্বিত করিয়া, উহাকে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। এই-রূপ পরিবর্তনকে এক প্রকার 'আভ্যন্তর সন্ধি' বলা যাইতে পারে; যেমন—সাধু-ভাষার « রাখিয়া » শব্দ : এই রূপটী ছিল প্রাচীন বাঙ্গালায়; অপিনিহিতির ফলে « রাখিয়া » হইল « রাইখিয়া », পরে « রাইখ্যা »—« রাইখ্যা » পূর্ব-বঙ্গে এখন প্রচলিত, প্রাচীন কালে পশ্চিম-বঙ্গেও প্রচলিত ছিল; পরে পশ্চিম-বঙ্গে « আ+ই »-র সন্ধি হইয়া « রেখ্যা, রেখ্যে » রূপের মধ্য দিয়া « রেখে » রূপে, « রাখিয়া » পদের শেষ পরিণতি দাঁড়াইল। « রাখিয়া » > « রাইখ্যা » (অপিনিহিতি) > « রেখে » (অভিশ্রুতি)। « আ+ই+আ »—এইরূপ স্বর-সমাবেশ, সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল « এ+এ »-তে : এই প্রকার অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে, পূর্ব-স্থিত স্বরের পরিবর্তন অথবা পূর্ব-স্থিত স্বর-বর্ণের নব-রূপ-ধারণকে অভিশ্রুতি নাম দেওয়া হইয়াছে।

অভিশ্রুতি নানা ভাষায় দেখা যায়। ইংরেজী, ও ইংরেজীর সহিত সম্পৃক্ত জার্মান, সুইডীয়, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলি ভাষাতে মিলে। প্রাচীনতম ইংরেজী যুগে man (mann) শব্দের বহুবচন ছিল *mann-iz, পরে *mann-i ; এই শব্দের বিকারে, বহুবচনে menn (men) রূপ দাঁড়াইয়াছে ; অপিনিহিত i বা ই-কারের প্রভাবে, a বা আ-কারের e বা এ কারে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। Franc « ফ্রাঙ্ক » বা ফ্রান্স-দেশের অধিবাসী জাতি-বিশেষ—ইহা হইতে -isc প্রত্যয়-যোগে সৃষ্ট, প্রাচীনতম ইংরেজীতে বিশেষণ শব্দ ছিল Franc-isc ; এখানেও অভিশ্রুতির ফলে, a ধ্বনি i-ধ্বনির প্রভাবে পড়িয়া e হইয়া গেল, শব্দটী দাঁড়াইল Frencsc, পরে Frensh ও French। এই অভিশ্রুতির

ফলে man—men, France—French-এর মত, mouse—mice, sat—set, food—feed প্রভৃতি শব্দে স্বরবর্ণের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। ইংরেজীর এই সব পরিবর্তন, বাঙ্গালার « রাখ—রেখ্-, কর—কোর্-, হার—হের্-, খা—খে- » -র অনুরূপ।

বাঙ্গালা চলিত-ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি। এই রীতি-অনুসারে সৃষ্ট বহু শব্দ ও পদ, চলিত-ভাষা হইতে এখন অল্পে-অল্পে সাধু-ভাষাতেও গৃহীত হইতেছে; যথা—সাধু-ভাষার অনুমোদিত রূপ « থাকিয়া, ছানিয়া, মাইয়া, চাহিয়া » স্থলে « থেকে, ছেনে, মেয়ে, চেয়ে » ইত্যাদি।

সাধু-ভাষার প্রভাবে বহু স্থলে অপিনিহিত ই-কারের লোপ হয়, অভিশ্রুতি পুরাপুরি হয় না; যথা—« আজি কালি > আইজ্ কাইল্ > আ'জ কা'ল, > আজ কাল » (অভিশ্রুতি হইলে « এজ্ কেল্ » হওয়া উচিত ছিল, পশ্চিম-বঙ্গে কোথাও-কোথাও গ্রাম্য উচ্চারণে এই রূপ বিদ্যমান ছিল); « চারি > চাইর > চা'র, চার » (কিন্তু « চাইরের পাঁচ = চেরের পাঁচ »—এখানে এ-কার পাওয়া যায়); « সাধু > সাউধ > সাইধ > সা'ধ » কিন্তু « পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের = সাইধের »—এই প্রবাদে এ-কার দৃষ্ট হয়); « (সংস্কৃত) গ্রন্থি > (প্রাকৃত) গণ্ঠি > (প্রাচীন বাঙ্গালা) গাঁঠি > গাঁইঠ > গাঁ'ঠ, গাঁঠ, গাঁট (গাঁইঠের কড়ি > গেঁটের কড়ি) »; « চাউল > চাইল > চা'ল, চাল (কিন্তু চাইলের হাঁড়ি > চেলের হাঁড়ি) »; « রাখিল- > রাইখ্‌ল, রাইখ্‌লে > রাখ্‌লো, রা'খ্‌লে »; « চলিল > চইল্‌ল > চ'ল্‌ল » ([চোল্‌:লা]—এখানে অভিশ্রুতির ফল, চ-এর অ-কারের ও-কারে পরিবর্তিত হওন)। আ-কারের পরে অপিনিহিত ই-লোপ হইলেও, ই-এর সংস্পর্শে আ-কারের উচ্চারণ বঙ্গদেশের বহু স্থলে তালব্য বা সম্মুখাবস্থিত [আ'] হইয়া যায় (৪৩ পৃষ্ঠা)।

অভিশ্রুতির উদাহরণ

[১] « অ+ই+অ » > « অ' = ও+ও »: « চলিল > *চইল্‌ল > চ'ল্‌ল = [চোল্‌লো]; নড়িল > নইড়্‌ল > ন'ড়্‌ল [নোড়্‌লো]; বলিব > বইল্‌ব > ব'ল্‌ব, ব'ল্‌বো [বোল্‌বো]; ধরিব > ধ'র্‌বো; ত্য = সংতিয় > (উচ্চারণে) [শোত্তো]; লক্ষ = লখ্য—লক্‌খিয় > উচ্চারণে) [লোক্‌খো] » ইত্যাদি।

[২] « অ+ই+আ, বা এ » > « অ'=ও+এ » : « চলিয়া > চইল্যা > চ'লে=[চোলে]; করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে—[কোরে]; করিবা > কইর্‌বা > ক'র্‌বে [কোর্‌বে]; ধরিলে > ধইর্‌লে > ধ'রলে [ধোর্‌লে]; অভ্যাস=অব্‌ভিয়াস্ > 'অভ্যেস' (উচ্চারণে) [ওব্‌ভেশ্]; পরিষ্কার > *পইর্‌স্কার, *পইস্কার > [পোস্কের্] (কলিকাতার গ্রাম্য উচ্চারণ) » ইত্যাদি।

[৩] « আ+ই+অ, বা ও » > « এ+ও » : « (সংস্কৃত) অবিধবা > (প্রাকৃত) অবিহবা > (অপভ্রংশ) অইহব > (পুরাতন-বাঙ্গালা আইহ) > আইঅ, আয়া > এও, এয়ো; রাখিহ > রাখিঅ, রাখিও > রাইখ্যো > রেখো; খাইহ > খেয়ো, খেও »। সাধু-ভাষার প্রভাবে, « বাসিল > বাস্‌ল, নাচিব > নাচ্‌ব » প্রভৃতি স্থলে আ-কার সংরক্ষিত হইয়াছে।

[৪] « আ+ই+আ » > « এ+এ » : « রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে; আসিয়া > আইস্যা > এসে; বাছিয়া > বেছে; পানিহাটী > *পাইন্‌হাটী, *পাইনাটী > পেনেটী; কাঁদিহাটী > কেঁদেটী » ইত্যাদি « রাখিলা > রাখ্‌লে »—এইরূপ ক্ষেত্রে সাধু-ভাষার প্রভাবে আ-কার রক্ষিত হইয়াছে।

[৫] « অ, আ, ই, উ, এ, বা ও+আই+আ » > যথাক্রমে « অ'= ও, আ, ই, উ, ই, উ+ই+এ » : « বলাইয়া > ব'লিয়ে [বোলিয়ে]; নাচাইয়া > নাচিয়ে'; ডিঙ্গাইয়া > ডিঙিয়ে'; শুখাইয়া > শুখিয়ে'; দেওয়াইয়া (=দেআইয়া) > দিইয়ে'; শোয়াইয়া > শুইয়ে' »।

[৬] « অ+ইআ+ই » > « অ'—ও+এ+ই » : « করিয়াছি > ক'রেছি [কোরেচি]; বসিয়াছিল > ব'সেছিল »।

[৭] « অ, আ, আই, ই, উ, এ, ও+অ+ইআ » > যথাক্রমে « অ'—ও, আ, এ, ই, উ, ই, উ+উ+এ » : « নগরিয়া > ন'গুরে, নগুরে [নোগুরে]; শহরিয়া > শহুরে'; চন্দ্র=চন্দর, চন্দরিয়া > চন্দুরে'

[চোন্দুরে]; কান্দনিয়া > কাঁদুনে'; বাইগণিয়া > বেগুনে'; শিখনিয়া > শিখুনে'; জুড়নিয়া > জুড়ুনে'; দেঅনিয়া > দিউনে; কোন্দলিয়া > কুঁদুলে' »।

[৮] « অ+উ+আ » > « অ'=ও+ও »: « জলুয়া > জ'লো [জোলো]; পটুয়া > প'টো [পোটো] » ইত্যাদি।

[৯] « আ+উ+আ » > « এ+ও »: « সাথুয়া > সাউথুআ > সাইথুআ > সেথো; গাছুয়া > গেছো; মাছুয়া > মেছো; তারা > তারুয়া (অনাদরে) > তেরো; চারু > চারুআ (অনাদরে) > চেরো; মাধব=মাধু+আ (অনাদরে) > মেধো » ইত্যাদি।

দেখা যাইতেছে যে, চলিত-ভাষায় অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী অ-কার ও-কার হইয়া যায়, আ-কার এ-কার হইয়া যায়, এবং অপিনিহিত ই-কারের-ও লোপ হয়। অভিশ্রুতির ফলে সৃষ্ট চলিত-ভাষার এই সব রূপে, যেখানে অ-কার ও-কার হইয়া গিয়াছে, সেখানে লুপ্ত ই-কারের চিহ্ন-স্বরূপ [']-চিহ্নকে পরিবর্তিত অক্ষরের শীর্ষদেশে বসাইয়া বর্ণ-বিন্যাস করাই বাঙ্গালা ধ্বনির ইতিহাসের অনুযায়ী হইবে; যেমন—« চলিয়া > চইল্যা, চ'ল্যা > চ'লে » (« চোলে, চলে' » বা শুধু « চলে » নহে)। « রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে' »; এখানে [']-চিহ্ন না দিলে-ও চলে।

দ্রষ্টব্য :—স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির কার্যের ফলে, সাধু-ভাষার আদর্শ হইতে, অর্থাৎ ৪।৫ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার আদর্শ হইতে, উচ্চারণ-বিষয়ে চলিত বাঙ্গালা (বিশেষতঃ কলিকাতা-অঞ্চলে) বিশেষ-ভাবে বিচ্যুত হইয়াছে। চলিত-ভাষা লিখিবার সময়ে, অনেক ক্ষেত্রে সাধু বাঙ্গালার প্রভাব কার্যকর হয়, চলিত-ভাষায় কলিকাতা অঞ্চলের বিকৃত মৌখিক রূপ সব সময়ে লেখা হয় না—বহু ক্ষেত্রে সাধু ও মৌখিক বা চলিত, এই দুইয়ের মাঝামাঝি রূপ লিখিত হয়। আবার অনেক স্থলে, চলিত-ভাষার বা কলিকাতার মৌখিক ভাষার রূপের প্রভাবে, সাধু-ভাষার পদ-ও বিকৃত হইয়া যায়

ফলে চলিত-বাঙ্গালায় একই পদের একাধিক রূপ দেখা যায়, যেমন—সাধু-ভাষায় রূপ « দৌড়াইতেছে », কলিকাতার মৌখিক ভাষার রূপ « দৌড়ুচ্চে » ; ইহাদের পরস্পরের প্রভাবে « দৌড়াচ্ছে, দৌড়োচ্ছে, দৌড়চ্ছে » প্রভৃতি রূপও অনেকে লেখেন। তদ্রূপ—« শিখাইতাম—শিখুতুম, শিখাতাম, শিখাতেম, শিখোতুম, শিখাতুম » প্রভৃতি। পরে ক্রিয়া-পদের চলিত-রূপ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

[২.৭১৩] [৩] য়-শ্রুতি ও (অন্তঃস্থ-)ব-শ্রুতি (Insertion of Euphonic Glides—« y » and « w »)

বাঙ্গালায় শব্দের অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটী স্বর-ধ্বনি থাকিলে, যদি এই দুইটী স্বর মিলিয়া একটী যৌগিক স্বরে বা সন্ধ্যক্ষরে পরিণত না হয়, তাহা হইলে এই দুইটী স্বরের মধ্যে Hiatus বা ব্যঞ্জনের অভাব-জনিত ফাঁকটুকুতে, উচ্চারণ-সৌকর্যার্থ অন্তঃস্থ য (y) বা অন্তঃস্থ ব (w = ওয়, ও)-এর আগম হয়। Euphony বা শ্রুতিসুখকরত্বের জন্য এই অপ্রধান ব্যঞ্জন-ধ্বনির আগমকে (ইংরেজীতে এইরূপ ধ্বনিকে Glide বলে) য়-শ্রুতি ও ব়-শ্রুতি (অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি) বলা হয়। « মা আমার »—এই বাক্যাংশটীতে, দুইটী পদ পাশাপাশি বসায় দুইটী আ-কার পর-পর আসিয়াছে ; সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মুখে এখানে য়-শ্রুতি হয়—« মা-য়্-আমার »। বাঙ্গালায় গান করিবার কালে, এই শ্রুত্যাগম বিশেষ-ভাবে কর্ণগোচর হয় ; যথা—« সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চ'খের জলে = [সকলো-য়্-অহঙ্কারো হে-য়্-আমার] » ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি য়-বর্ণ-দ্বারা নির্দিষ্ট হয় ; ব-শ্রুতি-সম্বন্ধে কিন্তু লিখন-বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা উদাসীন—« ওয়, ও, বা য় » এই তিনটীই ব্যবহৃত হয় ; যথা—« রাখিআ—রাখিয়া ; খাআ—খাওয়া ; (সংস্কৃত) শূকর—(মাগধী প্রাকৃত) শূঅর—(বাঙ্গালা) শূওর, শূয়র = [ŝuwor] ; ধোআ—ধোওয়া [dhowa] ; মোআ—মোয়া [mowa] ; মালপুআ—মালপুয়া [puwa] ; পিআনো (piano)—পিয়ানো ; নাহা—নাআ—নাওয়া [nawa] ; কেআরী—কেয়ারী ; কেঅড়া—কেওড়া »। য়-কার ও ব-কারের অদল-বদলও দেখা যায় ; যথা—দেআল [deal]—দেওয়াল [dewal], দেয়াল [deyal] ; ছায়া [chaya]—ছাওয়া [chawa]।

[২.৭১৭] [৭] শব্দের অভ্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লোপ-প্রবণতা (Tendency to drop Internal « r » and « h »)

বাঙ্গালা উচ্চারণের ইহা আর একটী বৈশিষ্ট্য। বহু সংস্কৃত ও বিদেশী এবং প্রাকৃত-জ শব্দ এই বৈশিষ্ট্যের ফলে বাঙ্গালায় রূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছে। শব্দের অভ্যন্তরে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে র-কার (রেফ) থাকিলে, সেই রেফ চলিত-বাঙ্গালা উচ্চারণে বহু স্থলে লুপ্ত হয়; এবং দুই স্বরের মধ্যাবস্থিত হ-কার-ও সহজেই লুপ্ত হইয়া যায়। অন্ত্য হ-কার-ও লোপ-প্রবণ বর্ণ: যথা—

[১] র-এর লোপ: « করিতে > ক'র্‌তে > ক'ত্তে [কোত্তে]; তর্ক > তক্ক; ধর্ম > ধম্ম; অর্ধ > অদ্ধ; সূর্য > সুজ্জি; ক'র্‌ছি > কচ্ছি; মারিল—মার্‌ল, মার্‌লে > [মাল্‌লে]; করিলাম—ক'র্‌লাম, ক'র্‌লুম > ক'ল্লাম, ক'ল্লুম; (ফারসী) শীরীনী > শির্‌নী > শিন্নী; গৃহিণী > গির্‌হিণী > গির্‌নী > গিন্নী; নৃত্য > নের্ত > নেত্ত; চর্ব্য > [চোব্বো, চব্ব] » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-পদে, ব-য়ের পূর্বস্থিত র-কারের লোপ হয় না; যথা—« করিবার > কর্‌বার ('কব্বার' নহে); ধরিবার > ধর্‌বার; হারিবে > হার্‌বে »। কতকগুলি বিদেশী শব্দে র-লোপ হয় না; যথা—« সর্‌কার, দর্‌বার (কিন্তু সর্‌দার > সদ্দার); কুর্‌নিশ; সার্‌কুলার (কিন্তু 'রিপোর্ট'-স্থলে 'রিপোট' শুনা যায়), চার্জ, পার্‌-সেন্ট » ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দে র-লোপ করা না-করা, বক্তার শিক্ষার উপরে নির্ভর করে; সংস্কৃত ও অন্য শব্দের বানানে এই জন্য র-লোপ করা হয় না।

[২] হ-লোপ: « ফলাহার > *ফলাআর > ফলার; পুরোহিত > *পুরুইত > পুরুত; গাহিলাম > গাইলাম; কহে > কয়; চাহে > চায়; সিপাহী > সেপাই; সুরহী > সোরাই; মহোৎসব > মোচ্ছব; মহার্ঘ্য

> মাগ্নি (র ও হ—উভয়ের লোপ); পন্নরহ—পনের; সাধু > সাহু > সাহ > সাহা বা সা; (আরবী > ফারসী) আল্লাহ্—আল্লা; আলাহিদা > আলাদা; শাহ্ > শা, শাহা »।

হ-কার-লোপ-বিষয়ে প্রবণতার ফলে, সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার রূপের মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে; যথা—« দুহে—দোয়; গাহে—গায়; গাহিল—গাইল, গাইলে; চাহিবে—চাইবে; নাহিয়াছিল —নাইয়াছিল > নেয়েছিল; কহে—কয়; বহা—বওয়া » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—« বধূ > বহু > বউ, বৌ; মধু > মহু > মউ, মৌ; দধি > দহি > দই, দৈ » ইত্যাদি।

মন্তব্য—পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় সাধারণ বাঙ্গালা হ-কার, কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট-ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় (৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); এই হ-কার-জাত কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট-ধ্বনি লুপ্ত হয় না, ইহা সাধারণতঃ শব্দের মধ্য হইতে শব্দের আদ্য অক্ষরে নীত হয়; যথা—« আহার = ['আআর] »।

দ্রষ্টব্য—অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থিত র-বর্ণকে লুপ্ত করিয়া দিবার স্বাভাবিক ঝোঁক আছে বলিয়া, বহু স্থলে (বিশেষতঃ অশিক্ষিত বা গ্রাম্য উচ্চারণে) ইহার প্রতিক্রিয়া হয়; এবং তাহার ফলে, অল্প-শিক্ষিত লেখকের হাতে যেখানে « র » নাই সেখানে-ও র-য়ের আমদানী হয়, ও অশুদ্ধ বানান সৃষ্ট হয়; যথা—« সাহার্য্য (সাহায্য), চিন্তার্বিত (চিন্তাবিত), জর্ম (প্রাচীন-বাঙ্গালায়=জন্ম-শব্দের বিকৃত রূপ 'জম্ম'-র পরিবর্তে); মোকদ্দমা > মোকর্দমা » ইত্যাদি।

[২.৭২] তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি

[২.৭২১] [১] ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান

[১ক] ণত্ব-বিধান

খাঁটি বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দের বানানে মূর্ধন্য « ণ »-য়ের ব্যবহার কচিৎ দেখা যায়—কিন্তু বাঙ্গালায় মূর্ধন্য « ণ »-য়ের বিশিষ্ট উচ্চারণ এখন

অজ্ঞাত; এই সকল প্রাকৃত-জ শব্দে দন্ত্য « ন » লিখিলে কোনও ক্ষতি নাই —দন্ত্য « ন » লেখাই বরং ভাল; প্রাকৃত-জ শব্দে কেবল মাত্র দন্ত্য « ন », এই রীতি স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। প্রাকৃত-জ শব্দে যে মূর্ধন্য « ণ » লেখা হয়, তাহা, হয় মূল সংস্কৃত শব্দের প্রভাবে, না-হয় অনুরূপ সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি শব্দে মূর্ধন্য « ণ » ও দন্ত্য « ন » দুই-ই ব্যবহৃত হয়; যথা—« রাণী—রানী; ঠাকুরাণী, ঠাকরুণ—ঠাকুরানী, ঠাকরুন; কাণ—কান; সোণা—সোনা; ঝরণা—ঝরনা; পুরাণ—পুরানো; হারাণ—হারানো, হারান; বাণান—বানান; পরণ—পরন » ইত্যাদি। বিদেশী শব্দেও কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুকরণে « ণ » লেখা হয় (সাধারণতঃ শব্দের শেষে), কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দন্ত্য « ন » লেখাই সমীচীন; যথা—« কোরাণ ('পুরাণ' শব্দের দেখাদেখি)—কোরান (অথবা মূল আরবী শব্দের উচ্চারণ প্রদর্শনের চেষ্টায়—কোর্-আন অথবা কুর্-'আন্); দূরবীণ—দূরবীন; কুর্ণিশ —কুর্নিশ্; ইরাণ, তুরাণ—ঈরান, তুরান; ট্রেণ—ট্রেন; রিপণ—রিপন; নর্ম্মাণ—নর্মান; জার্ম্মাণী—জর্মানী » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দে কিন্তু যেখানে মূর্ধন্য « ণ » আছে, সেখানে এই বর্ণকে যথাযথ-ভাবে রক্ষা করা উচিত।

সংস্কৃত শব্দের মূর্ধন্য « ণ »-কে উৎপত্তি-হিসাবে, [১] দন্ত্য-ন-জাত, এবং [২] মৌলিক, —এই দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়। [১] সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের মূর্ধন্য-ণ, দন্ত্য-ন-য়ের বিকারে উৎপন্ন; সংস্কৃত উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম-অনুসারে, দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-য়ে পরিণত হইয়া থাকে; এবং [২] কতকগুলি বিশেষ শব্দে, মূর্ধন্য-ণ মৌলিক অক্ষর-রূপে বিদ্যমান; এই শব্দগুলিতে মূর্ধন্য-ণ সংস্কৃতের আদি অবস্থা হইতেই আছে, এখানে মূর্ধন্য-ণ সংস্কৃতের উচ্চারণের নিয়ম-অনুসারে দন্ত্য-ন হইতে উদ্ভূত নহে। এই প্রকারের মৌলিক-ণ-যুক্ত সংস্কৃত শব্দ সংখ্যায় অল্প, এবং এইরূপ শব্দ মনে করিয়া রাখিবার বিষয়। বাঙ্গালায় প্রচলিত এইরূপ কয়েকটী শব্দ—« অণু, আপণ ('দোকান' অর্থে), কঙ্কণ, কণা, কফোণি, কল্যাণ, গণ, গণ্-ধাতু, গুণ, গৌণ, ঘুণ চক্কণ তূণ, নিক্কণ, নিপুণ, পণ,

পণ্য, পাণি, পুণ্য, কণা, ফণী, বণিক্‌, বাণ, বাণিজ্য, মণি, মৎকুণ, লবণ, লাবণ্য, বিপণি, বীণা, বেণী, বেণু, শণ, শাণ, শোণ, শোণিত, স্থাণু »।

সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য-ন-এর মূর্ধন্য ণ-য়ে পরিবর্তনের নিয়মকে ণত্ব-বিধান বলে। ণত্ব-বিধান, যথা—

[১] ট-বর্গের পূর্বে মূর্ধন্য-ণ হয়: « বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, চণ্ড, খণ্ড, দণ্ড, ভাণ্ড »।

[২] « ঋ, ৠ, র, ষ » এই কয় বর্ণের পরে যদি প্রত্যয়ের দন্ত্য-ন আইসে, তাহা হইলে ইহা মূর্ধন্য-ণ হইয়া যায়: যথা—« ঋণ, পিতৃণ (পিতৃ+ঋণ), ঘৃণা, কৃষ্ণ (<√কৃষ্‌+ন), বর্ণ (<√বৃ–বর্‌+ন), বিষ্ণু (<√বিষ্‌+নু); পূর্ণ (<√পৃ–পূর্‌+ন) » ইত্যাদি।

[৩] একই পদের মধ্যে, প্রথমে « ঋ, ৠ, র, ষ », ও পরে স্বর-বর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য-, ব-, হ-কার ও অনুস্বারের ব্যবধান, এবং ইহার পরে দন্ত্য-ন; এ ক্ষেত্রেও দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হইয়া যায়; যথা—« করণ (√কৃ–কর্‌+অন), দর্পণ (√দৃপ্‌–দর্প্‌+অন), শ্রবণ (√শ্রু=শ্রব্‌+অন); হরিণ, বক্ষ্যমাণ, রুক্মিণী, বিষয়িণী, পর্যাণ, সৃক্কণী, বিষাণ, নির্বাণ, কৃপণ, রেণু, লক্ষণ, লক্ষ্মণ » ইত্যাদি। কিন্তু « ঋ, র, ষ » ও পরবর্তী দন্ত্য-ন-য়ের মধ্যে অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকিলে, ণ-ত্ব হয় না; যেমন—« মর্দন (√মৃদ্‌–মর্দ্‌+অন), দর্শন (√দৃশ্‌–দর্শ্‌+অন); প্রার্থনা, কর্তন, অর্চনা, বর্ণনা, রচনা, রঞ্জন » ইত্যাদি। পদের অন্তে দন্ত্য-ন (অর্থাৎ হসন্ত-যুক্ত দন্ত্য-ন) মূর্ধন্য-ণ হয় না—পূর্বেকার অক্ষরের « ঋ, র, ষ »-র পরে স্বর-বর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য-, ব-, হ-কার ও অনুস্বার থাকিলেও; যেমন—« ব্রহ্মন্‌, শ্রীমান্‌ »।

[৪] যেখানে দুইটী পদ মিলিয়া একটী শব্দ, সেখানে উপরের [২] ও [৩]-এর নিয়ম কার্যকর হয় না; যথা—« দুর্নাম ('দুর্‌+নাম'—'দুর্ণাম' নহে), হরিনাম ('হরিণাম' নহে), ত্রিনয়ন, বারিনিধি » ইত্যাদি। « সূর্প+নখ+আ=সূর্পণখা ('যাহার কুলার মত নখ এমন নারী') »—এই

শব্দ ব্যক্তি-বিশেষের (রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনীর) নাম বলিয়া, ইহা এক-পদ-রূপে বিবেচ্য ; সেই জন্য এখানে পূর্বের নিয়ম ধরিয়া ণত্ব-বিধান হইল ; কিন্তু « তাম্রনখ ('তামার মত অর্থাৎ লাল নখ যাহার') »-শব্দ কাহারও নাম নহে, ইহাতে দুইটী পদের অর্থ বিশ্লিষ্ট আছে, তাই এখানে « ণ » হইল না। তদ্রূপ « ত্রি+হায়ন, চতুর্‌+হায়ন » এই দুই শব্দ 'তিন বৎসরের বা চারি বৎসরের শিশু' বুঝাইলে এক-পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং সেখানে মূর্ধন্য-ণ হয়—« ত্রিহায়ণ, চতুর্হায়ণ »; কিন্তু 'তিন বৎসর', 'চারি বৎসর' অর্থে পদদ্বয়ের অর্থ পৃথক্‌, এবং সেখানে দন্ত্য-ন-ই থাকে ; তুলনীয়—মাসের নাম « অগ্রহায়ণ »।

[৫] উপরের দুইটী নিয়ম-অনুসারে, « প্র, পরা, পরি, নির্‌ » এই চারি উপসর্গের ও « অন্তর »-শব্দের পরস্থিত « নদ্‌, নম্‌, নশ্‌, নহ্‌, নী, নুদ্‌, অন্‌, হন্‌ » এই কয়টী ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় ; যথা—« নমে » কিন্তু « প্রণমে »; « নষ্ট—প্রণষ্ট ; নীত—প্রণীত ; নতি—পরিণতি ; হনন—প্রহণন » ইত্যাদি। « প্র, পরি » ইত্যাদির পরে « নি » উপসর্গ থাকিলে তাহা « ণি » হয় ; যথা—« নিধান—প্রণিধান ; নিপাত—প্রণিপাত » ইত্যাদি। « পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ » শব্দের ণ-ও এই কারণে (« পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, নার + অয়ন »)।

এতদ্ভিন্ন, অন্য কতকগুলি শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে, বাঙ্গালার পক্ষে সেগুলি তত আবশ্যক নহে। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্রষ্টব্য :—

« অহ্ন » শব্দ (দন্ত্য-ন) : « আহ্নিক, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন »-তে দন্ত্য-ন ; « প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ »—এখানে মূর্ধন্য-ণ।

« প্রকম্পন, পরিগমন »—এখানে মূর্ধন্য-ণ হয় না (নিয়মের প্রতিকূল)। « আম্রবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ » ইত্যাদি কতকগুলি শব্দে « বন »-শব্দের দন্ত্য-ন-স্থানে মূর্ধন্য-ণ হয়—বিশেষ নিয়ম-অনুসারে ; বাঙ্গালায় কিন্তু সাধারণতঃ « আম্র-বন, শর-বন, ইক্ষু-বন » প্রভৃতি লেখা হয়।

[১খ] ষত্ব-বিধান

মূর্ধন্য-ষ-এর প্রাচীন উচ্চারণ এখন বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। তথাপি, খাঁটী বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দে কখনও-কখনও সংস্কৃত বানানের অনুকরণে মূর্ধন্য-ষ লিখিত হইয়া থাকে; যেমন « ভয়ষা ষী ('মহিষ' শব্দের প্রভাবে), আঁষ ('আমিষ' শব্দের প্রভাবে), ঘষা (< ঘর্ষ), নিষুতি (< নিষুপ্তিক), উড়িষ্যা (< ঔড্রীবিষয়-), আউষ (< আ-বৃষ্) » ইত্যাদি। বিদেশী শব্দেও তদ্রূপ « স » বা « শ »-স্থলে কচিৎ « ষ » মিলে; যথা—« মুষলমান ('মুসলমান'-স্থলে), কানখুষ্কি ('খুশ্‌কি' স্থলে), জিনিষ (=জিনিস), বারকোষ (–কোশ), বালাপোষ, তক্তপোষ, খরগোষ (সর্বত্র 'শ'-স্থলে 'ষ'-ই সাধারণ); বুরুষ (brush ব্রাশ্) » ইত্যাদি। কতকগুলি প্রাকৃত-জ শব্দে « ষ » এক রকম সুদৃঢ়-ভাবেই বাঙ্গালা বানানে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদেশী শব্দে « ষ » না লিখিয়া, উচ্চারণ-অনুসারে « স » বা « শ » লেখাই উচিত। সংস্কৃতে « ট »-এর পূর্বে কেবল « ষ » ব্যবহৃত হয়—« ষ্ট »; সেই জন্য ইংরেজী শব্দে st অর্থাৎ [স্ট] থাকিলে « স্ট » না লিখিয়া সাধারণতঃ « ষ্ট » লেখা হয়: « ষ্টেশন, খ্রীষ্ট »। হিন্দীতে সংযুক্ত-বর্ণ স্ট আছে, বাঙ্গালা « স্ট » অক্ষর এত দিন ছিল না, সেই জন্য কেবল « ষ্ট » ব্যবহার করা হইত; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ইংরেজী-জানা বাঙ্গালীর মুখে « ষ্ট »-কে sht-এর পরিবর্তে st-রূপেই উচ্চারণ করা হয়। সম্প্রতি ইংরেজীর উচ্চারণ যথাযথ জানাইবার জন্য « স্ট » অক্ষর ছাপার জন্য গঠিত হইয়াছে।

উৎপত্তি বিচার করিলে, মূর্ধন্য-ণ-য়ের মত মূর্ধন্য-ষ-ও দুই শ্রেণীতে পড়ে—

[১] সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়মে তালব্য-শ ও দন্ত্য-স হইতে উৎপন্ন মূর্ধন্য-ষ; এবং

[২] সংস্কৃত ভাষার আদিকাল হইতে বিদ্যমান ষ—মৌলিক ষ। মৌলিক-ষ-যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত : « আষাঢ়, ঈষৎ, ঈর্ষা (ঈর্ষ্যা), ঊষা (উষা), ঊষর, উষ্ম, ইষ্ ধাতু, ওষধি, ঔষধ, কোষ, কর্ষণ, গণ্ডূষ, গ্রীষ্ম, ঘর্ষণ, তুষার, তুষ, তুষ্ ধাতু, দুষ্ ধাতু, নিকষ, পরুষ, পুরুষ, পুষ্প, প্রত্যূষ, (প্রত্যুষ), প্রদোষ, পাষাণ, পুষ্ ধাতু, পৌষ, ভীষ্ম, ভূষণ, ভাষা, ভিষক্, মেষ, মহিষ, মহিষী, মূষিক (মুষীক), যূষ, রোষ, বিশেষ, বিশেষণ, বিষ, বিষাণ, বর্ষণ, শেষ, শোষ, শ্লেষ, শ্লেষ্মা, ষোড়শ, ষট্, ষণ্ড, সর্ষপ, হর্ষ » ইত্যাদি।

ষত্ব-বিধানের নিয়ম—

[১] ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হয় ; যথা—« ঋষি, বৃষ, ঋষভ, বৃষ্ণি » ইত্যাদি।

[২] « অ, আ » ভিন্ন স্বর, এবং « ক » ও « র »—পদস্থিত এই কয়টী বর্ণের পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স আসিলে, মূর্ধন্য-ষ-যে পরিবর্তিত হয় ; যথা— « কল্যাণীয়েষু (কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে 'কল্যাণীয়াসু'), মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, চিকীর্ষা » ইত্যাদি।

উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয় ; যথা—« অভি + √সিচ্ > সেক্ + অ = অভিষেক ; স্থা + অন = স্থান—কিন্তু অধি + স্থান = অধিষ্ঠান, অনু + স্থান = অনুষ্ঠান, প্রতি + স্থিত = প্রতিষ্ঠিত ; নি + স্নাত = নিষ্ণাত ; সিদ্ধ, কিন্তু নিষিদ্ধ, নিষেধ ; সন্ন, নিষণ্ণ » ইত্যাদি। কতকগুলি ধাতুতে কখনও কখনও এইরূপে দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়, কিন্তু সর্বত্র নয় ; যথা—« অনুসন্ধান, বিসর্গ, অনুস্বার » ইত্যাদি।

[৩] দুইটী পদ সমাস-যুক্ত হইয়া একটী শব্দ হইয়া গেলে, প্রথম পদের শেষে « ই, উ, ঋ, ও » থাকিলে, পরবর্তী পদের আদ্য দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ-য়ে পরিবর্তিত হয় ; যথা—« যুধি + স্থির = যুধিষ্ঠির ; অগ্নি + স্তোম = অগ্নিষ্টোম ; সু + স্থু = সুষ্ঠু ; মাতৃ + স্বসা = মাতৃষ্বসা ; পিতৃ + স্বসা = পিতৃষ্বসা ;

গো+স্থ=গোষ্ঠ; হরি+সেন=হরিষেণ; সু+সমা=সুষমা; সু+সেন=সুষেণ; বি+সম=বিষম » ইত্যাদি।

এই নিয়মের ব্যত্যয়—« সাৎ » প্রত্যয়ের দন্ত্য-স অবিকৃত থাকে; যথা—« ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ »।

দ্রষ্টব্য:—« শাস্ » ধাতুর রূপভেদে « শিস্=শিষ্ », তাহা হইতে « শিষ্য, শিষ্ট, অনুশিষ্ট »; « বি+স্তম্ভ » হইতে, « বিস্তম্ভ বা বিষ্টম্ভ » (দুই রূপ); « প্র+স্থ » হইতে, 'অগ্রগামী' অর্থে « প্রষ্ঠ », অন্য অর্থে « প্রস্থ »; « বি+স্তর » হইতে 'কুশের আসন' অর্থে « বিষ্টর », অন্য অর্থে « বিস্তর »।

[২.৭২২] [২] গুণ (First Gradation), বৃদ্ধি (Second Gradation), ও সম্প্রসারণ (Vocalisation); অপশ্রুতি (Ablaut, Apophony, Vocal Alternance বা Vowel Gradation)

সংস্কৃত স্বর-ধ্বনিগুলির মধ্যে « অ, ই, উ, ঋ (=র্), ঌ (=ল্) »-কে মূল স্বর ধরা হয়। এই মূল স্বরগুলির দীর্ঘ রূপ হইতেছে « আ, ঈ, ঊ, ৠ » (দীর্ঘ ঌ-কারের প্রয়োগ নাই)। অবশিষ্ট স্বর « এ, ঐ, ও, » মূল স্বর « অ, ই, উ » হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; « এ, ঐ, ও, ঔ » এগুলি যৌগিক স্বর—এগুলিকে **সন্ধ্যক্ষর** বা সন্ধি অর্থাৎ একাধিক স্বরের মিলন হইতে জাত অক্ষর বলে। **গুণ** ও **বৃদ্ধি**, এই দুই নিয়ম-অনুসারে এই চারিটী নূতন স্বরের উদ্ভব। « ই, উ, ঋ, ঌ » যখন কোনও পদের মূল অর্থাৎ ধাতু-জাত অংশে থাকিত, তখন প্রাচীন সংস্কৃতে এই স্বর-ধ্বনি অনুদাত্ত থাকিত, ইহারা কখনও উদাত্ত হইত না (পূর্বে দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ৮৫), কিন্তু দীর্ঘ স্বর থাকিলে উদাত্ত হইতে পারিত, এবং গুণ- ও বৃদ্ধি-যুক্ত রূপে সাধারণতঃ উদাত্ত হইত। হ্রস্ব অবস্থায় মূল স্বরের মধ্যে « ই, উ, ঋ, ঌ »-কে **দুর্বল রূপ** (Weak Forms), এবং ইহাদের দীর্ঘ এবং গুণ- ও বৃদ্ধি-যুক্ত রূপকে ইহাদের **সবল রূপ** (Strong Forms) বলা যায়। মূল স্বরের

পূর্বে « অ » যোগ হইলে, **গুণ** (First Gradation বা Strong Gradation) হয় ; যথা—

মূল স্বর—হ্রস্ব (দুর্বল রূপ)—« অ, ই, উ, ঋ, ঌ » ;
দীর্ঘ ... « আ, ঈ, ঊ, ৠ, — » ;
গুণ ... ... « অ+অ, অ+ই, অ+উ, অ+ঋ, অ+ঌ »
« অ+আ, অ+ঈ, অ+ঊ, অ+ৠ, — » ।

« অ »-এ অ-কার যোগ হইয়া গুণ হইলে, « অ »-ই থাকে, পরিবর্তন হয় না। গুণের ফলে—

অ+আ	=আ	...	আ-কারের গুণ ;
অ+ই, অ+ঈ	=অই, অঈ=এ	...	ই-, ঈ-কারের গুণ ;
অ+উ, অ+ঊ	=অউ, অঊ=ও	...	উ-, ঊ-কারের গুণ ;
অ+ঋ, অ+ৠ	=অর্ ...	...	ঋ-, ৠ-কারের গুণ ;
অ+ঌ	=অল্ ...	...	ঌ-কারের গুণ।

বাঙ্গালায় একটী স্বরের পাশে যে-কোনও আর একটী স্বর বসিয়া Diphthong বা যৌগিক স্বরের সৃষ্টি করিতে পারে ; যেমন—« এই, কেউ, যাই, ভুয়া=ভুআ » ইত্যাদি (পূর্বে দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ৪০) ; সংস্কৃতে তাহা হয় না—সংস্কৃতে সাধারণতঃ দুইটী স্বর পাশাপাশি থাকিতে পারে না, থাকিলেই উহাদের মিলন বা সন্ধি হইয়া, একটী স্বরে পরিবর্তন হয় ; যেমন—« অ+ই=এ, অ+উ=ও » এবং « আ+ই=ঐ, আ+উ=ঔ »।

গুণের পরে আবার আদিতে যদি অ-কার যোগ করা হয়, তাহা হইলে **বৃদ্ধি** (Second Gradation বা Long Gradation) হয় ; যথা—

অ+গুণ অ=আ	...	...	...	...	অ-কারের বৃদ্ধি ;
অ+গুণ আ=আ	...	...	...	...	আ-কারের বৃদ্ধি ;
অ+গুণ এ (অর্থাৎ অ+অই, অ+অঈ)=আই, আঈ=ঐ					ই-, ঈ-কারের বৃদ্ধি ;
অ+গুণ ও (=অ+অউ, অ+অঊ)=আউ, আঊ=ঔ ...					উ-, ঊ-কারের বৃদ্ধি ;
অ+গুণ অর্ (=অ+অ+ঋ, অ+অ+ৠ)=আর্				...	ঋ-, ৠ-কারের বৃদ্ধি ;
অ+গুণ অল্ (=অ+অ+ঌ)=আল্			...	...	ঌ-কারের বৃদ্ধি।

« ই, ঈ » এবং « উ, ঊ »-এর গুণ ও বৃদ্ধিতে যে « এ, ঐ, ও, ঔ » উদ্ভূত হয়, সময়ে-সময়ে সেই « এ, ঐ, ও, ঔ »-এর মূল রূপটী, অর্থাৎ « অই, আই, অউ, আউ » রূপ, ফিরিয়া আইসে, এবং শব্দের মধ্যে « অয়্, আয়্, অব্, আব্ (অন্তস্থ ব-যুক্ত রূপ—অৱ্, আৱ্ aw, āw) » রূপে স্বর বর্ণের পূর্বে দৃষ্ট হয়।

« অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ঌ »-র পূর্বে যেমন « অ » বা « অ + অ » যোগ করিয়া গুণ ও বৃদ্ধি হইয়া « অই (= অয়্, এ), আই (= আয়্, ঐ), অউ (= অৱ্, ও), আউ (= আৱ্, ঔ) » হয়, তেমনি « ই, উ, ঋ (= র্), ঌ (= ল্) »-এর পরে অ-কার আসিয়া বসিলে « ইঅ (i + a = ya) = য, উঅ (u + a, ua = wa) = ৱ বা অন্তঃস্থ ব, ঋঅ = র্অ = র, ঌঅ = ল্অ = ল », অর্থাৎ « য, র, ল, ব » এই চারিটী অন্তঃস্থ বর্ণ হয়, অর্থাৎ « ই, ঋ, ঌ, উ » এবং « য, র, ল, ৱ » (অথবা « য, র, ল, ব »), একই ধ্বনির অবস্থা-গতিকে বিভিন্ন প্রকার ভেদ। « য, র, ল, ব »-কে এইরূপে « ই, ঋ, ঌ, উ »-তে পরিবর্তন করাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে **সম্প্রসারণ** বলে (« সম্প্রসারণ » = Vocalisation)। ইউরোপীয় ব্যাকরণকারগণ এই « সম্প্রসারণ » শব্দটীকে আবার « ই, ঋ, ঌ, উ »-র অ-কার যোগে « য, র, ল, ব »-তে পরিবর্তন জানাইতেও ব্যবহার করেন।

অতএব, গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণে অ-কারের, আদিতে বা অন্তে অবস্থান লইয়া, নিম্নলিখিত-ভাবে সংস্কৃতের স্বর ও অন্তঃস্থ ধ্বনিগুলি পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত :—

মূল রূপ (দুর্বল রূপ)	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ
অ	অ	আ	—
আ	আ	আ	—
ই (ঈ)	এ, অয়্	ঐ, আয়্	য়
উ (ঊ)	ও, অব্	ঔ, আব্	ব (ৱ)
ঋ (ৠ)	অর্	আর্	র
ঌ	অল্	আল্	ল

সংস্কৃত ধাতুর মূল স্বর-ধ্বনি উপর্যুক্ত রীতি অনুসারে, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে ; যথা—

[মূল	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ]
পত্ ধাতু	পতন	নিপাত	—
খাদ্ ধাতু	খাদিত	খাদ্য, খাদক	—

[মূল	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ]
দিশ্ ধাতু ···	দেশ ···	দৈশিক ···	—
নী ধাতু, নীতি ···	নইতা = নেতা নইঅন্ = নয়ন	নাইঅক = নায়ক ··· ···	—
শ্রু ধাতু, শ্রুতি ···	শ্রউতা = শ্রোতা শ্রউঅণ = শ্রবণ, শ্রবণ	শ্রৌত, শ্রাবণ	
দুহ্ ধাতু, দুগ্ধ ··	দউগ্ধা = দোগ্ধা দউহন = দোহন	দৌগ্ধ	
যুজ্ ধাতু, যুগ ···	যোগ, যোজন	যৌগিক	
ভূ ধাতু, স্বায়ংভূব, ভূমি	ভবন ···	ভাব	
কৃ ধাতু, কৃতি, কৃত	কর, করণ	কার	
ধৃ ধাতু, ধৃতি, ধৃত	ধর, ধরণী	উদ্ধার	
কৢপ্ ধাতু, কৢপ্ত ···	কল্পনা ···	কাল্পনিক	
যজ্ ধাতু (ইজ্) ···	যজন, যজ্ঞ ···	যাজক, যাজ্ঞিক	ইজ্যা, ইষ্ট (ইজ্ > ইশ্ + ত)
বচ্ ধাতু (উচ্) ···	বচন ···	বাচক, বাচ্য	উক্ত (উচ্ > উক্ + ত)
বদ্ ধাতু (উদ্) ···	বংশবদ, অনবদ্য	বাদ, অনুবাদ	অনুদিত (অনু + উদ্ + ইত)

সংস্কৃত ভাষায় সর্বত্র—সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণে (অর্থাৎ শব্দ- ও ধাতু-রূপে), এবং কৃৎ- ও তদ্ধিত প্রকরণে—এইরূপ ধাতু-গত স্বর-ধ্বনির পরিবর্তনের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। একই ধাতু হইতে উৎপন্ন এই প্রকার গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্প্রসারণ-দ্বারা বিভিন্নীকৃত বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় আছে। গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্প্রসারণের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে, সংস্কৃত শব্দসমূহের উৎপত্তি সাধারণতঃ সহজেই ধরা যাইবে, একই পর্য্যায়ের বহু সংস্কৃত শব্দের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ ও সম্বন্ধ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যথা—« গো (<গউ), গব্য (<গউ + য, গব্ + য), গাবী (<গাউ + ঈ, গাব্ + ঈ), দ্বিগু ('দুইটী গোরু আছে যার', দ্বি + গু = গ্ + উ—এখানে অ-কার-লোপে 'গো' অর্থাৎ 'গউ' শব্দের দুর্বল রূপ 'গু') »।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাকৃত-জ শব্দে কচিৎ সংস্কৃতের গুণ ও বৃদ্ধির নিদর্শন রক্ষিত আছে ; যথা—

চল্ ধাতু—চলতি (গুণ),	···	চালয়তি (বৃদ্ধি)	[সংস্কৃত]
চলদি, চলই	···	চালেদি, চালেই	[প্রাকৃত]
চলে	···	চালে	[বাঙ্গালা] ;

ত্রুট্ ধাতু—ত্রুট্যতি (দুর্বল রূপ) … ত্রোটয়তি (গুণ—সবল রূপ) [সংস্কৃত]
টুট্টদি, টুট্টই … তোড়েদি, তোড়েই [প্রাকৃত]
টুটে … তোড়ে [বাঙ্গালা]।

ধাতুর স্বর-ধ্বনির গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্প্রসারণ-জনিত পরিবর্তন, সংস্কৃত ভাষার একটী বৈশিষ্ট রীতি। আদি-আর্য-ভাষা হইতে সংস্কৃত এই রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পারসীক, গ্রীক, লাটিন, রুষ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা, আদি-আর্য-ভাষার শাখা ; এই ভাষাগুলিতেও এই প্রকারে ধাতুর স্বর-পরিবর্তনের নিয়ম আছে ; যথা— « ইংরেজী sing—sang—sung—song ; drive—drove—driven ; give—gave—given—gift ; thrive—throve—thrift ; see—saw—sight » ইত্যাদি। গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ, এই তিনটী একই রীতির বিভিন্ন অঙ্গ ; এই মূল-রীতি ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ-কর্তৃক Ablaut (জরমান শব্দ), Apophony (গ্রীক শব্দ) বা Vowel Gradation অথবা Vocal Alternance রূপে বর্ণিত হয়। এ বিষয়ে সর্বগ্রাহী নাম সংস্কৃতে নাই—Ablaut বা Apophony-র আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া সৃষ্ট অপশ্রুতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

[২.৭২৩] [৩] সন্ধি (Liaison বা Assimilation)

দুইটী (বা কচিৎ দুইটীর অধিক) ধ্বনি একই পদে বা দুইটী বিভিন্ন পদে পাশাপাশি অবস্থান করিলে, দ্রুত উচ্চারণের সময়ে তাহাদের মধ্যে আংশিক- বা পূর্ণ-ভাবে মিলন হয়, কিংবা একটীর লোপ হয়, অথবা একটী অপরটীর প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এইরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে।

সকল ভাষাতেই এইরূপ সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিয়ম ভাষাভেদে পৃথক্ হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণে যে পরিবর্তন ঘটিত, বানানে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইত। কিন্তু অনেক ভাষায় আবার সন্ধি-জাত মিলন বা লোপ অথবা উচ্চারণের পরিবর্তন, লেখায় দেখানো-ই হয় না।

বাঙ্গালা সন্ধির দৃষ্টান্ত : কলিকাতার চলিত-ভাষায়, « দেই > দিই (স্বর-সঙ্গতি) > দি (দুইটী ই-কারে মিলিয়া একটী ই-কারে পরিবর্তন) ; জুয়া > জুও > জো (স্বর-সঙ্গতি এবং তৎপরে সন্ধিতে উ-কার-লোপ) ; বিয়া > বিয়ে > ব্যে > বে ; দিয়া > দিয়ে > দ্যে > দে ;

কোথা যাবে > [কোজ্জাবে] (থা-এর আ-কারের লোপ, পরে পরবর্তী ব-কারের প্রভাবে থ-এর পরিবর্তন); পাঁচ সের (উচ্চারণে [শের]) > [পাশ্-শের] (স-এর প্রভাবে চ-এর পরিবর্তন); বড়ঠাকুর > বট্-ঠাকুর (ড়-কারের অ-লোপ, পরে ঠ-এর প্রভাবে ড়-এর ট-তে পরিবর্তন); পাঁচ জন > [পাজ্জন]; হাত-ধরা > [হাদ্ধরা]; মেঘ ক'রেছে > [মেকোরেচে] ইত্যাদি উচ্চারণ আমরা সর্বদা কানে শুনি, লেখায় কখনও প্রদর্শন করি না। ইংরেজী সন্ধির দৃষ্টান্ত: extraordinary—উচ্চারণে [ikstrordinari] (a এবং o-র সন্ধিতে প্রথম স্বর-ধ্বনির লোপ); drawers—উচ্চারণে [drōz] (draw শব্দের অ-ধ্বনি ও -ers প্রত্যয়ের স্বর-ধ্বনির সন্ধি); five pence [faiv+pens]—উচ্চারণে [faif pens], p-র প্রভাবে পূর্বের v-র f-এ পরিবর্তন; begged—উচ্চারণে [begd, বেগ্ড্], -ed প্রত্যয়ের d-র ঘোষ-ধ্বনি, g বা গ-এর ঘোষ-ধ্বনির সাহায্যে এখানে অবিকৃত; কিন্তু looked উচ্চারণে [lukt=লুক্ট্]—এখানে অঘোষ k-র প্রভাবে ed-র d-ধ্বনির অঘোষ t-তে পরিবর্তন; horse+shoe—উচ্চারণে [hors-shu] না হইয়া [horshshu বা hoshshu, «হর্স্‌শু» স্থানে «হর্শ্‌শু» বা «হশ্‌শু»]।

খাঁটী বাঙ্গালা সন্ধিরও নিয়ম আছে; বাঙ্গালা উচ্চারণ-রীতি, পূর্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত বাঙ্গালার সন্ধির নিয়ম জড়িত। কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণে যে সন্ধি আসিয়া পড়ে, সাধারণতঃ বানানে তাহা লেখা হয় না। খাঁটী বাঙ্গালা সন্ধি-তত্ত্ব এখনও কতকটা আলোচনা ও গবেষণার ব্যাপার হইয়া আছে। তবে এইটুকু প্রণিধান করা আবশ্যক: বাঙ্গালার উচ্চারণ-রীতি, সংস্কৃতের উচ্চারণ-রীতি হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্ বলিয়া, সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গালার পক্ষে খাটে না—বাঙ্গালা সন্ধির অন্য নিয়ম আছে। এগুলি পরে ('সন্ধির পরিশিষ্ট' অংশে) উল্লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একক পাওয়া যায়, আবার অন্য শব্দের সহিত সমস্ত বা মিলিত অবস্থায়ও পাওয়া যায়। এই মিলিত রূপে, সন্ধি-হেতু মূল শব্দগুলির ধ্বনি ও তদবলম্বনে সেগুলির বানান অনেক সময়ে বদলাইয়া যায় বলিয়া (এবং ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের সংযোগে আবশ্যক-মত নূতন শব্দ-সৃষ্টি হইলে, সংস্কৃতের নিয়ম-অনুসারে তাহাদের সন্ধি হয় বলিয়া), বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট সংস্কৃত শব্দের আলোচনায়

তাহাদের সন্ধির নিয়মও জানা আবশ্যক ; যেমন—সংস্কৃত « অতি » ও « আচার » এই দুইটী শব্দ পৃথগ্‌ভাবে বাঙ্গালায় পাওয়া যায় ; কিন্তু « অতি » ও « আচার » [ati + āchāra] মিলিয়া হইল « অত্যাচার » ; প্রাচীনকালে « অত্যাচার »-এর উচ্চারণ ছিল কতকটা যেন [অৎ-ইআ-চা-র at-iā-chā-ra, at-yā-chā-ra], কিন্তু এখন বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে [ওৎ-ত্যা-চার্‌, ot-tæ-char] (পূর্ব-বঙ্গে [অইত্তাচার্‌, oit-ta-tsar]) । « অত্যাচার » শব্দের গঠন বুঝিতে হইলে, সংস্কৃতে « ই » ও « আ » পর-পর আসিলে মিলিয়া যে « য়া » হয়, এবং এই য়া'র 'য' যে য-ফলার রূপ ধারণ করিয়া পূর্ব-ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয়, এই সন্ধি-নিয়ম জানিতে হইবে। « উপরি + উপরি [= upari + upari > uparyupari, uparyyupari] », বানানে « উপর্য্যুপরি, উপর্য্যুপরি », আধুনিক উচ্চারণে পশ্চিম বঙ্গের সাধু ভাষায় [uporjupori], পূর্ব-বঙ্গে [upoirdzupori] : এইরূপে, এখন প্রাচীন সংস্কৃত ধরণে উচ্চারণ করা হয় না বলিয়া, সন্ধির সার্থকতা সহজে বোঝা যায় না এবং নিয়মগুলি কিছু কষ্ট সহকারে মনে রাখিতে হয়। প্রাচীন উচ্চারণ ধরিয়া জিনিসটী আলোচনা করিলে, সন্ধি-প্রকরণ অতি সহজ-বোধ্য হইয়া যায়। অন্য উদাহরণ —« বধূ + আগমন (wadhū + āgamana) = বধ্বাগমন », প্রাচীন উচ্চারণে [বধ্‌ৱাগমন] = [wadhwāgamana] ; এখন বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে [বোদ্‌ধাগোমোন] = [boddhagomon]; « নৌ + ইক » হইতে « নাবিক » [nāu + ika = nāwika], এখনকার উচ্চারণে আর অন্তঃস্থ ব-কার নাই— বর্গীয়-ব হইয়াছে [nabik] ; « সাধু + ঈ = সাধ্বী » [sādhu + ī = sādhwī], এখন বাঙ্গালা উচ্চারণে [shaddhi] ; « তৎ + শক্তি = তচ্ছক্তি » ; « মনঃ + গত > মনোগত » ইত্যাদি। ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের সন্ধির উদাহরণ— Cape of Good Hope-এর অনুবাদ, « উত্তম আশা অন্তরীপ—উত্তমাশা অন্তরীপ » ; « ভারত + ঈশ্বরী = ভারতেশ্বরী ; বঙ্গেশ্বর ; বিচার + আলয় = বিচারালয় » ইত্যাদি।

স্বর-বর্ণে স্বর-বর্ণে মিলিয়া যে সন্ধি হয় তাহার নাম স্বর-সন্ধি ; ব্যঞ্জন-বর্ণে ব্যঞ্জন-বর্ণে এবং ব্যঞ্জন-বর্ণে স্বর-বর্ণে মিলিয়া যে সন্ধি হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জন-সন্ধি।

স্বর-সন্ধির নিয়ম

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতে বাঙ্গালার মত দুইটী স্বর-ধ্বনি পাশাপাশি থাকিতে পারে না—পাশাপাশি আসিলেই তাহাদের সংযোগে

(দুইটীর পরিবর্তে একটী অক্ষরের সৃষ্টি হয়। « এ, ও » মূলে ছিল « অই, অউ » এবং « ঐ, ঔ » ছিল « আই, আউ »—সন্ধিতে এই চারিটী বর্ণের এই প্রকৃতি প্রকট হয়।

কেবল দুই-চারিটী বিশেষ স্থলে সংস্কৃত ভাষায় দুইটী স্বর পাশাপাশি থাকিলেও সন্ধি হয় না। সন্ধি করা হয় নাই এইরূপ স্বরকে **প্রগৃহ্য** বলে; যথা—« কবী + এতৌ > কবী এতৌ ; সাধূ + ইমৌ > সাধূ ইমৌ »।

[১] দুইটী পদে বা পদাংশে, একই স্বর-বর্ণ হ্রস্ব-ভাবেই হউক বা দীর্ঘ-ভাবেই হউক, পর-পর বা পাশাপাশি অবস্থান করিলে, এই উভয় অবস্থান মিলিয়া উক্ত স্বর-বর্ণের দীর্ঘ-রূপে পরিণত হয়, এবং এই দীর্ঘ-স্বরে পদ বা পদাংশ দুইটী মিলিত হয় ; যথা—

অ + অ = আ : বেদ + অন্ত > বেদান্ত ; ধর্ম + অধর্ম > ধর্মাধর্ম ; অন্য + অন্য > অন্যান্য ; অপর + অপর > অপরাপর ; বর + অভয় > বরাভয় ; নব + অন্ন > নবান্ন ; নর + অধম > নরাধম ; ইত্যাদি।

অ + আ = আ : দেব + আলয় > দেবালয়, জল + আশয় > জলাশয় ; হিম + আলয় > হিমালয় ; ঈশ্বর + আদেশ > ঈশ্বরাদেশ ; চন্দ্র + আনন > চন্দ্রানন ; পুস্তক + আগার > পুস্তকাগার ; ইত্যাদি।

আ + অ = আ : আশা + অতিরিক্ত > আশাতিরিক্ত ; আজ্ঞা + অধীন > আজ্ঞাধীন ; বিদ্যা + অলঙ্কার > বিদ্যালঙ্কার ; মহা + অর্ণব > মহার্ণব ; নিন্দা + অর্হ > নিন্দার্হ ; হত্যা + অপরাধ > হত্যাপরাধ।

আ + আ = আ : দয়া + আর্দ্র > দয়ার্দ্র ; মহা + আশয় > মহাশয় ; বিদ্যা + আলয় > বিদ্যালয় ; শিলা + আসীন > শিলাসীন ; মাত্রা + আধিক্য > মাত্রাধিক্য ; আশা + আনন্দ > আশানন্দ।

ই + ই = ঈ : • গিরি + ইন্দ্র > গিরীন্দ্র ; অভি + ইষ্ট > অভীষ্ট ; অতি + ইত > অতীত ; মুক্তি + ইচ্ছা > মুক্তীচ্ছা।

ই+ঈ—ঈ : ক্ষিতি+ঈশ > ক্ষিতীশ ; প্রতি+ঈক্ষা > প্রতীক্ষা ; অধি+ঈশ্বর > অধীশ্বর।

ঈ+ই—ঈ : শচী+ইন্দ্র > শচীন্দ্র ; মহী+ইন্দ্র > মহীন্দ্র।

ঈ+ঈ—ঈ : সতী+ঈশ > সতীশ ; রজনী+ঈশ > রজনীশ।

উ+উ—উ : সু+উক্ত > সূক্ত ; ভানু+উদয় > ভানূদয় ; গুরু+উপদেশ > গুরূপদেশ ; সাধু+উত্তম > সাধূত্তম।

উ+ঊ—ঊ : লঘু+ঊর্মি > লঘূর্মি।

ঊ+উ—ঊ : বধূ+উক্তি > বধূক্তি।

ঊ+ঊ—ঊ : ভূ+ঊর্ধ্ব > ভূর্ধ্ব।

ঋ+ঋ=ৠ : পিতৃ+ঋণ > পিতৄণ।

[২] « অ » বা « আ » পূর্বে থাকিলে, পরবর্তী স্বর যদি « ই » বা « ঈ » হয়, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া « এ » হয় ; যদি « উ » বা « ঊ » হয়, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া « ও » হয় ; « ঋ » হইলে, « অর্ » হয় ; « ঌ » হইলে « অল্ »; এবং « এ » বা « ঐ » হইলে « ঐ » হয় ; যথা—

অ+ই, ঈ—এ : দেব+ইন্দ্র > দেবেন্দ্র ; রাজ+ইন্দ্র > রাজেন্দ্র ; পূর্ণ+ইন্দু > পূর্ণেন্দু ; গণ+ইশ > গণেশ ; পরম+ঈশ্বর > পরমেশ্বর।

আ+ই, ঈ—এ : যথা+ইষ্ট > যথেষ্ট ; উমা+ঈশ > উমেশ ; রমা+ঈশ > রমেশ।

অ+উ, ঊ — ও : হিত+উপদেশ > হিতোপদেশ : সূর্য+উদয় > সূর্যোদয় ; পর্বত+ঊর্ধ্ব > পর্বতোর্ধ্ব ; এক+ঊনবিংশতি > একোনবিংশতি।

আ+উ, ঊ—ও : মহা+উদয় > মহোদয় ; মহা+উৎসব > মহোৎসব ; মহা+ঊর্মি > মহোর্মি।

অ+ঋ—অর্ : দেব+ঋষি > দেবর্ষি।

আ+ঋ=অর্ : মহা+ঋষি > মহর্ষি।

[এই নিয়মের ব্যত্যয়; « পরম+ঋত=পরমর্ত » — « অ+ঋ= অর্ » ; কিন্তু « শীত+ঋত=শীতার্ত, ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত »—এই দুইটী শব্দে, 'শীত বা ক্ষুধার দ্বারা কাতর (ঋত)', এই অর্থে তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হওয়ার কারণে, বিশেষ-ভাবে এই দুই শব্দে « অ, আ+ঋ > অর্ » না হইয়া, বৃদ্ধি হইয়া « আর্ » হয়।]

অ+এ, ঐ=ঐ : এক+এক=একৈক ; হিত+এষী=হিতৈষী ; রাজ+ঐশ্বর্য=রাজৈশ্বর্য ; মত+ঐক্য=মতৈক্য।

আ+এ, ঐ=ঐ : সদা+এব=সদৈব ; মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য।

অ+ও, ঔ=ঔ : মাংস+ওদন>মাংসৌদন ; দিব্য+ঔষধ>দিব্যৌষধ।

আ+ও, ঔ=ঔ : মহা+ঔষধ > মহৌষধ।

[৩] পূর্বে যদি « ই ঈ, উ ঊ, বা ঋ » থাকে, এবং পরে যদি অন্য স্বর-বর্ণ আসে, তাহা হইলে « ই ঈ » স্থানে « য (য-ফলা) », « উ ঊ » স্থানে « ব (অন্তঃস্থ ব, ব-ফলা) », এবং « ঋ » স্থানে « র (র-ফলা) » হয় ; এই « য, ব, র » (ফলা-রূপে) পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয় ; যথা—

ই, ঈ+অ, আ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ : অতি+অন্ত > অত্যন্ত ; অতি+আচার > অত্যাচার ; উপরি+উপরি > উপর্যুপরি (অর্থাৎ উপর্‌যুপরি) ; প্রতি+উত্তর > প্রত্যুত্তর ; অতি+ঊর্ধ্ব > অত্যূর্ধ্ব ; প্রতি+এক > প্রত্যেক ; অতি+ঐশ্বর্য > অত্যৈশ্বর্য ; ইতি+ওম্ > ইত্যোম্ ; নদী+অম্বু > নদ্যম্বু ; নদী+উপকণ্ঠ > নদ্যুপকণ্ঠ, ইত্যাদি।

উ, ঊ+অ, আ, ই, ঈ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ : অনু+অয় > অন্বয় ; সু+আগত > স্বাগত ; অনু+ইত > অন্বিত ; বহু+ঋচ > বহ্বৃচ ; অনু+এষণ > অন্বেষণ ; পশু+অধম > পশ্বধম ; বধূ+আনয়ন > বধ্বানয়ন ; ইত্যাদি।

ঋ+অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ : পিতৃ+অনুমতি > পিত্রনুমতি ; পিতৃ+আলয় > পিত্রালয় ; মাতৃ+উপদেশ > মাত্রুপদেশ ; ইত্যাদি।

[৪] পূর্বে « এ ঐ, ও ঔ » থাকিলে, পরবর্তী যে কোন স্বরের যোগে « এ ঐ (অর্থাৎ সন্ধ্যক্ষর অই, আই) » স্থলে « অয়্, আয়্ » এবং « ও ঔ (অর্থাৎ সন্ধ্যক্ষর অউ, আউ) » স্থলে « অব্ আব্ (অব়্, আর়্) » হয়। (এইরূপ সন্ধি, বাঙ্গালায় দুইটী বিভিন্ন পদের মিলনে হয় না—পদ-মধ্যে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগে সৃষ্ট শব্দে এইরূপ সন্ধি পাওয়া যায়); যথা—« নে+অন > নয়ন (অর্থাৎ নী ধাতুর গুণ—নই, সংক্ষেপে নে ; নে = নই + অন = নইঅন = নয়ন); শে + অন > শয়ন (শী ধাতুর গুণ—শে = শই + অন = শয়ন) ; নৈ + অক > নায়ক (নী ধাতুর বৃদ্ধি—নাই বা নৈ ; নাই + অক = নায়ক) ; গৈ + অক > (গাইঅক =) গায়ক ; শ্রো + অন > শ্রবণ (শ্রু ধাতু হইতে শ্রউ বা শ্রব়্ + অন > শ্রব়ণ, শ্রবণ) ; পো + অন > পবন (পূ ধাতুর গুণ—পউ বা পো ; পউ + অন = পব় + অন > পবন) ; গো + এষণা > গবেষণা (গো—গউ বা গব়্ + এষণা = গবেষণা) ; পৌ + অক > পাবক (পূ—পৌ বা পাউ + অক > পাব় + অক > পাব়ক, পাবক) ; নৌ + ইক > নাবিক (নৌ—নাউ + ইক = নাউইক, নাব়্-ইক, নাব়িক, নাবিক) ; ভৌ + উক > ভাবুক (ভৌ—ভাউ + উক > ভাব়্ + উক, ভাবুক) » ইত্যাদি।

স্বর-সন্ধির নিয়মের ব্যত্যয়

উপরের নিয়ম কয়টী, সংস্কৃতের স্বর-সন্ধির সাধারণ নিয়ম। এতদ্ভিন্ন, ঐ সকল নিয়মের প্রতিকূল সন্ধি কতকগুলি স্থলে দেখা যায়। ইহাদের কতকগুলির সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণ-কারগণ পৃথক্ নিয়ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; আবার কতকগুলির সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে এইরূপ সন্ধি « নিপাতনে সিদ্ধ », অর্থাৎ নিয়ম-বহির্ভূত। এইরূপ সন্ধির ব্যত্যয়-ফলে উদ্ভূত কতকগুলি শব্দ (বাঙ্গালায় যেগুলির ব্যবহার আছে) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

« কুল + অটা > কুলটা » ; সীম + অন্ত = 'সীঁথি' অর্থে « সীমন্ত », 'দেশের সীমা' অর্থে « সীমান্ত » ; « মার্ত + অণ্ড > মার্তণ্ড » ; « বিশ্ব +

ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ » (নিয়মানুসারে), এতদ্ভিন্ন নিপাতনে « বিম্বোষ্ঠ » ; তদ্রূপ « বিম্বৌষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ » ; « শুদ্ধ+ওদন > শুদ্ধোদন » ; স্ব+ঈর > স্বৈর (স্ত্রীলিঙ্গে স্বৈরিণী) ; অক্ষ+ঊহিনী > অক্ষৌহিনী ; অন্য+অন্য > অন্যান্য, এবং অন্যোন্য ; প্র+ঊঢ় > প্রৌঢ় ; সার+অঙ্গ > সারঙ্গ ; প্র+এষণ > প্রেষণ ; মনস্+ঈষা > মনীষা ; গো+ঈশ্বর=গউ+ঈশ্বর=গব্+ঈশ্বর =গবীশ্বর (অধিকন্তু নিয়মাতিরিক্ত গবেশ্বর) » ; তদ্রূপ, « গো+ইন্দ্র > গবেন্দ্র, গো+অক্ষ=গবাক্ষ » ।

ব্যঞ্জন-সন্ধি

(১) অঘোষ স্পর্শ-বর্ণের ঘোষ-বর্ণে পরিণতি—

(ক) স্বর-বর্ণ পরে থাকিলে, পূর্বে অবস্থিত অঘোষ-বর্ণ « ক চ ট ত প », যথাক্রমে ঘোষ-বর্ণ « গ জ ড (ড়) দ ব » তে পরিণত হয় ; যথা— « বাক্+ঈশ > বাগীশ ; দিক্+অন্ত > দিগন্ত ; ণিচ্+অন্ত > ণিজন্ত ; ষট্+আনন > ষড়ানন ; জগৎ+ঈশ্বর > জগদীশ্বর ; সুপ্+অন্ত > সুবন্ত ; ষট্+ঋতু > ষড়্ঋতু, ষড়ৃতু » ইত্যাদি । কিন্তু « যাচ্+অক =যাচক », « যাজক » নহে—এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে ।

(খ) বর্গের ঘোষ-বর্ণ (তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ—« গ ঘ, জ ঝ, ড ঢ, দ ধ, ব ভ ») অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ (« য ব »), র, ল, হ » পরে থাকিলে, « ক চ ট ত প » ঘোষ-বর্ণে পরিণত হয় ; যথা—« দিক্+গজ > দিগ্গজ, দিগ্‌গজ , বাক্+জাল > বাগ্‌জাল ; প্রাক্+জ্যোতিষ > প্রাগ্‌জ্যোতিষ ; স্রক্+ধরা > স্রগ্ধরা ; ষট্+দর্শন > ষড়্‌দর্শন ; জগৎ+বন্ধু > জগদ্বন্ধু ; উৎ+ঘাটন > উদ্ঘাটন ; উৎ+ভব > উদ্ভব ; মৃৎ+ভাণ্ড > মৃদ্ভাণ্ড ; অপ্+জ > অব্জ , অপ্+ধি > অব্ধি ; বৃহৎ+রথ > বৃহদ্রথ ; উৎ+যোগ > উদ্যোগ, উদ্‌যোগ ; উৎ+যম > উদ্যম ; ভরৎ+বাজ > ভরদ্বাজ ; বাক্+লোপ > বাগ্‌লোপ ; ষট্+বর্গ > ষড়্‌বর্গ » ইত্যাদি ।

এই সম্পর্কে নিম্নে প্রদত্ত [৩ ক, খ, গ] নিয়ম দ্রষ্টব্য।

[গ] বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ নাসিক্য-বর্ণ « ঙ ঞ ণ ন ম » পরে থাকিলে, পূর্বাবস্থিত অঘোষ-বর্ণ « ক চ ট ত প », ঘোষ-বর্ণ « গ জ ড দ ব »-তে পরিণত হয়; অথবা বিকল্পে, স্বকীয় বর্গের নাসিক্য-বর্ণের সহিত সারূপ্য প্রাপ্ত হয়; যথা—« দিক্+নাগ > দিগ্‌নাগ, অথবা দিঙ্‌নাগ; দিক্+নির্ণয় > দিগ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌নির্ণয়; ষট্+মাস > ষড়্‌মাস, ষণ্মাস; জগৎ+নাথ > জগন্নাথ বা জগদ্‌নাথ; পরিষদ্ বা পরিষৎ+মন্দির > পরিষদ্‌মন্দির, পরিষন্মন্দির; তদ্ বা তৎ+মধ্য > তদ্‌মধ্য, তন্মধ্য » ইত্যাদি। « ময় » প্রত্যয়ের ও « মাত্র » শব্দের পূর্বে কিন্তু কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়; যথা—« বাঙ্ময়; মৃন্ময়; চিন্ময়; এতন্মাত্র » ইত্যাদি।

পদের অন্তে স্থিত ত-এর পরে « হ » থাকিলে, ত-স্থানে « দ » ও হ-স্থানে « ধ » হয়; যথা—« পৎ+হতি > পদ্ধতি; উৎ+হৃত > উদ্ধৃত » ইত্যাদি।

[২] ঘোষ স্পর্শ-বর্ণের অঘোষ-বর্ণে পরিণতি—

বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ, কিংবা « স », পরে থাকিলে, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হয়—বিশেষতঃ ত-বর্গ সম্পর্কে; যথা—« তদ্+কাল > তৎকাল; তদ্+ত্ব > তৎত্ব—তত্ত্ব; তদ্+পর > তৎপর; তদ্+ফল > তৎফল; তদ্+সম—তৎসম; তদ্+সহিত > তৎসহিত; ক্ষুধ্+পিপাসা > ক্ষুৎপিপাসা » ইত্যাদি।

[৩] পরবর্তী বর্ণের সহিত সারূপ্য বা সাগোত্র্য লাভ—

[ক] ত-বর্গীয় বর্ণের চ-বর্গের বর্ণের সহিত সারূপ্য বা সাগোত্র্য লাভ হয়:—

« চ বা ছ » পরে থাকিলে, « ত ও দ »-স্থলে « চ » হয়; যথা—« সৎ+চরিত্র > সচ্চরিত্র; বিপদ্+চয় > বিপচ্চয়; উৎ+ছেদ > উচ্ছেদ; বিপদ্+চিন্তা > বিপচ্চিন্তা »।

« জ » বা « ঝ » পরে থাকিলে, « ত » ও « দ »-স্থানে « জ » হয় ; যথা—« উৎ+জ্বল > উজ্জ্বল ; জগৎ+জন > জগজ্জন ; যাবৎ+জীবন > যাবজ্জীবন ; সৎ+জন > সজ্জন ; তদ্+জন্য > তজ্জন্য ; কুৎ+ঝটিকা > কুজ্ঝটিকা ; পদ্+ঝটিকা > পজ্ঝটিকা »।

তালব্য-শ পরে থাকিলে, ক-বর্গের বর্ণের স্থানে « চ » হয়, এবং « চ » ও তালব্য-শ, « ছ »-তে পরিণত হয় ; যথা—« উৎ+শৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল ; চলৎ+শক্তি > চলচ্ছক্তি ; তদ+শক্তি > তচ্ছক্তি ; উৎ+শ্বাস > উচ্ছ্বাস » ইত্যাদি।

চ-বর্গের পরে « ন » থাকিলে, তাহা « ঞ » হইয়া যায় ; যথা—« যাচ্+না > যাচ্ঞা ; রাজ্+নী > রাজ্ঞী » ; কিন্তু পূর্বে তালব্য-শ থাকিলে, এই দন্ত্য-ন পরিবর্তিত হয় না ; যথা—« প্রশ্ন »।

[খ] ত-বর্গীয় বর্ণের ট-বর্গে পরিবর্তন :—

ত-বর্গ, ট-বর্গের পূর্বে আসিলে, ট বর্গে পরিণত হয় ; যথা « উৎ+টলন > উট্টলন ; উৎ+ডীন > উড্ডীন ; বৃহৎ+ঢক্কা > বৃহড্ঢক্কা ; তদ্+টীকা > তট্টীকা » ইত্যাদি।

মূর্দ্ধন্য ষ-এর পরে ত-বর্গ আসিলে, ট-বর্গে পরিণত হয় ; যথা—« আ-কৃষ্+ত > আকৃষ্ট ; দৃশ্—দৃষ্+তি > দৃষ্টি ; ষষ্+থ > ষষ্ঠ ; স্রষ্+তা > স্রষ্টা ; প্র-বিশ্—প্রবিষ্+ত > প্রবিষ্ট » ইত্যাদি।

[গ] « ল » পরে থাকিলে পূর্ববর্তী « ত » ও « দ », ল-এর সহিত সারূপ্য লাভ করে ; যথা—« উৎ+লেখ > উল্লেখ ; উৎ+লম্ফ > উল্লম্ফ ; তদ্+লোক > তল্লোক ; সম্পদ্+লাভ > সম্পল্লাভ » ইত্যাদি। দন্ত্য-ন-ও « ল » হইয়া যায়, কিন্তু উহার অনুনাসিকত্ব একেবারে যায় না, উহা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ; যথা—« বিদ্বান্+লোক > বিদ্বাঁল্লোক ; মহান্+লাভ > মহাঁল্লাভ »।

[৪] নাসিক্য ও অনুস্বার—

[ক] স্পর্শ-বর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তঃস্থিত « ম্ », যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বা নাসিক্য বর্ণে পরিণত হয়; বিকল্পে এই নাসিক্য বর্ণকে অনুস্বার-রূপেও লেখা যায়; যথা—« সম্+কলন > সঙ্কলন, সংকলন; সম্+গীত > সঙ্গীত (সঙ্গীত), সংগীত; সম্+ঘাত > সঙ্ঘাত, সংঘাত; বরম্+চ > বরঞ্চ; সম্+চয় > সঞ্চয়; কিম্+চিৎ > কিঞ্চিৎ; সম্+তাপ > সন্তাপ; বসুম্+ধরা > বসুন্ধরা; সম্+ধান > সন্ধান; সম্+ন্যাসী > সন্ন্যাসী; কিম্+নর > কিন্নর; কিম্+পুরুষ > কিম্পুরুষ, কিংপুরুষ; কিম্+ভূত > কিম্ভূত; সম্+মান >সম্মান » ইত্যাদি।

পদের মধ্যে ত-এর পূর্বে ম্-স্থানে এইরূপে « ন্ » হয়; যথা—« গম্+তব্য > গন্তব্য; √শম্ > শাম্+ত=শান্ত; কিম্+তু > কিন্তু; পরম্+তু > পরন্তু; নি-যম্+তা (তৃ) > নিয়ন্তা » ইত্যাদি।

[বাঙ্গালায় ক-বর্গ ভিন্ন অন্য স্পর্শ-বর্ণের পূর্বে অনুস্বার লেখা হয় না, কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে অনুস্বারের প্রচলন বেশী; আমরা লিখি « সঙ্কল্প, সঙ্গীত, সঞ্চয়, সঞ্জয়, পণ্ডিত, খণ্ড, বিন্দু, কিন্নর, চন্দ্র, সন্ধ্যা, সম্পূর্ণ, সম্ভব, সম্মান », কিন্তু দেবনাগরী অক্ষরে গুজরাটী ও মারহাট্টীতে (এবং আজকাল হিন্দীতেও) « সংকল্প, সংগীত, সংচয়, সংজয়, পংডিত, খংড, বিংদু, কিংনর, চংদ্র, সংধ্যা সংপূর্ণ, সংভব, সংমান » প্রচলিত। বাঙ্গালায় « ং »-এর উচ্চারণ « ঙ »-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া, বাঙ্গালা বানানে ক-বর্গের পূর্বে বিকল্পে অনুস্বার লেখা হয়; যথা—« সংকল্প, সংগীত »; কিন্তু « সংচয়, সংজয়, পংডিত, খংড, কিংতু, কিংনর, সংপূর্ণ, সংভব, সংমান » লেখা হয় না।]

এই [৪ক] নিয়মকে পূর্ববর্তী [৩]-এর নিয়মেরই অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে—ইহাও পরবর্তী বর্ণের সহিত সারূপ্য- বা সাগোত্র্য-লাভের নিয়ম।

[খ] অন্তঃস্থ- বা উষ্ম-বর্ণ (« য র ল ব, শ ষ স, হ ») পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুস্বার হয়; যথা—« সম্+যোগ > সংযোগ; সম্+রক্ত > সংরক্ত; সম্+লগ্ন > সংলগ্ন; সম্+শয় > সংশয়; সর্বম্+সহা > সর্বংসহা; সম্+হার > সংহার » ইত্যাদি। [কেবল « সম্+√রাজ্ »—এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়—« সংরাজ্ » না হইয়া « সম্রাজ্ » হয়, ম-কার অবিকৃত থাকে

[গ] দন্ত্য-ন-এর পরে উষ্ম-বর্ণ « শ, ষ, স, হ » থাকিলে, সেই « ন » অনুস্বার হইয়া যায়; যথা—« √দন্শ্ > দংশ্; √শন্স্ > শংস্—প্রশংসা; √জিঘান্স্ > জিঘাংস; বৃন্হিত > বৃংহিত » ইত্যাদি।

এই নিয়ম-অনুসারে, অন্তঃস্থ-ব w)-এর পূর্বে অনুস্বার হওয়া উচিত; « সংবাদ, কিংবা, প্রিয়ংবদা, বশংবদ, স্বয়ংবরা, সংবরণ » ইত্যাদি শব্দ, প্রাচীন সংস্কৃত উচ্চারণে ও লিখনে অনুস্বার যুক্ত হইত (saṃ-wāda, kiṃ-wā, priyaṃ-wadā, waśaṃ-wada, swayaṃ-warā, saṃ-waraṇa)। কিন্তু বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ-ব-এর প্রাচীন w (বা v) ধ্বনি পরিবর্তিত হইয়া, বর্গীয় ব বা b হইয়া গিয়াছে, এবং এই b-এর প্রভাবে পড়িয়া পূর্ববর্তী অনুস্বার ম্-হইয়া গিয়াছে [shombad, kimba, priyomboda, boshombodo, shoyombora, shomboron]—এবং তদনুসারে বাঙ্গালা অক্ষরে বানানেও বহুশঃ « সম্বাদ, কিম্বা, প্রিয়ম্বদা, বশম্বদ, স্বয়ম্বরা, সম্বরণ » দৃষ্ট হয়। « ং ব » স্থলে « ম্ব » লেখার কারণ—এই উচ্চারণের পরিবর্তন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এখনও বাঙ্গালায় সংস্কৃত-ভাষার রীতি-অনুসারে « ং ব » দিয়া এই-সকল শব্দ লেখা অধিকতর শিষ্ট-রীতি-সম্মত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় « ং ব » লেখাই ভাল।

[ঙ] স্বর-বর্ণের পরে « ছ » আসিলে, ছ-স্থানে « চ্ছ » হয়; যথা—« পরি+ছেদ > পরিচ্ছেদ; বৃক্ষ, তরু, বট+ছায়া > বৃক্ষচ্ছায়া, তরুচ্ছায়া, বটচ্ছায়া; অব+ছেদ > অবচ্ছেদ; বি+ছেদ > বিচ্ছেদ; মধু+ছন্দঃ > মধুচ্ছন্দাঃ (ব্যক্তির নাম); গায়ত্রী+ছন্দঃ > গায়ত্রীচ্ছন্দঃ; ভাষা+ছন্দঃ > ভাষাচ্ছন্দঃ » ইত্যাদি।

[চ] উৎ-উপসর্গের পরে স্থা-ধাতু ও স্তন্ভ্-ধাতুর স-কার লোপ

হয়; যথা—« উৎ+স্থান > উত্থান; উৎ+স্থাপন > উত্থাপন; উৎ+স্তম্ভ > উত্তম্ভ »।

[৭] « সম্ » ও « পরি » উপসর্গদ্বয়ের পরে কৃ-ধাতু আসিলে, ধাতুর পূর্বে স-কারের আগম হয়; যথা—« সম্+কৃত > সংস্কৃত; সম্+কার > সংস্কার; পরি+কার > পরিস্-কার > পরিষ্কার (ষত্ব-বিধান-অনুসারে স-স্থানে ষ—১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) » ইত্যাদি।

[৮] হ-কারের পূর্বে « ত্ » বা « দ্ » থাকিলে, « ত্ »-স্থানে « দ্ » হয়, « দ্ » অবিকৃত থাকে, এবং হ-কার, ধ-তে পরিবর্তিত হয় (ৎ+হ= দ্+হ > দ্ধ); যথা—উৎ+হৃত > উদ্ধৃত; তদ্+হিত > তদ্ধিত »।

[৯] পদের মধ্যে « ঘ (হ-কারের সহিত সংপৃক্ত), ধ » এবং « ভ »-এর পরে ত-কার আসিলে, « ঘ্ত (হ্ত), ধ্ত, ভ্ত » যথাক্রমে « গ্ধ (গ্ধ), দ্ধ (দ্ধ), ব্ধ (ব্ধ) »-তে পরিণত হয়; যথা—« দুহ্+ত > দুঘ্ত > দুগ্ধ; দহ্+ত > দঘ্ত > দগ্ধ; বুধ্+ত > বুদ্ধ; লভ্+ত > লব্ধ » ইত্যাদি।

[১০] বিসর্গ-সংক্রান্ত সন্ধি—

[ক] পদের অন্তস্থিত « র্ » ও « স্ (ষ্) »-স্থানে সংস্কৃতে বিসর্গ হয়; যথা—« অহর্—অহঃ; অন্তর্—অন্তঃ; মনস্—মনঃ; বয়স্—বয়ঃ; আশিস্, আশিষ্—আশীঃ, আশীর্ »। র-স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাকে র-জাত বিসর্গ, ও স-স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাকে স-জাত বিসর্গ বলে। বাঙ্গালায় এই অন্ত্য বিসর্গ উচ্চারিত হয় না। (কিন্তু « বয়স » শব্দের স-কারকে অ-কারান্ত-বৎ করিয়া, বাঙ্গালায় «বয়স্» শব্দ গঠিত হইয়াছে।)

[খ] বিসর্গ-যোগে অ-কারের ও-কারে পরিবর্তন—

(/০) অ-কারের পরে বিসর্গ থাকিলে এবং অ-কার পরে থাকিলে, পূর্ব অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, এবং পরবর্তী অ-কারের লোপ হয়; এই

লুপ্ত-অকার কখনও কখনও « ঽ » অক্ষর-দ্বারা প্রদর্শিত হয়; যথা—« বয়ঃ+অধিক > বয়োঽধিক, বয়োধিক; ততঃ+অধিক > ততোঽধিক, ততোধিক; যশঃ+অভিলাষ > যশোঽভিলাষ, যশোভিলাষ » ইত্যাদি।

(৵০) বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা « য, র, ল, ব, হ » পরে থাকিলে, অ-কার ও অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ উভয়ের স্থানে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়; যথা—« মনঃ+গত > মনোগত; মনঃ+মোহন > মনোমোহন; মনঃ+যোগ > মনোযোগ; অধঃ+মুখ > অধোমুখ; পুরঃ+হিত > পুরোহিত; মনঃ+রম > মনোরম; সদ্যঃ+জাত > সদ্যোজাত; মনঃ+জ > মনোজ; সরঃ+জ > সরোজ; সরঃ+বর > সরোবর » ইত্যাদি।

[গ] বিসর্গ ও « র »—

(/০) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অথবা « য, র, ল, ব, হ » পরে থাকিলে, « অ, আ » ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গ-স্থানে « র্ » হয়; « র্ » পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয়, কিংবা রেফ-রূপে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হয়; যথা—« নিঃ+অবধি > নিরবধি; নিঃ+আকার > নিরাকার; দুঃ+আত্মা > দুরাত্মা; দুঃ+অপনেয় > দুরপনেয়; চক্ষুঃ+উন্মীলন > চক্ষুরুন্মীলন; বহিঃ+গমন > বহির্গমন; নিঃ+গত > নির্গত; দুঃ+গতি > দুর্গতি; নিঃ+ঘোষ > নির্ঘোষ; নিঃ+ঝর > নির্ঝর; নিঃ+জল > নির্জল; দুঃ+দম > দুর্দম; দুঃ+বোধ > দুর্বোধ; আবিঃ+ভাব > আবির্ভাব; প্রাদুঃ+ভাব > প্রাদুর্ভাব; দুঃ+যোগ > দুর্যোগ; আশীঃ+বাদ, বচন > আশীর্বাদ, আশীর্বচন; দুঃ+অবস্থা > দুরবস্থা

জ্যোতিঃ+ইন্দ্র > জ্যোতিরিন্দ্র ; মুহুঃ+মুহুঃ > মুহু মুহুঃ, চতুঃ+ভুজ, হস্ত > চতুর্ভুজ, চতুর্হস্ত » ইত্যাদি।

(৵৹) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অথবা « য, র, ল, ব, হ » পরে থাকিলে, অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ নিজ মূল রূপ অর্থাৎ র-ভাব ফিরিয়া পায়, এবং এই র-কার পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয় ; যথা—« পুনর্=পুনঃ+আগত > পুনরাগত, পুনঃ+অপি > পুনরপি ; প্রাতর্—প্রাতঃ+আশ > প্রাতরাশ ; অন্তর্—অন্তঃ+ধান > অন্তর্ধান ; পুনঃ+বার > পুনর্বার » ইত্যাদি।

[ঘ] বিসর্গের « শ, ষ, স »-তে পরিবর্তন—

(৴৹) « চ » কিংবা « ছ » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে তালব্য « শ » হয়; যথা—« দুঃ+চরিত্র > দুশ্চরিত্র ; নিঃ+চয় > নিশ্চয় ; শিরঃ+ছেদ > শিরশ্ছেদ ; দুঃ+চিকিৎস্য > দুশ্চিকিৎস্য » ইত্যাদি।

(৵৹) « ট » কিংবা « ঠ » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে মূর্ধন্য « ষ » হয় ; যথা—« ধনুঃ+টঙ্কার > ধনুষ্টঙ্কার ; নিঃ+ঠুর > নিষ্ঠুর » ইত্যাদি।

(৶৹) « ত » কিংবা « থ » পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে দন্ত্য « স » হয় ; যথা—« ইতঃ+ততঃ > ইতস্ততঃ ; নিঃ+তেজ > নিস্তেজ ; মনঃ+তাপ > মনস্তাপ » ইত্যাদি।

(।৹) « ক খ, প ফ » পরে থাকিলে, অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ, দন্ত্য « স » হয় এবং « অ, আ » ভিন্ন অন্য স্বরের পরস্থিত বিসর্গ, মূর্ধন্য « ষ » হয় ; যথা—« নমঃ+কার > নমস্কার ; পুরঃ+কার > পুরস্কার ; তিরঃ+কার > তিরস্কার ; শ্রেয়ঃ+কর > শ্রেয়স্কর ; মনঃ+কামনা > মনস্কামনা ;

অয়ঃ + কান্ত > অয়স্কান্ত ; ভাঃ + কর > ভাস্কর ; বাচঃ + পতি > বাচস্পতি ; যশঃ + কর > যশস্কর ; ভ্রাতুঃ + পুত্র > ভ্রাতুষ্পুত্র ; নিঃ + কলঙ্ক > নিষ্কলঙ্ক ; ধনুঃ + পানি > ধনুষ্পাণি ; নিঃ + কর্মন্ > নিষ্কর্মা ; আবিঃ + কার > আবিষ্কার ; নিঃ + কৃতি > নিষ্কৃতি ; চতুঃ + কোণ > চতুষ্কোণ ; চতুঃ + তয় > *চতুষ্তয় > চতুষ্টয় ; বহিঃ + কৃত > বহিষ্কৃত » ইত্যাদি।

কিন্তু বহু শব্দে এই নিয়ম পালিত হয় না—বিসর্গ অবিকৃত থাকে (বিশেষতঃ « ক, প »-এর পূর্বে) ; যথা—« মনঃকল্পিত, শিরঃকম্পন, মনঃকষ্ট, অন্তঃকরণ, শিরঃপীড়া, তেজঃপুঞ্জ, অধঃপাত, যশঃপ্রার্থী, পয়ঃপ্রণালী, নভঃপ্রদেশ, দুঃখ » ইত্যাদি।

(৶০) « শ, ষ, স » পরে থাকিলে, বিসর্গ অবিকৃত থাকে, বা বিকল্পে পরবর্তী sibilant বা শিশ্-ধ্বনিটীর সহিত সারূপ্য লাভ করে (বাঙ্গালায় অবিকৃত বিসর্গ-ই প্রচলিত) ; যথা—« নমঃ + শিবায় = নমঃ শিবায় (বা নমশ্শিবায়) ; মনঃ + শান্তি > মনঃশান্তি (বা মনশ্শান্তি) ; তপঃসাধন ; মনঃসংযম » ইত্যাদি।

[ঙ] বিসর্গ-লোপ—

(৴০) অ-কার ভিন্ন স্বর পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না (এই সম্পর্কে পূর্বে দত্ত [খ] (৴০) নিয়ম দ্রষ্টব্য) ; যথা—« অতঃ + এব > অতএব ; তপঃ + আধিক্য > তপআধিক্য ; শিরঃ + উপরি > শিরউপরি ; যশঃ + ইচ্ছা > যশইচ্ছা » ইত্যাদি।

(৵০) র-কার পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ-স্থানে যে « র্ » হয়, তাহার লোপ হয়, এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয় ; যথা—

« নিঃ+রোগ > নীরোগ ; নিঃ+রস > নীরস ; নিঃ+রব > নীরব ; চক্ষুঃ+রোগ > চক্ষুরোগ » ইত্যাদি।

(৵০) « স্ত, স্থ বা স্প » পরে থাকিলে, বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয় ; যথা—« নিঃ+স্তব্ধ > নিঃস্তব্ধ বা নিস্তব্ধ ; অন্তঃস্থ, অন্তস্থ ; বক্ষঃস্থল, বক্ষস্থল ; দুঃস্থ, দুস্থ ; মনঃস্থ, মনস্থ ; নিঃস্পন্দ, নিস্পন্দ » ইত্যাদি।

(।০) সম্বোধন-সূচক সংস্কৃত অব্যয় « ভোঃ », স্বর-বর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ অথবা « য, র, ল, ব, হ »-এর পূর্বে আসিলে, উহার বিসর্গের লোপ হয় ; যথা—« ভোঃ রাজন্! > ভো রাজন্! ; ভোঃ অবনীপতে! > ভো অবনীপতে! » ইত্যাদি।

নিয়ম-বহির্ভূত সন্ধি

উপর্যুক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কতকগুলি সন্ধির উদাহরণ লক্ষণীয়—

« গীঃ+পতি > গীষ্পতি ('গীর্পতি, গীঃপতি' রূপ-ও হয়) ; অহন্ শব্দের ন্-স্থানে র্ হইয়া অহন্+অহন্=অহরহঃ, অহন্+নিশ > অহর্নিশ, অহঃ+রাত্র > অহোরাত্র, অহঃ+কর > অহস্কর, অহঃ+পতি > অহস্পতি বা অহর্পতি ; হরি+চন্দ্র > হরিশ্চন্দ্র ; গো+পদ > গোষ্পদ ; বৃহৎ+পতি > বৃহস্পতি ; বন+পতি > বনস্পতি ; পুংস্+লিঙ্গ > পুংলিঙ্গ, পুংস্+জাতি > পুংজাতি ; তদ্+কর > তস্কর ; আ+পদ > আস্পদ ; আ+চর্য > আশ্চর্য ; ষষ্ (ষট্)+দশ > ষোড়শ ; দিব্+লোক, দিব্+মণি > দ্যুলোক, দ্যুমণি ; পতৎ+অঞ্জলি > পতঞ্জলি ; পশ্চাৎ+অর্ধ > পশ্চার্ধ »।

সংস্কৃতে আরও বহু ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ আছে, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম-সিদ্ধ, কতকগুলি আপাত-দৃষ্টিতে নিয়ম-বহির্ভূত, কিন্তু বাঙ্গালায় আগত সেই-রূপ ধ্বনি- বা বর্ণ-পরিবর্তন-যুক্ত শব্দ তত বেশী নহে, এবং যেখানে সেই-রূপ শব্দ পাওয়া যায়, সেখানে বিশ্লেষ বা উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পুরা শব্দটী আয়ত্ত করাই সহজ। এই হেতু, সেই প্রকার শব্দের সন্ধির আলোচনা বাঙ্গালার পক্ষে বাহুল্য।

সন্ধি-সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খাঁটি বাঙ্গালার সন্ধির নিয়ম ও সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্; সুতরাং বাঙ্গালার অ-সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম ও বিদেশী শব্দে, উপরিলিখিত সংস্কৃতের সন্ধির নিয়মাবলী প্রযোজ্য নহে—অ-সংস্কৃত শব্দে ঐ সকল নিয়মের প্রয়োগ করিলে, ভাষার প্রকৃতির বিরোধী হয়। « তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট »-কে « তুম্যামারোপরাসন্তুষ্ট » বলিলে বা লিখিলে, বাঙ্গালা হয় না। বাঙ্গালায় দুইটী স্বর-বর্ণ মিলিত না হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকে; সংস্কৃতের অ-কারান্ত শব্দ সাধারণতঃ হসন্ত হইয়া বাঙ্গালায় উচ্চারিত হয়; এই হিসাবে সন্ধি করিয়া লিখিলে, বরং « তুমি আমারুপরসন্তুষ্ট » লেখা যায়—কিন্তু তাহাও বাঙ্গালার রীতি-বিরুদ্ধ। « চিতোর + উদ্ধার » সন্ধি করিয়া « চিতোরোদ্ধার » লিখিলে, না-বাঙ্গালা না-সংস্কৃত, কিছুই হইল না; « চিতোর » বাঙ্গালায় হসন্ত শব্দ—[চিতোর্]: « চিতোর্ + উদ্ধার্ = চিতোরুদ্ধার »-ই হওয়া উচিত; কিন্তু সন্ধি করিয়া এ-রূপে লেখা অপেক্ষা, শব্দগুলি বাঙ্গালায় পৃথক্ রাখাই ভাল।

কিন্তু সাধারণতঃ অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যে, বা সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যে, সন্ধি না করিলেও, সন্ধি-গ্রথিত বড়-বড় পদ সাধু-বাঙ্গালার বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্য বহন করিয়া থাকে বলিয়া, সংস্কৃত পদের অনুকরণে অ-সংস্কৃত (বিশেষতঃ বিদেশী) শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি সাধু-ভাষায় বহু স্থলে মিলে; যথা—« দিল্লীশ্বর, ইংলণ্ডাধিপতি, ব্রিটনেশ্বরী ('ভারতেশ্বরী'-র অনুকরণে), আইনানুসারে ('নিয়মানুসারে'র দেখাদেখি), হিসাবাদি, কোটাবৃত, গ্যাসালোক, জাহাজোপরি » ইত্যাদি। এ-রূপ স্থলে সন্ধি না করিয়া, কেবল পদ-সংযোজক চিহ্ন-দ্বারা সমাস-যুক্ত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়, বুঝিবার পক্ষেও সহায়তা হয়; যথা—« আইন-অনুসারে, হিসাব-আদি, কোট-আবৃত, গ্যাস-আলোক, জাহাজ-উপরি » ইত্যাদি। কিন্তু এই-রূপ সন্ধি-দ্বারা গ্রথিত কতকগুলি মিশ্র-শব্দ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে—« দিল্লীশ্বর, ব্রিটনেশ্বরী, আইনানুসারে » ইত্যাদি বহুশঃ ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃত-জ ও সংস্কৃত শব্দেরও সমাস- বা সংযোগ-কালে, কচিৎ সংস্কৃতের অনুকরণে সন্ধি দেখা যায়; যথা—« বনোমাঝে, মনোমাঝে »; আবার সংস্কৃত হইতে ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা পদ তৈয়ার করিয়া, সংস্কৃতের ধরণেও সন্ধি করিতে দেখা যায়; যথা—« মনান্তর (সংস্কৃত 'মনস্' হইতে উদ্ভূত বাঙ্গালা 'মন' শব্দ + 'অন্তর' শব্দ : সংস্কৃত রীতিতে 'মনঃ' + 'অন্তর' > 'মনোঽন্তর' এবং খাঁটী বাঙ্গালা রীতিতে 'মন্' + 'অন্তর' = 'মনন্তর' হওয়া উচিত,);

যশাকাঙ্ক্ষা (সংস্কৃত 'যশস্' হইতে বাঙ্গালা 'যশ্'+'আকাঙ্ক্ষা') ; প্রায়াগতা (সংস্কৃত 'প্রায়ঃ' হইতে বাঙ্গালা 'প্রায়্'+'আগতা') ; পাহাড়োপরি ('পর্বতোপরি'র দেখাদেখি) ; মনাগুন (মন+আগুন) ; ঢাকেশ্বরী ; দিল্লীশ্বর ; মক্কেশ্বর ; ষাঁড়েশ্বর ; (সংস্কৃতের 'জগদ্বন্ধু, জগন্মোহন, জগজ্জন' প্রভৃতির বিকারে বাঙ্গালা) জগবন্ধু, জগমোহন, জগজন » ইত্যাদি। « জ্যোতিঃ+ঈশ, জ্যোতিঃ+ইন্দ্র, তেজঃ+ইন্দ্র », বাঙ্গালায় বহুশঃ বিসর্গের দিকে দৃষ্টি না রাখায়, « জ্যোতীশ, জ্যোতীন্দ্র, তেজেন্দ্র » প্রভৃতি অশুদ্ধ রূপে মিলে (শুদ্ধ রূপ—'জ্যোতিরীশ, জ্যোতিরিন্দ্র, তেজসিন্দ্র' প্রভৃতি)।

সংস্কৃতের পদ-মধ্যস্থিত ধাতু ও প্রত্যয়ের এবং উপসর্গ ও ধাতুর সন্ধি বুঝিয়া লইলে, অনেক সময়ে সংস্কৃত শব্দের আলোচনা সহজ হয়। কিন্তু এইরূপ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণাঙ্গ শব্দ-হিসাবে আসিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে এগুলি যেন স্বয়ংসিদ্ধ ; যথা—« মৃন্ময়, সংসদ্, পরিষদ্, বহিষ্কার, নয়ন, পাচক, প্রাপ্তি, অত্যাচার, উড্ডীন, উত্থান » ইত্যাদি। এগুলির সন্ধি-বিশ্লেষ বাঙ্গালার জন্য তাদৃশ আবশ্যক নহে।

সংস্কৃত সমাসময় পদ একটী পূর্ণ-শব্দ-রূপে যেখানে ব্যবহৃত হয়, সেখানে লেখায় শব্দের ভিতরকার সন্ধি অব্যাহত রাখা কর্তব্য : « বিদ্যালয়, প্রাতরাশ, সায়মাশ, ভূম্যধিকারী, অন্তরাত্মা, সরোবর, ভ্রাতুষ্পুত্র, শিরশ্ছেদ, বাগ্‌রোধ » ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত সন্ধি-যুক্ত সমস্ত-পদের অংশীভূত পদ, বাঙ্গালা ভাষায় যেখানে পৃথক্ বা স্বাধীন পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে বাঙ্গালা গদ্যে বা পদ্যে, ভাষার লালিত্যের বা ছন্দোগতির অনুরোধে, সন্ধি ভাঙ্গিয়া পৃথক্ শব্দ-রূপে যথেচ্ছ বলিতে বা লিখিতে পারা যায় ; যথা—« নয়ন-অমৃত নদী প্রবাহিত হয় যদি ; একদা ভাদ্রের গঙ্গা তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে ; নয়নে নয়নে কথা, প্রেম-আলাপন ; নিশা-শেষে ঝ'রে পড় বসুধা-উপরে, সিউলি সুন্দরি ! ; নূপুর মঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা ; কনক-আসনে বসে দশানন বলী ; হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু-সহ ; কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন ; কমল-আলয় সরঃ ; তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ; প্রদীপ-আলোকে এস' ধীরে-ধীরে ; সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা » ইত্যাদি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, যেখানে মিলিত পদ দুইটীর নিজ-নিজ অর্থ অব্যাহত থাকে, সেখানে সন্ধি করিলে যদি শ্রুতি-কটু বা দুরুচ্চার্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় সন্ধি করা হয় না ; যথা—« সন্ধ্যা-আহ্নিক ; ঈশ্বর-ইচ্ছায় ; যথা-অভিরুচি ; পিতৃ-আজ্ঞা ; স্ত্রী-আচার ; প্রীতি-উপহার ; দেশ-উদ্ধার ; দৃষ্টি-আকর্ষণ ; শ্রীঅঙ্গ ; বাহু-আবেষ্টন ; নাম উচ্চারণ ; শরৎ-চন্দ্র ; শ্রীঈশ্বরচন্দ্র » ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সন্ধির পরিশিষ্ট : খাঁটী বাঙ্গালা মৌখিক সন্ধি

স্বর-সন্ধি—দুইটী স্বর পাশাপাশি অবস্থান করিলে, বাঙ্গালায় সে দুইটী অবিকৃত থাকে। বাঙ্গালা স্বরাঘাতের প্রভাবে শব্দের অভ্যন্তরস্থ স্বরের লোপ হয়—পূর্বে ইহা আলোচিত হইয়াছে (« দ্বিমাত্রিকতা » পর্যায়, পৃ° ৪৫ ; « ঝোঁক বা স্বরাঘাত » পর্যায়, পৃ° ৮২)। স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ফলে, শব্দের অভ্যন্তরে যে সন্ধি হয় ও যে স্বর-ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে (« স্বর-সঙ্গতি », « অপিনিহিতি » ও « অভিশ্রুতি » পর্যায়—পৃ° ৯৫, পৃ° ১০০ ও পৃ° ১০২)। এই প্রকার স্বর-ধ্বনির পরিবর্তন বাঙ্গালায় বহুশঃ লেখায় প্রদর্শিত হয় না।

ব্যঞ্জন-সন্ধি—

[১] পাশাপাশি ঘোষ- ও অঘোষ-ভেদে ভিন্ন শ্রেণীর দুইটী ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকিলে, দ্বিতীয়টী যদি ঘোষ-বর্ণ হয়, প্রথমটী অঘোষ হইলে উচ্চারণে ঘোষবৎ হয় ; এবং দ্বিতীয়টী যদি অঘোষ-বর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রথমটী ঘোষ থাকিলেও উচ্চারণে অঘোষ হইয়া যায় ; যথা—« এক + গুণ > উচ্চারণে [অ্যাগ্‌গুন্] ; « এক ঘা » > [অ্যাগ্ ঘা] ; « মুখ ঘোর » > [মুগ্‌ঘোর] ; « রাগ করে » > [রাক্ করে] ; « বাঁধ্ তাকে » > [বাঁৎতাকে] ; তদ্রূপ, « মেঘ ক'রেছে > [মেক্ কোরেছে] ; কাজ করা > [কাচ্ করা] ; হাত ধরা > [হাদ্‌ধরা] ; এত দিন > [এৎ দিন্] > [অ্যাদ্দিন্] ; হাট বাজার > [হাড্‌বাজার্] ([হাট্ বাজার্]-ও শোনা যায়—ট-বর্গের ঘোষবৎ রূপ প্রায় হয় না) ; মাঠ ঘাট > [মাড্ ঘাট্ (মাট্ ঘাট্)] ; পাপ ভয় > [পাব্ ভয়্] ; উপকার > উপ্‌গার > [উব্‌গার] ; কাজ চালানো > [কাচ্চালানো] ; নাট-মন্দির > [নাড্‌মন্দির্ (নাট্ মন্দির্)] ; সাত গুণ > [সাদ্‌গুন্] ; সব পাওয়া > [সপ্ পাওআ] ; সব কাজ > [সপ্ কাজ্] » ইত্যাদি। (বক্তা একটু সচেত হইয়া কথা কহিলে, বহু স্থলে এই প্রকার ঘোষ বা অঘোষে পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু যেখানেই বক্তা অনবহিত হইয়া কথা বলেন, সেখানেই এইরূপ পরিবর্তন হয়, বা হইবার দিকে একটা প্রবণতা আইসে।)

[২] পরবর্তী বর্ণের সহিত সারূপ্য বা সাগোত্র্য লাভ—

[ক] চ-বর্গের পরে « শ ষ স » থাকিলে, « চ » পরবর্তী ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয় : যথা—« পাঁচ শ > [পাঁশ্ শো] ; পাঁচ সের > [পাঁশ্‌শের] »।

[খ] ত-বর্গের পরে চ-বর্গের ধ্বনি আসিলে, ত-বর্গের ধ্বনি চ-বর্গের সঙ্গে বহু স্থলে বিকল্পে মিশিয়া যায়; যথা—« সাত জন > [শাদ্জন্, শাজ্জন্]; বাদ যাবে > [বাজ্জাবে]; নাত-জামাই > [নাদ্ জামাই, নাজ্ জামাই] ; হাত ছানি > [হাচ্ছানি] » ইত্যাদি।

[গ] পূর্বে « র », পরে অন্য ব্যঞ্জন আসিলে, র-কার সাধারণতঃ পরবর্তী ব্যঞ্জনের সহিত সারূপ্য লাভ করে (« শব্দের অভ্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লোপ-বিষয়ে প্রবণতা » দ্রষ্টব্য); যথা—« তর্ক, তক্ক; মূর্খ, মুক্খু; স্বর্গ, [শগ্গ]; মহার্ঘ (মহার্ঘ্য) মাগ্গি; চর্চ্চা [চচ্চা] ; ক'রূছে, ক'চ্ছে ; মূর্চ্ছা, মুচ্ছা, মুচ্ছো ; গর্জন, [গজ্জন] ; কর্জ, [কজ্জো]; নির্ঝর, [নিঝ্ঝর] ; কর্ণ, [কন্ন] ; চরণামৃত > চর্নামের্ত > চন্নামেত্ত ; কর্ত্তা, কত্তা; করিতে > ক'রতে, ক'ত্তে ; পার্ত, পাত্ত ; শর্দী, [শদ্দী] ; বর্ধন, [বদ্ধন] ; সর্প, সপ্প ; সর্ব্ব কর্ম্ম > সব্ব কম্ম ; ধর্ম্ম, ধম্ম ; কার্য [কাজ্জ] ; সূর্য, [সুজ্জ], সুজ্জি ; চার লাখ, [চাল্লাখ্]; মারলুম, মাল্লুম ; গর্ব্ব, [গব্ব] ; দর্শন > [দশ্শন] (গ্রাম্য উচ্চারণ) » ইত্যাদি।

যেখানে শব্দটী সুপ্রচলিত নহে, সেখানে র-কার এইরূপে পরিবর্তিত হয় না। ক্রিয়া-পদে « -ইব »-প্রত্যয়-স্থিত « ব »-প্রত্যয়ের পূর্বে « র » আসিলে, সেখানে র-এর পরিবর্তন ঘটে না : « করিবার, কর্‌বার: ধরিবে, ধ'র্‌বে » ([কব্বার, ধ'ব্বে] হয় না)।

মোটামুটি ভাবে, ইহাই বাঙ্গালার মৌখিক ব্যঞ্জন-সন্ধির নিয়ম। প্রায় সর্বত্রই পরবর্তী ব্যঞ্জন-ধ্বনির প্রভাবে, পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরিবর্তন হয়—এইরূপ পরিবর্তনকে **প্রত্যাবর্ত সমীকরণ** (Regressive Assimilation) বলে। ইহার বিপরীত রীতি—**পুরোবর্ত সমীকরণ** (Progressive Assimilation) অর্থাৎ পুরোবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন, বাঙ্গালায় অজ্ঞাত না হইলেও, নিতান্ত বিরল; যথা—« ফারসী zabt জাব্‌ৎ > বাঙ্গালা জব্দ্, জব্দ » (পূর্ববর্তী ধ্বনি ব-য়ের প্রভাবে পরবর্তী ত-য়ের ঘোষবৎ ভাব)।

[২.৮] ছন্দঃ (Prosody, Metrics)

মানুষ সহজ-ভাবে যে ভাষায় কথাবার্তা বলে, সেই ভাষার গতির একটা ভঙ্গী আছে। অর্থ-অনুসারে, বাক্যে আগত পদের ক্রম স্থির হয়; এতদ্ভিন্ন, সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় বাক্যকে তুল্য-গুণ-যুক্ত অংশে ভাগ করিবার, অথবা কোনও প্রকার অলঙ্কার-মণ্ডিত করিবার প্রয়াস করা হয় না। কথোপকথনের ভাষায় বাক্য-রচনা-রীতি ও সহজ গতি-ভঙ্গীর

উপরে গদ্য-সাহিত্যের ভাষা প্রতিষ্ঠিত। সহজ- ও সরল-ভাবে কিছু বলিয়া যাইতে হইলে, সাধারণ-ভাবে কোনও-কিছু আলোচনা করিতে হইলে, বা চিন্তার আদান-প্রদান করিতে হইলে, এই গদ্য-ভাষা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপযোগী, সার্থক ও সুন্দর শব্দ-চয়নের উপরে, এবং অন্তর্নিহিত ভঙ্গীটীকে মনোহর করার উপরে, গদ্য-ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

কিন্তু কবিত্বশক্তি-প্রভাবে, মানুষ যখন কল্পনা ও সৌন্দর্য-বোধ এবং অপার্থিব বস্তুর অনুভূতির অধিকারী হইয়া চিন্তা করে, বা দেখে, অথবা কিছু দেখিবার চেষ্টা করে, এবং যাহা সে চিন্তা করিয়াছে বা দেখিয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহে, তখন সাধারণ কথোপ-কথনের বা গদ্যের ভাষায় তাহার কুলায় না : তাহার ভাষার প্রায়ই রস-বস্তুর প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে একটী সুষমা-মণ্ডিত স্পন্দনে, একটী শ্রুতি-মধুর নৃত্য- বা তাল-ভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভাষার এই সুষমাময় স্পন্দন বা গতি-মাধুর্যকে ছন্দঃ (বা ছন্দ) বলা হয়। বাক্যকে, সমান-গুণ-যুক্ত, পরস্পরের সহিত সমতুল, কতকগুলি বাক্যাংশে বিভক্ত করায় বহু স্থলে ছন্দোবোধ জন্মে। ধ্বনি- ও অর্থ-ঘটিত নানা প্রকার অলঙ্কার, অনেক সময়ে এই ছন্দকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে, এবং ছন্দের সহিত অনেক সময়ে একাঙ্গীভূত হইয়া যায় : কিন্তু ভাষার এই স্পন্দনময় ভঙ্গীর নিজের একটী বিশেষ শক্তি ও ব্যঞ্জনা থাকে। Rhythm বা ছন্দোগতি, মানবের অন্তঃপ্রকৃতির ও বাহ্য বিশ্বপ্রকৃতির তাবৎ ব্যাপারের মধ্যে অন্তর্নিহিত বলিয়াই, মানবের ভাষাতেও ছন্দ আসিয়া গিয়াছে।

কোনও ভাষার ছন্দ, সেই ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির সহিত বিশেষ-ভাবে জড়িত ; ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির বিরুদ্ধে গমন করিলে বা উহাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করিলে ছন্দঃসৃষ্টি হইতে পারে না। উচ্চারণ-রীতি যেখানে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্, এরূপ অপর কোনও ভাষার ছন্দোবিধি, যথাযথ-রূপে একটী বিশেষ ভাষায় গৃহীত হইতে পারে না, বিদেশী ছন্দোবিধিকেই পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষার ছন্দের প্রকৃতি ও সূত্র, এবং বাঙ্গালা ছন্দের প্রকার-ভেদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল (পরিশিষ্ট, [৫.১])।

[৩] রূপতত্ত্ব

[৩.০১] শব্দ ঃ শব্দ-গঠন, শব্দের গঠন-মূলক শ্রেণী-বিভাগ ঃ মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ

[৩.০১১] শব্দ (Words) ঃ শব্দ-সাধন বা শব্দ-গঠন (Formation of Words) ঃ শব্দের গঠন-মূলক শ্রেণী (Formal Classification of Words) ঃ প্রকৃতি বা ধাতু (Roots) ঃ প্রাতিপদিক (Word Bases) ঃ পদ (Inflected Words) ঃ প্রত্যয় (Affixes) ঃ বিভক্তি (Inflexions) ঃ শব্দের অর্থ-মূলক শ্রেণী-বিভাগ (Semantic Classification of Words) ঃ বাক্যস্থ বিভিন্ন প্রকারের পদ (Parts of Speech)

বিশেষ বা স্বতন্ত্র পদার্থ বা ভাবকে প্রকাশ করে, মানব-মুখ-নিঃসৃত এমন একটী ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে (কিংবা তদ্রূপ ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির লিখিত রূপকে) শব্দ (Word) বলে ; যথা—• এ ; ও ; কে; মা ; ভাই ; চাঁদ ; হাত ; পা ; গাছ ; গোরু ; ঘোড়া ; ছেলেমি ; ভদ্র ; সুন্দর ; মনুষ্য ; ব্রাহ্মণ ; সাধুতা ; আতিথ্য ; জমী ; খাজনা ; দখল ; দলীল ; মোল্লা ; পুলিস ; মাষ্টার ; দেখা ; চলন • ইত্যাদি।

'পদার্থ' অর্থে, বৈশেষিক-দর্শন-মতে, 'দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সবিশেষ, সমবায়, অভাব' ; জটাধর-মতে, 'ভাব, ধর্ম, তত্ত্ব, সত্ত্ব, বস্তু' ; অর্থাৎ যাহা-কিছু আমরা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি, এবং বুদ্ধি, কল্পনা ও অনুভূতি-দ্বারা

দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই **পদার্থ** (Object)। শব্দ-দ্বারা যাহা-কিছু দ্যোতিত হইতে পারে, শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা কিছু, তাহা **পদার্থ**।

শব্দ দুই প্রকারের: [১] **মৌলিক** বা **স্বয়ংসিদ্ধ** (Simple Words বা Root Words); এবং [২] **সাধিত** (Derived Words বা Composed Words)।

[১] যে শব্দকে বিশ্লেষ করিতে পারা যায় না, যাহা কোনও পদার্থের **অভিধা** বা **নাম**, এবং যাহার প্রকাশিত অর্থই চরম;—যে শব্দকে ভাঙ্গিয়া বা বিশ্লেষ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে, হয় যে ভাষার শব্দ সেই ভাষায় তাহার বিশ্লেষ সম্ভব হয় না, না হয় তাহার ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট অংশের কোনও অর্থ হয় না;—সেইরূপ শব্দকে **মৌলিক** বা **স্বয়ংসিদ্ধ** শব্দ বলা যায়; যেমন—« মা; ভাই; হাত; পা; চাঁদ; ঘোড়া; উট; ছা; বউ; নাক; রঙ্ » ইত্যাদি।

অন্য ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ, সেই ভাষার মৌলিক বা মূল শব্দ না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় যদি সেগুলির বিশ্লেষ এবং বিশ্লেষ-অনুযায়ী ভগ্ন অংশের অর্থগ্রহ না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার পক্ষে সেগুলি মৌলিক শব্দ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য; যেমন—« হস্ত, চরণ, চন্দ্র, হস্তী, মনুষ্য, গতি, ভক্তি, আতিথ্য; জামিন, নাজির, বাজেয়াপ্ত, মজুর, মহকুমা; প্রিন্টার, রোমান্টিক, পিজবোর্ড, ইয়ারিং, লাটিন, ভোট » ইত্যাদি। উপর্যুক্ত শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, কতকগুলি ফারসী হইতে, বাকীগুলি ইংরেজী হইতে। এগুলির মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটাই নিজ নিজ ভাষায় মূল শব্দ নহে, এগুলিকে বিশ্লেষ করা যায়; যেমন—« ভজ্ » ধাতু + « তি » প্রত্যয় করিয়া « ভক্তি », « ভজ্ » ধাতু অর্থে ভজনা করা, ও « তি » ভাব-প্রকাশক প্রত্যয়; « আতিথ্য » শব্দ—« অতিথি » শব্দের অন্তে « য »-প্রত্যয় যোগ করিয়া (এই প্রত্যয়-যোগে মূল শব্দের আদ্য স্বর-বর্ণের বৃদ্ধি হয়); « বাজেয়াপ্ত » শব্দ ফারসীর « বাজ্ » অর্থাৎ 'পুনঃ, বা প্রতি' ও « য়াফ্‌ৎ » (অর্থাৎ 'প্রাপ্ত, গত') এই উভয়ের মিলনে নিষ্পন্ন; « মহকুমা » (মূলে মহ্‌কমহ্ ») শব্দ আরবীর « হ.কম »-ধাতুতে « মফ'অলহ্ » ওজনে বা পর্যায়ে, ম-উপসর্গ যোগে এবং ধাতুর স্বর-ধ্বনির যথা-রীতি

পরিবর্তনের ফলে নিষ্পন্ন ; « প্রিণ্টার », তদ্রূপ ইংরেজীর print « প্রিণ্ট্ » ধাতুতে -er « আর্ » প্রত্যয়-যোগে গঠিত ; এবং « পিজবোর্ট » ও « ইয়ারিং » সমাস-যুক্ত শব্দ paste-board « পেস্‌ট্‌+বোর্ড » ও ear-ring « ইয়ার্‌+রিঙ্ » হইতে জাত। (ইংরেজীর « লাটিন », « ভোট »—এই দুই শব্দকে ইংরেজীর বিদেশাগত মৌলিক শব্দ বলা যায়) বাঙ্গালার পক্ষে কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষ নিরর্থক ; বাঙ্গালার পক্ষে এই প্রকারের শব্দকে মৌলিক, পূর্ণার্থ, অবিশ্লিষ্ট বা অবিভক্ত শব্দ বলিয়া ধরাই স্বাভাবিক।

কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দ—মৌলিক ও সাধিত শব্দ—এত অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে যে, সংস্কৃতের এই সকল সাধিত শব্দের সাধন- বা গঠন-প্রণালীর আলোচনা, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদের প্রয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় ; যেমন—« ভূ » ধাতু হইতে জাত শব্দ—« ভূতি, অনুভূতি, বিভূতি, ভাব, ভব, ভবন, উদ্ভাবন, ভব্য, ভাব্য, ভূত, ভবিষ্যৎ, ভবিতব্য, বুভূষা, ভাবী » ; « কৃ » ধাতু হইতে « কৃত, কৃতি, কর্তা, কর, করী, কার, কারী, কারণ, কর্তব্য, চিকীর্ষা » ; « গম্ » ধাতু হইতে « গত, গতি, গম, গমন, গন্তব্য, গন্তা, গমনীয়, জঙ্গম, জিগমিষা » ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গালার প্রায় তাবৎ ধাতু সংস্কৃতের ধাতু-সমূহ হইতে উদ্ভূত, বহু ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ধাতু এবং সংস্কৃত ধাতু বা ধাতু-জাত কোনও-না-কোনও রূপ অভিন্ন ; যেমন—« কৃ—কর্ ; চল্ ; ধৃ—ধর্ ; দা—দে ; নী—নে ; লভ্—লহ ; জ্ঞা—জানাতি—জান্ ; দৃশ—দৃক্ষ—দেখ » ইত্যাদি। এই হেতু সংস্কৃত সাধিত পদগুলিকে বাঙ্গালা ব্যাকরণে, সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষারও সাধিত পর্যায়েই ফেলা হইয়া থাকে, এবং তদনুসারে মূল সংস্কৃতের ধাতু-প্রত্যয়াদি ধরিয়া সেগুলির গঠন আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ফারসী ও ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দ-সম্বন্ধে এইরূপ করা হয় না ; কারণ, (১) এগুলি সংস্কৃত শব্দের তুলনায় সংখ্যায় অল্প ; (২) সংস্কৃতের মত এই সব বিদেশীয় ভাষার—ইহাদের ধাতু ও প্রত্যয়ের—বাঙ্গালার সহিত কোনও মৌলিক যোগ নাই ; বিদেশীয় ভাষার শব্দ বিশ্লেষ করিলে, খাঁটী বাঙ্গালা অর্থাৎ প্রাকৃত-জ শব্দের সহিত কোনও দূর বা নিকট সম্পর্ক অনুভূত হয় না।

[২] সাধিত শব্দ দুই প্রকারের : [ক] প্রত্যয়-নিষ্পন্ন (Inflected Words), এবং [খ] সমস্ত (Compounded Words)।

[ক] যে-সকল শব্দ বিশ্লেষ করিলে, তাহাদের মধ্যে মৌলিক-ভাব-দ্যোতক একটি অংশ পাওয়া যায়, এবং ঐ মৌলিক ভাবটীর প্রসারক,

সঙ্কোচক অথবা অন্য উপায়ে উহার অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নকারী কোনও অংশ (যাহাকে প্রত্যয় বলে) পাওয়া যায়, সেই সকল শব্দকে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ বলে ; যেমন—« অজানা » শব্দ : « জান্ »—এই অংশ হইতেছে শব্দটীর মূল বা ধাতু, জ্ঞানার্থক ; তাহাতে « আ »-প্রত্যয়-যোগে হইল « জানা »—আ-য়ের প্রয়োগ হয়, ক্রিয়া হইতে বিশেষ্য-ভাব প্রকাশ করিতে ; এবং 'না'-অর্থে শব্দের পূর্বে বসিয়াছে « অ »-প্রত্যয় : « অ-জান্-আ > অজানা »। « ছেলেমি »—মূল শব্দ « ছা » (শিশু) + « আল »-প্রত্যয়, স্বার্থে ; « ছাআল » শব্দ, ব-শ্রুতিতে « ছাওয়াল » (পৃ° ১০৬), তৎপরে « ইয়া »-প্রত্যয়-যোগে, হ্রস্বার্থে—« ছাওয়ালিয়া » সংক্ষেপে « ছালিয়া », অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ফলে « ছেলে » ; তাহার উত্তরে « -আমি », ভাবার্থে বা ক্রিয়ার্থে (সংক্ষেপে « -মি ») প্রত্যয় = « ছেলেমি » ; « রাখালি »—মূল অংশ « রাখ্ » = 'রক্ষা করা' ; 'যে করে' এই অর্থে « -আল (প্রাচীন-বাঙ্গালা -ওয়াল) » প্রত্যয় : « রাখ্ + -আল » = « রাখাল », তাহার ভাব বা কার্য অর্থে « -ই (-ঈ) » প্রত্যয়— « রাখ্ + -আল + -ই = রাখালি » ; « হাতল »—« হাত » শব্দ + সাদৃশ্যার্থে বা সংযোগার্থে « -ল » প্রত্যয় ; ইত্যাদি।

[খ] যে-সকল শব্দ বিশ্লেষ করিলে, একাধিক মৌলিক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলিকে **সমস্ত** (অর্থাৎ সমাস-যুক্ত বা মিলিত) শব্দ বলা হয় ; যথা—« পা-গাড়ি, হাত-পাখা, জল-পথ, চাঁদ-মুখ, কমল-আঁখি, দিন-রাত » ইত্যাদি।

[৩.০১২] প্রকৃতি বা ধাতু ; প্রাতিপদিক ; পদ

ভাষায় যাহার বিশ্লেষ সম্ভবে না, এমন মৌলিক শব্দকে প্রকৃতি বলে। ১৫৯ন এই প্রকৃতি-দ্বারা কোনও দ্রব্য জাতি বা গুণ, অথবা অন্য পদার্থ

দ্যোতিত হয়, তখন তাহাকে নাম-প্রকৃতি বা সংজ্ঞা-প্রকৃতি বলা যায়।

প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বিশ্লেষে, মৌলিক ভাব-দ্যোতক যে অংশটুকু পাওয়া যায়, তাহা যখন কোনও দ্রব্য বা জাতি বা গুণ না বুঝাইয়া, অবস্থান বা গতি বা অন্য কোনও প্রকারের ক্রিয়া বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু-প্রকৃতি, অথবা সংক্ষেপে ধাতু বলে; যেমন—« মা, ছা, চাঁদ, হাত, হাট, নাট, কাঠ »—এগুলি নাম-প্রকৃতি ;« জান্, রাখ্, খা, যা, ধো »—এগুলি ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু। বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া-পদ বিশ্লেষ করিলে, ইহাদের প্রত্যয় ও বিভক্তি বাদ দিলে, ক্রিয়ার সাধারণ অর্থ-বাচক যে মূল অংশ পাওয়া যায়, তাহাও ধাতু ; যথা—« চলা, চলে, চলিল, চলুক্, চলিতে, চলায়, চলাইবে » প্রভৃতি ক্রিয়া-পদ এবং « চলন্ত, চলন, অচল, চাল, বেচাল, চালান, চল্‌কানো, চালনি » প্রভৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের মধ্যে, একই চল্-ধাতু বিদ্যমান, এবং এই চল্-ধাতুতেই প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া, তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া, এই সব পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

নাম-প্রকৃতিতে কিছু যোগ না করিয়া ইহাকে শব্দ-রূপে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাক্যে প্রয়োগ করিতে হইলে, এই নাম-প্রকৃতিতে সাধারণতঃ বিভক্তি-চিহ্ন যোগ করা হয়। ধাতু নিজে শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না—ইহাতে প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া তবে শব্দ-সৃষ্টি হয় ; এই প্রত্যয় বা বিভক্তি সাধারণতঃ প্রকট ও দৃশ্যমান, কিন্তু কখনও-কখনও অপ্রকট বা উহ্য থাকে (যেমন—« চল্, খা, দেখ্ » প্রভৃতি অনুজ্ঞার ক্রিয়া : এগুলিতে আপাততঃ কোনও প্রত্যয় দেখা যায় না, কিন্তু প্রাচীন-বাঙ্গালায় « -অ » বিভক্তি ছিল,—« চল', খাঅ, দেখ' » ; এখন এই প্রত্যয়ে অ-কার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে)।

বিভক্তি-বিহীন নাম-প্রকৃতি, অথবা সাধিত শব্দ, এবং ক্রিয়া-পদের বিশিষ্ট প্রত্যয়-যুক্ত কিন্তু বিভক্তি-হীন ধাতু-প্রকৃতি বা ধাতু—এই উভয়কে প্রাতিপদিক (Base, Word-base) বলে—নাম-প্রাতিপদিক ও ক্রিয়া-প্রাতিপদিক। (Affix বা প্রত্যয় এবং Inflexion বা বিভক্তির পার্থক্য নিয়ে দ্রষ্টব্য। প্রাতিপদিকের

পরে বিভক্তি-যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত পদ (Inflected Word) সৃষ্ট হয়। (প্রতিপদ শব্দের অর্থ 'আরম্ভ'; বিভক্তি-যুক্ত পদের আরম্ভ বা সূত্রপাত ইহা হইতেই, এই জন্য ইহাকে প্রাতিপদিক বলে।) «মা, হাত, চলন, বই, পড়া = 'পাঠ-ক্রিয়া'» —এগুলি হইল বিভক্তি-হীন নাম-প্রাতিপদিক (Noun-base); এইগুলি হইতে জাত বিভক্ত্যন্ত পদ—«মায়ের, হাতে, চলনের, বইয়ে, পড়াতে» ইত্যাদি। «রাখ্» ধাতু + «-ইল» প্রত্যয় = «রাখিল» (অতীত ক্রিয়া-বাচক); «চল্ + -ইব প্রত্যয় = চলিব» (ভবিষ্যৎ ক্রিয়া-বাচক); «থাক্ + -ইত = থাকিত» (পুরাঘটিতাবৃত্ত ক্রিয়া-বাচক): এগুলি ক্রিয়ার প্রাতিপদিক (Verb-base): «রাখিলাম, চলিবার, থাকিতে»— «-আম, -আর, -এ» বিভক্তি-যোগে ক্রিয়া-পদ সৃষ্ট হইয়াছে। বিভক্তিগুলি সাধারণতঃ সুস্পষ্ট-ভাবে শব্দের বা ধাতুর সহিত সংলগ্ন হয়; আবার কখনও-বা, শব্দ বা ধাতুর সহিত মিলিয়া যায়, বা লুপ্ত হইয়া যায়, অথবা উহ্য থাকে। «মায়ে বলে, পড় পুতা»—«মা» প্রাতিপদিক শব্দ, তাহাতে কর্তৃবাচক বিভক্তি «-এ (-য়ে)» যুক্ত হইয়া দাঁড়াইল বিশেষ-পদ কর্তৃকারক «মায়ে»; «বলে»—«বল্» ধাতু, বর্তমান কালে প্রথম-পুরুষ-বাচক বিভক্তি «-এ» -যোগে; «পড়»—«পড়্»-ধাতু + অনুজ্ঞা-সূচক বিভক্তি «-অহ», সংক্ষেপে «-অ» («পঢ়হ, পড়হ > পড়»); «পুতা»—«পুত» শব্দ, আদর-সূচক আ-প্রত্যয় যোগে «পুতা», সম্বোধনে বিভক্তি নাই। «আমি»—এই সর্বনাম শব্দের প্রাতিপদিক রূপ «আমা-», কর্তৃকারকের বিশেষ বিভক্তি-যোগে «আমি»। «মা বলিলেন»,—এখানে «মা» প্রাতিপদিক রূপের উপর প্রথমার বিভক্তি «-এ» উহ্য, বা বিশেষ বিভক্তি নাই।

অসমাপিকা ক্রিয়ার এবং কতকগুলি অব্যয়-শব্দে বিভক্তি যুক্ত হয় না—সেই-সব শব্দের সম্বন্ধে, প্রাতিপদিক রূপ বলিয়া কোনও অসম্পূর্ণ রূপ ধরা হয় না।

এই-রূপে দেখা যাইতেছে যে, ভাষা-গত পদ বিশ্লেষ করিলে, আমরা পাই—

[১] **নাম-প্রকৃতি বা সংজ্ঞা-প্রকৃতি** (Noun Root);

[২] **ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু** (Verb Root)।

এগুলির অর্থ সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট করিয়া দিবার জন্য, ইহাদের সহিত বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি যোগ হয়—

[৩] **প্রত্যয়** (Affix) : প্রত্যয়-দ্বারা প্রকৃতি (বিশেষতঃ ক্রিয়া-প্রকৃতি) অন্য ধাতু বা শব্দ সৃষ্টি করে। প্রত্যয়ান্ত পদকে প্রাতিপদিক (Word Base) বলে।

[৪] **বিভক্তি** (Inflexion বা Termination) : এগুলির যোগে, শব্দ ও ধাতু, পদে পরিণত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয়। বিভক্তি-যোগের পরে শব্দে আর কিছু যোগ হয় না।

[৩.০১৩] প্রত্যয় (Formative Affixes)—
[১] কৃৎ, ও [২] তদ্ধিত

ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইয়া যে-সকল প্রত্যয় শব্দ-সৃষ্টি করে, সেগুলিকে **কৃৎ-প্রত্যয়** (Primary Affixes) বলে ; যেমন—« √দেখ্+অন্= দেখন ; √খা+আ=খাআ, খাওয়া ; √চল্+অন্ত>চলন্ত ; √চাল্+অ্ >চাল, চাল্ » ইত্যাদি। (সংস্কৃত কৃৎ—« √দৃশ্+অন=দর্শন ; √যম্+ তি>যতি ; √কৃ+অ=কর ; √ভী+অ=ভয় ; √জাগৃ+উক= জাগরূক » ইত্যাদি।) কৃৎ-প্রত্যয়-সিদ্ধ পদকে কৃদন্ত বলে। কতকগুলি কৃৎ-প্রত্যয়-দ্বারা মূল ধাতু হইতে অন্য ধাতু গঠন করা হয় ; এইরূপ কৃৎ-প্রত্যয়কে ধাত্ববয়ব বলে ; যেমন—« √দেখ্+আ=দেখা » (যথা— « সে দেখায়, আমি দেখাই », ণিজন্ত রূপ)। শব্দের সহিতও যে প্রত্যয় যোগ করিয়া, নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহাও ধাত্ববয়ব, অতএব তাহাও কৃৎ-প্রত্যয়ের মধ্যে গণ্য ; যথা—« দাগ্+-আ>দাগা (=দাগ দেওয়া); চমক্+-আ > চমকা »।

নাম-শব্দ বা সাধিত শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাকে তদ্ধিত (Secondary Affixes) বলে ; যেমন—« সাধু+-তা > সাধুতা ; মিঠা+ -আই > মিঠাই ; ঢাকা+-ঈ > ঢাকাই ; হিন্দু+-ত্ব=হিন্দুত্ব ; জেঠা+ -আমি > জেঠামি » ইত্যাদি।

[৩.০১৪] **বিভক্তি** (Inflexions) : [১] **শব্দ-বিভক্তি** (Noun বা Nominal and Pronominal Inflexions বা Declensional Inflexions) ও [২] **ক্রিয়া-বিভক্তি** (Verbal Inflexions বা Conjugational Inflexions)

শব্দ-বিভক্তি-যোগে নাম (ও সর্বনাম) পদ হয়—বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন ও কারক প্রকাশিত হয় ; যথা—« মায়েরা, তাদের, চাঁদের, সকলকার, ঘরে, বাড়ীতে, হাতে, আমায়, তাঁকে » ইত্যাদি। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত শব্দ-বিভক্তির একটী নাম হইতেছে সুপ্ ; বিভক্তি-যুক্ত নাম বা সর্বনাম পদকে সুবন্ত (সুপ্+অন্ত) পদ বলে।

ক্রিয়া-বিভক্তি, ধাতুতে ও প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ধাতু-প্রাতিপদিকে যুক্ত হইয়া, ক্রিয়া-পদের সৃষ্টি করে। ক্রিয়া-বিভক্তির একটী প্রাচীন সংস্কৃত নাম তিঙ্ ; বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়া-পদকে তিঙন্ত (তিঙ্+অন্ত) পদ বলে। ধাতুর উত্তর কাল-বাচক প্রত্যয়, ও তাহার উত্তর বিভক্তি, সমস্ত মিলিয়া ক্রিয়া-পদ হয় ; যথা—« কর্+-ইল্=করিল্+-আম=করিলাম ; খা+-ইব্=খাইব্+-এন্=খাইবেন»। বর্তমানের ক্রিয়ায় কিন্তু কাল-বাচক বিশেষ রূপ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না—ইহাতে মাত্র বিভক্তি-দ্বারাই কাল ও পুরুষ উভয়ই ব্যক্ত হয় (যথা—«করে, করি, করিস্ (কর্+-এ, -ই, -ইস্) » ইত্যাদি)।

প্রকৃতি- ও প্রত্যয়-দ্বারা কেবল অসংলগ্ন শব্দ-সৃষ্টি হয় মাত্র। বিভক্তি-দ্বারাই ইহাদের পরস্পরের সংযোগ বা সম্বন্ধ সুস্পষ্ট হয়, পূর্ণ অর্থের প্রকাশ হয়। যেখানে বিভক্তির অভাব, সেখানে বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তি-হীন শব্দগুলির অবস্থান সুনির্দিষ্ট থাকে, শব্দের ক্রম (Word-Order) দ্বারা সেখানে বিভক্তির অভাব পূরিত হয়। « বাঘ » ও « মানুষ » এই দুইটী শব্দ ; « মার্ » একটী ধাতু ; বিভক্তি-যুক্ত পদ « বাঘে », বিভক্তি-যুক্ত অথবা বিভক্তি যাহাতে উহ্য আছে এমন পদ « মানুষকে » বা « মানুষ » এবং বিভক্তি-যুক্ত ক্রিয়া-পদ

« মারে » ;—তিনে মিলিয়া বাক্য হইল, « বাঘে মানুষকে মারে » বা « বাঘে মানুষ মারে »। বাক্যটির কর্তায় ও কর্মে বিভক্তি থাকায়, বাক্যগত শব্দের ক্রম একটু উল্টাইয়া দিলে, অর্থ-বিকৃতি হয় না ; যেমন—« মানুষকে বাঘে মারে »। কিন্তু যেখানে কর্তায় বা কর্মে, কোথাও প্রকট-রূপে বিভক্তি থাকে না, সেখানে—প্রথম কর্তা, পরে কর্ম, শেষে ক্রিয়া—এই ক্রম পরিবর্তিত করিয়া দিলে, অর্থ-সঙ্কট ঘটে ; যথা—« বাঘ মানুষ মারে » ;—কিন্তু « মানুষ বাঘ মারে », এই-রূপে কর্তা ও কর্মের অবস্থান উল্টাইয়া দিলে, অর্থ অন্য রূপ হইয়া যায়।

বাঙ্গালায় ধাতুর বা শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ না করিলে, অর্থগ্রহই হয় না ; যথা—« বাঘ মানুষ মার্ »। বিভক্তির কার্য—সম্বন্ধ-ব্যঞ্জনা ; প্রত্যয়ের কার্য—ধাতু বা প্রাতিপদিকের প্রকার-ব্যঞ্জনা ; এবং মৌলিক শব্দ বা ধাতুর কার্য—মৌলিক-পদার্থ-ব্যঞ্জনা।

[৩.০১৩] শব্দের অর্থ-মূলক শ্রেণী-বিভাগ (Semantic Classification of Words)

উপরে, সাধন বা গঠনের দিক্ দিয়া শব্দ-বিচার করা হইল। অর্থের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, যৌগিক তথা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন এবং সমস্ত বা সমাস-যুক্ত শব্দকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায় :—

[১] যৌগিক বা যোগ শব্দ (Words of Derivative Sense) : (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে, বা একাধিক শব্দের সংযোগে, যে অর্থ হওয়া উচিত, এই-সকল শব্দে সেই অর্থই প্রকাশিত হয় ;) যথা—« রাখাল ('যে রাখে বা রক্ষা করে', বিশেষ করিয়া 'যে গোরু রক্ষা করে'); মিতালি ('মিতা বা বন্ধুর ভাব') ; দাতা ('যিনি দান করেন') ; অণ্ডজ ('ডিম হইতে যে জীবের উৎপত্তি') ; পিতৃহীন, রাজপুরুষ, মালগাড়ী » ইত্যাদি।

[২] রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ (Derived Words of Specialised Sense) : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুসারী অর্থ না হইয়া, যেখানে শব্দের দ্বারা অন্য কিছু বিশেষ পদার্থ বুঝাইয়া থাকে, তাদৃশ শব্দকে রূঢ় বা রূঢ়ি

শব্দ বলে ; যথা—« জেঠাম (মূল-গত অর্থ—'জেঠার মত কাজ' ; রূঢ়ি অর্থ—'চাপল্য') ; শত্রু (ধাতু ও প্রত্যয়-গত অর্থ—'যে ধ্বংস করে', রূঢ়ি অর্থ—'যে বিরোধী হয়') ; সন্দেশ ('মিষ্টান্ন'-অর্থে ; মূল অর্থ, 'সংবাদ') ; পাঞ্জাবী ('এক প্রকারের জামা'-অর্থে) ; হস্তী, করী (মূল-গত অর্থ—'যাহার হাত আছে' ; কিন্তু পশু-বিশেষ 'হাতী'-অর্থে রূঢ়ি) » ইত্যাদি।

[৩] যোগরূঢ় শব্দ (Compounded Words of Specialised Sense) : (একাধিক শব্দ বা ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন, অথবা সমাস-যুক্ত শব্দ, যেখানে অপেক্ষিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া, বিশেষ কোনও অর্থে ব্যবহৃত হয় (যেমন, সমগ্র জাতিকে না বুঝাইয়া, সেই জাতির অন্তর্গত কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়), তদ্রূপ শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলে); « সরোজ ('যাহা সরোবরে জন্মায়'—সরঃ+জ, 'পদ্ম'-অর্থে রূঢ়ি) ; জলদ (জল-দ='যাহা জল দেয়'—বিশেষ অর্থ, 'মেঘ') ; সুহৃৎ (সু-হৃৎ='সুন্দর হৃদয় যার'—বিশেষ অর্থে 'বন্ধু') ; রাজপুত ('রাজার পুত্র'—বিশেষ অর্থে 'ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধ-জাতি-বিশেষ') » ইত্যাদি।

[৩.০১৬] বাক্য ও বাক্য-গত বিভিন্ন প্রকারের পদ (Sentence ও Parts of Speech)

বক্তা যাহা বলিতে চাহে, তাহাকে পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করে এরূপ পদ বা পদ-সমষ্টিকে বাক্য বলে ; যথা—« জল পড়ে ; পাতা নড়ে ; মা ডাকিতেছেন ; আমি কল্য কলিকাতায় যাইব ; তুমি আসিলে পরে আমরা খাইতে বসিব ; যদি সে না দেয় তাহা হইলে আমি দিব » ইত্যাদি। একপদময় বাক্যে, অন্য পদ উহ্য থাকে ; একপদময় বাক্যের নিদর্শন :— « দেখ। » (অনুজ্ঞা ক্রিয়া—'তুমি ইহা বা উহা দেখ') ; « এসো » (—'তুমি আইস') ; « 'তোমার হাতে কি ?'—'বই।' » (অর্থাৎ 'বই

আছে’); « ‘আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি’—‘বেশ্!’ » (=‘বেশ হইয়াছে’); « ‘সে বাড়ী যাবে ?’—‘যাক্’ » ইত্যাদি।

[বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যের প্রকৃতি ও বাক্যে শব্দের ক্রম ইত্যাদি, বাক্য-রীতি (Syntax বা Word-Order) অংশে আলোচিত হইয়াছে।]

বাক্য-মধ্যে, বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির কার্য ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচার করিলে, এগুলিকে মুখ্য পাঁচটী শ্রেণীতে ফেলা যায় : [১] নাম বা বিশেষ্য ; [২] বিশেষণ ; [৩] সর্বনাম ; [৪] ক্রিয়া ; এবং [৫] অব্যয় ও অব্যয়-স্থানীয়।

[১] নাম, সংজ্ঞা বা বিশেষ্য (Noun)

যে শব্দ, দৃষ্ট অথবা অদৃষ্ট, চক্ষু কর্ণ মন আদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অথবা ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত অনুভূতি-সাপেক্ষ কোনও পদার্থের নাম ; এবং যাহাকে বাক্য-মধ্যে অবস্থিত অথবা উহ্য, গুণ- বা ধর্ম-বাচক অন্য কোনও শব্দ বা শব্দাবলী-দ্বারা নিজ জাতি বা শ্রেণী হইতে পৃথক্ বা বিশিষ্ট করা যায় ; সেইরূপ শব্দকে নাম বা বিশেষ্য বলে।

যে শব্দ-উচ্চারণেই, কোনও সামান্য বা বিশেষ দ্রব্যের আকৃতি, মানস-চক্ষে উদ্ভূত হয় ; অথবা মানসিক ধারণা-শক্তির কিংবা আধ্যাত্মিক অনুভূতি-শক্তির গ্রাহ্য কোনও গুণ বা ধর্ম বা কার্য, একটী স্বতন্ত্র পদার্থ-রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় ; তাহা সেই দ্রব্যের, অথবা গুণ বা ধর্ম বা কার্যের, নাম ; যেমন—« মানুষ ; বুদ্ধদেব ; আকবর ; রাজা ; গাছ ; অশ্বত্থ ; বই ; রামায়ণ ; জল ; ঘোড়া ; ভূমি ; বঙ্গদেশ ; কলিকাতা ; যাওয়া ; খাওয়া ; দৌড়ানো ; স্রোত ; আকর্ষণ ; লৌহ ; বায়ু ; স্বর্গ ; দেবতা ; স্বর্গদূত ; ফেরেস্তা ; যম ; আজ্রাইল ; ঠাকুর ; পীর ; সুখ ; দুঃখ ; খাড়াই ; উচ্চতা ; নীচতা ; স্নায় ; মুক্তি ; জীবন ; মৃত্যু ; ইস্কুল ; নীলিমা ; দয়া ; শৌর্য ; ঈশ্বর ; আত্মা » ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোনও বিশেষ গুণ বা ধর্ম আরোপ করিয়া ইহাদের বিশেষ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়, এবং এইরূপে পৃথক্ বা বিশিষ্ট করা যায় বলিয়া, এই প্রকার নাম-শব্দকে

বিশেষ্য বলে; যথা—« ভালো মানুষ; কাঁধে-লাঠি মানুষ »—এখানে বিশেষণ-পদ « ভালো » বা বিশেষণ-বাচক শব্দ-সমষ্টি « কাঁধে-লাঠি » দ্বারা, সাধারণ মানুষ-জাতি হইতে একটী মানুষ বা এক অবস্থার মানুষকে বিশিষ্ট বা পৃথক্ করা হইল; তদ্রূপ, —« লাল ঘোড়া; বড় গাছ; ঐশী শক্তি; ধর্মময় জীবন; বাঁকা চলন; টাকার লোভ; পেটা লোহা; ভক্তের ভগবান্ » ইত্যাদি। বিশেষ বস্তুর নাম, যে বস্তু একটীর বেশী নাই, তাহাকে তাহার জাতি হইতে বিশেষণ-যোগে পৃথক্ করিয়া লইবার উপায় নাই, নামটী আপনা হইতেই বিশিষ্ট হইয়া আছে; যেমন—« বুদ্ধদেব; আকবর; কলিকাতা »; কিন্তু « শিশু বুদ্ধদেব, প্রৌঢ় আকবর বা বর্দ্ধিষ্ণু আকবর বা বিজেতা আকবর, প্রাচীন কলিকাতা »—এইরূপে উক্ত-প্রকার নাম-সমূহের অবস্থা-বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রদর্শন করা যায়।

[২] বিশেষণ (Adjective)

যে শব্দের দ্বারা নামের, বা ক্রিয়ার, বা অন্য কোনও বিশেষণের, গুণ বা ধর্ম, কার্য বা অবস্থা-বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রকটিত হয়, তাহাকে **বিশেষণ** বলে; যেমন—« পাঁচ হাত; লম্বা দাড়ী; উঁচু নজর; খুব ভাল লোক; অতি নিরীহ মানুষ; বেশ গায়; চমৎকার নাচে » ইত্যাদি। সম্বন্ধ-বাচক ষষ্ঠী বিভক্তির নাম-পদও বিশেষণ-স্থানীয়: « ভাতের হাঁড়ী, সোনার দাঁত, মামার বাড়ী »। অসমাপিকা ও অন্য ক্রিয়া-পদও বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হয়: « নাচিয়া-নাচিয়া চলে; গেল বৎসর; আস্‌ছে কাল »।

[৩] সর্বনাম (Pronoun)

বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত অথবা অপ্রযুক্ত কোনও নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, এইরূপ পদকে **সর্বনাম** বলে। **প্রতিনাম**—এই শব্দও এই প্রকার পদের জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা—« রামবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম, শুনিলাম তিনি বাড়ী নাই »; এখানে « তিনি » পদটী, « রামবাবু » এই নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। « আমি বলিয়াছিলাম যে তোমার

সঙ্গে একত্র যাইব »—এখানে « আমি » বক্তার ও « তোমার », যাহাকে বলা হইতেছে তাহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। « কে যায় ? » —এখানে « কে » শব্দ কোনও অজ্ঞাত ও অনুল্লিখিত-পূর্ব ব্যক্তির স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সর্বনাম-পদ ব্যবহারের দ্বারা একই নাম-শব্দকে বার-বার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না।

[৪] ক্রিয়াপদ বা আখ্যাত (Verb)

যে পদ-দ্বারা, বাক্য-স্থিত কোনও পদার্থের অবস্থান-সম্বন্ধে ; বা তদ্দ্বারা, তৎপ্রতি কিংবা তদর্থে কোনও-কিছু করণ- বা ঘটন-সম্বন্ধে ; এবং এই অবস্থান, করণ বা ঘটনের কাল ও রীতি-সম্বন্ধে—পূর্ণ বোধ জন্মে, তাহাকে ক্রিয়া বলে।

পদার্থ বা বিশেষ্যের অবস্থা অথবা কার্য-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করে বলিয়া, ক্রিয়া-পদের আর একটী নাম আখ্যাত ; এই 'আখ্যাত'-নামটী ক্রিয়ার এই লক্ষণের কথা স্মরণ করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণকারগণ-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল ; এবং আধুনিক কালে ডেনমার্কের বৈয়াকরণ পণ্ডিত Madvig মাদ্‌ভিগ্ এই হেতুই ক্রিয়া-পদ বুঝাইবার জন্য ডেনীয় ভাষায় নূতন নাম-করণ করিয়াছেন—Udsagnsord, (=Out-saying-word), অর্থাৎ 'যে শব্দ-দ্বারা বিশেষ্যের অবস্থা-সম্বন্ধে পরিস্ফুট করিয়া বলা যায়'। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে Verb অর্থে আখ্যাতিক পদ এই সংজ্ঞাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজীর Verb শব্দ লাটিনের Verbum [ৱের্‌বুম্] ও তজ্জাত ফরাসীর Verbe শব্দ হইতে গৃহীত ; ইহার অর্থ—'শব্দ'—অর্থাৎ, বাক্য-মধ্যে প্রযুক্ত বিশেষ-অর্থ-দ্যোতক শব্দ। জর্মান ভাষায় ক্রিয়াকে Zeitwort (=Tide-word) বা 'কাল-নির্দেশক শব্দ' বলে—যেন কেবল কাল-নির্দেশই ক্রিয়ার কার্য ; জর্মানে Tatwort (=Deed-word) বা 'ক্রিয়া-পদ' শব্দটীও প্রযুক্ত হয়। « ক্রিয়া-পদ », Verb, Zeitwort ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা, « আখ্যাত » শব্দ-দ্বারাই ক্রিয়ার লক্ষণ সুষ্ঠুতর-ভাবে দ্যোতিত হয় ; বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য নাম-পদ, অর্থাৎ ক্রিয়ার যে কর্তা, তাহার বিশেষ-ভাবে অবস্থানের

বা বিশেষ কার্যের বিধান বা ব্যাখ্যা করে বলিয়া, এইরূপ ক্রিয়াকে বিধেয়-পদ (Predicate)-ও বলে।

ক্রিয়া-পদের দৃষ্টান্ত—« রাম যায় ; শীত পড়িয়াছে ; খাওয়া শেষ হইল ; লোভ ত্যাগ করিবে ; ন্যায়-ধর্ম্মই রাজ্য রক্ষা করে ; আমি কাল সকালে দেখা করিব ; মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন » ইত্যাদি। এই-সকল বাক্যে পদার্থের অবস্থান বা তাহাদের দ্বারা কৃত কর্ম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কিছু ঘটন—এই সব ব্যাপারের পূর্ণ পরিচয় পাইতেছি, এবং বাক্যস্থ বিষয়টীর কাল-সম্বন্ধে এই ক্রিয়া-পদের দ্বারাই আমাদের পূর্ণ বোধ ঘটিতেছে।

« সে করিবে »—« করিবে » ক্রিয়াপদ, ভবিষ্যৎ বাচক, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিভক্তি-বিহীন প্রাতিপদিক রূপ « করিব্ » হইতে যে ক্রিয়া-দ্যোতক নাম-শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে (যেমন « করিবা »—যথা, « করিবা-র, করিবা-মাত্র »), তাহা হইতে কাল-বিষয়ে অথবা উদ্দেশ্য- বা বিশেষ্য-বিষয়ে অথবা কর্তার বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় না। অসমাপিকা ক্রিয়া « করিবা »-পদটীকে এই জন্য « আখ্যাত » বলা চলে না।

[৫] অব্যয় ও অব্যয়-স্থানীয় পদ (Indeclinables—Conjunctions, Interjections, etc.)

বাক্য-গত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রকার-বিষয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে অব্যয় বলে।

সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের ন্যায়, লিঙ্গ, বচন, কারক, এবং কাল- ও পুরুষ-বাচক প্রত্যয়-বিভক্তি গ্রহণ করিত না ; বিভক্তি-যোগে এগুলির মূল রূপের অথবা অর্থের কোনও ব্যয় অর্থাৎ 'ক্ষয় বা সংকোচ বা পরিবর্তন' হইত না,—

এই জন্য এগুলিকে অ-ব্যয় বলা হইত ; যথা—« অপি ; চ ; তথা ; উত ; তু ; ননু » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এইরূপ বিকার-হীন অব্যয় শব্দ আছে ; যথা—« আর ; না ; ও ; তো » ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃত ও অ-সংস্কৃত উভয় প্রকারের বহু বিভক্তি-যুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদ, এবং উক্ত-প্রকার পদের সংযোগে সৃষ্ট বাক্যাংশ, বাঙ্গালা-ভাষায় অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« বরং ; কিন্তু ; অর্থাৎ ; বলিয়া ; তাহা-হইলে » ; এগুলি অব্যয়-পর্যায়েই পড়ে। অব্যয়ের আলোচনা-কালে এগুলি বিচার করা হইবে।

[৩.০২] শব্দ-গঠন—কৃৎ- ও তদ্ধিত-প্রত্যয়
(Word Formation : Affixes—Primary and Secondary)

[৩.০২১] বাঙ্গালা (প্রাকৃত-জ) কৃৎ-প্রত্যয়

ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতুতে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাকে কৃৎ বলে। বাঙ্গালা ভাষার কৃৎ-প্রত্যয়গুলি সাধারণতঃ প্রাকৃত প্রত্যয় বা শব্দ হইতে লব্ধ। এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে সংস্কৃতের বিশেষ কৃৎ-প্রত্যয় পাওয়া যায়—এগুলির দুই-একটী আবার বাঙ্গালা বা প্রাকৃত-জ ধাতুর সহিতও ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত প্রাকৃত-জ কৃৎ-প্রত্যয়গুলি বাঙ্গালায় মিলে ; প্রাকৃত-জ ধাতুর সঙ্গেই এগুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে, বাঙ্গালায় আগত তৎসম ধাতুর সহিত এগুলি প্রায় যুক্ত হয় না।

[১] «-অ » প্রত্যয়। আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণে এই প্রত্যয় এখন লুপ্ত। ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়-যোগে, ধাতু-গত ক্রিয়া-বাচক নাম-শব্দের সৃষ্টি হয় ; যথা—« ধর-পাকড়, ভাঙ-গড়, ভাঙ-চুর ; রহ-সহ করা, পাক ধরা, কাট ধরা, চল নাই, কাট-ছাঁট, ছাড়-পত্র, বাড়-বাড়ন্ত, জিত » ইত্যাদি। সকল ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয় না ; বিশেষতঃ স্বরান্ত ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় মিলে না। (অনেক স্থলে, প্রাকৃত-জ শব্দের

বিকারে জাত লুপ্ত-অকারান্ত শব্দের সহিত, এই অ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ অভিন্ন ; কিন্তু বাঙ্গালায় অর্থ ধরিয়া, প্রত্যয়টীর অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় এই অ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দগুলি ক্রিয়াদ্যোতক বিশেষ্য হইয়া থাকে।)

[২] « -অ » প্রত্যয় : এই « অ » উচ্চারিত, এবং ইহা অনুরূপ প্রত্যয় « -ও » বা « -উ » হইতে অভিন্ন। প্রবণতা, ঈষদ্ভাব, এবং কল্পভাব অর্থাৎ 'প্রায় এইরূপ, পূর্ণভাবে এইরূপ নহে'—এই অর্থে, ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয় ; যথা—« কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), মরো-মরো, পাকো-পাকো, উড়ু-উড়ু, নিবো-নিবো বা নিবু-নিবু, ডুবু-ডুবু, দাউ-দাউ করিয়া জলা, হবু-জামাই < হোউ » ইত্যাদি। এই প্রত্যয়-বিশিষ্ট শব্দের সাধারণতঃ দ্বিত্ব হয়—এবং এগুলি বিশেষণ-শব্দ।

[৩] « -অন », বিকারে স্বর-বর্ণের পরে « -ওন » : ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য সৃষ্টি করে, এবং অর্থ বহুশঃ ক্রিয়া-বাচক হইতে বস্তু-বাচক হইয়া যায় ; যথা—« √খা—খা-অন>খাওন ; √হ—হ-অন>হওন ; √থাক্—থাকন ; √নাচ্—নাচন ; দেখন, বিঁধন (বেঁধন), ঝুলন ; √উজা—উজান ; শুনন, কলন, কাঁদন »। « মরণ (=মরন), করণ (=করন), ধর্—ধরণ (=ধরন), ধার—ধারণ (=ধারন) » ইত্যাদি কতকগুলি শব্দে সংস্কৃতের « -অণ », এই মূর্ধন্য-ণ-যুক্ত রূপ পাওয়া যায়। বস্তু-বাচক—« √ঝাড়্—ঝাড়ন (='ধূলা প্রভৃতি ঝাড়া,' এবং 'ধূলা ঝাড়িবার বস্ত্র-খণ্ড'), √কুড়্—কোড়—কোড়ন, √ঢাক্—ঢাকন » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বাচক প্রত্যয়-হিসাবে, « -অন »-এর ব্যবহার চলিত-ভাষায় ও সাধু-ভাষায় কিছু কম ; অধুনা পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায়ই ইহার প্রচলন অধিক।

« -অন » প্রত্যয়ের প্রসার—

[৩ক] « অন+-আ > -অনা », এবং দ্বিমাত্রিকতা-হেতু অ-কার-লোপে « -না » ; যথা—ক্রিয়া-বাচক—« √কান্দ্—কান্দন+-আ >

কান্দনা, *কান্ননা, *কাননা > কান্না, কান্না ; √গাহ্+-অন+-আ > গাহনা, *গাঅনা>গাওনা ; √দে+-অন+-আ > দেনা ; √পা+-অন +-আ > *পাঅনা, পাওনা ; √রান্ধ্+-অন+-আ > রান্ধনা, রান্না > রান্না » ইত্যাদি। বস্তু-বাচক—« √কুট্—কুটনা (=খণ্ডে খণ্ডে কাটা শাক-শব্জী ; √বাট্—বাটনা ; √ঢাক্—ঢাকনা ; √বাজ্—বাজনা »। বিশেষ্য ও বিশেষণ—« √মাঙ্গ্—মাঙ্গন, মাঙ্গনা ; √শুখা—শুখানা, শুখনা »। দুই-এক স্থলে ধাতুর দেখাদেখি নাম-প্রকৃতিতেও এই প্রত্যয় যুক্ত হয় : « ছা (=শাবক)—ছানা ; পো (=পোত)—পোনা ; পক্ষ > পাখ—পাখনা »।

[৩খ] « -অন+-ঈ, -ই > -অনী (-অনি) », স্বর-সঙ্গতির ফলে « -উনী, -উনি », ও পরে দ্বিমাত্রিকতার কারণ « -উ » লোপে « -নী, নি »। স্বল্পতা-দ্যোতক ক্রিয়া অর্থে; ক্ষুদ্র বস্তু অর্থে; এবং 'সে এই কার্য করে' এই অর্থে; যথা—« নাচুনী (='নর্তন,' তথা 'নর্তকী') ; কাঁদুনী ; বাঁধন—বাঁধুনী ; ঢাকন—ঢাকনা, ঢাকুনী, ঢাকনি ; (ছেদন—ছেদনিকা—ছেঅনিআ >) ছেনী ; (ছাদনিকা >) ছাউনী ; করণী—করুণী (করুনি); √মহ—মহনী—মউনি (ঘোল-মউনি) ; বিননী, বিনুনি ; রাঁধুনী (যে রাঁধে) ; পোড়ন—পোড়নী ; জ্বলন—জ্বলনী (চলিত-ভাষায় জ্বলুনি-পুড়ুনি) » ইত্যাদি।

[৪] « -অন্ত », স্ত্রীলিঙ্গে « -অন্তী, -অন্তি (স্বর-সঙ্গতির প্রভাবে, উন্তি) »। বাঙ্গালার শতৃ-শানচ-বাচক প্রত্যয় (Participial Adjective) : 'এইরূপ করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় আছে,'—এই অর্থে, এই প্রত্যয় বিশেষণ এবং বিশেষ্য গঠন করে ; যথা—« √জী+অন্ত > জীয়ন্ত, জ্যান্ত ; (সংস্কৃত ধাতু) জীব্—জীবন্ত ; চলন্ত, ভাসন্ত, ঘুমন্ত, বাড়ন্ত, উঠন্ত, হাসন্ত ; নাচুন্তি, দেখুন্তি » ইত্যাদি। এই প্রত্যয় এখন বাঙ্গালায় আর জীবন্ত নহে—সব ধাতুর সহিত জুড়িয়া ইহা ব্যবহার করা যায় না, মাত্র কতকগুলি ধাতুর সহিত ইহা মিলে। ইহার রূপও প্রাচীন বাঙ্গালার।

এই « -অন্ত » প্রত্যয়েরই রূপ-ভেদ ও উহার সহিত অনেকটা একার্থক—

[৫] « -অত » প্রত্যয়, প্রসারে « -অতা, -অতী (-অতি) -তা, -তি »: « √ফির্—ফিরত > ফেরত, ফিরতী, বিলাত-ফেরত, বিলাত-ফেরতা; √চল্—চলতী ভাষা; উঠতি বয়স; বহতা নদী, সব-জান্তা (হিন্দীর প্রভাবে); পারত-পক্ষে » ইত্যাদি। « আমার জানত (=জানতো) লোক; করত, করতঃ (=করতো, অর্থ, 'করিবার পর') »—এই দুই শব্দে অ-কারান্ত অত-প্রত্যয়-ই বিদ্যমান।

এই প্রত্যয়ের প্রসার-জাত « -অতি, -তি » -প্রত্যয়, ক্রিয়া এবং বস্তু জানাইতেও ব্যবহৃত হয়; যথা—« কম্‌তি (ফারসী কম্ শব্দ, ধাতু-রূপে ব্যবহৃত); গুণতি, ভরতি, বাড়তি, ঘাটতি, ঝড়তি-পড়তি » ইত্যাদি। (সংস্কৃত « -তি » প্রত্যয়ের প্রভাব এ স্থলে কিছু আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়—« ভক্তি, মুক্তি, যুক্তি, যতি, গতি, নতি » প্রভৃতি তি-প্রত্যয়ান্ত বহু শব্দের বাঙ্গালায় ব্যবহারের ফলে।)

['নম্র নিবেদন' অর্থে « বিনতি » শব্দের উৎপত্তি পৃথক্: সংস্কৃত « বিজ্ঞপ্তিকা » > প্রাকৃত « বিণ্ণত্তিআ » > বাঙ্গালা « বিনতী, বিনতি »। এই শ্রেণীর « -অতি, -তি» প্রত্যয়ান্ত শব্দাবলীর সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াসে, আরবী « মিন্নৎ » শব্দে (অর্থ —'প্রার্থনা') ই-যোগ করিয়া, « বিনতি »-র অনুরূপ ও সমার্থক « মিনতি » শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে; তদ্রূপ আরবী « ওকালৎ »-এর প্রসারে ওকালতি », এবং ইহার দেখাদেখি ইংরেজী « জজ্ » শব্দ হইতে « জজিয়ৎ—জজিয়তি » (তুলনীয়, হিন্দুস্থানীতে « পঞ্জাবী » হইতে « পঞ্জাবিয়ৎ »)।

[৬] « -আ »: নিষ্ঠা, অর্থাৎ কর্ম-বাচ্যের অতীত-কাল-দ্যোতক বিশেষণ (Passive বা Past Participle) এবং ক্রিয়া-বাচক বা ভাব-বাচক বিশেষ্য (Verbal Noun) জানাইতে, ধাতুর উত্তর « -আ » প্রত্যয় হয়: যথা « √কর—করা »: (১) নিষ্ঠা—'কৃত' অর্থে, যথা « করা কাজ »;

(২) ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য—« করা » (='করণ-ক্রিয়া')। তদ্রূপ « চলা, খাওয়া, দেখা, দেওয়া, জানা, রাখা » ইত্যাদি।

[৭] « -আ »: এই আ-প্রত্যয়, উৎপত্তির দিক্ হইতে দেখিলে, (৬)-সংখ্যক প্রত্যয় « আ » প্রত্যয় হইতে ভিন্ন। (৬)-সংখ্যক নিষ্ঠা আ-প্রত্যয় আসিয়াছে সংস্কৃত « -ইত » বা « -ত » প্রত্যয় হইতে, এবং এই [৭] « -আ » প্রত্যয় আসিয়াছে « -অক » (বা « -আক ») প্রত্যয় হইতে; তদ্ধিত « -আ » (তদ্ধিত আ-সম্বন্ধে নিম্নে দ্রষ্টব্য) ও এই ([৭]-সংখ্যক) দ্বিতীয় আ-প্রত্যয়ের পরস্পর জড়িত থাকা সম্ভব; কিন্তু বাঙ্গালার প্রয়োগে ইহাদের পৃথক্ করা, সময়ে-সময়ে কঠিন হয়।

ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় বসাইয়া যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহা একক ব্যবহৃত হয় না, অন্য শব্দের সহিত মিলিত বা সমস্ত হইয়া তবে ব্যবহৃত হয়; এবং কর্তা, করণ বা অধিকরণ অর্থে এই সমস্ত-পদ প্রযুক্ত হয়; যথা—« ভাত-রাঁধা হাঁড়ী (করণ); ভাত-রাঁধা বামুন (কর্তা); গলা-কাটা দাম (অধিকরণ বা করণ), গলা-কাটা দোকানদার (কর্তা); কাপড়-কাচা সাবান; পাঁঠা-কাটা খাঁড়া; ইট-বহা মজুর; বুক-ভাঙ্গা দুঃখ; পাখ-মারা, বাঘ-মারা; মুখ-ধোয়া জল ('মুখ ধুইবার জল;' ও 'যে জলে মুখ ধোয়া হইয়াছে'); আখ-মাড়া কল » ইত্যাদি।

এই নিষ্ঠা আ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস করা যায়, এবং বহুশঃ সেইরূপ সমস্ত-পদ যে-বিশেষ্যের বিশেষণ, সেই বিশেষ্য-শব্দ সমস্ত-পদস্থ ক্রিয়ার কর্মস্থানীয় হইয়া থাকে; যথা—« ঘরে-পাতা দই; পায়ে-চলা পথ; সুর-বাঁধা বীণা; ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল; কূয়া-তোলা জল; বাদুড়-চোষা আম » ইত্যাদি।

[৮] « -আ »: ণিজন্ত ক্রিয়ার (অর্থাৎ অন্যের দ্বারা করানো ক্রিয়ার), নাম-ধাতুর (অর্থাৎ বিশেষ্য হইতে সৃষ্ট ধাতুর) এবং কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার প্রত্যয়। ধাতুর অংশবৎ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই প্রত্যয়কে ধাত্ববয়ব বলা হয়; যথা—« √কর্ + -আ > √করা—করায়;

√জান্ +-আ > √জানা—জানায়; √চাখ্ +-আ > √চাখা; √খো+-আ > √খোয়া; √শো— √শোয়া; √খা— √খাওয়া; রাঙা = রক্তবর্ণ+-আ > √রাঙা—রাঙায় (= 'রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে,' নাম-ধাতু); চড়-শব্দ = 'চপেটাঘাত' > √চড়া নাম-ধাতু; বিষ— √বিষা (নাম-ধাতু); শাণ— √শাণা; √বিঁধ্— √বেঁধা (যথা— « কান বেঁধায় »); √শুন্— √শোনা ('কথাটা ভাল শোনায় না'— কর্ম-বাচ্যে); √কহ্— √কহা (কর্ম-বাচ্যে : 'সে লোক ভালো কহায় বটে, কিন্তু আসলে সে লোক ভালো নয়') » ইত্যাদি।

[৯] « -আই » : ভাব-বাচক ক্রিয়া-দ্যোতক, এবং কচিৎ ভাব- হইতে বস্তু-দ্যোতক; ধাতু ও শব্দ, উভয়ের উত্তর এই প্রত্যয় আইসে : « যাচাই, বাছাই, খোদাই, ঢালাই, লড়াই, (কাঠ-)ফাড়াই, বামনাই, বড়াই, রাজাই (= 'রাজত্ব'—অপ্রচলিত), লম্বাই, চৌড়াই (চওড়াই), দোলাই, মিঠাই, ভালাই, পাল্টাই, চোরাই, সাফাই (ফারসী সাফ হইতে) »। (« চড়াই, উৎরাই, সেলাই, ধোলাই, চোলাই »—এই « -আই » প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি হিন্দুস্থানী হইতে গৃহীত; এবং হিন্দুস্থানী « বনাঈ » শব্দের বিকারে আমাদের « বানী » শব্দ—'সেকরার পারিশ্রমিক' অর্থে; হিন্দুস্থানীতে « -আই » প্রত্যয়ের রূপ হইতেছে « -আঈ »)।

[১০] « -আইৎ », চলিত-ভাষায় « -আৎ », স্ত্রীলিঙ্গে « -আতী » : ধাতুর উত্তর (এবং শব্দের উত্তর) শতৃ-বাচক প্রত্যয়, অথবা 'তাহার আছে' এই অর্থ-দ্যোতক প্রত্যয়; যথা—« ডাক্—ডাকাইত, ডাকাত; বাইতি ('যে বাজায়'—প্রাচীন বাঙ্গালা « √বা » = 'বাজানো'); শব্দের উত্তর—« সেবা—সেবাইত; ঢাল—ঢালাইত; সঙ্গ—সাঙ্গাইত, সাঙ্গাত; পো—পোয়াইতী, পোয়াতী = 'সন্তানবতী, শিশুর মাতা' »।

[১০ক] এই প্রত্যয়ে, ভাবার্থে « -ঈ বা -ই » যোগ করিয়া

« -আইতী, -আতি » প্রত্যয় পাওয়া যায়—« ডাকাইত—ডাকাইতা, ডাকাতি »।

[১১] « -আও »: ধাতুর উত্তর, ভাবার্থে এই প্রত্যয় হয়: « চড়াও, ঘেরাও, ছাড়াও, বনিবনাও »। হিন্দুস্থানীতে এই প্রত্যয়ের রূপ « আব »: হিন্দুস্থানী « ফৈলাব » হইতে বাঙ্গালা « ফয়লাও, ফালাও »—'প্রসার' অর্থে।

[১২] « -আন্, -আন (-আনো) »: এই প্রত্যয়-যোগে ণিজন্ত ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া-বাচক ও তাহার অর্থ-পরিবর্তনে কচিৎ বস্তু-বাচক বিশেষ্য সৃষ্ট হয়; যথা—« আঁচানো; জানান্ ('জানান্ দিয়া যাওয়া'), জানানো ('তাকে জানানো না-জানানো দুই-ই সমান'); চালান্ ('মাল চালান্ দেওয়া'—'ইটের গাড়ীর চালান্'), চালানো ('এ কাজ চালানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়'); মানান্ ('মানান্-সহি'), মানানো; শোনানো » ইত্যাদি। নাম-ধাতু হইতে—« জুতা—জুতান্, জুতানো; যোগ—যোগান্, যোগানো; ঠক—ঠকান্; হাত—হাতানো; কম—কমানো; জমা—জমানো » ইত্যাদি।

বিশেষার্থে « -আন্ », সামান্যার্থে « -আনো » প্রত্যয় হয়। এই « আন্, আনো » প্রত্যয়ের প্রসার—

[১২ক] « -আনি, -আনী », ও তাহার বিকারে « -অনী, -অনি, -উনী, উনি »: ভাব-বাচক ক্রিয়া জানাইতে ব্যবহৃত হয়: কচিৎ বস্তু-বাচক নাম-রূপেও ব্যবহৃত হয়; যথা—« শুনানী, শোনানী; পারানী, দেখানী, ঝাঁকানী; নিড়ানী; উড়ানী, উড়ানি, উড়নি, উড়ুনি; জ্বালানি; ঝাঁকানী, ঝাঁকনি, ঝাঁকুনি; শেজ-তোলানী, শেজ-তুলুনি »।

[১৩] « -আন (-আনো) »—ণিজন্ত বা নাম-ধাতুর নিষ্ঠা অর্থে, [৬] « -আ » দ্রষ্টব্য; যথা—« করানো, দেখানো, হওয়ানো » ইত্যাদি।

[১৪] « -ই »: কতকগুলি ধাতুতে « -ই » প্রত্যয় পাওয়া যায়—ভাব-বাচ্যে; এই « -ই » চলিত ভাষায় লুপ্ত হয়, কিন্তু অপিনিহিত অবস্থায়

পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় ইহা বিদ্যমান থাকে ; যথা—« মারি—(মাইর্) —মার্ ; হাসি—(হাস্)—হাস (চলিত-ভাষায় হাঁসি) ; মারি-ধরি > মাইর্-ধইর্—(চলিত-ভাষায় মার-ধোর্), হারি—(হাইর্)—হার্ » ইত্যাদি।

[১৫] « -ইত্ » (চলিত-ভাষায় আনুষঙ্গিক ই-কারের লোপের ফলে « -ত » অভিশ্রুতি-হেতু পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ ও-কার হয়)। ইহা বাঙ্গালা ভাষার শতৃ-প্রত্যয়, সাধারণতঃ পদটীকে দ্বিত্ব করিয়া ব্যবহৃত হয় ; [৪, ৫] « -অন্ত, -অত » -প্রত্যয়দ্বয়ের সহিত সম-মূল ; যথা— « √কর্ + -ইত্ + এ = করিতে (করিতে-করিতে), > চলিত-ভাষায় ক'রতে [কোর্‌তে] ; √চাহ্ + -ইত্ + এ = চাহিতে > চাইতে » ইত্যাদি।

[১৬] « -ইব » (চলিত-ভাষায় « -ব », আনুষঙ্গিক ই-লোপ এবং তদনন্তর অ-কারের অভিশ্রুতিতে ও-কারে পরিবর্তন) : ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রাতিপদিক রূপ এই প্রত্যয়-দ্বারা সাধিত হয় ; যথা— « √কর্ + ইব্ = করিব্—করিব্ + অ = করিব, করিব্ + এন্ = করিবেন ; চলিব্-, খাইব্-, যাইব্-, দেখিব্- » ইত্যাদি।

[১৭] « ইবা » : এই প্রত্যয়ের যোগে ভাব-বাচক ক্রিয়া হয় ; যথা— « করিবা-মাত্র, দিবার জন্য »। এই « ইবা » প্রত্যয়, চলিত-ভাষায় ই-কার লোপে « -বা » হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধাতুতে অ-কার থাকিলে, অভিশ্রুতি-দ্বারা ও-তে তাহার পরিবর্তন ঘটে না।

মন্তব্য :—[১৬] « -ইব » এবং [১৭] « -ইবা » উৎপত্তিতে পৃথক্ ; « -ইব »-র মূল, সংস্কৃতের « -তব্য » বা « -ইতব্য » প্রত্যয় (চলিতব্য > চলিঅব্ব > চলিব, চ'লব) ; এবং « -ইবা »-র মূল, সংস্কৃতের « -এয্য » (*চলেয্য- > চলেব্ব- > চলিবা-, চল্‌বা-)।

[১৮] « ইয়া » : অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়, চলিত-ভাষায় « -এ, -য়ে » (অভিশ্রুতি সহ) : যথা—« করিয়া—ক'রে, বহিয়া—ব'য়ে, খাইয়া—খেয়ে, চাহিয়া—চাইয়া > চেয়ে » ইত্যাদি।

[১৯] « ইয়ে' » : কতকগুলি ধাতুর উত্তর, 'সেই বিষয়ে প্রবীণ বা নিপুণ' অর্থে, চলিত-ভাষায় এই প্রত্যয় মিলে ; যথা—« খাইয়ে', গাইয়ে', বাজিয়ে', চলিয়ে', বলিয়ে', নাচিয়ে' » ইত্যাদি। (মূল রূপ—« *খাঅইয়া, গাহইয়া, বাজইয়া, চলইয়া, বোলইয়া, নাচইয়া » প্রভৃতি বাঙ্গালায় এখন অপ্রচলিত।)

[২০] « -ইল্ », অতীত কালের ক্রিয়ার প্রাতিপদিক রূপ এই প্রত্যয়-যোগে হয় ; (চলিত-ভাষায় « -ল্ », সঙ্গে-সঙ্গে ই-কার-লোপ, এবং অ-কারের অভিশ্রুতি-জাত ও-কারে পরিবর্তন ; এবং চলিত-ভাষায় ধাতুর « আ+ই » মিলিয়া এ-কারে পরিবর্তিত হয়—কিন্তু মূল ধাতুতে « হ- » থাকিলে, এই হ-লোপের পরে অবশিষ্ট « আ+ই » মিলিয়া « এ » হয় না, « আই » থাকে) ; যথা—« চলিল্, খাইল্ (চলিত-ভাষায় খেল্-), যাইল্, চাহিল্ (চাইল্) » ইত্যাদি। ইহার-ই প্রসারে—

[২০ক] « -ইলে » প্রত্যয়—অসমাপিকা-ক্রিয়া-দ্যোতক : চলিত-ভাষায় « -লে » : « চলিলে—চ'ল্লে, বহিলে—বইলে, খাইলে—খেলে, চাহিলে—চাইলে, রহিলে—রইলে » ইত্যাদি।

[২১] « -উআ (-উয়া) » (চলিত-ভাষায় « -ও »—আনুষঙ্গিক অভিশ্রুতি সহ) : 'সে করে' এই অর্থে : « √পড় – 'পাঠ করা'—পড়ুয়া > প'ড়ো (– 'ছাত্র') ; √খা—খাউয়া, খেয়ো ; √পড় (– পতিত হওয়া)—পড়ুয়া > প'ড়ো ('প'ড়ো বাড়ী') » ইত্যাদি। প্রত্যয়টী অন্য শব্দের সঙ্গেও প্রযুক্ত হয়, এবং সম্পর্ক জানায় ; যথা—« সাথ—সাথুআ > সেথো ; জল—জলুয়া > জ'লো » ইত্যাদি।

[২২] « -উক »—প্রসারে « -উক + -আ = -উকা » : স্বভাব প্রকাশ করে ; যথা—« √মিশ্—মিশুক ; √খা—খাউকা—খেকো »। ইহা নাম-পদের সহিতও যুক্ত হয় ; যথা—« পেট—পেটুক ; মিথ্যা—মিথ্যুক ; হিংসা—হিংসুক »।

[২৩] « -ক »—প্রসারে « -কা, -কী, -কি »; স্বার্থে, তথা সংযোগ জানাইতে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যথা—« √মুড়্—মোড়ক; √টান্—টনক; √চড়্—চড়ক; √ছল্—ছলক; √ফাট্—ফাটক, ফটক; সড়ক; সড়কী; মড়ক (মড়া); চুক; পটকা; √চল্—চল্‌কা; √বৈঠ্—বৈঠক; হেঁচকা, হেঁচকী; হুড়কা » ইত্যাদি। « -ক » প্রত্যয় নাম-পদের সহিতও ব্যবহৃত হয়।

[২৪] এতদ্ভিন্ন, ধাতুর প্রসারক কতকগুলি কৃৎ প্রত্যয় বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। এগুলির দ্বারা ধাতুর অর্থ ঈষৎ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এগুলি যথা—

[২৪ক] « -ক- »: « √কুঁচ্—কোঁচকা; খিচকা; টপকা; √থাম্—থমকা; ঠমকা; √নড়্—নড়কা; ভড়কা; √বহ্—বহকা, বখা, বকা; জমকা; সটকা; √মুচ্—মুচকা; √চল্—চল্‌কা; টস্‌কা » ইত্যাদি।

[২৪খ] « -ট- »: « কষটা; কছটা; ঘষটা; চিপটা; জাপটা; পাশটা; দাপটা; লপটা » ইত্যাদি।

[২৪গ] « -ড়- »: « ঘষড়া; ঘেঁষড়া; দাবড়া; হেঁচড়া; আঁচড়া; খেদড়া; খিঁচড়া; চুমড়া; চাপড়া; তাঙ্গড়া; থাবড়া; নিঙ্গড়া; দৌড়া (সংস্কৃত দ্রব+-ড়-); হাতড়া; হাঁকড়া; হুমড়া » ইত্যাদি।

[২৪ঘ] « -র- »: « ঠাহরা, চুমরা, ঝাঁকরা, হাঁকরা, ডুকরা, ফুকরা »।

[২৪ঙ] « -ল- »: « আগলা, খোসলা, ছোবলা, থেঁতলা, দাঁদলা, পিকলা, ফুসলা, বাওলা, হামলা » ইত্যাদি।

[২৪চ] « -স-, -চ- »: « গুমসা, চকসা, ঝলসা, ধামসা, লেজচা, বালসা, ভাপসা; ভাজচা, ভেজচা (< ভঙ্গ=মুখভঙ্গী) » ইত্যাদি।

[৩.০২২] সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

বাঙ্গালায় বহু সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই-সকল শব্দের আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অন্তর্ভুক্ত—সংস্কৃত ধাতু- ও সংস্কৃত প্রত্যয়-যোগে কি করিয়া সেগুলি গঠিত হইল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রকার শব্দের বিশেষ আধিক্য-হেতু, ইহাদের আলোচনা বাঙ্গালা ব্যাকরণেরই অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির সাধন ভাল করিয়া না বুঝিলে, নির্ভুল-রূপে ভাষায় এগুলিকে প্রয়োগ করা চলে না। কখন-কখন সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় বাঙ্গালা ধাতু ও প্রত্যয়ের সঙ্গে সমান ; এবং যেখানে পার্থক্য থাকে, সাধারণতঃ সেখানেও এই দুইয়ের যোগ বোঝা কঠিন হয় না। সংস্কৃতের সহিত তুল্য-রূপ বাঙ্গালা ধাতু ও প্রত্যয় ; যথা—« √চল্‌+অন=চলন ; মৃ—মর্‌—মর্‌+অন=সংস্কৃত মরণ, বাঙ্গালা মরন ; কৃ—কর্‌—কর্‌+অন=সংস্কৃত করণ, বাঙ্গালা করণ » ; ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে বাঙ্গালায় বিদ্যমান সংস্কৃত ধাতু ; যথা—« (সংস্কৃত) পঠ্‌—পঠন, (বাঙ্গালা) পড়্‌—পড়ন ; খাদ্‌—খাদন, খা—খাওন ; মিশ্রাপন—মিশান » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ হইলে, সাধারণতঃ ধাতুর কোনও পরিবর্তন হয় না ; যেমন—« রাখ্‌+-ইয়া > রাখিয়া, চল্‌+-ইব্‌+-এ =চলিবে » ইত্যাদি। চলিত-ভাষায় প্রত্যয়াদি যোগের সঙ্গে-সঙ্গে যে কতকগুলি উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, সেগুলি অপিনিহিতি-, অভিশ্রুতি- ও স্বরসঙ্গতি-মূলক ; এবং সাধু-ভাষার প্রাচীনতর ও সম্পূর্ণ রূপগুলি বিদ্যমান থাকায়, চলিত-ভাষায় এই সকল পরিবর্তনের ধারাও সুপরিস্ফুট ; যথা—« রাখ্‌+-ইয়া=রাখিয়া, রাইখ্যা > রেখে ; চল্‌+-ইব্‌+-এ=চ'লবে ([চোল্‌বে] < চলিবে, চইল্‌বে) ; মিল্‌+আ=মিলা > মেলা » ইত্যাদি।

কিন্তু সংস্কৃতে কৃৎ (এবং তদ্ধিত) প্রত্যয় যুক্ত হইলে, গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্প্রসারণ হেতু ধাতুর মধ্যস্থ স্বর-ধ্বনির বহুশঃ পরিবর্তন হইয়া যায়, এবং শব্দস্থ syllable বা অক্ষরের উদাত্তাদি স্বর বা সুরেরও পরিবর্তন ঘটে। এতদ্ভিন্ন, ধাতুর স্বর- বা ব্যঞ্জন-বর্ণের বিলোপও হইতে

পারে। প্রত্যয়-রূপে প্রযুক্ত অক্ষরটী হয় তো এক ; কিন্তু এই এক প্রত্যয়-ই, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে, অর্থের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাদের রূপেরও নানা প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে ; যেমন—বিশেষ্য পদ-দ্যোতক « -অ » প্রত্যয় ; ইহার যোগে নানা প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় ; যথা—« √বুধ্ (=বুঝা, জানা) + -অ=বুধ » ('যে বুঝে বা জানে, পণ্ডিত',—এখানে ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই ; « √বদ্+অ=বদ » ('যে বলে' ; যথা—« বশংবদ, প্রিয়ংবদ », এখানেও ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই) ; কিন্তু « √বদ্+-অ=বাদ » ('বলা, বলার ভাব',—এখানে ধাতুতে 'বৃদ্ধি' হইল, অ-কার আ-তে পরিবর্তিত হইল) ; « অনু+ √জন্+-অ=অনু-জ » (এখানে জন্-ধাতুর ন-কারের লোপ হইল) ; « √জি+-অ=জই-অ=জয় » (এখানে ধাতুর স্বর-ধ্বনির 'গুণ' হইয়াছে)।

প্রত্যয়গুলির শক্তি, এবং প্রত্যয়-যোগে ধাতুর রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ প্রত্যয়গুলির এমনভাবে নাম-করণ করিয়াছেন, যাহাতে নাম দর্শন-মাত্রেই সেগুলির কার্য পুরাপুরি বুঝিতে পারা যায়। মূল প্রত্যয়টীকে (অর্থাৎ যে একটী বা একাধিক অক্ষর প্রত্যয়ের কাজ করে, সেটীকে বা সেগুলিকে) ধরিয়া, তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে অন্য কতকগুলি অক্ষর জুড়িয়া দিয়াছেন ; অক্ষরগুলি বিশেষ-বিশেষ অর্থের অথবা বিশেষ-বিশেষ পরিবর্তনের নির্দেশক ; যেমন—« √বুধ্+-অ=বুধ » ; এ ক্ষেত্রে, এই « -অ »-প্রত্যয়কে, মাত্র « অ » না বলিয়া, ইহাতে « ক্ » অক্ষর জুড়িয়া দিয়া, ইহার নাম-করণ হইয়াছে « ক্+অ »=« ক » প্রত্যয় ; « ক্ » দ্বারা পাণিনির ব্যাখ্যা-মতে এইটুকু দ্যোতিত হয় যে, যে ধাতুর সঙ্গে এই « ক » (বা « অ »)-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার স্বর-ধ্বনি « ই, উ, ঋ, » »—এই কয়টীর একটী (এই স্বরগুলির গুণ বা বৃদ্ধি হয় না), এবং ইহার দ্বারা 'সে করে' এই অর্থ দ্যোতিত হয় ; এবং এই অর্থে, « জ্ঞা, প্রী, কৄ », দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত এই তিনটী ধাতুর পরে যে « অ » আইসে, তাহাকেও « ক » নামে অভিহিত করা হয়। « √বদ্+অ »=« বাদ », এখানে « অ »-প্রত্যয়ের পূর্বে « ঘ্ » বর্ণ ও পরে « ঞ্ » বর্ণ জুড়িয়া দিয়া, ইহার নাম করা হইয়াছে « ঘঞ্ »—« ঘ্+অ+ঞ্ » ;—« ঞ্ »-এর অর্থ এই যে, ধাতুতে যদি হ্রস্ব স্বর থাকে এবং সেই স্বরের পরে যদি অন্য ধ্বনি থাকে, তাহা হইলে এই হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়, যদি ধাতুতে স্বর-ধ্বনির পরে ব্যঞ্জন না থাকে, তাহা হইলে এই স্বর-ধ্বনির বৃদ্ধি হয় ; এবং যদি ধাতুতে অ-কার থাকে, তাহা হইলে অ-কারের বৃদ্ধি হইয়া আ-কার হয় ; এবং « ঘ্ » দ্বারা ইহাই দ্যোতিত হয় যে, ধাতুর অন্তে স্থিত « চ্ » স্থানে « ক্ » ও « জ্ » স্থানে « গ্ » হয় ; « ঘঞ্ » -প্রত্যয়-দ্বারা ভাব-বাচ্যের বা কর্ম-বাচ্যের

ক্রিয়া-বাচক নাম-শব্দ সৃষ্ট হয়। « প্রিয়া + √বদ্ + অ » = « প্রিয়ংবদ »: এখানে যে « অ »-প্রত্যয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে « খচ্ »—« খ্ + অ + চ্ »; « খ্ » ইহা প্রকাশ করে যে, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দটীর পূর্বে কর্মকারকে ম-কার-যুক্ত একটী পদ বসিয়াছে (« প্রিয়ম্ + বদ = প্রিয়ংবদ »), এবং « চ্ » দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে, ধাতুর স্বর-ধ্বনিতে না হইয়া প্রত্যয়ের স্বর-ধ্বনিতে উদাত্ত উচ্চারণ আইসে (« বদ »-র « দ »-অক্ষরটী উদাত্ত)। « অনু-জ » শব্দে যে « অ »-প্রত্যয় আছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে « ড » (« ড্ + অ »), এবং এই « ড্ »-দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে, স্বরান্ত ধাতু হইলে ইহার স্বর-বর্ণ, এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতু হইলে ইহার স্বর ও অন্ত্য ব্যঞ্জন উভয়ই, লুপ্ত হয়; যেমন—« অনু + √জন্ + অ »—এখানে « জন্ (জ্ অন্) »-ধাতুর স্বর « অ » ও অন্তিম ব্যঞ্জন « ন্ » দুইয়ের-ই লোপ হইল, ধাতুর মাত্র « জ্ » অবশিষ্ট রহিল, এবং এই « জ্ »-এ « অ »-প্রত্যয় যোগ হওয়ায়, প্রত্যয়ান্ত ধাতুর রূপ হইল « জ »—« অনু + জ » = « অনুজ »। « √জি + অ »—জি-র 'গুণ' « জে », « জে + অ = জয় »—এই « অ »-প্রত্যয়ের নাম « অচ্ »—« চ্ » দ্বারা প্রত্যয়ের স্বর-ধ্বনির উদাত্ত উচ্চারণ দ্যোতিত হইতেছে (উপরের « প্রিয়ংবদ » শব্দের « খচ্ » প্রত্যয় দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে, কর্তা বা ভাব বুঝাইতে যে « অ »-প্রত্যয় হয়, তাহার সহিত নানা বর্ণ জুড়িয়া দিয়া, ধাতুর উপরে তাহাদের প্রভাব পরিস্ফুট করে এমন ভাবে তাহাদের নাম-করণ পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই-রূপে প্রত্যয়ের নাম-করণের জন্য তাহাদের কার্য-বাচক যে ধ্বনি বা বর্ণ যোগ করা হয়, সেগুলিকে **অনুবন্ধ** বলে। অনুবন্ধের বর্ণকে বাদ দিয়া (সংস্কৃত ব্যাকরণের ভাষায়, আগত এই সব বর্ণকে « ইৎ » বা লোপ করিয়া), যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেইটুকুই হইতেছে সত্যকার প্রত্যয়। « উ, ক্, খ্, ঘ্, চ্, ঞ্, ট্, ড্, ণ্, ত্, ন্, প্, ম্, র্, ল্, ব্, শ্, ষ্ » প্রভৃতি অনুবন্ধ বর্ণের অর্থ ও প্রয়োগ সংস্কৃত (পাণিনীয়) ব্যাকরণের খুঁটিনাটির বিষয়। কিন্তু তাহা হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের পূর্ণ আলোচনার জন্য, এইরূপ অনুবন্ধ-যুক্ত (পাণিনির ব্যাকরণে ব্যবহৃত) প্রত্যয়-নাম যথাসম্ভব মনে রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

নীচে বাঙ্গালায় আগত সাধারণ সংস্কৃত শব্দে প্রাপ্ত আবশ্যক সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল—তালিকায় প্রথমতঃ প্রত্যয়-স্বরূপ অক্ষরটী বা অক্ষরগুলি, ও পরে অনুবন্ধ-বর্ণ-যুক্ত প্রত্যয়ের নাম দেওয়া হইল।

[১] শূন্য প্রত্যয়—যেখানে ধাতুর উত্তর কোনও প্রত্যয় যুক্ত হয় না, মূল ধাতুই শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়;—এই-রূপ শব্দকে যুগপৎ Verb-Root ও Root-Word বা Root-Noun—ধাতু-প্রকৃতি ও নাম-প্রকৃতি বলা যায়। কর্তৃবাচ্যে ও ভাবে, উভয়বিধ অর্থে, প্রত্যয়-হীন ধাতু এই-রূপে নাম বা শব্দের কার্য করে;—কেবল, যেখানে ধাতু হ্রস্ব-স্বরান্ত, সেখানে ধাতুর পরে একটী "ত্ (ৎ)" বসে; যথা—"উদ্+√ভিদ্=উদ্ভিদ্ ('যাহা ভেদ করিয়া উপরে উঠে'); সেনা+√নী=সেনানী ('যিনি সেনাকে চালান'); ভাষা+√বিদ্=ভাষাবিদ্ ('যিনি ভাষা জানেন'; সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের রূপ ধরিয়া, ত্-কারান্ত 'ভাষাবিৎ' রূপই বাঙ্গালায় সাধারণ); তদ্রূপ, ধর্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎ, তত্ত্ববিৎ, ভূগোলবিৎ ইত্যাদি; পরি+√সদ্=পরিষৎ, পরিষদ্ ('সভা'); উপ+নি+√সদ্=উপনিষৎ, উপনিষদ্ ('যাহার জন্য গুরুর কাছে বসে, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের শাস্ত্র'); সভা+√সদ্=সভাসদ্ ('সভায় বসে যে'); স্বয়ম্+√ভূ=স্বয়ম্ভূ, ইন্দ্র+√জি=ইন্দ্রজিৎ (ত্-কারের আগম,—'ইন্দ্রকে যে জয় করিয়াছে'); বি+√পদ্=বিপদ্; তদ্রূপ আপদ্, সম্পদ্; √চিৎ=চিৎ ('জ্ঞান'); সম্+বিদ্=সংবিৎ; আ+√শাস্=আশিস্, আশীঃ; বি+√দ্যু (বা √দ্যুৎ)=বিদ্যুৎ; ব্রহ্ম+√হন্=ব্রহ্মহা; বীর+√সূ=বীরসূ; অগ্র+√নী=অগ্রণী; স্ব+√রাজ্=স্বরাজ্ ('স্বরাট্'—সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের এই রূপই বেশী প্রচলিত; বাঙ্গালা 'স্বরাজ' শব্দ কিন্তু সংস্কৃত 'স্বরাজ্য' হইতে জাত); সম্+√রাজ্=সম্রাট্ (সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের রূপ); অংশ+√ভজ্=অংশভাক্; দুঃখ+√ভজ্=দুঃখভাক্; ক্রব্য+√অদ্=ক্রব্যাৎ, ক্রব্যাদ্ ('যে কাঁচা মাংস খায়')"।

প্রত্যয়-রূপে কোনও অক্ষর বা বর্ণ যুক্ত না হইলেও, ধাতু কচিৎ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়। প্রত্যয় না থাকায় (অর্থাৎ শূন্য প্রত্যয়ের)-ও নাম-

করণ সংস্কৃত ব্যাকরণে হইয়াছে ;—ধাতুর স্বরের গুণ, বৃদ্ধি ও উদাত্ত-স্বরের অবস্থান ধরিয়া, « কিন্, ক্বিপ্, ণ্বি, ণ্বিন্, বিচ্, বিট্ » এই নামগুলি পাওয়া যায়। « ক্বিপ্ »-প্রত্যয়ই বেশী সাধারণ ; উপরের দৃষ্টান্তগুলি « ক্বিপ্ »-এর নিদর্শন ; কেবল « অংশভাক্, দুঃখভাক্ » হইতেছে « ণ্বি »-এর নিদর্শন, এবং « ক্রব্যাৎ » হইতেছে « বিট্ »-প্রত্যয়ের উদাহরণ।

[২] « অ »-প্রত্যয়। কর্তার, অথবা ভাবের দ্যোতনা করিবার জন্য, এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—এটী সংস্কৃতের একটী বহুল-প্রযুক্ত প্রত্যয়। ধাতুর পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এবং পূর্ব-পদের সহিত যোগ, তথা সাধিত পদের অর্থ, বিচার করিয়া, এই প্রত্যয়ের কার্য্য অবস্থা-গতিকে বিভিন্ন হয় ; এবং পূর্বোল্লিখিত অনুবন্ধ-সমূহ যোগ করিয়া, এই সকল বিভিন্নতা প্রদর্শিত হয়। তদনুসারে, এই « অ »-প্রত্যয়ের বিভিন্ন রূপ হয় ; ইহার এই কয়টী বিভিন্ন রূপ লক্ষণীয় :—

[২ক] « অ—অ » : অন্ত-প্রত্যয়-যুক্ত ধাতুতে, তথা ব্যঞ্জনান্ত গুরু-স্বর-যুক্ত ধাতুতে এই « অ » যোগ করিয়া, ভাববাচী সংজ্ঞা বা নাম সৃষ্টি করা হয় ; নব-সৃষ্ট এই-রূপ ভাব-বাচক শব্দ, সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ হয় বলিয়া, এগুলিতে উপরন্তু « আ »-প্রত্যয়ও যুক্ত হয় ; যথা—'করা'-অর্থে কৃ-ধাতু, তাহাতে ইচ্ছা-দ্যোতক « সন্ »-নামে প্রত্যয় যোগ করিয়া, « √কৃ+সন্ » মিলিয়া হইল « চিকীর্ষ » (সন্-প্রত্যয়ের ধাতুতে « স্ » যোগ হয়, ধাতুর অভ্যাস বা দ্বিত্ব-ভাব হয়, এবং ধাতুর আভ্যন্তর পরিবর্তনও হয়—« √কৃ+স্ »—« কীর্+স্ » = অভ্যাস দ্বারা « কিকীর্+স্ » স্থানে « চিকীর্+স্ », ষত্ব-বিধানে « চিকীর্ষ্ ») ; তাহাতে এই « অ » যোগে « চিকীর্ষ্ »+« অ »—« চিকীর্ষ » ; তদনন্তর স্ত্রীলিঙ্গে « আ (—টাপ্) » প্রত্যয় যোগ করিয়া « চিকীর্ষা », অর্থ, 'করিবার ইচ্ছা' ; তদ্রূপ « √পা+সন্ »—« পিপাস্ »+« অ »—« পিপাস »+« আ »—« পিপাসা »—'পান করিবার ইচ্ছা' ; তদ্রূপ, « দিদৃক্ষা (√দৃশ্), জিজ্ঞাসা

(√জ্ঞা) » ইত্যাদি ; « √ঈহ্ (ব্যঞ্জনান্ত দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত ধাতু)+অ+আ =ঈহা (='ইচ্ছা') » তদ্বৎ « ঊহা (=তর্ক), বাধা, শিক্ষা, পীড়া, হিংসা, লজ্জা, অসূয়া, সেবা, ভিক্ষা, দীক্ষা, রক্ষা, প্রশংসা »।

[২খ] « অ=অঙ্ » : « ভিদ্ » প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু, যেগুলি প্রত্যয়ান্ত নহে, এবং যেগুলিতে দীর্ঘ স্বর-ধ্বনিও নাই, সেগুলি হইতে পূর্ববৎ স্ত্রীলিঙ্গময় ভাব-বাচক সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে, এই « অঙ্=অ » প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—« √ভিদ্+অঙ্+আ (টাপ্) »=« ভিদা », অর্থ 'ভেদ'; « শ্রদ্ বা শ্রৎ »+« √ধা »+« অঙ্(=অ)+টাপ্(=আ) »=« শ্রদ্ধা » ; « √চিন্ত+অঙ্+টাপ্ »=« চিন্তা » ; « √কৃপ্+অঙ্+টাপ্=কৃপা » ; « √জৄ+অঙ্+টাপ্=জরা »।

[২গ] « অ=অচ্ » : « পচ্ » প্রভৃতি কতকগুলিতে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যোগে কর্তৃবাচ্যে (অর্থাৎ 'এই কার্য সে করে' এই অর্থে) সংজ্ঞা সৃষ্টি হয় ; যথা—« নন্দ (='যে আনন্দ করে'), চর ('যে চরে বা ঘুরিয়া বেড়ায়'), √চুর্—চোর ; অর্হ (=যোগ্য) ; চরাচর ; চলাচল ; গ্রহ (='যে গ্রহণ করে বা ধরে') » ইত্যাদি।

ই-কারান্ত তথা অন্য কতকগুলি ধাতুতে এই « অচ্ »-প্রত্যয়-যোগে ভাব-বাচক নাম সৃষ্ট হয় ; যথা—« √জি+অচ্=জয় ; √নী—নয়, প্রণয়, বিনয় ; √ভী—ভয়, √চি—চয়, সমুচ্চয়, নিচয় ; √স্তু—স্তব ; √বৃষ্—বর্ষ (='বর্ষণ-কার্য') ; গুহা+√শী+অচ্=গুহাশয় ; তদ্রূপ পার্শ্বশয় » ইত্যাদি।

[২ঘ] « অ=অণ্ » ; পূর্বে কর্ম-পদের কোনও শব্দ যুক্ত হইলে, পরবর্তী ধাতুতে যে « অ »-প্রত্যয় আইসে, তাহাকে « অণ্ » বলে ; যথা—« কুম্ভকার »=« কুম্ভ+√কৃ+অণ্ » ; তদ্রূপ « গ্রন্থকার, শাস্ত্রকার, চাটুকার ; তন্তুবায় (তন্তু+√বে+অণ্) ; দ্বারপাল »।

[২ঙ] « অ=অপ্ » : বিশেষ করিয়া দীর্ঘ ঋ-কারান্ত ও উ-বর্ণান্ত ধাতু

হইতে এই প্রত্যয়ের যোগে ভাব-বাচক সংজ্ঞা গঠিত হয়; যথা—« আ+ √দৃ+অপ্=আদর; বি+ √স্তৃ+অপ্=বিস্তর; √ভূ+অপ্=ভব; √জপ্+অপ্=জপ »; তদ্রূপ « স্বন, যম, সংযম, নিক্বণ » ইত্যাদি।

[এতৎসম্পর্কে নিম্নে দত্ত « ঘঞ্ » প্রত্যয় দ্রষ্টব্য—[২ঠ] « অ= ঘঞ্ »।]

[২চ] « অ=ক »: ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর স্বর-ধ্বনি যদি « ই, উ, ঋ, ঌ » থাকে (অথবা, যদি « উপধা » বর্ণ অর্থাৎ, শেষ ধ্বনি বা বর্ণ, « ই, উ, ঋ, ঌ » এই কয়টীর একটী হয়), তাহা হইলে কর্তৃবাচক ('সে করে' এই অর্থে) সংজ্ঞা-শব্দ এই « অ=ক »-প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন হয়; যথা—« √বুধ্+ক=বুধ; √লিখ্+ক=লিখ; √মিল্+ক= মিল » ইত্যাদি।

« জ্ঞা, প্রী, কৄ », এবং উপসর্গযুক্ত আ-কারান্ত ধাতুর উত্তরও এই অর্থে « ক »-প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা—« √প্রী+ক=প্রিয়; √জ্ঞা+ক=জ্ঞ, বি-জ্ঞ, প্রা-জ্ঞ, অ-জ্ঞ; নৃ+ √পা+ক=নৃপ; সু+√স্থা+ক=সুস্থ, স্ব+ √স্থা+ক=স্বস্থ; √হন্ (ঘন্)+ক=ঘ্ন, শত্রুঘ্ন, বৃত্রঘ্ন, কৃতঘ্ন; √দা+ক=দ, যথা—জলদ, শোকাপনুদ » ইত্যাদি।

[২ছ] « অ=কঞ্ »: কতকগুলি সর্বনাম-শব্দের পরে, জ্ঞানার্থক দৃশ্-ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে এই প্রত্যয় হয়: « তাদৃশ, যাদৃশ, সদৃশ, কীদৃশ, ঈদৃশ »।

[২জ] « অ=খচ্ »: ধাতুর পূর্বে কর্মপদ থাকিলে, এবং সেই কর্ম-পদে « ম্ »-বিভক্তি যুক্ত হইলে, যে « অ »-প্রত্যয় ধাতুতে সংযুক্ত হয়, তাহাকে « খচ্ » বলে। 'সে করে' এই অর্থে ইহার প্রয়োগ; যথা— « প্রিয়+ √বদ্+খচ্ »=« প্রিয়ম্-বদ্-অ > প্রিয়ংবদ »; « বশংবদ »; « ভয়+√কৃ+খচ্=ভয়ম্-কর > ভয়ঙ্কর »; « তুর+√গম্+খচ্ »= তুরঙ্গম »; তদ্বৎ, « পরন্তপ, সর্বংসহ, ধুরন্ধর, যুগন্ধর, বসুন্ধরা, ক্ষেমঙ্কর,

শুভঙ্কর, পুরন্দর, ভগন্দর, বিশ্বম্ভর, অভ্রংকষ, বাচংযম, ধনঞ্জয়, শত্রুঞ্জয়, রিপুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়, পুরঞ্জয় ; বিশ্বঙ্কর » ইত্যাদি।

[২ঝ] « অ—খল্ » : ধাতুর উপসর্গ « সু » বা « দুঃ (দুষ্, দুর্) » হইলে, বিশেষণ-অর্থে « খল্—অ » প্রত্যয় হয় ; যথা—« সুকর ('সহজে যাহা করা যায়'), দুষ্কর ; সুগম, দুর্গম » ।

[২ঞ] « অ—খশ্ »—পূর্বে কর্মপদ থাকিলে « তুদ্, তপ্, মন্ » প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর 'সে করে' এই অর্থে এই « খশ্—অ » প্রত্যয় হয়, এবং এই কর্মপদের « ম্ »-এর আগমও হয় ; যথা—«অরুন্তুদ (= 'মর্মস্থলে কষ্ট প্রদানকারী') ; ললাটন্তপ ; পণ্ডিতম্মন্য (= 'যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে') ; ইরম্মদ (= 'হস্তী—ইরা বা জল দ্বারা যে প্রমত্ত হয়') ; জনমেজয় (জনম্+এজয় — 'জন বা লোককে যিনি কম্পান্বিত করেন') ; স্তনন্ধয় (স্তনম্+ √ধে—'স্তন্যপায়ী') ; অভ্রংলিহ ; অসূর্যম্পশ্যা (স্ত্রীলিঙ্গে -আ) » ।

[২ট] « অ—ঘ » : ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্যে বা অধিকরণ-বাচ্যে এই প্রত্যয় যোগ করিয়া সংজ্ঞা বা নাম-পদ হয় ; যথা—« দন্তচ্ছদ (= 'ওষ্ঠ, যদ্দ্বারা দন্ত আচ্ছাদিত হয়'), প্রচ্ছদ ('যদ্দ্বারা কিছু আচ্ছাদিত হয়') ; কর ('যদ্দ্বারা কিছু করা যায়—হস্ত') ; আকর ('যেখানে ধাতুদ্রব্য আকীর্ণ থাকে'— √কৄ) ; শর ('যাহার দ্বারা হিংসা করা যায়'— √শৄ) ; আলয়, নিলয় ('যেখানে অধিষ্ঠান করা যায়— √লী') ; পরিসর (√সৃ— 'যাওয়া') » ।

[২ঠ] « অ—ঘঞ্ »—এই প্রত্যয়ে, ধাতুর স্বর-ধ্বনির 'গুণ' বা 'বৃদ্ধি' হয়, ধাতুর শেষে « চ, জ » থাকিলে এই « চ, জ » যথাক্রমে « ক, গ » হইয়া যায়, এবং ঘঞ্-প্রত্যয়-যোগে যে শব্দ সৃষ্ট হয়, তাহা ভাব, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান বা অধিকরণ প্রকাশ করে, কর্তাকে কখনও প্রকাশ করে না ; যথা—« √পচ্+ঘঞ্=পাক, √ভূ—ভাব,

√বুধ্ বোধ, √ভজ্—ভাগ, √যজ্—যাগ, √ভুজ্—ভোগ, √পঠ্—পাঠ. √পদ্—পাদ, √দা—দায়, √লভ্—লাভ, √লুভ্—লোভ » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—« বিস্তর—বি+ √স্তৃ+অপ্ », কিন্তু « বিস্তার—বি+ √স্তৃ +ঘঞ্ »; « √হস্+অপ্—হস, √হস্+ঘঞ্=হাস »; তদ্রূপ «√যম্—যাম »।

[২ড] « অ—ট »: পূর্বে অধিকরণ-বাচক শব্দ থাকিলে, চর্-ধাতুর উত্তর এবং « দিবা » প্রভৃতি শব্দ-যুক্ত কৃ-ধাতুর উত্তর « ট—অ »-প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হয়; যথা—« খচর, ভূচর, জলচর, বনচর; দিবাকর, নিশাকর, প্রভাকর »। তদ্রূপ « পুরঃসর, পুষ্টিকর, যশস্কর, অর্থকর, কর্মকর, কিঙ্কর » ইত্যাদি। এই প্রকার « ট—অ » যুক্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে « ঈ »-প্রত্যয় হয়।

[২ঢ] « অ—টক্ »: কর্মকারক পূর্বে থাকিলে, উপসর্গ-বিহীন « গা (গৈ) » ও « পা » ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে « টক্ »-প্রত্যয় হয়: « সামগ, মধুপ »। « বাতয় (তৈল), জায়ায় »—এই দুই শব্দেও « টক্ » প্রত্যয়।

[২ণ] « অ—টচ্ »: « রাজন্ (রাজা), অহঃ, সখি (সখা) »—এই কয়টা শব্দে, সমাস-বিশেষে « টচ্—অ »-প্রত্যয় হয়; যথা—« মহারাজ, ধর্মরাজ; বিবুধসখ (ষষ্ঠীতৎপুরুষ; বহুব্রীহিতে 'বিবুধসখি' »)।

[২ত] « অ—ড »: গম্-ধাতুর পূর্বে অন্ত-প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আসিলে, কর্তৃবাচ্যে « ড »-প্রত্যয় হয়—« ড্ »-এর অর্থ, ধাতুর স্বরের লোপ হইয়া তাহার স্থানে « অ » হয়; যথা—« পারগ, সর্বগ, উরগ, বিহগ, সুগ, দুর্গ; গিরিশ ('গিরিতে শয়ন করেন' এই অর্থে গিরি+ √শী+ড; এই শব্দের অন্য ব্যুৎপত্তি আছে—'গিরি আছে যার', গিরি+'আছে' অর্থে তদ্ধিত শ-প্রত্যয়।); তুরগ »; ইত্যাদি। অন্য ধাতুর যোগেও এই প্রত্যয় হয়—« পঙ্কজ, অম্বুজ; শোকাপহ; নগ;

পরিখা (পরিখ—প্রাতিপদিক রূপ, স্ত্রীলিঙ্গে আ-প্রত্যয়) ; শত্রুহ, দস্যুহ » ইত্যাদি।

[২খ] « অ—ণ » : জ্বল্-প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে এই প্রত্যয় হয় ; যথা—« জ্বাল ('যে জ্বলে'), চাল ('যাহা চলে'), রাম, তান, লেহ (অবলেহ), শ্লেষ, ব্যাধ, ভাব, গ্রাহ, শ্বাস » ইত্যাদি।

[২দ] « অ—শ » ; কর্তৃবাচ্যে : « গোবিন্দ (√বিদ্+শ, 'যিনি গো অর্থাৎ জীবাত্মাকে জানেন') ; অরবিন্দ ('অর বা চক্রাকার দল যে ফুল পাইয়াছে, পদ্ম') »।

[৩] কর্তৃবাচ্যে « অক »-প্রত্যয়। অনুবন্ধ-যোগে ইহারও রূপ-ভেদ আছে ; যথা—

[৩ক] « অক = ণ্বুল্ » : « √নী—নায়ক, √শ্রু—শ্রাবক, √পঠ্—পাঠক, √নশ্—নাশক, √কৃ—কারক, √তৃ—তারক, √স্মৃ—স্মারক, √পচ্—পাচক ('যে রাঁধে'), √জন্—জনক, √গা (গৈ)—গায়ক, √পালি—পালক, √রিচ্—রেচক » ইত্যাদি।

[৩খ] « অক = বুঞ্ » : « √নিন্দ্—নিন্দক, √হিংস্—হিংসক »।

[৩গ] « অক = বুন্ » : এখানে ধাতুর পরিবর্তন হয় না : « √জীব্—জীবক, √নন্দ্—নন্দক »।

[৩ঘ] « অক = ষ্বুন্ »—'শিল্পী' অর্থে : « √নৃৎ—নর্তক, √খন্—খনক, √রঞ্জ্—রজক »।

[৪] « অন্ত্—অৎ »-প্রত্যয় ; 'করিতেছে, বা করিয়া থাকে' অর্থে ; এই প্রত্যয়ের একটা বিশেষ নাম আছে—শতৃ-প্রত্যয়। পুংলিঙ্গে এক-বচনে (কর্তৃকারকে) এই প্রত্যয় « -অন্ » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -অতী » বা « -অন্তী », ক্লীবলিঙ্গে « -অৎ » ; সমাসে ইহার প্রাতিপদিক রূপ হয় « -অৎ » ; যথা—« √অস্+শতৃ = সন্ত্—সন্, সতী, সৎ (বাঙ্গালায় 'সৎ' পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, 'সন্' অপ্রচলিত) ; √মহ্+শতৃ = মহন্ত—মহান্, মহতী, মহৎ ; √ভূ—ভবান্, ভবতী, ভবৎ »। বাঙ্গালায়

সমস্ত-পদেই এই প্রত্যয়ান্ত পদের বেশী প্রয়োগ হইয়া থাকে ; যথা— « চলচ্ছক্তি—চলৎ+শক্তি ; ভবৎসকাশে ; জ্বলদর্চি—জ্বলৎ+অর্চি ; ভরদ্বাজ—ভরৎ+বাজ ('যিনি বাজ অর্থাৎ অন্ন বহন করেন') ; জমদগ্নি—জমৎ+অগ্নি ('যিনি অগ্নিকে আহার করেন') » ইত্যাদি।

[৫] « অন » : কর্তৃ-বাচ্যে ও ভাব-বাচ্যে, ক্রিয়া বা বস্তু-দ্যোতক প্রত্যয়।

[৫ক] « অন »=[ল্যুট্] (প্রত্যয়ের নাম) : করণ-অর্থে, যদ্দ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয়, এই অর্থে : « √নী—নয়ন ('যদ্দ্বারা লোকে নীত বা চালিত হয়—চক্ষু') চর্—চরণ ; সাধ্—সাধন ; কৃ—করণ ; যা—যান ('যদ্দ্বারা যাওয়া যায়'), বহ্—বাহন ; শী—শয়ন ('শয্যা' অর্থে) ; স্থা—স্থান ; ভূ—ভবন ; ভূষ্—ভূষণ » ইত্যাদি।

[৫খ] « অন »=[ল্যুট্] : কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে : « √শী—শয়ন ; ঈক্ষ্—ঈক্ষণ ; পত্—পতন ; গর্জ্—গর্জন ; তৃপ্—তর্পণ ; মন্—মনন ; দা—দান ; ঘ্রা—ঘ্রাণ ; জ্ঞা—জ্ঞান ; শ্রু—শ্রবণ ; অধি+√ই—অধ্যয়ন ; দৃশ্—দর্শন ; নৃৎ—নর্তন ; রুদ্—রোদন ; মৃ—মরণ ; চি—চয়ন ; স্না—স্নান » ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[৫গ] « অন » [ল্যুট্] : ভাব-বাচ্যে : « √গম্—গমন, √পী—পান, √কৃ—করণ, √চল্—চলন, √শুভ্—শোভন » ইত্যাদি।

[৫ঘ] « অন=ণ্যু » : কর্তৃবাচ্যে ; « √নন্দ—নন্দন, √মদ্—মদন, √সাধ্—সাধন, √বৃধ্—বর্ধন, √রম্—রমণ, √ভীষ্—ভীষণ, √নাশ্—নাশন, √সহ্—সহন, √দম্—দমন, √তপ্—তপন » ইত্যাদি।

[৫ঙ] « অন »—[যুচ্] (প্রত্যয়ের নাম) : ক্রোধার্থ ও ভূষার্থ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'শীল (স্বভাব)' আদি বুঝাইতে এই প্রত্যয় যুক্ত হয় ; যথা—« √ক্রুধ্—ক্রোধন ; √কুপ্—কোপন ; √মণ্ড্—মণ্ডন ; অলম্+√কৃ—অলঙ্করণ » ইত্যাদি।

[৫চ] « অন » -প্রত্যয়ের প্রসারে, স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে, « অনা »—

ভাবার্থে : « √অর্চ্—অর্চন, অর্চনা ; গণ্—গণন, গণনা ; কৢপ্—কল্পনা ; ধৃ—ধারণা ; যন্ত্র্—যন্ত্রণা ; বিদ্—বেদনা ; বন্দ্—বন্দনা » ইত্যাদি।

[৬] « অনীয়=অনীয়র্ » ; কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে, 'যোগ্য অথবা কর্তব্য' এই অর্থে ; যথা—« √পা—পানীয় ; কৃ—করণীয়, স্মৃ—স্মরণীয়, রক্ষ্—রক্ষণীয়, মন্—মননীয়, ছিদ্—ছেদনীয় ; রমণীয়, সেবনীয়, দর্শনীয়, পূজনীয়, পালনীয় » ইত্যাদি।

[৭] « আন, মান » প্রত্যয় ; « আন=শানচ্ »—সংস্কৃতের আত্মনেপদ ধাতুর উত্তর, শতৃ-স্থলে এই « শানচ্ » প্রত্যয় হয় ; যথা, « অধীয়ান, শয়ান, আসীন »।

[৭ক] « আন=কানচ্ » ; যথা—« অনূচান, যুযুধান »।

(নিম্নে [৩৫]-সংখ্যক « মান, মাণ »-প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।)

[৮] « আলু=আলুচ্ » প্রত্যয়, শীলার্থে ; « নিদ্রালু, শ্রদ্ধালু, দয়ালু, তন্দ্রালু »।

[৯] « ই » প্রত্যয়—

[৯ক] « ই=ইক্ » : « কৃষি, গিরি »।

[৯খ] « ই=ইঞ্ » : « বাপি »।

[৯গ] « ই=ইণ্ » : « আজি ('ক্ষেত্র') »।

[৯ঘ] « ই=ইন্ » : « আস্থরি »।

[৯ঙ] « ই=কি » : ভাবে : « বিধি, নিধি, সন্ধি, আধি » ; কর্মে ও অধিকরণে—« জলধি, পয়োধি, বারিধি »।

[১০] « ইত্র » : « অরিত্র, খনিত্র, পবিত্র (=কুশ) »।

[১১] « ইন্ » প্রত্যয় : কর্তৃবাচ্যে, ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। এই প্রত্যয়-যোগে, পুংলিঙ্গে কর্তৃবাচকে একবচনে « -ঈ » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -ইনী », ক্লীবলিঙ্গে « -ই » ; বাঙ্গালায় সাধারণতঃ এই দীর্ঘ-ঈ-যুক্ত রূপই প্রযুক্ত হয়, স্ত্রীলিঙ্গের « -ইনী »-প্রত্যয়ান্ত রূপও

বহুস্থলে ব্যবহৃত হয়। সমাসে « ইন্ »-প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ « -ই »-রূপ গ্রহণ করে, এবং বাঙ্গালায় তদনুসারে এই « -ই »-যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা—« মানী, মানিনী ; মানিজন, গুণিগণ, ধনিজন » ইত্যাদি।

[১১ক] « ইন্—ইনি » : « জয়ী, শ্রমী, প্রসবী, ক্ষমী, শমী, দোষী, দমী, যোগী »।

[১১খ] « ইন্=ণিনি » ; পুংলিঙ্গে « -ঈ », স্ত্রীলিঙ্গে « -ইনী », সমাসে পুং ও ক্লীবলিঙ্গে « -ই » রূপ গ্রহণ করে। ঈ-কারান্ত রূপই বাঙ্গালায় অধিক প্রচলিত ; যথা « মন্ত্রী, উৎসাহী, অপরাধী, সত্যবাদী, স্থায়ী, অধিবাসী, প্রতিরোধী, অধিকারী, মাংসভোজী, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, অনুগামী, সোমযাজী, শত্রুঘাতী, ত্যাগী, ভোগী, অনুরাগী, বিবেকী » ইত্যাদি।

[১১গ] « ইন্—ঘিণুন্ » : « পরিত্যাগী, দুঃখভাগী, বিবেকী »।

[১২] « ইষ্ণু=ইষ্ণুচ্ » : 'শীল, ধর্ম, এবং সম্যক্-রূপে করা' অর্থে : « সহিষ্ণু, বর্ধিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু »।

[১৩] « ঈ—চ্বি » : অভূত-তদ্ভাবার্থে, অর্থাৎ 'আগে ছিল না, পরে হইয়াছে' অর্থে ; « অঙ্গী-কার, স্বী-কার, সমী-করণ, হ্রস্বী-করণ, দীর্ঘী করণ ; আর্যীকরণ, তালব্যীকৃত, কণ্ঠ্যীকরণ » ইত্যাদি।

[১৪] « ঈর » প্রত্যয়—« গভীর, শরীর »।

[১৫] « উ » প্রত্যয় ; যথা—

[১৫ক] « উ—উ » : « পিপাসু, চিকীর্ষু, লিপ্সু, বুভুক্ষু, ঈপ্সু »

[১৫খ] « উ—উণ্ » : « কারু, বাহু, সাধু, পায়ু »।

[১৫গ] « উ—ডু » : কর্তৃবাচ্যে—« বিভু, প্রভু »।

[১৬] « উক » : শীলার্থে—« কামুক, ঘাতুক »।

[১৭] « উর » : শীলার্থে ; যথা—

[১৭ক] « উর—কুরচ্ »—« বিদুর, ছিদুর, ভিদুর »।

[১৭খ] « উর=ঘুরচ্ » : « ভঙ্গুর, মেদুর, ভাসুর (='উজ্জ্বল') »।

[১৮] « উর » : « ক্ষুর, খর্জুর »।

[১৯] « ত, ইত ; ন, ণ »-প্রত্যয় : 'হইয়াছে', এই অর্থে, ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে বিশেষণ-সৃষ্টি করে। সংস্কৃতে এই প্রত্যয়ের, ও [২০] সংখ্যক « তবৎ »-প্রত্যয়ের, মিলিত-ভাবে এই দুইটার একটা নাম আছে— নিষ্ঠা। « ত=ক্ত » ; যথা—« কৃত, খ্যাত, জ্ঞাত, ভ্রাত, প্রীত, স্মিত, যুক্ত, মুক্ত, লিপ্ত, স্থিত, তপ্ত, লুপ্ত, গুপ্ত » ইত্যাদি।

এই « ত »-প্রত্যয়, ধাতুস্থ ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া, « ট, ধ, ঢ় » রূপও ধারণ করে ; যথা—« সৃজ্—সৃষ্ট, দিশ্—দিষ্ট, প্রচ্ছ্ (পৃষ্)—পৃষ্ট, কৃষ্—কৃষ্ট, দুষ্—দুষ্ট, শ্লিষ্—শ্লিষ্ট ; লভ্—লব্ধ, দহ্—দগ্ধ, স্নিহ্—স্নিগ্ধ, বুধ্—বুদ্ধ ; রুহ্—রূঢ়, বহ্—ঊঢ়, লিহ্—লীঢ় » ইত্যাদি। কতকগুলি ধাতুর উত্তরে « ত » না হইয়া « ইত » হয় : « চলিত, চর্চিত, ঘটিত, পঠিত, পতিত, গ্রথিত, অর্চিত, লিখিত, লজ্জিত, রাজিত, যাচিত, চেষ্টিত, ক্রীড়িত, ঘূর্ণিত, ব্যথিত, নিন্দিত, মুদিত, বাধিত, স্পর্ধিত, কুপিত, কম্পিত, চুম্বিত, স্তিমিত, ক্ষরিত, ত্বরিত, জ্বলিত, মিলিত, মীলিত, স্খলিত, রক্ষিত, শিক্ষিত » ইত্যাদি। নিষ্ঠা পরে থাকিলে, ধাতুর অন্তে, ও কতকগুলি ধাতুর মধ্যে, « ন্ » বা « ম্ » থাকিলে, বহুশঃ তাহাদের লোপ হয় ; কচিৎ ধাতুর স্বর দীর্ঘ হয় ; যথা—« গম্—গত, রম্—রত, মন্—মত, হন্—হত, নম্—নত, তন্—তত ; খন্—খাত, জন্—জাত ; দন্‌শ্—দষ্ট ; রন্‌জ্—রক্ত, সন্‌জ্—সক্ত ; মন্থ্—মথিত ; শন্‌স্—শস্ত, স্তন্‌ভ্—স্তব্ধ ; ধ্বন্‌স্—ধ্বস্ত ; গ্রন্থ্—গ্রথিত ; বন্ধ্—বদ্ধ » ইত্যাদি। কতকগুলি ধাতুর উত্তর « ত » ও « ইত » উভয়ই হয় ; যথা—« বম্—বান্ত, বমিত ; শম্—শান্ত, শমিত ; হৃষ্—হৃষ্ট, হৃষিত ; কৃষ্—কৃষ্ট, কৃষিত ; শ্বস্—বি-শ্বস্ত, বিশ্বসিত ; ছদ্—ছন্ন, ছাদিত » ইত্যাদি।

কোনও-কোনও ধাতুর উত্তর « ক্ত—ত »-প্রত্যয় হইলে, « ত » না

হইয়া « ন (ণ) » হয়; যথা, « লীন, ভিন্ন (√ভিদ্+ন), লূন, পূর্ণ, আ-পন্ন, ক্ষুণ্ণ, ক্লিন্ন, ভগ্ন, মগ্ন, উড্ডীন (উৎ+√ডী), ক্ষীণ, চূর্ণ, কীর্ণ, জীর্ণ, দীর্ণ, তীর্ণ, শীর্ণ, গ্লান, ম্লান, রুগ্‌ণ » ইত্যাদি।

[২০] « তবৎ—ক্তবতু » প্রত্যয়: কর্তৃবাচ্যে, 'করিয়াছে' এই অর্থে। প্রথমার একবচনে এই প্রত্যয়ের রূপ—পুংলিঙ্গে « তবান্ » স্ত্রীলিঙ্গে « তবতী », ক্লীবলিঙ্গে « তবৎ »। পূর্বোক্ত « ত »-প্রত্যয়ের ন্যায় এই প্রত্যয়টীরও নাম নিষ্ঠা। « ত (ক্ত) »-এ « বৎ » (বান্, বতী, বৎ) যোগ করিয়া এই প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালায় তবৎ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের ব্যবহার বিরল; « কৃতবান্—কৃতবতী »।

[২১] « তব্য—তব্যৎ »: কর্ম- ও ভাব-বাচ্যে, 'ইহা করা হইবে, বা করা উচিত' এই অর্থে; যথা—« দাতব্য, কর্তব্য, স্থাতব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য, দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, হন্তব্য, আলোচিতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, চিন্তয়িতব্য, অধ্যেতব্য » ইত্যাদি।

« বল » ও « কহ », এই দুই বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ ধাতুর সহিত যুক্ত করিয়া « বলতব্য, কহতব্য » শব্দদ্বয় শুনা যায় বটে, কিন্তু সৎসাহিত্যে এই দুই শব্দ প্রযোজ্য নহে।

[২২] « তি » [—ক্তিন্, আদ্যোদাত্ত হইলে; ক্তিচ্—অন্তোদাত্ত হইলে]: ভাব-বাচ্যে—'তাহার ভাব', এই অর্থে বিশেষ্য-সৃষ্টি করে। ধাতুর উত্তর « ত »-প্রত্যয়ে যে-রূপ পদ সৃষ্ট হয়, « তি »-প্রত্যয়েও তদ্রূপ, কেবল « ত » স্থানে « তি » হয়; যথা—« কৃতি, খ্যাতি, প্রীতি, যুক্তি, মুক্তি, জ্ঞাতি »।

[২৩] « তু—তুন্ »—সংজ্ঞা-গঠন-কারক প্রত্যয়: « বস্তু, ক্রতু, সেতু, জন্তু, সক্তু, তন্তু, ধাতু »।

[২৪] « তু—তুন্ »—কেবল সমাসে পাওয়া যায়—'করিতে' বা 'করিবার জন্য' এই অর্থে; যথা—« শ্রোতুকাম, রোদিতুকাম, শিক্ষিতুকাম » ইত্যাদি।

[২৫] « তৃ—তৃচ্, এবং তৃন্ »—সংস্কৃতে যেখানে শব্দের শেষ অক্ষরে (অর্থাৎ প্রত্যয়ে) উদাত্ত স্বর যুক্ত হয়, সেখানে « তৃচ্ »-প্রত্যয়, এবং যেখানে আদ্য অক্ষরে (অর্থাৎ ধাতুতে) উদাত্ত স্বর হয়, সেখানে « তৃন্ »-প্রত্যয় বলে। এই প্রত্যয় সংস্কৃতের একটী বিশেষ লক্ষণীয় প্রত্যয়—ইহার দ্বারা কর্তৃবাচ্যে 'সে করে' এই অর্থে সংজ্ঞা-সৃষ্টি হয়। প্রত্যয়টীর প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে « -তা » হয়, স্ত্রীলিঙ্গে « -ত্রী » এবং ক্লীবলিঙ্গে « -তৃ »; সমাসেও « -তৃ » হয়। বাঙ্গালায় পুংলিঙ্গ « -তা » ও স্ত্রীলিঙ্গ « -ত্রী » রূপেই এই প্রত্যয় সমধিক প্রচলিত ; যথা—« পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দাতা, দাত্রী, ধাতা, ধাত্রী ; বিধাতৃ-চরণে ; যোদ্ধা ; যোদ্ধৃ-বেশ ; পিতৃ-দেব ; কর্তা, কর্তৃকারক, কর্তৃবাচ্য ; ভর্তা ; নেতা, নেত্রী, নেতৃগণ ; হর্তা ; হোতা, হোতৃগণ ; আহ্বাতা » ইত্যাদি।

[২৫ক] কতকগুলি ধাতুর উত্তর « তৃ » স্থলে « ইতৃ (ইতা, ইত্রী, ইতৃ) » ব্যবহৃত হয় ; যথা—« ভবিতা, কারয়িতা, সবিতা, স্তোতা (=স্তবিতা) » ইত্যাদি।

[২৬] « ত্র=ষ্ট্রন্ » : কর্তৃবাচ্যে ; যথা—« নেত্র, শস্ত্র, শাস্ত্র, পত্র, গাত্র, বস্ত্র, শ্রোত্র, সত্র, স্তোত্র, রাষ্ট্র, ক্ষত্র, ক্ষেত্র, মূত্র, নক্ষত্র »। ধাতু-বিশেষে এই প্রত্যয় « ইত্র » রূপে মিলে ; যথা—« পবিত্র, খনিত্র, চরিত্র, অরিত্র, বহিত্র »।

[২৬ক] « ত্র »-এর প্রসারে « ত্রি »—যথা—« রাত্রি ; কৃত্রিম » (=√কৃ+ত্রি+তদ্ধিত প্রত্যয় « ম »)।

[২৭] « ত্র »-এর প্রসারে « ত্রু » ; যথা—« শত্রু »।

[২৮] « থ=ক্থন্ » : « রথ, কাষ্ঠ » ;

« থ=থক্ » : « উক্থ, নিশীথ, তীর্থ » ;

« থ=থন্ » : « ওষ্ঠ, গাথা, অর্থ »।

[২৯] « ন=নঙ্ » : « যত্ন, যজ্ঞ (√যজ্+ন), প্রশ্ন, যাচ্ঞা (√যাচ্+ন+আ) » ; (« তৃষ্ণা » শব্দে পাণিনি-মতে উণাদি ন-প্রত্যয় বিদ্যমান—পৃঃ ১৮১।১৮২ দ্রষ্টব্য)।

« ন=নক্ » : « ঊর্ণা, ফেন, মীন, কৃষ্ণ » ;

« ম=মন্ » : « ধর্ম »।

[৩০] « নি—নিৎ » : « গ্লানি, হানি, শ্রেণি, শ্রোণি »।

[৩১] « নু—ক্নু » : « গৃধ্নু, ধৃষ্ণু »।

[৩২] « ভ=অভচ্ » : « বৃষভ, করভ, গর্দভ, রাসভ, শরভ »।

[৩৩] « ম=মন্ » : « ঘর্ম, স্তোম, তিগ্ম, ধর্ম »।

[৩৪] « মন্=মনিন্ » : « আত্মন্ (আত্মা), উষ্মন্ (উষ্মা), বর্ত্মন্ (বর্ত্ম), জন্মন্ (জন্ম) »।

[৩৫] « মান, মাণ »—'শানচ্'-প্রত্যয়ের রূপভেদ, [৭]-সংখ্যক « আন » প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। কতকগুলি ধাতুর উত্তর (কর্তৃবাচ্যে ভ্বাদি, দিবাদি ও তুদাদি গণীয় ধাতুর উত্তর, এবং কর্মবাচ্যে সমস্ত ধাতুর উত্তর) এই প্রত্যয় হয়।

[৩৫।ক] « মান, মাণ—শানচ্ » : « সেবমান, বর্তমান, বর্ধমান, বিদ্যমান, দীপ্যমান, ম্রিয়মাণ, জায়মান, ধ্রিয়মাণ, দীয়মান, ভ্রাম্যমাণ সৃজ্যমান, সেব্যমান, নীয়মান, ক্রিয়মাণ » ইত্যাদি।

[৩৫।খ] « মান=শানন্ » : « যজমান, পবমান »।

[৩৬] « য—ক্যপ্ » : « ভৃত্য, কৃত্য (—'কার্য' অর্থে), শিষ্য, হত্যা, ব্রজ্যা » ;

« য—ণ্যৎ » : « কার্য, ধার্য, বাক্য, বাচ্য, ভোগ্য, ভোজ্য, ত্যাজ্য, বোধ্য, হাস্য, বাহ্য » ; অর্থানুসারে ধাতুর উত্তর « ক » স্থানে « চ » এবং « গ » স্থানে « জ » হয়।

« য—যৎ » : « গম্য, ভব্য, দেয়, জেয়, শক্য, সহ্য, লভ্য, রম্য »।

« য—যপ্ » : « ব্রহ্মোদ্য (ব্রহ্ম-উদ্য—ব্রহ্ম- √বদ্-য), রাজসূয় »।

« য—শ » : « ক্রিয়া, পরিচর্যা »।

[৩৭] « য—যঙ্ » : পৌনঃপুন্যে ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর এই য-প্রত্যয় বসে, ও ধাতুর অভ্যাস হয়, অর্থাৎ আদ্য বর্ণের দ্বিত্ব হয় ; যথা— « চাঞ্চল্য, দেদীপ্যমান, জাজ্বল্যমান »।

[৩৮] « যু » : « মন্যু, মৃত্যু » ; (« মৃত্যু » শব্দে উণাদি « ত্যুক্ » প্রত্যয়)।

[৩৯] « র »—শীলাদি অর্থে কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে « র » হয় ; যথা—« নম্র, হিংস্র, কম্প্র, কম্র, অজস্র, দীপ্র, ভদ্র, শক্র, স্মের, অগ্র, শূর, বজ্র, বীর, বিপ্র, গৃধ্র, ছিদ্র, রন্ধ্র ; ধারা, সুরা » ইত্যাদি।

« র = ক্রন্ » : « সূর, সুর, ধীর »।

« র = রক্ » : « নীর, শুক্র, ক্ষুদ্র, ক্ষিপ্র »।

[৪০] « রু = ক্রু » : « ভীরু » ;

« রু = রু » : « মেরু, শত্রু, দারু »।

[৪১] « ল = ল » : « শুক্ল, তরল, পাল »।

[৪২] « ব » : « ধ্রুব, ঊর্ধ্ব, পক্ব, সচিব » (পাণিনি মতে, « পক্ব » শব্দ « √পচ্ + ক্ত » রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

[৪৩] « বর = ক্বরপ্ » : « নশ্বর, জিত্বর, গত্বর »।

« বর = বরচ্ » : « ঈশ্বর, ভাস্বর, স্থাবর, যাযাবর »।

« বর = ষ্বরচ্ » : « বর্বর, চত্বর » (« শর্বরী » শব্দ পাণিনি মতে « √শৄ + বনিপ্ + ঈ »)।

[৪৪] « স = সন্ »—অভিলাষ-প্রকাশনার্থে ; এই প্রত্যয় আসিলে, ধাতুর আদ্য-ধ্বনির অভ্যাস হয়। এই প্রত্যয়ের পরে « আ » এবং « উ » যুক্ত পদ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় ; যথা—« পিপাসা, বুভুক্ষা, মুমুক্ষু, লিপ্সা, চিকীর্ষা (সন্ + আ) ; পিপাসু, জিজ্ঞাসু, বুভুক্ষু, লিপ্সু, জিগীষু, ভিক্ষু (সন্ + উ) » ইত্যাদি।

[৪৫] « স » : « তীক্ষ্ণ, কৃৎস্ন, জ্যোৎস্না »।

[৪৬] « সু = গ্সু » : « জিষ্ণু, স্থাসু »।

[৪৭] « স্যমান »—ভবিষ্যৎ কর্মবাচ্যে : « বক্ষ্যমাণ, ধক্ষ্যমাণ, করিষ্যমাণ » ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, সংস্কৃত ব্যাকরণে **উণাদি-প্রত্যয়** নামে কতকগুলি কৃৎ-প্রত্যয় ধরা হয়। এইগুলি বিশেষ-বিশেষ কতকগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণের সাধনের জন্য ব্যাকরণকার-কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে ; যেমন—« √অঙ্গ্ + উণাদি উলিচ্ = অঙ্গুলি ; √অঞ্জ্ + অলিচ্ = অঞ্জলি ; অম্ + ক্র = অম্ল ; অন্ + ইলচ্ = অনিল ; সল্ + ইলচ্ = সলিল ; কপ্ + ওতচ্ = কপোত ; চট্ + এণ্ = চাটু ; তন্ড + উলচ্ = তণ্ডুল ; ধে + নু = ধেনু ;

দৃ+উরচ্=দর্দুর; স্ফায্+নক্=ফেন» ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি পৃথক্-ভাবে আলোচনা করিবার বিষয়।

সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ, বহু স্থলে উহাদের ব্যুৎপত্তি-অনুসারে প্রযুক্ত হয় না। কার্যতঃ, বিশেষ্য-বিশেষণ-রূপে বা ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—«তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন» (=«প্রকাশিত করিয়াছেন»; কিন্তু «প্রকাশ-করা»—মিলিত ভাবে যেন একটী ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয়); দেবী অন্তর্ধান (=অন্তর্হিত) হইলেন; পিণ্ডদানে প্রেত উদ্ধার হইয়া গেল (=উদ্ধার প্রাপ্ত হইল); তিনি মৌন (=মৌনী) রহিলেন; গল্প শেষ হইল; ভাষায় ইহা অপ্রচল (=অপ্রচলিত) হইয়াছে; শুভকার্য নির্বাহ (=নির্বাহিত) হইয়াছে; এই অর্থে শব্দটী ব্যবহার (=ব্যবহৃত) হয় না; তাঁহার বংশ লোপ (=লুপ্ত) হইল; আমার বক্তব্য শ্রবণ কর; ধাতুতে প্রত্যয় যোগ (=যুক্ত) হইলে শব্দ হয়; «'প্রণাম হই, ঠাকুর মহাশয়!'» ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার রীতি-অনুসারে «হ, কর্» প্রভৃতি ক্রিয়া-যোগে বিশেষ্য-পদ ক্রিয়াত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া, এই-রূপ ঘটিয়া থাকে; এবং সমাস-যুক্ত শব্দ বাঙ্গালা উচ্চারণে ও লেখায় পৃথক্-পৃথক্ করিয়া ধরা হয় বলিয়া, এই প্রকার আপাত-দৃষ্টিতে অপপ্রয়োগ সম্ভব হয়; যেমন—«তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন»—এইরূপ বাক্য দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে: (১) «তিনি এই-পুস্তককে প্রকাশ-করিয়াছেন»; ও (২) «তিনি এই-পুস্তক-প্রকাশ-রূপ কার্য করিয়াছেন»। প্রথমোক্ত রীতির অনুযায়ী ব্যাখ্যাই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-অনুযায়ী। (সমাস-পর্যায়ে 'অলগ্ন-সমাস—সংস্কৃত সমস্ত-পদের পৃথক্ লিখন' দ্রষ্টব্য,

[৩.০৪৬] ; এতদ্ভিন্ন, 'ক্রিয়া-পর্যায়'-এর অন্তর্গত 'ধাতু'-খণ্ডে, 'সংযোগ-মূলক ধাতু'-অংশও দ্রষ্টব্য)।

[৩.০২৩] বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়

শব্দ বা নাম-প্রকৃতির উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হয়। একাধিক তদ্ধিত প্রত্যয় পর পর বসিতে পারে। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত তদ্ধিত প্রত্যয় প্রদত্ত হইল।

[১] « অ » বা « ও »: স্বার্থে বা অনাদরে; যথা—« কাল (=কাল্, যেমন কাল্-শিরা, কাল্-সাপ), কাল (=কালো) » (« কাল »—তদ্ধিত প্রত্যয় [৩] দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যক্তির নামে এই প্রত্যয় মিলে: « শিবো, রুদো = রুদ্র, সিধো = সিদ্ধেশ্বর, বিভো, জনো = জনার্দ্দন, পিথো = পৃথ্বীধর » ইত্যাদি।

[২] « অট—ট »; প্রসারে—« অটা—টা (টো, টে'—স্বরসঙ্গতির ফলে); অটী—টি; অটিয়া, আটিয়া—টে', আটে' »। স্বার্থে বা সাদৃশ্যে, ভাবার্থে বা শীলার্থে, বিশেষ্য- ও বিশেষণ-দ্যোতক; যথা—« দাপ—দাপট; সাপট (< সর্প—গতি-অর্থে): ঝাপট; আঙ্গট (পাতা)—আঙ্গটা; মাথা —মাথট; চিপ বা চাপ—চেপটা; ঘষ—ঘষটা; শুখা—শুখটী, শুকটী, শুঁকটী (বর্ণব্যত্যয়ে) শুঁটকী (মাছ); নাঙ্গটা, ল্যাঙ্টা; পাঁশ—পাঁশুটা, পাঁশুটিয়া > পাঁশুটে'; নেহ (=স্নেহ)—নেহটা, নেওটা, নেওটো: ছিপ—ছিপটী; ধোয়াট; ভরাট; জমাট; ঘোলাট; আমিষ>আইষ—আইষটিয়া—আঁষ্‌টে'; ভাড়া—ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে'; ঘোলা—ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে'; ধোঁয়াটে'; তামাটে'; ঝগড়াটে'; রোগাটে' » ইত্যাদি। « এক—একটা, দুই—দুইটা, দুটা, দুটো; তিন—তিনটা, তিন্‌টে » ইত্যাদি সংখ্যা-বাচক « -টা-টো, -টে »-প্রত্যয়ও এই শ্রেণীতে পড়ে। [সংস্কৃত « বৃত্ত, বৃত্তি », প্রাকৃত « বট্ট, বট্টি, অট্ট, অট্টি » এই প্রত্যয়ের মূল রূপ।]

দ্রষ্টব্য :—« লেঙ্গট, মলাট, কষটী (পাথর), উলট, পালট »—এইরূপ কতকগুলি শব্দে এই « অট—ট » প্রত্যয় পাই না, এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি অন্য প্রকারের। এগুলির মূলে « পট্ট, পট্টিকা » শব্দ : « লিঙ্গপট্ট—লেঙ্গট ; মলপট্ট—মলাট ; কর্ষপট্টিকা—কষটী »।

[৩] « আ » (স্বরসঙ্গতি-হেতু « এ » বা « ও » হয়): স্বার্থে, অথবা নিন্দায়, এবং সম্বন্ধ বা বৈশিষ্ট্য, বিশেষণ-ভাব, অথবা (সমাসে) কর্তৃভাব বা করণভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« [স্বার্থে]—ঘোড়—ঘোড়া (ঘোড়-দৌড়, ঘোড়-গাড়ী : মূলশব্দ 'ঘোড়,' স্বার্থে আ-প্রত্যয়-যোগে ঘোড়া) ; তদ্রূপ, কাঁচ (যথা, কাঁচ-কলা)—কাঁচা ; গোরা (মূলশব্দ সংস্কৃত গৌর হইতে জাত 'গোর' আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না) ; গল—গলা (তুলনীয়—কণ্ঠ, কণ্ঠা) ; প্রেম—প্রেমা (পুরাতন-বাঙ্গালায়) ; ধাঁচ—ধাঁচা ; চাঁদ—চাঁদা ; গোপাল > গোআল—গোআলা – গোয়ালা ; চোর—চোরা ; পাত—পাতা ; [নিন্দায়, বৃহৎ অথবা স্থূল অর্থে]—কেষ্ট—কেষ্টা ; রাখাল—রাখালা>রাখ্‌লা ; আঁজল—আঁজলা ; গোপাল—গোপ্‌লা ; বাঘ—বাঘা ; পাগল—পাগলা ; বামুন—বামুনা—বাম্‌না ; [সম্বন্ধ]—পশ্চিম—পশ্চিমা ; ডাহিন > ডাহিনা, ডাইনে (চলিত-ভাষায়, স্বরসঙ্গতি-অনুসারে) ; পাছ—পাছা, লোন বা লুন—লোনা (নোনা), চাঁদ—চাঁদা (চাঁদা মাছ), তেল—তেলা ; [বৈশিষ্ট্য]—থাল—থালা ; গাছ—গাছা ; বঙ্গ—বঙ্গাল > বাঙ্গাল—বাঙ্গালা (বাঙলা) ; রাঙ্গ—রাঙ্গা, রাঙা ; এক—একা ; কাল—কালা (—'কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি-বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণ') ; হাত—হাতা ; জল—জলা ; [বিশেষণ-ভাব]—মিঠ—মিঠা ; মুখ > মুহ—মুহা (চৌমুহা ; প্রাচীন-বাঙ্গালা—পোড়ামুহা > পোড়ারমুয়ো) ; পশ্চিম—পশ্চিমা ; টিম্‌টিম্ করিয়া যাহা জ্বলে তাহা 'টিম্‌টিমা' আলোক ; গোঁফ—চোগোঁপা বা চোগোঁপ্পা পুরুষ ; একহারা, দোহারা (গড়ন) ; পাত > পাত-ল—পাতলা ; জঙ্গল—জঙ্গলা ; প্রাকৃত মইল—ময়লা ; ফুল-তোলা কাপড় ; হাত-কাটা

জামা; তে-পায়া (আসন বা পাত্র) ফুল-কাটা বাটী; [বিশেষণ সমস্ত-পদে বিশেষণীয় নামের কর্তৃভাব বা করণ ভাব]—কলম-কাটা ছুরী; চাল-ধোয়া চুবড়ী; কাপড়-কাচা সাবান; গায়ে-পড়া মানুষ» ইত্যাদি।

[৪] «আই»: আদরে, নামের পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত রূপের সঙ্গে: «কান,—কানু, কানাই; শ্রীমন্ত—ছিরাই; বলরাম, বলদেব—বলাই; জগৎ—জগাই; মাধব—মাধাই; জনার্দন—জনাই, দনাই; গণেশ—গণাই» ইত্যাদি।

[৫] «আই»: ভাবার্থে: «বড়াই, লম্বাই, চৌড়াই বা চওড়াই» ইত্যাদি। (পৃঃ ১৫৯, বাঙ্গালা কৃৎ-প্রত্যয় [৯] «আই» দ্রষ্টব্য)।

[৬] «আউআ, ওয়া»: প্রত্যয়-যোগে বিশেষণ হয়—«ঘর—ঘরাউআ > ঘরোয়া»।

[৭] «আন, আনো»: নাম-ধাতুর নিষ্ঠা-দ্যোতক: «জুতা—জুতানো, পেঁচ—পেঁচানো, লাথি—লাথানো, জমা—জমানো»।

[৮] «আনি»: 'জল বা জলীয় ভাব' অর্থে: «নখানি, নাকানি, ডুবানি, চোবানি, চোখানি, আমানি»। [মূল রূপ—«পানীয় > পানী»।]

[৯] «আম্—আম (আমো), ম'; ম্; আমি—ওমি, উমি, মি»: 'ভাব বা কার্য বা অনুকরণ' অর্থে: «ঠক—ঠকাম'; পাকা—পাকাম', পাকামি; নেকা—নেকাম', নেকামি; ছেলে—ছেলেম' (< ছালিয়াম), ছেলেমি; বুড়াম'; জেঠামো; বড়াম, বড়াম্, বড়াং; গিন্নেম, গিন্নিম; পাজি—পেজোমো, পেজোমি; ঘরামী (—'যে ঘর তৈয়ারীর কাজ করে') » ইত্যাদি। [মূল—«কাম—কর্ম»।]

[১০] «আর» (১): কর্তৃ-বোধক প্রত্যয়, ব্যবসায়ী বা কর্মী বুঝায় [সংস্কৃত 'কার'- শব্দ-জাত]। ইহার প্রসারে—«আর+আ» >

« আরা », « আর+ঈ » > « আরী, আরি ; ওরি, উরি » (স্বর-সঙ্গতির প্রভাবে) ; যথা—« চাম—চামার ; গোঁয়ার (=গাওঁয়ার, গ্রাম > গাঁও +আর) ; কুমার ; দোহার ; কাঁসারী ; পূজারী ; শাঁখারী ; প্রাচীন-বাঙ্গালা বাণিজার ; চুনারী ; সেকরা (< সেকারা) ; পিয়ার, পিয়ারী ; ধুনারী (ধুনোরি, ধুনুরি) ; ডুবারী (ডুবুরী) ; ছুতার ; ভিখারী (ভিখিরি) ; জুয়ারী (জুয়াড়ী) ; দিশারী » ইত্যাদি।

[১১] « আর » (২) : স্বার্থে, হ্রস্ব-ভাব অথবা সংযোগ অর্থে ('আকার' শব্দ হইতে) : প্রসারে « আরী » ; যথা—« পয়ার (< পদাকার) ; ঝিয়ারী ; মাঝার, মাঝারী ; বহুয়ারী »।

[১২] « আর » (৩) : 'স্থান' অর্থে ('আগার' শব্দ হইতে) ; প্রসারে « আর+ঈ »—« আরী » ; যথা— « ভাণ্ডার, ভাড়ার ; কাণ্ডার, কাঁড়ার ; মেহার, সাভার (স্থানের নাম—মহাগার, সভ্যাগার) »।

[১৩] « আরু » : কর্তৃবাচকে—« আর (১) »+« উ »—« আরু », « দিশারু, বাগারু, বন্দারু, ডুবারু, খোঁজারু (—চর) »।

[১৪] « আল (আল্), আলো » : চলিত ভাষায় « অল, ওল » -রূপে কখন-কখনও শোনা যায়। গুণ, সম্বন্ধ, শীল অথবা সংযোগ জানাইতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« বাঙ্গাল, বাঙাল (< বঙ্গ, সম্বন্ধ-অর্থে বঙ্গ-জাতি- বা বঙ্গ-দেশ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তি) ; পাঁকাল ; ধারাল ; দুধাল ; দাঁতাল ; মাথাল, মাথালো ; মাতাল (মত্ত- > মাতা, তদ্রূপ শীল যাহার) ; আড়াল (< আড়) ; পেঁচাল ; তেজাল ; বাচাল ; ভাটিয়াল (ভাটী) ; পাইকাল (পাইক বা সিপাহীর শীল—বীরত্ব) » ইত্যাদি। « বাঙ্গাল (বা বঙ্গাল) » হইতে ফরাসী নাম « বঙ্গালা » (দেশ), তাহাতে সম্বন্ধে « ঈ » প্রত্যয় ([১৫] সংখ্যার বাঙ্গালা তদ্ধিত) যোগে « বঙ্গালী » > « বাঙ্গালী »।

[১৪ক] প্রসারে—« আলী », চলিত-ভাষায় « উলী » : (ভাব-

বাচক) —« নাগরালী, ঠাকুরালী, মিতালী, সূতালী (সূত বা রথচালকের কার্য), মেয়েলী (< মাইয়া+আলী) » ; (কর্তৃবাচক, বিশেষণ ও বিশেষ্য)—« সোনালী, রূপালী, সুতালী » ।

[১৫] « আল, আলা ; ওয়াল, ওয়ালা », স্ত্রীলিঙ্গে « আলী, ওয়ালী » ; ওয়াল, ওয়ালা, ওয়ালী » হিন্দুস্থানী প্রত্যয়, ইহাদের বাঙ্গালা বিকৃতি « ওলা (< ওয়ালা), উলী (< ওয়ালী) » । ['পালক' শব্দ হইতে] সম্বন্ধ, দেশ, ব্যবসায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« কোটাল, ঘাটোয়াল (ঘাটাল), ঘড়ীয়াল (চলিত-ভাষায় 'ঘ'ড়েল'), রাখাল (প্রাচীন-বাঙ্গালা 'রাখোআল') ; ঘোষাল (=ঘোষ-গ্রামে বাড়ী যাহার), কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিল-গ্রামে বাড়ী যাহার), কাশীয়াল (চলিত-ভাষায় 'কেশেল'), গয়াল (গয়ালী—গয়াবাসী ব্রাহ্মণ), আগরওয়াল (আগ্রাবাসী বৈশ্য) ; গোয়ালা (গো বা গোরু লইয়া যাহার ব্যবসায়), কাপড়আলা ('কাপড়ওয়ালা' – হিন্দুস্থানী রূপ ; 'কাপড়ওলা' = হিন্দুস্থানী রূপের বাঙ্গালা বিকার) ; বাড়ীআলা ('বাড়ীওয়ালা' – হিন্দুস্থানী রূপ ; 'বাড়ীওলা'—তদ্বিকারজ বাঙ্গালা রূপ), পাহারালা ('পাহারাওয়ালা, পাহারোলা'), গাড়ীআলা ('গাড়ীওয়ালা, গাড়ীওলা') » । এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত « মাতোয়ারা » (কবিতায় প্রযুক্ত শব্দ), হিন্দুস্থানী « মত্‌বালা » হইতে, ইহার খাঁটী বাঙ্গালা প্রতিরূপ « মাতাল ») ।

[১৫ক] প্রসারে—« আলী, ওয়ালী, উলী », স্ত্রীলিঙ্গে ও ভাবার্থে ; যথা—« বাড়ীআলী, বাড়ীউলী ; বাসনালী, বাসনউলী ; মুড়িউলী ; রাখালী ; ঘাটোয়ালী » ।

[১৬] « ঈ, ই » (১) : সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, ধর্ম, ব্যবসায়, আজীবিকা বুঝাইতে বিশেষ্য ও বিশেষণে এই ঈ-কারের প্রয়োগ হয় ; যথা—« ভারী, দাগী, গুণী (তৎসম) ; ঢাকী, বেগুনী (=বাইগণ+ঈ) ; গোলাপী, হিসাবী, মরমী, আলাপী, দরদী, দেশী, বিলাতী (চলিত-ভাষায়—

'বিলিতি'); তেলী, কাগজী, জমিদারী ('জমিদারী চাল'), রেশমী, পশমী, উনী, সুতী (সুতী কাপড়—সুত+ঈ); রাঢ়ী, কানাড়ী (কানাড়া বা কর্ণাট-দেশের), মারহাট্টী (মারহাট্টা-দেশের), গুজরাটী, কটকী (কটক-নগরের), বনারসী—বেনারসী, বৃন্দাবনী, ঢাকাই, ক'লকাতাই; হাড়ী, কেরানী, শুঁড়ী, রাধনী বা রাঁধুনী (—পাচক, যে রাঁধে) »।

[১৭] « ঈ, ই » (২): স্ত্রী-বাচক এই প্রত্যয় বাঙ্গালায় বিশেষ্যে প্রযুক্ত হয়। স্ত্রী-প্রত্যয় ভিন্ন, ইহার দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু বা অন্য বিশেষ্যের হ্রস্বতা বা স্বল্পতা, এবং আদরও বুঝায়; যথা—« ঘোড়া—স্ত্রী. ঘোড়ী > ঘুড়ী; কাকা—কাকী; মামী; বুড়ী; পাগলী; বামনী; বোষ্টমী; মাটী; ঝোলা—ঝুলী; প্রাচীন-বাঙ্গালা পোথা ('বড় বই')—পুথী, পুঁথি; ছোরা—ছুরী; লাঠি; ছাতা—ছাতি; ধুতি; জাতী, যাঁতী » ইত্যাদি।

[১৮] « ঈ, ই » (৩): ভাব-বাচক বিশেষ্য এই প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হয়; যথা—« বড়-মানুষী, পণ্ডিতী, ডাকাতী, মাষ্টারী, রাখালী » ইত্যাদি।

মন্তব্য: এই প্রত্যয় [১৭] ও [১৮], বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব স্ত্রী-প্রত্যয়; সংস্কৃতের স্ত্রীলিঙ্গ « আ »-প্রত্যয়ের স্থলে, বহু বাঙ্গালা শব্দে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যথা—« সুনয়নী; অপ্সরী; স্বজনী, সজনী; ধনী; রূপসী » ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় « ইনি, ইনী, নী, নি »-প্রত্যয় ইহার স্থান অনেকটা অধিকার করিয়াছে; [৩১]-সংখ্যক তদ্ধিত দ্রষ্টব্য।

[১৯] « ইয়া », চলিত ভাষায় « এ' » (অভিশ্রুতি-জাত স্বর-পরিবর্তন-সহ): এই প্রত্যয়, সম্বন্ধ-বাচক বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠন করে; যথা—« হলুদ—হলদিয়া—হ'লদে; বাইগণ, বাইগণিয়া>বেগুনে'; জালিয়া—জেলে; নগরিয়া—নগুরে'; শহরিয়া—

শহুরে'; উত্তরিয়া—উত্তুরে'; মাটিয়া—মেটে; পাথরিয়া > পাথুরে' ('পাথুরে' প্রমাণ'); পাড়া-গাঁ+ইয়া—পাড়াগেঁয়ে; কান্দনিয়া—কাঁদুনে'; মিছ-কহনিয়া—মিছ-কউনে'; জাগানিয়া—জাগানে'; কালিয়া—কেলে; ওড়—ওড্রদেশ—ওড়িয়া, উড়িয়া—উড়ে'; পিউসী+ইয়া—পিউসিয়া, পিসা—পিসে » ইত্যাদি।

[২০] « উ »—আদরে; হ্রস্বার্থে—সাধারণতঃ ব্যক্তির নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়; যথা—« পঞ্চানন—পঞ্চু; পাঁচকড়ি—পাঁচু; নরেন্দ্র, নরপতি—নরু; হরনাথ—হরু; রাধানাথ—রাধু; (কৃষ্ণ—কণ্হ—) কান—কানু; বলরাম—বলু; খোকা—খুকু (হ্রস্বার্থে, পরে শিশু-কন্যা অর্থে); দুষ্ট—দুষ্টু, ধূর্ত—ধুত্তু; বড়—বড়ু » ইত্যাদি।

[২১] « উয়া », চলিত-ভাষায় « ও » (অভিশ্রুতি-সহিত): সম্বন্ধ ও সংযোগ জানাইতে প্রযুক্ত হয়; এবং তুচ্ছতা, নিন্দা ও জুগুপ্সা অর্থে, ব্যক্তি-বাচক নামের সহিতও ব্যবহৃত হয়; যথা—« ঘরুয়া—ঘ'রো, জলুয়া—জ'লো, হাটুয়া—হেটো, জরুয়া—জ'রো, ধামুয়া—ধেনো (মদ, জমী), কাঠুয়া—কেঠো, দামুয়া—দেনো (যথা, 'দেনো জিনিস'), টাকুয়া—টেকো; মাউসী (=মাসী)—মাউসুয়া, মাউসা > মেসো; রাম—রামুয়া > রেমো, শ্যাম—শেমো, মধু—ম'ধো, মাধব—মাধুয়া > মেধো, রাধানাথ—রাধুয়া—রেধো » ইত্যাদি।

[২২] « ক », প্রসারে « কা, কী » এবং « কিয়া, কুয়া » (চলিত-ভাষায় « কে', কো »—অভিশ্রুতি-সহ): স্বার্থে, সম্বন্ধে ও সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়; যথা—« ঢোল—ঢোলক; ধনু—ধনুক; দম—দমক, দমকা; ফলা—ফলক; বড়—বড়কী (বড়-ভাইয়ের স্ত্রী; তদ্রূপ, 'মেজকী, সেজকী, ছোট্‌কী, ছুটকী'); পণ—পণকিয়া, প'ণকে, পুনকে; কড়া—কড়াকিয়া, কড়াকে'; গণ্ডা—গণ্ডাকিয়া; শত—শতকিয়া, শ'তকে, শ'ট্‌কে; মন—মনকিয়া, মুন্‌কে; কাঠ—কাঠকুয়া, কেঠ্‌কো (কাষ্ঠপাত্র-বিশেষ) »।

« মড়ক, সড়ক, চড়ক » এইরূপে « ক »-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন (« মড়া, সড়া, চড়া » হইতে)।

[২৩] « জা »—পুত্র বা বংশ-জাত অর্থে : « ঘোষ—ঘোষজা, বসু—বোস্‌জা ; মিত্রজা »।

[২৪] « জাত » : অন্তর্ভুক্ত অর্থে : « পকেট-জাত, অভিধান-জাত »।

[২৫] « ড় », প্রসারে « ড়া, ড়ী » (১) : স্বার্থে বা সাদৃশ্যে ; « রাজা—রাজড়া, গাছ—গাছড়া, কাঠ—কাঠড়া, পাতা—পাতড়া, শাশ (=শ্বশ্রূ ; তুলনীয়, মাস-শাশ, পিশ-শাশ)—শাশড়ী, শাশুড়ী ; আঁক—আঁকড়ী ; চাম—চামড়া ; খড়্গ হইতে খাগ—খাগড়া ; ঝি—ঝিউড়ী ; মুখ হইতে মুহ—মুহড়া, মোহড়া, মহড়া ; কেয়া—কেওড়া ; হিজ (ফারসী শব্দ—hiz)—হিজড়া »।

এই প্রত্যয়, « র »-রূপেও কচিৎ পাওয়া যায় : « কাঠ্‌রা, গাঁঠ্‌রী, টুক্‌ড়া, ছোক্‌রা, চাঙ্গড়া—চাঙ্গারী, পেঁড়া—পেটরা, বাঁশ—বাঁশরী, ভাই—ভায়রা (ভায়রা-ভাই) »।

[২৬] « ড় বা আড় », প্রসারে « ড়া, ড়ী, ড়িয়া চলিত-ভাষায় -ড়ে') » (২) : সম্বন্ধ, ব্যবসায়, শীল বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। « ভাঙ্গড় (='যে ভাঙ্গ খায়'), তুখড় (তীক্ষ্ণ > তিক্‌খ, তীখ, তুখ+ড়), তেন্দড় বা ত্যাঁদড় (দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত), ফাঁসড়িয়া > ফাঁসুড়ে' ('যে ফাঁস দেয়') ; যোগাড় (> যোগ ; বাসাড়ে', যোগাড়ে', হাতুড়ে' (হাতড়িয়া—হাত+ড়- 'যে হাতড়াইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতা-হেতু অনিশ্চিততার মধ্যে চিকিৎসা করে, এমন বৈদ্য'), ধাউড়—ধাউড়ে' ('যে খুব দৌড়ায়'—বুদ্ধি-জীবী অর্থে) ; ঘাসিয়াড়া, ঘেসেড়া ; খেলোয়াড় ; জুয়াড়ী »।

[২৭] « ড়, ড়া, ড়ী »—স্থান-বাচক নামে (৩) : « আখড়া (> অক্ষবাট-), গোয়াড়ী (> গোপবাটিকা), ভাগাড় »।

[২৮] « ত, তী » (১)—ভাবদ্যোতক ক্রিয়া-পদ প্রকাশ করিতে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। « এওৎ—আইহত (অবিধবত্ব); অজিয়ন্তী »।

[২৯] « ত, তা, তী » (২)—পত্র-জাতীয় বস্তু বুঝাইতে ; যথা—« নামতা, রাঙ্গতা, চাকতি, করাত »।

[৩০] « ত, তা, তুতা » (চলিত ভাষায় -তো) : পুত্র-অর্থে—« জেঠাত, জেঠতুতা—জেঠুতা, খুড়ুতা, খুড়তুতা ; মাসুতা, পিসুতা »।

[৩১] « -ন », প্রসারে « নী, নি, অনী, আনী, ইনি, উনি, উন্, ন্ » : স্ত্রী-বাচক প্রত্যয়। « সতিন, সতিনী ; বেহাইন্, বেয়ান, ব্যান্ ; ঠাকুরাণী, ঠাকরুণ, ঠাক্‌রন, ঠান্ ; নাতিনী, নাতিন্ ; মিতিন ; বহিন্, বোন্ ; কামারনী, কুমারনী ; মেথরনী, মেথরানী ; চৌধুরানী ; ডাক্তারনী, মাষ্টারনী ; সেকরানী ; ধোবানী ; চোর—চুরনী ; ডোমনী, ডুমনী, চাড়ালনী ; সোহাগিনী ; ননদিনী, পাগলিনী ; গোয়ালিনী, গয়লানী ; রজকিনী ; বাঘিনী, সিংহিনী, সাপিনী ; বিহঙ্গিনী, চাতকিনী ; প্রেতিনী > পেত্নী ; পণ্ডিতানী ; অনাথিনী, হতভাগিনী ; নাপিতানী > নাপ্তনী » ইত্যাদি।

[৩২] « পনা » : ভাব-বাচক প্রত্যয় : « টাট (ধৃষ্ট)—টাটপনা ; গিন্নীপনা »।

[৩৩] « পানা » : সাদৃশ্যার্থে : « চাঁদপানা, কুলা (কুলো)-পানা, লাল-পানা, লম্বা-পানা »।

[৩৪] « পারা » : সাদৃশ্যার্থে : « চাঁদপারা »।

[৩৫] « ভর, ভরা »—পরিমাণার্থে, বিশেষ পরিমাণের 'এক' মাত্রা অর্থে ; যথা—« তোলা-ভ (='এক তোলা পরিমাণ ওজন যাহার'), দিন-ভর (='একটী পূরা দিন ব্যাপিয়া') রাতভর, সেরভর, ক্রোশভর ; মুঠাভরা, বাটাভরা, গালভরা »।

[৩৬] « মন্ত, মত « : যুক্ত অর্থে : « শ্রীমন্ত, পয়-(=পদ) মন্ত ; লক্ষ্মীমন্ত ; এমন্ত > এমত, জেমন্ত > যেমত, তেমন্ত > তেমত » ।

[৩৭] « রু, উর »—স্বার্থে, সাদৃশ্যে : « গোরু, সাঁজারু, বাছুর (< বাছরু), প্রাদেশিক বাঙ্গালা গাভুর (> গাভরু) » ইত্যাদি ।

[৩৮] « ল »—সম্বন্ধে, স্বার্থে, সাদৃশ্যে, ঈষদর্থে, গুণার্থে। প্রসারে— « লা, লী, আলিয়া (চলিত-ভাষায় -লে') » ; যথা—« আদল ; ছাওয়াল, ছাওয়ালিয়া > ছালিয়া, ছেলে ; দীঘল ; পাকল ; হাঁড়ল ; পাতল, পাতলা ; নহলী ; বিজুলী (বিদ্যুৎ—বিজ্জু), বিজলী ; সখী > সহী—সহীলা, সহেলা, সয়লা ; মাতল ; ধকল ; হাতল ; ফাঁদল ; মাদল ; কাতলা » ।

[৩৯] « স, সা, ছা, চা » ; প্রসারে—« সী, সিয়া (> চলিত-ভাষায় সে', চে') » : সাদৃশ্যার্থে : যথা—« মুখস ; √তাড়া—তাড়স ; রূপসী ; আলিসা > আ'লসে ('ছাতের আলিসা বা আলির মত') ; পানিসা > পা'নসে ; চামসা ; করসা ; ঝাপসা ; আবছা ('আভ বা অভ্র অর্থাৎ মেঘের মত') ; ভাঙ্গচা, ভেংচা ('মুখ-ভঙ্গী করা') ; কোয়াসা (প্রাকৃত কুহা=কোয়াসা) ; ফাকাসিয়া > ফাকাসে', ফাঁকাসে', ফ্যাঁকাসে', ফ্যাকাসে' (হিন্দুস্থানী 'ফক' =বাঙ্গালা 'সাদা হওয়া') ; লালসিয়া > লালচে' ; ঘুমসী, ঘুনসী, ঘুংসী » ।

[৪০] « স, আস, আসিয়া (চলিত-ভাষায় আসে') » : মাস-বাচক : « সাতাসে, আটাসে ; বারাস্তা বা বারমাস্তা » ।

[৪১] « সই »—পর্য্যন্ত অর্থে : « জলসই, বুকসই, দশাসই (= 'পুরা দশ পর্যন্ত, সুপুষ্ট') » ।

[৩.০২৪] সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়

(১) « অ » (১) [ডট্] : « একাদশ, দ্বাদশ, চত্বারিংশ » প্রভৃতি ক্রম-বাচক সংখ্যা-পদে এই প্রত্যয় বিদ্যমান।

(২) « অ » (২) [ষ] : « দ্বিমূর্ধ, ত্রিমূর্ধ (মূর্ধন্ শব্দ) » প্রভৃতি সমাসান্ত পদে।

(৩) « অ » (৩) [অচ্] : অস্ত্যর্থে—« পাপ (পাপী অর্থে), পুণ্য (পুণ্য-যুক্ত অর্থে) »।

(৪) « অ » (৪) [টচ্] : সমাস-যুক্ত পদে—« মহারাজ ('মহারাজা' নহে), প্রিয়সখ ['প্রিয়সখা' নহে) »।

(৫) « অ » (৫) [অণ্] : সমাস-যুক্ত পদে : « বৈমাত্র, সৌভ্রাত্র (মাতৃ—মাতা, ভ্রাতৃ—ভ্রাতা হইতে) »।

(৬) « অ » (৬) [অণ্] : অপত্য, অথবা ভক্ত অর্থে : « গাঙ্গ, রাঘব, মানব, বাসুদেব, শৈব » ইত্যাদি।

(৭) « অ » (৭) [অঞ্] : « পৌত্র, দৌহিত্র »।

(৮) « অক » (১) [বুন্] : « শিক্ষক, ক্রমক, পদক, মীমাংসক »।

(৯) « অক » (২) [বুন্] : « আর্দ্রক, মূলক, বাসুদেবক »।

(১০) « অঠ » [অঠচ্] : « কর্মঠ »।

(১১) « অতম » [ডতমচ্]—পূরণার্থে : « কতম, একতম »।

(১২) « অতর » [ডতরচ্]—তুলনায় : « কতর, একতর »।

(১৩) « অতস্ » [অতসুচ্] : « দক্ষিণতঃ, উত্তরতঃ »।

(১৪) « অন্ » [অনিচ্] : সমাসান্ত পদে—« সমানধর্মন্=সমান-ধর্মা »।

(১৫) « অয় » [অয়চ্] : « দ্বয়, ত্রয় » (সমাসান্ত)।

(১৬) « অস্ » [অসি] : « পুরঃ, অধঃ »।

(১৭) « অস্ » [অসিচ্] : সমাসান্ত পদে—« সুমেধস্=সুমেধাঃ »।

(১৮) « আকিন্ » [আকিনিচ্] : « একাকিন্=একাকী »।

(১৯) « আমিন্ » [আমিনচ্] : « স্বামিন্=স্বামী [স্ব (=ধন) আছে এই অর্থে] »।

(২০) « আয়ন » [ফক্] : « দ্বৈপায়ন, বাদরায়ণ » [রাম+অয়ন (=চরিত্র)=রামায়ণ ; তদ্রূপ কৃষ্ণায়ন]।

(২১) « আল » [আলচ্] : « রসাল, বাচাল »।

(২২) « ই » (১) [ইৎ] : সমাসান্ত—« সুগন্ধি, সুরভিগন্ধি »।

(২৩) « ই » (২) [ইচ্] : সমাসান্ত—« কেশাকেশি »।

(২৪) « ই » (৩) [ইঞ্] : « দাশরথি, সৌমিত্রি »।

(২৫) « ইক » (১) [ষ্ঠন্] : « কুসীদিক »।

(২৬) « ইক » (২) [ঞিঠ] : « কাশিক, বৈদিক »।

(২৭) « ইক » (৩) [ঠঞ্, ঠন্] : « মাসিক, বাৎসরিক, দৈনিক, নাবিক, মাহারাজিক »।

(২৮) « ইন্ -(ঈ) » [ইনি] : « তপস্বী, সাক্ষী, গুণী, ধনী, সুখী, হস্তী, পুষ্করিণী »।

(২৯) « ইম » [ডিমচ্] : « অগ্রিম, পশ্চিম, আদিম »।

(৩০) « ইমন্ (-ইমা) » [ইমনিচ্] : « ভূমা, গরিমা, নীলিমা »।

(৩১) « ইয় » [ঘ] : « ক্ষত্রিয়, রাষ্ট্রিয় »।

(৩২) « ইল » [ইলচ্] : « পিচ্ছিল, ফেনিল, পঙ্কিল »।

(৩৩) « ইষ্ঠ » [ইষ্ঠন্] : « গরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ »।

(৩৪ক) « ঈ » [ঙীন্] : স্ত্রী-প্রত্যয় : জাতিবাচক, « পুত্রী ; শার্ঙ্গরবী, গৌতমী ; নারী (এখানে নর-শব্দের স্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে) »।

(৩৪খ) « ঈ » [২] [ঙীপ্, ঙীষ্] : স্ত্রী-প্রত্যয় : « দেবী, কর্ত্রী, ব্রাহ্মণী, রজকী »।

(৩৫) « ঈন » (১) [খ] : « কুল—কুলীন ; বিশ্বজনীন »।

(৩৬) « ঈন » (২) [খঞ্] : « সার্বজনীন, বৈশ্বজনীন »।

(৩৭) « ঈয় » [ছ] : « পরকীয়, রাজকীয় »।

(৩৮) « ঈয়স্ (ঈয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈয়সী) » [ঈয়সুন্] : « গরীয়ান্, লঘীয়ান্, বলীয়ান্, জ্যায়ান্ »।

(৩৯) « উক » [উকঞ্] : « কার্মুক »।

(৪০) « উর » [উরচ্] : « দন্তুর, মেদুর »।

(৪১) « এয় » (১) [ঢক্] : অপত্যার্থে—« গাঙ্গেয়, বৈনতেয়, কৌন্তেয় »।

(৪২) « এয় » (২) [ঢক্] : « পাথেয়, আগ্নেয়, বৈমাত্রেয়, ভাগিনেয় »।

(৪৩) « ক » [কন্]—স্বার্থে, হ্রস্বার্থে, নিন্দার্থে : « পঞ্চক, শূদ্রক, পুত্রক »।

(৪৪) « কল্প » [কল্পপ্] : ঈষদর্থে : « আচার্য্যকল্প, গুরুকল্প »।

(৪৫) « গ্মিন্ » [গ্মিনি] : « বাগ্মী »।

(৪৬) « চুঞ্চু » [চুঞ্চুপ্] : « বিদ্যাচুঞ্চু, অক্ষরচুঞ্চু »।

(৪৭) « তন » [টু্য, টু্যল্] : « পুরাতন, সনাতন, অধুনাতন, চিরন্তন »।

(৪৮) « তম » (১) [তমট্] : ক্রম-সংখ্যা-প্রকাশার্থে : « বিংশতিতম, পঞ্চাশত্তম, একষষ্টিতম »।

(৪৯) « তম » (২) [তমপ্] : প্রকর্ষার্থে : « গুরুতম, প্রিয়তম, দীর্ঘতম »।

(৫০) « তয় » [তয়প্] : « চতুষ্টয়, দ্বিতয়, ত্রিতয় »।

(৫১) « তর » [ষ্টরচ্] : « অশ্বতর, বৎসতরী (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) »।

(৫২) « তস্ » (১) [তসি] : « সর্বতঃ, উভয়তঃ »।

(৫৩) « তস্ » (২) [তসিল্] : « অতঃ, ইতঃ, ততঃ »।

(৫৪) « তা » [তল্] : ভাবার্থে—« সাধুতা, জনতা (জনসমূহ-অর্থে), বন্ধুতা, গ্রাম্যতা, সহায়তা, চঞ্চলতা, বিলাসিতা, প্রতিযোগিতা »। বাঙ্গালা শব্দ—« সততা »।

(৫৫) « তিক, তিকা » [তিকন্] : « মৃত্তিকা »।

(৫৬) « ত্য » (১) [ত্যপ্] : « তত্রত্য, অত্রত্য »।

(৫৭) « ত্য » (২) [ত্যক্] : « দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য »।

(৫৮) « ত্যক » [ত্যকন্] : « উপত্যকা, অধিত্যকা »।

(৫৯) « ত্র » (১) [ত্রল্] : « যত্র, তত্র, কুত্র, সর্বত্র »।

(৬০) « ত্র » (২) [ত্রন্] : « ছত্র »।

(৬১) « ত্ব », ভাবার্থে : « দ্বিত্ব, কবিত্ব, ণত্ব, ষত্ব, সত্ত্ব, তত্ত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব, নূতনত্ব, প্রাচীনত্ব, মনুষ্যত্ব » ইত্যাদি। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ— « সতীত্ব; আমিত্ব; নোতুনত্ব; হিন্দুত্ব »।

(৬২) « ত্রিম » (কৃৎ-প্রত্যয় ত্রি = [ক্ত্রি] + তদ্ধিত « মপ্ ») : « কৃত্রিম »।

(৬৩) « থ » [থুক্] : « চতুর্থ, ষষ্ঠ »।

(৬৪) « থা » [থাল্] : « যথা, তথা, সর্বথা »।

(৬৫) « দা » : « একদা, সদা »।

(৬৬) « ধা » : « দ্বিধা, ত্রিধা »।

(৬৭) « ন » [নঞ্] : « স্ত্রী > স্ত্রৈণ »।

(৬৮) « ম » [মট্] : « পঞ্চম, সপ্তম, দশম »।

(৬৯) « মৎ (মান্, মতী) » [মতুপ্] : « মধুমান্, মতিমান্, শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্; জ্ঞানবান্, যশস্বান্, লক্ষ্মীবান্ »।

(৭০) « ময় » [ময়ট্] : « বাঙ্ময়, মৃন্ময়, অন্নময়, জলময়, গোময় »।

(৭১) « য » (১) [ণ্য] : « সাম্রাজ্য, পাণ্ড্য, কৌরব্য »।

(৭২) « য » (২) [ষ্যঞ্] : « চাতুর্বর্ণ্য, সৈন্য »।

(৭৩) « য » (৩) [যক্] : « প্রাজাপত্য, পৌরোহিত্য »।

(৭৪) « য » (৪) [যৎ] : « ব্রাহ্মণ্য, মনুষ্য, গ্রাম্য, দিব্য, ন্যায্য »।

(৭৫) « র » : 'আছে', এই অর্থে—« শ্রীর, শিখর (শেখর), মধুর, ধূম্র »।

(৭৬) « ল » : অস্ত্যর্থে—« বৎসল, মাংসল »।

(৭৭) « বৎ » [বতি] : তুল্যার্থে—« লোকবৎ, তদ্বৎ, দেববৎ, মনুষ্যবৎ »।

(৭৮) « বৎ » [বতুপ্] : « যাবৎ, তাবৎ, এতাবৎ, কিয়ৎ, ঈষৎ »।

(৭৯) « বল » [বলচ্] : « শাদ্বল, কৃষীবল (=কৃষক) »।

(৮০) « বিধ » [বিধল্] : « নানাবিধ, বহুবিধ »।

(৮১) « বিন্ », অস্ত্যর্থে : « মেধাবী, মনস্বী, মায়াবী »।

(৮২) « ব্য » (১) [ব্যৎ] : « পিতৃব্য »।

(৮৩) « ব্য » (২) [ব্যন্] : « ভ্রাতৃব্য »।

(৮৪) « শ » : « রোমশ, লোমশ, কর্কশ »।

(৮৫) « শঃ » : « বহুশঃ, প্রায়শঃ, ক্রমশঃ »।

(৮৬) « সাৎ » [=সাতি] : « পাত্রসাৎ, অগ্নিসাৎ, আত্মসাৎ »।

[৩.০২৫] তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় তদ্ধিতের মত ব্যবহৃত হয় ; যথা—

(১) « জাত »—« গৃহ-জাত »—গৃহে উৎপন্ন ; « পকেট-জাত, অভিধান-জাত »—'রক্ষিত' অর্থে। (« দ্রব্য-জাত »—এখানে « জাত » শব্দ সমূহ-অর্থে প্রযুক্ত ; ফারসী « -জাৎ » -প্রত্যয় ; যথা—« মেওয়াজাৎ »='ফলসমূহ, বিভিন্ন প্রকারের ফল',—ইহার সহিত সম্পৃক্ত নহে।)

(২) « শুদ্ধ »—« আমি-শুদ্ধ, সাজ-শুদ্ধ, ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জন »।

(৩) « সহ »—« কাপড়-সহ »।

(৪) « স্থ »—« লেন-স্থ, বহুবাজার-স্থ »।

[৩.০২৬] বিদেশী তদ্ধিত

বাঙ্গালায় আগত বিদেশী শব্দে (যথা, ফারসী শব্দে) সেই ভাষার তদ্ধিত পাওয়া যায়। অনেকগুলি বিদেশী শব্দে একই তদ্ধিত পাওয়া গেলে, সেই তদ্ধিতের অর্থটা সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে, সাধারণ অশিক্ষিত জনও সেই তদ্ধিতের বিশেষ অর্থ অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হয়।

পরে সেই তদ্ধিত, ভাষার নিজস্ব শব্দেও যুক্ত হয়, এবং ইহা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। কতকগুলি ফারসী তদ্ধিত-প্রত্যয় এইরূপে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। সমাসাগত কতকগুলি শব্দও এইরূপে তদ্ধিতের আকারে বাঙ্গালা ভাষায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

কোনও ভাষার নিজস্ব শব্দের সহিত বিদেশী ভাষা হইতে প্রাপ্ত তদ্ধিত-প্রত্যয় বা অন্য শব্দ যুক্ত হইলে, তদ্রূপ মিশ্র শব্দকে **সঙ্কর-শব্দ (Hybrid Word বা Hybrid)** বলে।

(১) « আন্, ওয়ান্ »—'তাহার আছে' এই অর্থে; যথা—« গাড়ী—গাড়োয়ান্; দরওয়ান্; কোচওয়ান্ (ইংরেজী coachman-এর সঙ্গে অনেকে এই শব্দকে সংযুক্ত করেন) »; স্বার্থে—এই অর্থে: « বাগওয়ান—বাগ বা উদ্যানের কর্মী » হইতে « বাগান » শব্দ।

(২) « আনা (য়ানা) »—'অভ্যাস বা শীল' অর্থে; প্রসারে « আনী »: « সাহেবীআনা; বাবুয়ানা, বাবুয়ানী; বিবিয়ানা, বিবিয়ানী; হিন্দুয়ানা, হিন্দুয়ানী, হিঁদুয়ানী; ঘরানা, বড়-ঘরানা » ইত্যাদি।

(৩) « খানা »—'স্থান', 'দোকান' অর্থে: « কেতাবখানা, পিলখানা (=হাতীশাল), কবুতরখানা; শুঁড়ীখানা, মুদীখানা, ডাক্তারখানা, ছাপাখানা; বৈঠকখানা »।

(৪) « খোর »—'যে সেবন করে' এই অর্থে: « গুলিখোর, গাঁজা-খোর, ঘুষখোর, আফিমখোর, চণ্ডুখোর, চশমখোর »।

(৫) « গর »—'যে করে, অথবা গড়ে' এই অর্থে: « কারিগর, বাজিগর »।

(৬) « গিরি (গীরী) »—ব্যবসায় বা শীল অর্থে: « মুটিয়াগিরি, কেরানীগিরি, বাবুগিরি, মুচিগিরি, পাণ্ডাগিরি, পণ্ডিতগিরি, রাজাগিরি »।

(৭) « চা, চি, চী »—আধার অর্থে; অথবা, ক্ষুদ্র অর্থে: « বাগিচা,

নলিচা, নইচা, ধূনাচী, পাতমৃচি বা পাতঞ্চি »। ব্যবসায়ী বা কর্মী অর্থে « চী »—« বাবুর্চী, মশালচী, খাজাঞ্চী, কলমচী (ব্যঙ্গার্থে) »।

(৮) « তর, তরো »—প্রকার অর্থে: « এমনতর, কেমনতর, যেমন-তর, গুরুতর, বহুতর » (দ্রষ্টব্য—« তর-বেতর »)।

(৯) « দান, দানী »—আধার অর্থে: « কলমদান, পিকদানী, নস্যদান, আতরদান, শামাদান »।

(১০) « দার »—ধারক বা কর্তা অর্থে: « বাজনদার (প্রসারে বাজনদারিয়া > চলিত-ভাষায় বাজনদেরে, বাজুনদুরে'), চৌকীদার, চড়নদার, ফাঁড়ীদার, ছড়িদার, সমঝদার, অংশীদার, ভাগীদার, মজাদার, মজুমদার, জোয়ার্দার, শুমারদার বা সমাদ্দার, জমীদার, চাকলাদার, জমাদার, হাবিলদার, ওহদেদার, হুদ্দাদার »।

(১১) « নবিশ »—অর্থ, 'লেখক': « নকল-নবিশ »। (ইংরেজী novice শব্দের প্রভাবে—« শিক্ষানবিশ »)। লেখা, পেশা বা ব্যবসায় অর্থে—« নবিশি » শব্দ প্রচলিত।

(১২) « বন্দ », প্রসারে « বন্দী »: 'বদ্ধ বা গৃহীত' অর্থে: « ইজারা-বন্দ, পেঁটরাবন্দী, বাক্সবন্দী, চিঠাবন্দী, নজরবন্দী; বাঘবন্দী খেলা »। কখনও কখনও এই ফারসী-প্রত্যয় সংস্কৃত « বন্ধ » শব্দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া 'বন্ধ' রূপে মিলে: « গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ »।

(১৩) « বাজ »—'অভ্যস্ত' এই অর্থে; প্রসারে শীল-অর্থে « বাজী »: « ধড়ীবাজ, ধোঁখাবাজ, চালবাজ; গলাবাজী, ফেরেববাজী »।

(১৪) « সহি, সই »—'যোগ্য বা উপযুক্ত' অর্থে: « মানানসহি, প্রমাণসহি, মাপসই, দশাসই, টেঁকসই, চলনসই, লাগসই »।

দেশ অর্থে, ফারসী « অস্তান, স্তান » শব্দ—বাঙ্গালায় ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ « স্থান »-এ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে: « হিন্দোস্তান বা হিন্দুস্তান = হিন্দুস্থান; তদ্রূপ—আফগানিস্থান, তুর্কীস্থান, বেলুচীস্থান,

সীস্থান, বালূচীস্থান ; রাজস্থান »। ফারসী « মন্দ » বাঙ্গালায় « মন্ত »-প্রত্যয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে : « দৌলতমন্ত, আক্কেলমন্ত » (তুলনীয়, শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ « শ্রীমন্ত, পয়মন্ত »)।

[৩.০৩] উপসর্গ

সংস্কৃতে কতকগুলি অব্যয়-শব্দ আছে, এগুলি ধাতুর পূর্বে বসে এবং ধাতুর মূল ক্রিয়ার গতি নির্দেশ করিয়া, উহার অর্থের প্রসার, সংকোচ বা অন্য পরিবর্তন আনয়ন করিয়া দেয়। এই অব্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলি আবার নাম-শব্দের সহিত কারকের সম্বন্ধকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অব্যয়-শব্দকে উপসর্গ (Prefixes) বলে। ধাতু-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দে এই সকল সংস্কৃত উপসর্গ আইসে। সংস্কৃত উপসর্গের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল।

খাঁটী বাঙ্গালার স্বকীয় (অর্থাৎ প্রাকৃতজ) উপসর্গ অতি অল্প। এই উপসর্গগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার « শব্দের আদিতে অবস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয় » বলা চলে।

[১] বাঙ্গালা উপসর্গ—

(১) « আ-, অনা-, অ- »—'না' অর্থে, অথবা মন্দ অর্থে : « আলুনি, আধোয়া, আকাঁড়া, আবুদ্ধিয়া ; আবেলা, অবেলা ; অজানা, আজান ('আজান গাছ' = অজ্ঞাত বিদেশী বৃক্ষ) ; অনামা, অবনৃতি, অবনিবনা ; অশুধ (= অশুদ্ধ) ; অবিয়ত (= অবিবাহিত) ; আঘাট ; অহিন্দু, অমুসলমান ; অহিসাবী, অখুশী ; অনামুখ ; অনাসৃষ্টি বা অনাছিষ্টি »।

(২) « আ-, অ- »—প্রকৃষ্ট অর্থে, স্বার্থে, সাদৃশ্যার্থে : « অঘোর (= ঘোর) নিদ্রা, আকাঠ (= কাঠের মত), আভাজা ; প্রাচীন-বাঙ্গালা আকুমারী বা অকুমারী (= কুমারী), আরজা বা অরজা (= রজীন) »।

(৩) « কু- »—নিন্দনীয় অর্থে : « কুকাজ, কুনজর, কুদিন, কুচাল, কুকেচ্ছা » ।

(৪) « দর- »—অল্প বা ঈষৎ অর্থে : « দর-কাঁচা, দর-পাকা, দর-পোক্ত (= অর্ধ-পক্ব) » ।

(৫) « নি-, নির্-, নিশ্- »—'না' অর্থে : « নিখুঁত, নিথাক্তি (= যে স্ত্রীলোক থায় না), নিনাই বা নিনায় (যাহার না বা নৌকা নাই), নির্খোজ, নিদয়, নির্ভরসা, নিলাজ, নিরাম, নিবারণ, নিকরুণ, নির্জোশ (= খাঁটী, জোশ- বা ঔজ্জ্বল্য-বিহীন; "নিয্যস" রূপে বহুশঃ বানান করা হয়); 'নিশ্ছিপি বোতল' » ।

(৬) « পাতি- »—ক্ষুদ্র অর্থে : « পাতি-কুয়া বা পাত্‌কো, পাতি-ভাঁড়, পাতি-হাঁস, পাতি-কাক, পাতি-মোড় (বা পাত-মোড়) » ইত্যাদি ।

(৭) « বি-, বে- »—'না' অর্থে, নিন্দার্থে : « বিযোড়, বিভুঁই, বিকাল, বে-টাইম, বে-হেড » ।

(৮) « ভর-, ভরা- »—পূর্ণ অর্থে : « ভর-সাঁঝ, ভর-দিন, ভর-পেট, ভর- বা ভরা-যৌবন » ।

(৯) « স- »—সহিত অর্থে : « সকাল, সজোরে, স-বুট, সতৃষ্ণ » ; স্বার্থে : « সক্ষম, সঠিক » ।

(১০) « সু- »—প্রশস্ত অর্থে : « সুজন, সুছাঁদ, সুমন, সুডোল, সুদিন, সুনাম, সুখবর, সুনজর » ।

(১১) « হা- »—হতার্থে বা বিগতার্থে : « হাপুত ; হাঘরিয়া, হাঘ'রে ; হাভাতিয়া, হাভাতে' » ।

[২] সংস্কৃত উপসর্গ—

(১) « অতি- »—অতিক্রমণ, অতিরিক্ত, অতিক্রান্ত ইত্যাদি অর্থে : « অতিশয়, অতীত, অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, অতিভক্তি » । (এই উপসর্গটী

বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপেও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় ; যথা—« কোনও কিছুর অতি ভাল নহে ; তাহার অতি বাড় বাড়িয়াছে »।)

(২) « অধি »—উপরে, অথবা মধ্যে অর্থে : « অধিকার, অধিগত, অধিপতি, অধীশ্বর, অধিবাসী »।

(৩) « অনু »—পরে, বা কোনও কিছুর দিকে, এই অর্থে : « অনুগত, অনুলিখন (= নকল), অনুবাদ, অনুনয়, অনুরোধ, অনুজ »।

(৪) « অন্তর্, অন্তঃ »—মধ্যে বা ভিতরে অর্থে : « অন্তর্গত, অন্তর্ধান, অন্তর্জলী, অন্তঃপুর, অন্তঃসলিলা »। (« অন্তর্ » শব্দ « অন্তর » রূপে বিশেষ্যবৎ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।)

(৫) « অপ »—দূরে, মধ্য হইতে অর্থে : « অপক্রান্ত, অপগত, অপমান, অপভ্রষ্ট, অপশ্রুতি »।

(৬) « অপি »—ভিতরে, উপরে, সন্নিকটে অর্থে ; « অপি » সংক্ষেপে « পি » রূপে সংস্কৃতে মিলে : « পিনদ্ধ, অপিনিধান, অপিনিহিতি »।

(৭) « অভি »—প্রতি, উপরে, দিকে, চতুর্দিকে অর্থে : « অভিভাষণ, অভিসন্ধি, অভিভূত, অভিমান, অভিশ্রুতি, অভিনিবেশ, অভিব্যক্তি »।

(৮) « অব »—নিম্নে বা নিম্নদিকে, এই অর্থে : « অবগাহন, অবমান, অবরোধ, অবনমন, অবনয়ন »।

(৯) « আ »—প্রতি, উপরে, ঈষৎ অথবা সম্যক্ অর্থে : « আগমন, আয়াস, আক্রমণ, আস্থা, আভাস, আহ্লাদ »।

(১০) « উদ্ »—উপরে, উপরের দিকে, বাহিরে : « উদ্গ্রীব, উদ্বোধন, উদ্দাম, উদ্দেশ, উদ্ধার, উদয় »।

(১১) « উপ »—দিকে, প্রতি, সন্নিকটে : « উপবেশন, উপস্থিত, উপকার, উপহার, উপনিবেশ »।

(১২) « দুঃ, দুর্, দুষ্ »—মন্দ বা কু অর্থে : « দুঃশীল, দুঃস্থ বা দুস্থ, দুরদৃষ্ট, দুর্গত, দুর্নাম, দুষ্প্রাপ্য, দুর্মনাঃ »।

(১৩) « নি »—নিম্নে, ভিতরে, মধ্যে, পূর্ণরূপে : « নিপাত, নিকৃষ্ট, নিবাস, নিপাদ, নিস্বন »।

(১৪) « নিঃ (নির্, নিষ্) »—বহির্গত, বা 'নাই' অর্থে : « নির্ধন, নিষ্করুণ, নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্মথিত, নির্বিকল্প, নিরপরাধ, নিরাবরণ, নিরাভরণ »।

(১৫) « পরা »—দূরে, বাহিরে, অর্থে : « পরাজিত, পরাভব, পরাবর্তিত »। (« পরাকাষ্ঠা » শব্দ কিন্তু বস্তুতঃ « পরা কাষ্ঠা, সমাসে পরকাষ্ঠা », অর্থাৎ 'চরম সীমা' ; কিন্তু বাঙ্গালায় এই দুইটী পদ মিলিত হইয়া একপদ-রূপে প্রযুক্ত হয়।)

(১৬) « পরি »—চতুর্দিকে, অথবা ব্যাপক-ভাবে অর্থে : « পরিক্রমা, পরিচালনা, পরিভ্রমণ, পরিবেষ্টন, পরিপ্রশ্ন, পরিবেষণ »।

(১৭) « প্র »—সম্মুখে, পুরতঃ, শ্রেষ্ঠ : « প্রগতি, প্রণাম, প্রকৃষ্ট, প্রয়োগ, প্রভাব, প্রতাপ »।

(১৮) « প্রতি »—বিপরীত ভাবে, বিরুদ্ধে, প্রত্যুত্তরে : « প্রতিদান ; প্রতিষেধক ; প্রতিরোধ ; প্রতিশব্দ (=synonym), প্রত্যক্ষর, প্রতিবর্ণ (=transliteration) ; প্রতিরূপ (=equivalent cognate form) ; প্রতিবাদ, প্রতিনমস্কার, প্রতিনৈতিক »।

(১৯) « বি »—বিদূরে, বিশ্লিষ্ট, বাহিরে : « বিগত, বিনয়, বিহিত, বিধান, বিবরণ, বিচার, বিহার »।

(২০) « সম্, সং »—সহিত বা একত্র অর্থে : « সংলাপ, সংবাদ, সঙ্গতি, সংহতি, সন্ধান, সম্মোহন »।

(২১) « সু »—মঙ্গল, ভদ্র, উৎকৃষ্ট বা উৎকর্ষ অর্থে : « সুবিচার, সুচিন্তিত, সুদৃঢ় » ইত্যাদি।

পর-পর একাধিক উপসর্গ একই শব্দে বসিতে পারে ; যথা—« অভ্যুদয়, দুঃসংবাদ, দুরপনেয়, প্রত্যুপকার, অত্যাচার, অধ্যবসায়, প্রত্যুত্তর,

প্রণিপাত, অভিনিবেশ, নিঃসঙ্কোচ, সম্প্রদান, সুসংস্কৃত, পরিব্যাপ্তি, অত্যুৎকৃষ্ট » ইত্যাদি। খাঁটি বাঙ্গালা ও বিদেশী উপসর্গ কিন্তু একই শব্দে একটার বেশী ব্যবহৃত হয় না।

উপসর্গের মত আরও কতকগুলি অব্যয় আছে, এগুলিও ধাতুর সহিত যথেষ্ট-রূপে ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে **গতি** বলে ; যথা—

(১) « আবিঃ »—দৃষ্টিগোচরে, বাহিরে : « আবির্ভাব, আবিষ্কার »।

(২) « তিরঃ »—বাঁকা, আড়াআড়ি ভাবে ; অদৃশ্য হওন : « তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান »।

(৩) « পুরঃ »—সমক্ষে, সামনে : « পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোধাঃ »।

(৪) « প্রাদুঃ »—দৃষ্টিগোচরে : « প্রাদুর্ভাব »।

(৫) « বহিঃ »—বাহিরে : « বহিষ্কার, বহির্ভারত, বহির্জগৎ, বহিরঙ্গ »।

(৬) « অলম্ »—সম্যক্-রূপে : « অলঙ্কার »।

(৭) « সাক্ষাৎ »—« সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শন »।

[৩] বিদেশী উপসর্গ—

কতকগুলি ফারসী শব্দ ও অব্যয় বাঙ্গালা শব্দে উপসর্গ বা আশ্রবস্থিত তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—

(১) « গর »—'না' অর্থে : « গর-মিল, গর-হাজির »।

(২) « দর »—নিম্ন অর্থে : « দর-পত্তনী »।

(৩) « না »—নঞর্থে : « না-হক, না-পার্যামানে, না-টক, না-মিষ্টি »।

(৪) « ফি (ফী) »—'প্রত্যেক' অর্থে : « ফি-লোক, ফি-জন, ফি-হাত, ফি-দিন »।

(৫) « বদ্ »—নিন্দায় : « বদ্‌লোক, বদ্‌রাগী, বদ্‌মেজাজী, বদ্-রীত, বদ্-গন্ধ »।

(৬) « বে- »—'না' অর্থে, নিন্দনীয় অর্থে : (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত « বি- » দ্রষ্টব্য) :

« বেচাল, বে-রসিক, বে-হাত, বেনামী, বে-হেড, বে-টাইম, বেঘোরে, বে-মকা (< বে-মৌকা), বে-বন্দোবস্ত, বে+বাক (< বে+বাকী = 'সমগ্র') »।

(৭) « হর »—'প্রত্যেক' বা 'সর্ব' অর্থে: « হর-বোলা, হর-দিন, হর-রোজ, হর-ঘড়ী »।

এতদ্ব্যতিরিক্ত দুই একটী ইংরেজী শব্দও উপসর্গবৎ ব্যবহৃত হয়; যথা—

(ক) « সব, সব্- (= sub-) »—অধীন অর্থে: « সব্-ডেপুটী, সব্-রেজিষ্ট্রার, সব্-জজ্, সব্-আফিস »। কেবল ইংরেজী শব্দেই ব্যবহৃত হয়।

খ) « হেড, হেড্ (= head) »—ঊর্ধ্বতন অর্থে: « হেড-মাষ্টার, হেড-ম্যান, হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলবী, হেড-আফিস, হেড-মুহুরী, হেড-চাপরাশী, হেড-জমাদার »।

[৩.০৪] সমাস

ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে শব্দ হয়। একাধিক শব্দ একত্র জুড়িয়া একটি বৃহৎ শব্দ-সৃষ্টি করাকে **সমাস** বলে। এই প্রকারের সমাস হইতে জাত শব্দ বা পদকে **সমস্ত-পদ** বলে। সমস্ত পদের অংশীভূত পদগুলিকে **সমস্যমান পদ** বলে, এবং সমস্ত-পদকে ভাঙিয়া, উহার মধ্যস্থ সমস্যমান পদগুলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে বাক্যের সাহায্যে বিশ্লেষ করিয়া দেখানো হয়, সেই বাক্যকে **ব্যাস-বাক্য** বা **বিগ্রহ-বাক্য** অথবা **সমাস-বাক্য** বলে; যেমন—« চাঁদ » ও « মুখ » এই দুই সমস্যমান পদ একত্র করিয়া সমস্ত-পদ « চাঁদ-মুখ » গঠিত হইল,—এই « চাঁদ-মুখ » পদের ব্যাস-বাক্য হইতেছে « চাঁদের মত মুখ », অথবা « চাঁদের মত মুখ যাহার »। সমাস-বদ্ধ হইলেও, যেখানে অন্বয়-জ্ঞাপক বিভক্তির লোপ হয় না, সেই সমাসকে **অলুক্-সমাস** বলে; যথা—« ঘোড়ার-গাড়ী, মামার-বাড়ী, মুখে-মধু, তাদের-বড়া »; এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সমস্ত-পদ না বলিলেও চলে, যদিও শব্দ দুইটী মিলিত-পদের ভাব প্রকাশ করে।

বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকারের শব্দের পরস্পরের সহিত সংযোগ-দ্বারা সমস্ত-পদের সৃষ্টি হইতে পারে—কি প্রাকৃত-জ, কি দেশী, কি তৎসম, কি অর্ধ-তৎসম, কি বিদেশী। অনেকে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর শব্দের মিশ্রণ পছন্দ করেন না, এবং স্থলে-স্থলে

বিভিন্ন শ্রেণীর পদের মধ্যে সমাস শ্রুতিকটু হয় বটে ; এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পদের সমাসকে ব্যঙ্গ করিয়া « মড়া-দাহ, শব-পোড়া » সমাস বা ভাষা বলা হয়। বাঙ্গালা সমাসের দৃষ্টান্ত : « হাত-পা, ঠাকুর-বাড়ী » (প্রাকৃতজ+প্রাকৃতজ) ; « দো-ঠেঙা » (প্রাকৃতজ+দেশী), « গোড়-মুড় » (দেশী+প্রাকৃতজ) ; « ঢেঁকী-ছাটা » (দেশী+দেশী) ; « চাঁদ-মুখ » (প্রাকৃতজ+সংস্কৃত বা তৎসম), « শ্বশুর-বাড়ী » (তৎসম+প্রাকৃতজ) ; « রাজ্যচ্যুত » (তৎসম+তৎসম) ; « গিন্নী-মা » (অর্ধ-তৎসম+প্রাকৃতজ), « গুরু-মশাই » (তৎসম +অর্ধতৎসম) ; « হাট-বাজার, বড়-লাট » (প্রাকৃতজ+বিদেশী) ; « হেড-পণ্ডিত » (বিদেশী+তৎসম) ; « খাঁ-সাহেব, হেড-মাষ্টার » (বিদেশী+বিদেশী—ফারসী অথবা ইংরেজী, এক ভাষার), « লাট-বাহাদুর » (বিদেশী+বিদেশী—বিভিন্ন ভাষার—ইংরেজী+ফারসী)।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ দুইটীর বেশী শব্দ জুড়িয়া সমাস করা হয় না। আবার কতকগুলি সমাসের উত্তর বাঙ্গালায় একটী বিশেষণ-বাচক প্রত্যয় আইসে (যথা—« ঈ, ইয়া »)। বহু সংস্কৃত সমস্ত-পদ বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া গিয়াছে,—এই সকল সংস্কৃত সমাসের সাধন সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারেই হইয়াছে। সংস্কৃতের অতি প্রাচীন অবস্থা বৈদিক ভাষাতে, বাঙ্গালারই মতন দুইটীর বেশী পদকে জুড়িয়া সমাস-গঠন করিবার রীতি ছিল না, কিন্তু সাধারণ সংস্কৃতে দুইয়ের অধিক পদ-যোগে সমাস প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। এইরূপ বহুপদময় সমাস বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ সাধু-ভাষায়, সংস্কৃত হইতে বহুল পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে, এবং বহুশঃ নূতন সমাস সৃষ্টও হইতেছে ; যথা—« বাত্যাহতকদলীপত্র ; অসমাপিকা-ক্রিয়া-প্রকরণ ; বঙ্গভাষা-প্রবেশিকা ; গলিত-নখ-দন্ত ; নিখিল-ভারত-রাজনৈতিক-মহাসম্মেলন ; সকলনীতিশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ ; সেন-কুল-কমলভাস্কর ; শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী ; ভুবনমনোমোহিনী ; নির্নিমেষনয়নে ; জনগণমন-অধিনায়ক ; অতীতগৌরব-বাহিনী ; অভ্রভেদিচূড়াবলম্বী » ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণকারগণ সংস্কৃতে সমাস-বিধি অতি সুন্দর-ভাবে বিশ্লেষ করিয়া, সংস্কৃত সমাসের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত শ্রেণী, এমন কি বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্কৃত নাম পর্যন্ত, ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃতে শ্রেণী-বিভাগ ও সমাসের সংস্কৃত নাম বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হয়।

সমাস মোটামুটী তিনটী প্রধান বিভাগে পড়ে—

[১] **সংযোগ-মূলক বা দ্বন্দ্ব-সমাস** (Copulative বা Collective Compounds) : এই প্রকার সমাসে সমস্যমান পদসমূহ-দ্বারা দুই বা তদধিক পদার্থের (বস্তুর বা ভাবের) সংযোগ বা সম্মিলন প্রকাশিত হয়। মিলিত পদগুলির মধ্যে কেহ কাহারও অধীন থাকে না।

[ক] দ্বন্দ্ব-সমাস।

[খ] বাঙ্গালার বিশিষ্ট দ্বন্দ্বস্থানীয় সমাস।

[২] **ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস** (Determinative Compounds) : এই প্রকারের সমাসে, প্রথম শব্দটী দ্বিতীয় শব্দটীকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, কিংবা উহার বিশেষণ-রূপে বসে—তাহাকে যেন আশ্রয় করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যান-মূলক সমাস এই কয় প্রকারের—

[ক] **তৎপুরুষ** (Determinatives with one element governing another)—উপপদ, অলুক্-তৎপুরুষ, নঞ্-তৎপুরুষ, প্রাদিসমাস, নিত্য-সমাস, অব্যয়ীভাব, সুপ্‌সুপা।

[খ] **কর্ম্মধারয়** (Appositional Determinatives)—রূপক, উপমিত, উপমান, মধ্যপদলোপী।

[গ] **দ্বিগু** (Numeral Determinatives)।

[৩] **বর্ণনা-মূলক সমাস** (Possessive, Relative বা Descriptive অথবা Secondary Descriptive Compounds) : এইরূপ সমাসে, সমস্যমান পদগুলি মিলিয়া যে অর্থ প্রকাশ করে, উহার দ্বারা অপর কোনও পদার্থের বর্ণনা হয়। এইরূপ

সমস্ত-পদ মূলতঃ বিশেষণ পর্যায়ের ; এবং ব্যাখ্যান-মূলক সমস্ত বিশেষ্য-পদকে বিশেষণ করিলে, এই বর্ণনামূলক বিভাগের মধ্যে ফেলা যায়।

বর্ণনা-মূলক সমাস বহুব্রীহি নামে অভিহিত হয়। বহুব্রীহি চার প্রকারের ; যথা—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যতিহার বহুব্রীহি (Reciprocal) এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

[৩.০৪১] **সংযোগ-মূলক সমাস** (**Copulative বা Collective Compounds**) :

[ক] **দ্বন্দ্ব-সমাস**—

« দ্বন্দ্ব » শব্দের অর্থ 'জোড়া'। দ্বন্দ্ব-সমাসে সমস্যমান পদগুলির প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে, কেহ কাহারও দ্বারা সঙ্কুচিত হয় না। « ও, এবং, আর, তথা » প্রভৃতি সংযোগার্থক অব্যয়ের সাহায্যে, দ্বন্দ্বসমাসের ব্যাস করিতে হয়। এই সমাসে যে পদটী বানানে বা উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত ছোট, সাধারণতঃ সেটী প্রথমে বসে ; কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয়ও দেখা যায়—যে পদটীর অর্থ অপেক্ষাকৃত গৌরব বোধক বলিয়া বিবেচিত হয়, সে পদটী অন্যটীর অপেক্ষা দীর্ঘ হইলেও প্রথমে বসিতে পারে।

দ্বন্দ্ব-সমাসের দৃষ্টান্ত—

« মা ও বাপ = মা-বাপ ; বাপ ও মা = বাপ-মা ; মা-মেয়ে ; মা-বোন্ ; ভাই-বোন্ ; ছেলে-মেয়ে ; ঝী (= কন্যা) ও জামাই = ঝী-জামাই ; শ্বশুর-জামাই ; শাশুড়ী-বউ ; বৌ-ঝী ; বৌ-বেটা, বেটা-বৌ ; হাত-পা ; হাত-মুখ ; দাল-ভাত ; দুধ-ভাত ; পথ-ঘাট ; কানা-খোঁড়া ; গাড়ী-ঘোড়া ; গাড়ী-পাল্‌কী ; মিঠা-কড়া ; কেনা-বেচা ; দেন-দেন ; রাত-দিন, দিন-রাত ; সকাল-সাঁঝ, সাঁঝ-সকাল ; ইট-কাঠ ; হাঁড়ী-কুঁড়ী (হাঁড়ী ও কুণ্ডী—'বড় পাত্র') ; লেপ-কাঁথা ; কাপড়-চোপড় (= বস্ত্র ও পেটিকা—চোপড় = 'বড় চুপড়ী বা পেটারী') ; মশা-মাছি ; মুড়ি-মুড়কি ; সন্দেশ-রসগোল্লা ; দুধ-দই ; দই-ক্ষীর ; হাঁচি-টিক্‌টিকি ; আজ-কাল ; রুই-কাতলা ; কই-মাগুর ; গোরু-বাছুর ; গাই-বলদ ;

ছাগল-ভেড়া ; দশ-বিশ ; ভাল মন্দ ; আসা-যাওয়া ; আনা-গোনা (=আগমন-গমন) ; সাত-পাঁচ ; হয়-নয় »।

« দেব-দ্বিজ ; গুরু-পুরোহিত বা গুরু-পুরুত ; পিতা-মাতা, মাতা-পিতা ; স্বামি-স্ত্রী ; দাস-দাসী ; দিবা-রাত্রি ; দিবা-নিশি, অহর্নিশি ; রাজা-প্রজা ; দোল-দুর্গোৎসব ; লাভালাভ ; দীন-দুঃখী ; সদসৎ (সৎ-অসৎ) ; শত্রু-মিত্র ; গণ্যমান্য ; ইতর-ভদ্র, ভদ্রেতর ; বাহ্যাভ্যন্তর ; ইষ্ট কুটুম্ব ; আত্মীয়-বন্ধু ; পাত্র-মিত্র ; চন্দ্র-সূর্য »।

« রাজা-উজীর ; লাভ-লোকসান ; হাট-বাজার ; হাট-হদ্দ (হদ্দ=সীমা) ; ঝী-চাকর ; বামুন-চাকর ; চুন-সুরকী ; কম-বেশী ; বাক্স-পেঁটরা ; কোচমান-সহিস ; উকীল-ব্যারিষ্টার ; উকীল-মোক্তার ; থানা-পুলিস ; রেল-স্টীমার (রেল-ইষ্টিমার) ; জজ-ম্যাজিস্ট্রেট (জজ-ম্যাজিষ্টর) ; ডাক্তার-বৈদ্য ; পীর-পয়গম্বর ; আইন-কানুন ; কেতাব-পত্র ; বাদশা-বেগম ; লোক-লস্কর ; পাইক-পেয়াদা ; সেপাই-সান্ত্রী ; রোজা-নমাজ ; খুন-খারাপী » ইত্যাদি।

সংস্কৃতের কতকগুলি বিশিষ্ট দ্বন্দ্ব-সমাসময় পদ—

সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত কতকগুলি দ্বন্দ্ব-সমাস-নিষ্পন্ন পদে, সংস্কৃত-ব্যাকরণানুযায়ী সন্ধি প্রভৃতির নিয়ম-অনুসারে একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

১। ঋ-কারান্ত শব্দ। সমান-গোত্রীয় হইলে, কিংবা « পুত্র » শব্দ পরে থাকিলে, ঋ-কারান্ত শব্দ যদি পূর্বে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে « ঋ » স্থানে « আ » হয় ; অন্যথা « ঋ »-ই থাকে ; যথা—« মাতা (মাতৃ-শব্দ) ও পিতা (পিতৃ-শব্দ) =মাতা-পিতা (সমান-গোত্রীয়) ; মাতা ও পুত্র=মাতা-পুত্র ; তদ্রূপ পিতা-পুত্র ; দাতা ও ভোক্তা=দাতৃ-ভোক্তা ; জামাতা এবং পুত্র=জামাতৃ-পুত্র (কিন্তু জামাতার পুত্র অর্থে জামাতাপুত্র) ; মাতার পিতা=মাতৃ-পিতা »। « পিতৃমাতৃহীন »—এই শব্দ বাঙ্গালায় 'যাহার পিতা ও মাতা নাই' এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; সংস্কৃত মতে এই অর্থ অশুদ্ধ— « পিতৃমাতৃহীন » শব্দের সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সম্মত অর্থ, 'যাহার পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী বা ঠাকুর-মা নাই' ; 'মা ও বাপ যাহার নাই'—এই অর্থে শুদ্ধ সমাস, সংস্কৃত মতে, « মাতাপিতৃহীন »।

২। « জায়া ও পতি »—এই অর্থে দ্বি-বচনান্ত « জায়াপতী » শব্দ স্বাভাবিক, কিন্তু « দম্পতী ও জম্পতী » শব্দদ্বয়, স্বামী ও স্ত্রী অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় ; এবং বাঙ্গালায়

« দম্পতী » শব্দ « দম্পতি » রূপেও লিখিত হয়। « দ্যৌঃ (স্বর্গ) ও পৃথিবী = দ্যাবা-পৃথিবী ; কুশ ও লব = কুশীলব ; অহঃ + রাত্রি = অহোরাত্র »।

দুইয়ের অধিক পদের মিলনে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সমাস বাঙ্গালায় কিছু-কিছু পাওয়া যায় ; যথা—« হাতী-ঘোড়া-গাড়ী-পাল্‌কী ; পাইক-পেয়াদা-সিপাহী-সান্ত্রী ; দুধ-দই-ক্ষীর-সর ; ইট-কাঠ-চুন-সুরখী ; হাত-পা-নাক-কান ; বার-ব্রত-দোল-দুর্গোৎসব ; তেল-নুন-লকড়ী »। সাধারণতঃ পৃথক্ শব্দ-রূপে, সমাস-বদ্ধ না করিয়া, এই প্রকারের দ্বন্দ্ব-সমাস লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বহুপদময় দ্বন্দ্ব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় এরূপ শব্দ সাধুভাষায় মিলে ; যথা—« রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ; কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য ; দেবাসুর-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃ ; রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন » ইত্যাদি।

[খ] অলুক্-দ্বন্দ্ব—

বাঙ্গালা বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বন্দ্ব প্রচুর ; এগুলিকে বাঙ্গালার অলুক্-দ্বন্দ্ব বলা যায় ; যথা—« আগে-পাছে বা -পিছে ; বুকে-পিঠে ; হাতে-পায়ে ; পথে-ঘাটে ; গোঠে-মাঠে ; হাটে-বাটে ; জলে-কাদায় ; দুধে-ভাতে ; ঝোপে-ঝাড়ে ; বনে-বাদাড়ে ; হাতে-ভাতে ; ঠারে-ঠোরে » ইত্যাদি।

[গ] 'ইত্যাদি' অর্থে দ্বন্দ্ব-সমাস (পরে দ্রষ্টব্য, [৩.০৫] শব্দ-দ্বৈত)।

সহচর শব্দের সহিত সমাস-দ্বারা, 'অনুরূপ বস্তু' এই ভাব-প্রকাশের জন্য, একপ্রকারের দ্বন্দ্ব-সমাস বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে ; যথা—

(একার্থক) সহচর-শব্দের সহিত সমাস—« জন-মানব, ছেলে-ছোকরা, গা-গতর, লোক-জন, কাজ-কর্ম, জীব-জন্তু, ভুল-চুক, জাঁক-জমক, ধর-পাকড়, বাড়ী-ঘর, ভয়-ডর, ঢাক-ঢোল, চড়-চাপড়, বস-বাস, হাই-তুল, ঠেলা-ঠাটি, মাথা-মুণ্ডু »।

অনুচর-শব্দের সহিত সমাস—« কাপড়-চোপড়, আলাপ-সালাপ, চুরি-চামারি, দোকান-পাট, চাল-চুলা, পথ-ঘাট, শত্রু-শত্র, আশ-পাশ, চুল-বুল, কলা-মূলা, মরা-ধরা, কামার-কুমার, মাল-মশলা, চুলা-পুঁটি, খাল-বিল, ঘটী-বাটি, হাঁড়ী-কুঁড়ী, সভাব-চরিত্র »।

প্রতিচর-শব্দের সহিত সমাস—« দিন-রাত, রাজা-উজির, মেয়ে-পুরুষ, বামুন-চাঁড়াল, বামুন-বাগ্দী, বামুন-বষ্টুম, হিন্দু-মুসলমান, শত্রু-মিত্র, পাপ-পুণ্য, রদ-বদল, গুরু-শিষ্য, পীর-মুরীদ, রাজা-প্রজা, বেচা-কেনা, বিকি-কিনি, শীত-গ্রীষ্ম, রাজা-রাণী, জজ-ব্যারিষ্টার »।

বিকার-শব্দের সহিত প্রয়োগ—« ঠাকুর-ঠুকুর, ফাঁকি-ফুঁকি, জারি-জুরি, ঠিক-ঠাক, মিট-মাট, টান-টোন, গোল-গাল, ধুম-ধাম, দোকান-দাকান »। কচিৎ বিকার-শব্দ পূর্বে বসে—« অলি-গলি, আঁকা-বাঁকা, অদল-বদল, হাবু-ডুবু »।

অনুকার- বা ধ্বন্যাত্মক-শব্দের সহিত—« বাসন-কোসন, চাকর-বাকর, তেল-টেল, হাতী-টাতী, কাজ-কাজ »।

[ঘ] **সমার্থক দ্বন্দ্ব**—

কতকগুলি দ্বন্দ্ব-সমাসে সমার্থক এক বা বিভিন্ন ভাষার পদ পাওয়া যায়—বহুস্থলে এইরূপ দ্বন্দ্ব-সমাস-দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ না বুঝাইয়া, অনুরূপ বস্তুর সমষ্টি বুঝায়; যথা—« কাগজ-পত্র » = ফারসী « কাগজ » + সংস্কৃত « পত্র », অর্থ—'কোনও বিশেষ বিষয়-সম্পৃক্ত দলিল প্রভৃতি, documents'; « রাজা-বাদশা »—'রাজা শ্রেণীর ব্যক্তিসমূহ'; « ডাক্তার-বৈদ্য »—'বিভিন্ন প্রকারের চিকিৎসকসমূহ'; « ঠাট্টা-মস্করা »—'রসিকতার কথা'; « ভাগ-বাটোয়ারা » ইত্যাদি। এই প্রকার দ্বন্দ্বকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব** বলা চলে।

[৩.০৪২] ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস (Determinative Compounds)

এই বিভাগের সমাসগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা—

[ক] **তৎপুরুষ**; [খ] **কর্মধারয়**; [গ] **দ্বিগু**।

[ক] **তৎপুরুষ**—

ইহাতে পরস্পরের সহিত অন্বিত দুইটী পদ থাকে; দুইটীই বিশেষ্য পদ হয়, তন্মধ্যে প্রথমটী দ্বিতীয়টীর অর্থকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়।

প্রথমটীর অন্বয় পরবর্তীটীর সহিত কর্মরূপে, করণ (বা যোগ অথবা অভাব)-রূপে, সম্প্রদান (বা নিমিত্ত, অথবা জন্য)-রূপে, অপাদান-রূপে, সম্বন্ধ-রূপে অথবা অধিকরণ-রূপে ঘটে। দ্বিতীয় পদটীর অর্থই প্রধান অর্থ হইয়া থাকে ; যথা—« সাহায্য-প্রাপ্ত (কর্ম), মন-গড়া (করণ), বুদ্ধি-হীন (অভাব), ব্রাহ্মণোৎসৃষ্ট (সম্প্রদান), জীয়ন-কাঠি (জন্য), অতিথি-শালা (নিমিত্ত), বিলাত-ফেরৎ, পদচ্যুত (অপাদান), ঠাকুর-ঘর (সম্বন্ধ), ব্রাহ্মণগণ (সমূহ), গাছ-পাকা (অধিকরণ) »। ব্যাস-বাক্যে বিশ্লেষ করিতে হইলে প্রথম পদটীতে কর্ম, করণ প্রভৃতি বিভিন্ন কারকের বিভক্তি যোগ করিতে হয় ; যথা—« সাহায্যকে-প্রাপ্ত (কর্ম-কারক—দ্বিতীয়া বিভক্তি), মনের দ্বারা গড়া (করণ-কারক—তৃতীয়া বিভক্তি), পদ হইতে চ্যুত (অপাদান-কারক—পঞ্চমী), ঠাকুরের ঘর (সম্বন্ধ—ষষ্ঠী), গাছে পাকা (অধিকরণ—সপ্তমী) »।

« তৎপুরুষ শব্দের অর্থ 'তাহার সম্পর্কীয় পুরুষ' ; এই সমস্ত-পদটাকে, অনুরূপ সমস্ত-পদের প্রতীক- বা নাম-স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতে কর্তৃকারক ব্যতীত পাঁচটা কারক এবং 'সম্বন্ধ-পদ' আছে ; এই ছয়টার জন্য এক এক শ্রেণীর বিভক্তি নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে সংস্কৃতে তৎপুরুষ-সমাস, « দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ, তৃতীয়া-তৎপুরুষ, চতুর্থী-তৎপুরুষ, পঞ্চমী-তৎপুরুষ, ষষ্ঠী-তৎপুরুষ ও সপ্তমী-তৎপুরুষ »—এই ছয় উপশ্রেণীতে পড়ে। বাঙ্গালায় অতিরিক্ত « প্রথমা-তৎপুরুষ »-ও ধরা যায় ; যথা—

(১) **কর্তৃ-বাচক—প্রথমা-তৎপুরুষ** : « দাগ-লাগা (যথা—কাপড়ের এইখানটায় দাগ-লাগা) ; হাতী-কাঁদা (রাস্তা—যে রাস্তায় চলিতে হাতীও কাঁদে) ; বাজ-পড়া, ঘর-চাপা (যথা—বাজ-পড়ায় ও ঘর-চাপায় চারজন লোক মারা গিয়াছে) »। (ষষ্ঠী-তৎপুরুষ-রূপেও এই শ্রেণীর তৎপুরুষের বিশ্লেষ চলে)।

(২) **কর্ম-বাচক—দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ** : « জল-খাওয়া (=জলপান ক্রিয়া) ; দুধ-দোহা ; ভাত-রাঁধার হাঁড়ী ; পা-টেপা ; পা-ধোয়াতে অসুখ হইবে না ; হাটে হাঁড়ী-ভাঙ্গা ; ফুল-তোলা ; মাথা-গোঁজা ; চোখ-মটকানো ; হাত-গোণা ; পাট-কাটার

(পকেট-মারার) অপরাধে শাস্তি হইয়াছে ; ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা, জল-তোলা আর কাপড়-কাচার জন্য চাকর দরকার ; নথ-নাড়া ; উঠান-চষা ; কাঠ-কাটা ; রথ-দেখা, কলা-বেচা ; হীরা-বসানো কাজ ; কালি-মাখানো ; ভুঁই-ফোঁড় » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ মিলিয়া দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ—« সাহায্য-প্রাপ্ত ; বিস্ময়াপন্ন, খ্যাত্যাপন্ন ; দেবাশ্রিত, দুর্গাশ্রিত ; লোকাতীত ; অশ্বারূঢ়, রথারূঢ় ; পাদানুধ্যাত ; গৃহপ্রবিষ্ট ; ধর্মসংক্রান্ত ; পুস্তকগত, তদ্গত »।

• সমাসের প্রথম পদ, কাল- অথবা অবস্থা-জ্ঞাপক বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইলে, সমস্ত-পদটী দ্বিতীয়া-তৎপুরুষের অধীনেই ধরা হয় ; যথা—« চিরশত্রু, মাসাশৌচ, ক্ষণস্থায়ী, দৃঢ়বদ্ধ, ঘনসন্নিবিষ্ট, অর্ধজীবিত, নিমেষহত »। তদ্রূপ « নিম-খুন (= অর্ধ-হত), নিম-রাজী, নিম-দাগী ; আধ-পাকা »।

(৩) করণ-বাচক—তৃতীয়া-তৎপুরুষ : প্রথম পদের অর্থ, করণ-, যোগ- অথবা অভাব-বাচক ; যথা—« মন-গড়া, হাত-গড়া, ঢেঁকি-ছাঁটা, কালি-মাখানো, হাত-তোলা, বাদুড়-চোষা, পাতা-ছাওয়া, ঝাঁটা-পেটা, পোয়া-কম, বুদ্ধি-হারা, মা-হারা, দিশা-হারা, মধু-মাখা, নুন-মাখা »।

সংস্কৃত শব্দ—« শ্রীযুত, শ্রীযুক্ত, গুণ-সম্পন্ন, পদ-দলিত, ঘর্মাক্ত, রক্তাক্ত, যষ্টি-তাড়িত, অসিচ্ছিন্ন, হস্ত-চালিত, শ্রম-লব্ধ, মোহান্ধ, শোকাকুল, সর্প-দষ্ট, কীট-দষ্ট, ছায়া-শীতল, বাতাহত, সর্বালম্ভা, বাগ্‌বেত্তা, বিদ্যাধন্ত, বিস্ময়বিহ্বল, ইচ্ছাসক্ত, মৎকৃত, রজ্জুবদ্ধ, গুণহীন, মুক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, ক্ষমাহীন, বায়ুপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, জনশূন্য, বিবেক-রহিত, মাতৃহীন, ইন্দ্রিয়-বিকল, রোগ-পীড়িত » ইত্যাদি।

(৪) উদ্দেশ্য-বাচক—চতুর্থী-তৎপুরুষ : প্রথম পদের অর্থ, নিমিত্ত- অথবা সম্প্রদান-অর্থে ; যথা—« জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি ; শোষ-কাগজ ; মড়া-কান্না ; বিয়ে-পাগলা ; ডাক-মাশুল, রেল-মাশুল ; ধান-জমী ; ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরোত্তর (এই তিনটী শব্দে, 'নিষ্কর জমী' অর্থে মূল সংস্কৃত শব্দ « ব্রহ্মত্রা » হইতে 'উত্তর' এই নবসৃষ্ট বাঙ্গালা পদটী বিদ্যমান) ; হিন্দু-স্কুল ; মাল-গুদাম ; বালিকা-বিদ্যালয় ; গো-ব্রাহ্মণ-হিত (= গো অর্থাৎ গৃহ-সম্পত্তি ও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ধর্মোপদেষ্টা, ইহাদের অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে মঙ্গলকারী নারায়ণ) ; শিশু-বিভাগ ; যূপ-কাষ্ঠ ; দেবোৎসৃষ্ট ; দন্ত-কাষ্ঠ »। কচিৎ বিকল্পে এইরূপ সমস্ত-পদকে ষষ্ঠী-তৎপুরুষও বলা যায়।

(৫) অপাদান-বাচক—পঞ্চমী-তৎপুরুষ : 'হইতে' এই অর্থে পূর্ব পদের সহিত অন্বয় হয় ; যথা—« ঘর-ছাড়া, গাঁ-ছাড়া, পাল-ছাড়া, ঘর-পালানো, আগা-গোড়া, গলিয়া (গ'লে)-ঝাড়া, মিত্তির-জা বা মিত্রজা, ঘোষ-জা, দত্তজা »।

সংস্কৃত শব্দ—« পাশ-মুক্ত, অগ্নি-ভয়, চৌর-ভয়, স্বর্গ-ভ্রষ্ট, পদচ্যুত, পদ-স্খলন, আপ্তস্থ, আকাশ-বাণী, বিদেশাগত, বিপদুত্তীর্ণ, ভুক্তাবশেষ, ভস্মিভূত, হত্ভব, গৃহ-নির্গত, দুগ্ধ-জাত »।

মিশ্র শব্দ—« জেল-খালাস, বিলাত-ফেরত »।

(৬) সম্বন্ধ-বাচক—ষষ্ঠী-তৎপুরুষ : সম্বন্ধ-দ্যোতক অন্বয়ে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হয় ; যথা—« বামুন-পাড়া, ঠাকুর-বাড়ী, বড়তলা বা বটতলা, ধানক্ষেত, চাঁদপাল-ঘাট, ট্যাক-ঘড়ি, হাত-ঘড়ি, বেগুন-বাড়ী, তালপাতা, মৌচাক, পুকুর-ঘাট, আম-গাছ, তাল-গাছ, বাঁদর-নাচ, ঠাকুরপো, ঠাকুরঝী » ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ—« জেল-দারোগা, জাহাজ-ঘাটা, গোরা-বারিক, ফুল-বাগান, রাস্তা-বাজার, মৌলবী-বাজার, সাহেব-বাগান, চা-বাগান, হিন্দুস্থান, খ্রীষ্ট-ধর্ম, রেল-কুলী, বিল-সরকার, গিনি-সোনা, পুলিস-সাহেব, পণ্ডিত-মহল, ইংলণ্ডেশ্বর, দিল্লীশ্বর »।

সংস্কৃত শব্দ—« গঙ্গাজল, গুরূপদেশ, রাজবংশ, যমলোক, সৎসঙ্গ, অতিথিসেবা, কাশী-নরেশ, মনোযোগ, শিশুগণ, ঋষিগণ » ইত্যাদি। কতকগুলি অশুদ্ধ সংস্কৃত রূপও বাঙ্গালায় চলে ; যথা—« চক্ষুলজ্জা, জগবন্ধু »।

সংস্কৃত ভাষার বিশেষ নিয়মে সৃষ্ট ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস—

(ক) « সহ » ও « তুল্য » অর্থে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস হয় ; যথা—« ভ্রাতৃসহ, পিতৃসহ, তত্তুল্য, তৎসম, ভ্রাতৃসম, মুমূর্ষু-প্রায়, অনল-সন্নিভ, সোদর-প্রতিম, চন্দ্রনিভ, পুষ্পসঙ্কাশ »।

(খ) « প্রতি »-যোগে—« তৎপ্রতি, মৎপ্রতি, রামপ্রতি »।

(গ) « সমূহ »-বাচক পদের যোগ যেখানে ঘটে, সেখানেও ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হয় ; যথা—« ধেনুকুল, বিহঙ্গম, পণ্ডিতগণ, বস্তুরাজি, বৃক্ষসমূহ » ইত্যাদি। সংস্কৃত-ভাষার শব্দের প্রথমার একবচনই বাঙ্গালা ভাষায় মূল-শব্দ-রূপে গৃহীত হয়, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষার সমাসে সেই সকল শব্দের প্রাতিপদিক বা বিভক্তি-হীন রূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত নিয়মে সমাস করিতে গেলে, সেই হেতু প্রাতিপদিকের রূপ ধরিয়া করিতে হয় ; যথা—« রাজন্ » শব্দ—প্রথমার একবচনে « রাজা », প্রাতিপদিক রূপ « রাজ » : « রাজা + গণ »—« রাজা-গণ » বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-অনুসারে সমর্থিত হইতে পারে, কিন্তু

সংস্কৃত নিয়ম-অনুসারে « রাজগণ » হওয়া উচিত ; তদ্রূপ « ধনিগণ » (« ধনিন্ » শব্দ— প্রাতিপদিক রূপ « ধনি », প্রথমার একবচনে « ধনী »), « যুব-সমূহ » (বাঙ্গালা রীতিতে « যুবা-সকল ») ; « ভ্রাতৃসম » (বাঙ্গালা রীতিতে « ভ্রাতা-সম »); « দাতৃ-গণ, শ্রোতৃগণ » (« দাতা-গণ, শ্রোতা-গণ »—বাঙ্গালা রীতিতে) ; « ভ্রাতৃচতুষ্টয় » (কিন্তু বাঙ্গালা রীতিতে « ভ্রাতা চারজন »), « মাতৃস্নেহ » (বাঙ্গালা রীতিতে এই পদ অপ্রচলিত—« মাতা-স্নেহ » চলে না) ।

এই প্রকার সমাসে, যেখানে দুইটী পদই সংস্কৃত-ভাষার, সেখানে শুদ্ধ সংস্কৃত রূপ ব্যবহার করা, বাঙ্গালার পক্ষে শিষ্ট-প্রয়োগ-সঙ্গত ।

(ঘ) কতকগুলি শব্দে, স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে সেগুলির সাধারণ রূপই সমাসে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« মৃগশিশু ('মৃগীশিশু' নহে), ছাগদুগ্ধ, মেষশাবক, হংসাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড » ।

(ঙ) কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত সমস্ত-পদ লক্ষণীয় : « কালিদাস (স্থলে কালিদাস, তদ্রূপ দেবিদাস, হরিদাস, চণ্ডিদাস) »—এই কয়টা শব্দের « দীর্ঘ ঈ » হ্রস্ব হয় ; « বিশ্বামিত্র »—ঋষি-বিশেষের নাম-অর্থে বৈদিক সমাস, এখানে « বিশ্ব » শব্দের পরে « আ » আইসে ('বিশ্বের মিত্র' অর্থে 'বিশ্বমিত্র') ; « বৃহস্পতি, বনস্পতি »—এই দুই শব্দে « স-কার »-এর আগম হয় ; « ভ্রূকুটি »—বিকল্পে « ভ্রুকুটি, ভৃকুটি » ; « রাজহংস, রাজপথ »—এখানে শ্রেষ্ঠার্থ-বোধক « রাজন্ »-শব্দের পূর্ব-নিপাত (« হংস-রাজ, পথরাজ » হওয়া উচিত ছিল) ; তদ্রূপ « পূর্বকায়, পূর্বরাত্র » ।

(৭) স্থান-কাল-বাচক—সপ্তমী-তৎপুরুষ : পূর্ব পদের অধিকরণ-কারকে অন্বয় হয় ; যথা—« গাছ-পাকা, ঘর-বাস, বুড়ী-হুজুরী, মাথা-ব্যথা, কোল-কুঁজা, ঘর-পোড়া, পুঁথি-গত, গোলা-ভরা ধান, বাটা-ভরা পান, গাল-ভরা কথা » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ—« গৃহবাস, অরণ্যবাস, বন-জাত, জল-জাত, কাশীবাসী, কার্য-কুশল, রণ-বীর, সদ্যোজাত, নরাধম, লোক-বিশ্রুত, আকাশগঙ্গা, বিশ্ববিখ্যাত, দক্ষিণাপথ, দক্ষিণামুখ, পুরুষোত্তম, জলমগ্ন, দুঃখিমাসক্ত » ইত্যাদি। « পূর্ব » শব্দের পর-নিপাত বা পরে আগমন হয় ; যথা—« শ্রুতপূর্ব, দৃষ্টপূর্ব, ভূতপূর্ব » ।

মিশ্র-শব্দজাত-সমাস—« বাক্স-বন্দী, ইংরেজী-শিক্ষিত, পকেট-জাত, তালিকান্তর্গত, লিষ্ট-ভুক্ত » ।

(৮) উপপদ-তৎপুরুষ : সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়-যুক্ত পদের পূর্বে

উপসর্গ বসে, এবং অন্য শব্দ বসে। উপসর্গ ভিন্ন শব্দকে উপপদ বলে। এইরূপ উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে **উপপদ-তৎপুরুষ** বলে। উপপদ-তৎপুরুষ সমাসের উপপদ অঙ্গের সহিত পরবর্তী কৃদন্ত অঙ্গের অন্বয়,—কর্ম করণ সম্প্রদানাদি কারকের অন্বয় হইয়া থাকে ; যেমন—« কুম্ভকার (কর্মের অন্বয়), বিহঙ্গম, আত্মম্ভরি, ঋত্বিক্, পঙ্কজ, মধুপ, ইন্দ্রজিত, দেবজিৎ, ব্রহ্মবিৎ, খেচর, মনসিজ, করদ, গৃহস্থ, স্বয়ম্ভু, ধনঞ্জয়, রিপুঞ্জয়, শত্রুঞ্জয়, জলচর, ভূচর, হিতৈষী, গিরিশ ('গিরৌ শেতে—গিরিতে যিনি অবস্থান করেন'—শিব), পাদপ, বিমৃশ্য-কারী, সত্যবাদী, চিরস্থায়ী, স্বল্পভাষী, দ্রুতগামী, ধীরগামী, অলঙ্কার, স্বীকার » ইত্যাদি।

খাঁটী বাঙ্গালায় উপপদ আলাহিদা ধরিবার প্রয়োজন নাই, কারণ « -আ » বা অন্য কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদগুলি বাঙ্গালায় অন্য সাধারণ পদ-রূপেই ব্যবহৃত হয় ; তবে কতকগুলি বাঙ্গালা সমস্ত-পদকে উপপদ বলা যায়, কারণ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত দ্বিতীয় অংশের শব্দ-হিসাবে পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ; যথা—« বনোলোভা, বর্ণচোরা, গাঁব-বুঝানী, পাড়া-বেড়ানী, সাজীকর, হালুইকর, কারকর, কারিকর » ইত্যাদি।

(৯) **নঞ্-তৎপুরুষ** : 'না', 'নাই', অথবা 'নয়' অর্থে সংস্কৃতে একটী প্রত্যয় আছে, সেটীর নাম « নঞ্ » ; এই নঞ্-প্রত্যয়, শব্দের আদিতে বসে। ব্যঞ্জনাদিক শব্দে এই প্রত্যয় « অ- »-তে রূপান্তরিত হইয়া যায়, স্বরাদিক শব্দের পূর্বে « অন্ »-তে পরিবর্তিত হয় : এবং কখনও-কখনও « ন »-রূপেও এই প্রত্যয় মিলে। খাঁটী বাঙ্গালায় এই প্রত্যয়, « আ-, অ-, বা অনা- » রূপে মিলে।

নঞ্-তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ—« অধর্ম, অসাধু, অধীর, অস্থির, অরূপ, অকাতর, অকর্তব্য ; অনেক, অনাদর, অনভ্যাস, অনতিক্রম, অনন্ত ; নাতিশীর্ষ, নপুংসক, নাতিশীত-তোক, নাতিবৃহৎ » ইত্যাদি। তদ্রূপ, « অজানা, অচেনা, আদেখা, আগুনি, অকাজিলা বা অকেজো, আরন্ধন বা অরন্ধন, অনাছিষ্টি (অনাসৃষ্টি), অনামুখ » ইত্যাদি।

(১০) **অলুক্-তৎপুরুষ** : সমাসে প্রথম পদের বিভক্তির লোপ হয়, পদটী তাহার মূল অথবা প্রাতিপদিক-রূপেই অবস্থান করে। কিন্তু কোনও-কোনও স্থলে এরূপ হয় যে, বিভক্তির লোপ হয় না, বিভক্তি-যুক্ত পদই সমাস-নিবদ্ধ হয়। এরূপ সমাসকে **অলুক্** বা **অলুক্-তৎপুরুষ** বলে ; যথা—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অলুক্-তৎপুরুষ—« গায়ে-পড়া, মাথায়-পাগড়ী, পায়ে-পড়া, গায়ে-হলুদ, গোরুর-গাড়ী, মামার-বাড়ী, বানে-ভাসা, ছিপে-গাঁথা, হাতে-কাটা (সূতা), হাতে-গরম, পাথরের-বাটী » ইত্যাদি। সংস্কৃত অলুক্-সমাস—« পরস্মৈপদ, আত্মনেপদ, যুধিষ্ঠির, অন্তেবাসী, ভ্রাতুষ্পুত্র, মনসিজ, খেচর, পরাৎপর, সারাৎসার, বাচস্পতি » ইত্যাদি।

(১১) **প্রাদি-সমাস** (Prepositional Determinatives) : ইহা তৎপুরুষের রূপান্তর এবং এক হিসাবে ইহাকে নিত্য-সমাসের অধীনেও ধরিতে পারা যায় (পরে ১২-সংখ্যক সমাস দ্রষ্টব্য)। প্রথমে উপসর্গ ও পরে কৃদন্ত-পদ-যোগে এবং অব্যয়ের সহিত নাম-পদ-যোগে ইহা সৃষ্ট হয় : যথা—« প্রভাত (প্র = প্রকৃষ্টভাবে ভাত বা জ্যোতিঃ যুক্ত), অভিমুখ, অনুতাপ (অনু = পশ্চাৎ + তাপ), অতিপ্রাকৃত, অতিমানব, অতিগিরি, স্বয়ংসিদ্ধ, উদ্বেল, উচ্ছৃঙ্খল, অধিজ্যা, উন্নিদ্র » ইত্যাদি।

অব্যয়ীভাব-সমাস, প্রাদি-পর্যায়েই আইসে। সংস্কৃতে এইরূপ পদ, ক্রিয়ার-বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রথম অংশে সাধারণতঃ অব্যয়-পদ থাকে ; যথা—« যথাশক্তি, যথাকাল, যথাসাধ্য, আজীবন, আকর্ণ, আকণ্ঠ, অনুক্ষণ, যথানাম, আবালবৃদ্ধবনিতা, প্রত্যূষ, অপরূপ, উপকূল, প্রত্যক্ষ » ইত্যাদি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অব্যয়ীভাব—« জনাকি, জন-কে-জন, মাঠ-কে-মাঠ, ঘর-পিছু, জন-প্রতি ; হর-রোজ, দিন-ভর, বা-পারি, ভর-পেট » ইত্যাদি। অব্যয়ীভাব-সমাসান্ত পদ বাঙ্গালায় সামীপ্য, বীপ্সা ('পুনঃ পুনঃ' অর্থে), অতিক্রম, পর্যন্ত, যোগ্যতা, অভাব, অথবা অধিকরণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

বহু স্থলে আবার দ্বিত্ব করিয়া বীপ্সা অর্থাৎ পৌনঃপুন্য অর্থ প্রকাশিত হয়; যথা—« চলিতে-চলিতে, দেখিতে-দেখিতে, দিন-দিন; চকিত-চকিত; পিছু-পিছু; পর-পর; ঘর-ঘর; প্রীত-প্রীত; বছর-বছর; গালাগালি; বাড়ী-বাড়ী; রাতারাতি » ইত্যাদি। (এরূপ স্থলে সমাস না বলিয়া শব্দ-দ্বৈত বলাও চলে)।

অব্যয়-যুক্ত বহু সমাস-সিদ্ধ পদ বাঙ্গালায় নাম-পদ-রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে; যথা—« উপদ্বীপ, দুর্ভিক্ষ, নির্বিঘ্ন, নিরামিষ, প্রত্যক্ষ (দর্শন) » ইত্যাদি।

(১২) **নিত্য-সমাস**: যেখানে সমস্যমান পদগুলি পাশাপাশি অবস্থান-দ্বারাই সমাস হইয়া যায়, সেইরূপ ক্ষেত্রে সমাসকে **নিত্য-সমাস** বলে। অনেক সময়ে প্রথম অংশ প্রাতিপদিক-রূপেই থাকে; যথা— « কেবল দর্শন=দর্শনমাত্র: ঈষৎ পিঙ্গল=আপিঙ্গল; তাহা মাত্র (অর্থাৎ কেবল তাহা)—তন্মাত্র (তদেব মাত্রম্); চিন্মাত্র; গ্রামান্তর; গৃহান্তর » প্রভৃতি। « নিভ, সন্নিভ, সঙ্কাশ » প্রভৃতি তুল্যার্থ-বোধক পদের সহিতও নিত্য-সমাস হয়; যথা—« দুগ্ধফেন-নিভ, অনল-সঙ্কাশ, বজ্র-সন্নিভ, বজ্র-নিকাশ » ইত্যাদি। (বাঙ্গালায় « মাত্র » শব্দের পৃথক্ প্রয়োগ হয়, সংস্কৃতে তাহা হয় না; কিন্তু « নিভ, সঙ্কাশ » ইত্যাদি শব্দ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়, স্বাধীন শব্দ-রূপে প্রচলিত নহে।)

(১৩) তৎপুরুষ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এইরূপ আর এক প্রকার সমাস, পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ-কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার নাম **সহসুপা** বা **সুপ্সুপা**। « সুপ্সুপা, সহসুপা » অর্থে, সুপ্ অর্থাৎ বিভক্তি-যুক্ত একটী পদের সহিত আর একটী সুপ্ বা বিভক্তি-যুক্ত পদের সমাস যেখানে আছে; এবং ব্যাপক অর্থ বিচার করিলে, তাবৎ সমাসকেই সহসুপা বা সুপ্সুপা-পর্যায়ে ফেলিতে হয়; কিন্তু বিশেষ বা সঙ্কুচিত অর্থে, [এই] শ্রেণীর সমাসকে মাত্র ব্যাখ্যান- বা আশ্রয়-মূলক

সমাস-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুপসুপা. যথা—« ভূতপূর্ব (=পূর্বম্. দ্বিতীয়া-বিভক্তির পদ+ভূতঃ প্রথমা বিভক্তি); প্রত্যক্ষভূত (প্রত্যক্ষম্+ভূতঃ); নাতিশীতোষ্ণ; পরমপূজ্য (পরমম্+পূজ্যঃ); শিষ্যভূত (শিষ্যঃ+ভূতঃ); পূর্বরাত্র; পূর্বকায় » ইত্যাদি।

উপরের সমস্ত-পদগুলিকে তৎপুরুষ অথবা কর্মধারয় শ্রেণীতেও ফেলা যায়।

[খ] কর্মধারয় (Appositional Determinative বা Descriptive Compounds)—

এই শ্রেণীর সমাসে. প্রথম পদটী দ্বিতীয়টীর বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে, এবং দ্বিতীয় পদের অর্থই বলবৎ থাকে। « কর্মধারয় » শব্দের অর্থ, « কর্ম- বা বৃত্তি-ধারণ-কারী »। বিশেষণ ও বিশেষ্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ, বিশেষণ ও বিশেষণ, বিশেষ্য ও বিশেষ্য—সকল প্রকারের শব্দ-যোগে কর্মধারয়-সমাস হয়।

(১) সাধারণ কর্মধারয় সমাসকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায়—

(৴০) বিশেষণ-পূর্বপদ—« কাল-পেঁচা, কাল-সাপ, কাঁচ-কলা, নীল-মাণিক, কাণা-কড়ি, লাল-টুপী, খাস তালুক, খাস-মহল, কালা-পল্টন, মহারাণী, ভাঙ্গা-হাট, ভুনি-খিচুড়ী, হেড-মাষ্টার (=প্রধান মাষ্টার), হেড-পণ্ডিত, থার্ড-পণ্ডিত »; সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রয়োগে—« সতী-রমণী, সতী-সাধ্বী »।

সংস্কৃত শব্দ—« রক্তাশোক, হতশ্রদ্ধ, দুষ্টমতি, মহাষ্টমী, মহাকাল, পরমেশ্বর, উষ্ণোদক, নবপল্লব, নীলমণি, পরমাত্মা, মধুরবচন, পূর্বরাত্র, শ্বেতবস্ত্র, নীলোৎপল, সর্বগুণ, পুণ্য-ভূমি, পুণ্যদিন, মহর্ষি, মোহনভোগ, মহাজন, বিশ্বমানব,

পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, দীর্ঘরাত্র, মধ্যরাত্র, দশগুণ » ইত্যাদি।

(৵০) বিশেষণোত্তরপদ—« ঘনশ্যাম, ঘননীল, হলুদ-বাটা, গোলাপ-লাল » ইত্যাদি।

(৶০) বিশেষণোভয়পদ—« চালাক-চতুর, কাঁচা-মিঠা, আধ-ফোটা, সাড়ে-পাঁচ, টাটকা-ভাজা, তাজা-মরা, লাল-কালা, ফিকা-লাল » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ—« শীতোষ্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, নীল-লোহিত, বিরাট্-বিশাল, কঠিন-কোমল, হিংস্র-কুটিল, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত, মধুর-ভীষণ, শ্বেত-কৃষ্ণ, ঈষত্তিক্ত, স্তিমিতাগমন, স্নিগ্ধ-বিশ্বস্ত, দন্তাপগত, সুপ্তোত্থিত » ইত্যাদি।

(।০) বিশেষ্যোভয়পদ—« ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, সাহেবলোক, খাঁ-সাহেব, পণ্ডিত-মহাশয়, মৌলবী-সাহেব, ওস্তাদজী, কিষেণজী, পিতাঠাকুর, লাট-সাহেব, সর্দার-পড়ুয়া, আম-আদা, মা-ঠাকরুন, ঠাকুর-মশাই, গোলাপ-ফুল, রাজা-বাহাদুর, ইংরাজ-রাজ, রাজপুত-বীর »।

সংস্কৃত শব্দ—« দেবর্ষি, সাধুসজ্জন, পিতৃদেব, ভূলোক, দ্যুলোক, আম্রবৃক্ষ, গণ্ডদেশ, কামরিপু, অবন্তী-নগরী, গঙ্গানদী, মথুরাপুরী, অশোক-পুষ্প, আকাশ-মণ্ডল, ললাট-ভাগ, পণ্ডিতাখ্যা, তমাললতা, পণ্ডিতজন » ইত্যাদি।

(।৵০) অবধারণা-পূর্বপদ—যে কর্মধারয়-সমাসে প্রথম পদটীর অর্থের সম্বন্ধে অবধারণা অর্থাৎ অর্থের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহাকে « অবধারণা-পূর্বপদ-কর্মধারয় » বলা হয়; যথা—« কালসর্প, কালসাপ (কাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে যে সর্প), বিদ্যাসর্বস্ব (বিদ্যা ই সর্বস্ব), কালকূট »।

(৸৹) সর্বনাম, অব্যয়, উপসর্গ ও গতি-দ্বারা, এবং সংখ্যা-বাচক শব্দ-দ্বারা বিশেষিত সমস্ত-পদ, কর্মধারয়-শ্রেণীতে পড়ে; যথা—বাঙ্গালা পদ-গ্রথিত, « এখন, তখন, সেজন; অজানা, অক্ষুরস্ত; অনাসৃষ্টি; আধোয়া, আলুনি; অমিল, অবনতি, অকাজ, আগাছা; বিভুঁই; কুনজর, সুনজর; বেয়ারাম, (= বে + আরাম), গর-হাজির, বে-সুর, বে-নাম; দু-জন, দু-শ', দু-তালা, তে-তালা, চৌ-তালা » ইত্যাদি।
সংস্কৃত শব্দ—« অনিন্দ্য, অসহ্য, অকর্ম, অদৃষ্ট, সুজাত, দুশ্চরিত, স্বলংকৃত, অলংকৃত, বিদেশ, সপ্তর্ষি, একোন-বিংশতি, কদাচার, কাপুরুষ, জাগ্রৎস্বপ্ন, জীবন্মৃত » ইত্যাদি।

(৸৶৹) কতকগুলি কর্মধারয়-সমাসে পূর্ব-নিপাত হয়, অর্থাৎ যে পদের পরে বসা উচিত, সে পদ আগে বসে; যথা—« অধম রাজা = রাজাধম; পুরুষব্যাঘ্র; ভরতশ্রেষ্ঠ; পুরুষোত্তম; বিপ্রগৌর; আলু-সিদ্ধ, চাউল-ভাজা, তেল-পড়া, হলুদ-বাটা, মুখপোড়া » ইত্যাদি।

(২) **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**: যেখানে কর্মধারয়-সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত ব্যাখ্যান-মূলক পদের লোপ হয়, সেখানে এইরূপ সমাসকে « মধ্যপদলোপী কর্মধারয় » বলে; যথা—« ঘি-মেশানো ভাত = ঘি-ভাত; দুধ-সাগু, জল-সাগু; তেলধুতি (= তেল মাখিবার ধুতি); ঘৃতান্ন (ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন); পলান্ন (পল- বা মাংস-মিশ্রিত অন্ন); সিংহাসন (সিংহ-চিহ্নিত আসন); অষ্টাদশ (অষ্ট-অধিক দশ); ছায়াতরু (ছায়া-প্রধান তরু); স্বর্ণাক্ষর (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর); কীর্তিমন্দির (কীর্তি-প্রকাশক মন্দির); ভিক্ষান্ন (ভিক্ষালব্ধ অন্ন); যম-যন্ত্রণা (যমের দেওয়া যন্ত্রণা); অশ্বসৈন্য (অশ্বারূঢ় সৈন্য); ষোড়শ

(ষট্‌ বা ছয় অধিক দশ) » ইত্যাদি। তদ্রূপ—« মনি-ব্যাগ ('মনি' অর্থাৎ টাকা রাখিবার 'ব্যাগ' অর্থাৎ থলি); সিন্দুর-কৌটা (সিঁদুর রাখিবার কৌটা); ঘর-জামাই ; কেশ-তৈল ; ফাঁসী-কাঠ » ইত্যাদি।

দুইটী বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে তুলনা বা উপমা করিয়া সমাস করিলেও কর্মধারয়-সমাস হয়। (যাহা উপমিত হয় তাহাকে « উপমেয় » বলে ; যাহার সহিত উপমা করা হয়, তাহাকে « উপমান » বলে)। এইরূপ কর্মধারয় তিন প্রকারের ; যথা—

(৩) **উপমান-কর্মধারয়** : যেখানে উপমান একটী গুণ-বাচক শব্দ, এবং উপমেয়ে সেই গুণ বর্তমান থাকে, সেখানে « উপমান-কর্মধারয় » হয় ; যথা—« শৈলোন্নত, দূর্বাদলশ্যাম, তুষার-ধবল ; মিশ্‌-কালো (=মিশির মত কালো) ; তুষার-শীতল, অরুণ-রাঙ্গা, সিন্দুর-রাঙ্গা বা সিন্দুর-লাল (সিঁদুর-রাঙা) ; কুসুম-কোমল » ইত্যাদি।

(৪) **রূপক-কর্মধারয়** : যেখানে একটী পদার্থকে, সম্পূর্ণ-রূপে অন্য প্রকারের অথবা অন্য শ্রেণীর আর একটী পদার্থের সহিত, উভয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তুলনা করিয়া সমাস করা হয়, সেখানে « রূপক-কর্মধারয় » হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহুস্থলে উপমেয় ও উপমানের অভিন্নত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে ; যথা, « জ্ঞানালোক (জ্ঞান-রূপ আলোক), কমল-মুখ, শোক-সিন্ধু, সংসার-সাগর, ভবনদী, বিরহ-সাগর, বিদ্যালোক, বিদ্যারত্ন, কোপ-বহ্নি, শোকাগ্নি, বিচ্ছেদানল, বিদ্যাধন, আনন্দ-পীযূষ, দেহ-পিঞ্জর, কীর্তি-ধ্বজা, কীর্তি-মেখলা, মুখচন্দ্র (মুখরূপ চন্দ্র), জলপথ ; নয়ন-অমৃতনদী ; প্রাণপাখী, আত্মা-পুরুষ ('আত্ম-পুরুষ'—সংস্কৃত মতে শুদ্ধ), ডাঙ্গাপথ, আঁখি-পাখী, চিত্ত-চকোর ; চাঁদবদন, চাঁদমুখ ; বচনামৃত, চরিতামৃত ; ক্ষুধানল, শান্তিবারি, ভক্তিসুধা » ইত্যাদি।

(৫) **উপমিত কর্মধারয়** : যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে

সাদৃশ্য স্পষ্ট নহে, উহাদের অন্তর্নিহিত কোনও গুণের কথা ভাবিয়া তবে উপমা করা হয়, সেখানে « উপমিত-কর্মধারয় » হয় ; যথা—« মুখচন্দ্র, নরসিংহ, পুরুষব্যাঘ্র, রাজর্ষি, নরপুঙ্গব, করপল্লব ; পদ্ম-আঁখি » ইত্যাদি ।

উপমানের ধর্ম উপমেয়-দ্বারা দ্যোতিত হইলে, « উপমান-সমাস » হয় ; উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোনও বিষয়ে স্পষ্ট হইলে, এবং উভয়কে অভিন্ন-রূপে কল্পনা করিলে, « রূপক-সমাস » হয় ; এবং উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া লইলে, বা উহাদের মধ্যে কোনও সমান ধর্ম প্রচ্ছন্ন থাকিলে, « উপমিত-সমাস » হয় ।

[গ] **দ্বিগু** (Numeral Determinative Compounds) : ব্যাখ্যান- বা আশ্রয়-মূলক সমাসে, যেখানে প্রথম পদটী সংখ্যা-বাচক হয়, এবং সমস্ত-পদটীর দ্বারা সংযোগ বা সমষ্টি বুঝায়, সেখানে ইহাকে দ্বিগু বলে। সংস্কৃতে, « দুইটী গো বা গোরুর সমষ্টি » অর্থে « দ্বি-গু » শব্দের ব্যবহার হয়—তাহা হইতে এই প্রকার সমাসের নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ : « নবরত্ন, ত্রিজগৎ, ত্রিমূর্তি, ত্রিভুবন, পঞ্চভূত, দশচক্র, অষ্টধাতু, সপ্তাহ, ষড়্‌ঋতু ; তেমাথা, চৌমুহানী, দুয়ানী (< দুই + আনা + ঈ), পাঁচ-জন, চার-হাত, চার-চোখ, তিন-ঠেং » ইত্যাদি ।

সংস্কৃতে যেখানে দ্বিগু-সমাসে সমষ্টি বুঝাইতে শেষের পদে প্রত্যয়ের লোপ বা যোগ হয় বা অন্য পরিবর্তন আইসে, সেখানে **সমাহার দ্বিগু** বলা হয় ; যথা—« দ্বিগু (গো-শব্দের বিকারে গু), ত্রিলোকী (লোক-শব্দের বিকারে লোকী), পঞ্চবটী (< বট), ত্রিপদী (< পদ), চতুষ্পদী (< পদ), শতাব্দী (< অব্দ), সহস্রাব্দী, পঞ্চনদ (< নদী), পঞ্চাঙ্গুল (< অঙ্গুলি) » ইত্যাদি ।

সমষ্টি না বুঝাইয়া গুণ-বাচক হইয়া দাঁড়াইলে, দ্বিগু-সমাস-যুক্ত পদ সহজেই বর্ণনাত্মক সমাস বহুব্রীহিতে পরিণত হয় ।

[৩.০৪৩] বর্ণনা-মূলক সমাস (Possessive, Relative বা Descriptive অথবা Secondary Descriptive

Compounds) : এই পর্য্যায়ের সমাসে, সমাসস্থ পদগুলির একটীও প্রধান নহে, ইহাদের মিলিত অর্থ অন্য একটী পদার্থকেই বর্ণন করে, অন্য পদার্থ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ সমাসের ব্যাস-বাক্যে, সর্বনাম « যে » শব্দের « যে, যাহার, যাহাকে, যাহাতে » প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ হয় ; যেমন—« বহু ব্রীহি (অর্থাৎ ধান্য) যাহার, সে 'বহুব্রীহি' ; নীল বরণ বা বর্ণ যাহার, সে ব্যক্তি 'নীলবরণ' » ইত্যাদি।

বহুব্রীহি-সমাসে প্রথম পদটী বহুস্থলে বিশেষণ হয়, কিন্তু বিশেষ্য বা অন্য নাম-পদও হইতে পারে, এবং অব্যয় বা সংখ্যা-বাচক পদও হইতে পারে। আবার সমাসে ব্যাস-বাক্যের বিরোধী পূর্ব- বা পর-নিপাতও হয়। এতদ্ভিন্ন, কোনও-কোনও স্থলে, অন্ত্য পদে প্রত্যয়-যোগ হয়, পদের পরিবর্তনও ঘটে। সংস্কৃত বহুব্রীহি-সমাসের উত্তর « ক », « ই », « অ » প্রত্যয় হয়, এবং খাঁটী বাঙ্গালা বহুব্রীহি-সমাসে « আ », « ইয়া », « ঈ », ও « উয়া » প্রত্যয় যুক্ত হয়।

বহুব্রীহি-সমাসের প্রকার-ভেদ আছে ; যথা—

(ক) **ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে, তাহাকে ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি বলে ; যথা—« শূলপাণি, বজ্রনখ, বজ্রদেহ, কমলমুখ, পদ্মনাভ ; সোনামুখ »।

(খ) **সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি**—পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হইলে, সমানাধিকরণ-বহুব্রীহি বলে ; যথা—« পীতাম্বর, রক্তনেত্র ; কালোবরণ »।

(গ) **ব্যতিহার-বহুব্রীহি**—পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইলে, একই শব্দের পুনরুক্তি-দ্বারা যে বহুব্রীহি হয়, তাহাকে « ব্যতিহার-বহুব্রীহি » বলে ; যথা—« দণ্ডাদণ্ডি (= দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ যেখানে তাহা) ; নখানখি ; লাঠালাঠি (লাঠিতে লাঠিতে লড়াই যেখানে) ; কানাকানি (কানে কানে কথা যেখানে) ; বাঁকাবাঁকি » ইত্যাদি।

(ঘ) **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**—যেখানে ব্যাস-বাক্যে আগত পদের লোপ হয় ; যথা—« চাঁদের মত সুন্দর মুখ যার সে 'চাঁদমুখ' ;

দশ বছর বয়স যার সে 'দশ-বছরিয়া' (বা 'দশ-ব'ছুরে') ; পাঁচ হাত পরিমাণ যাহার এমন ধুতি 'পাঁচহাতী' ; চন্দ্রবদন, মৃগনয়না » ইত্যাদি।

বহুব্রীহির দৃষ্টান্ত—

বাঙ্গালা ও মিশ্র : « সোনামুখা (সোনার মত মুখ যাহার—আ-প্রত্যয়), দেড়-হাতী গামছা (দেড় হাত পরিমাণ যাহার—ঈ-প্রত্যয়) ; হতভাগা (হত ভাগ অর্থাৎ ভাগ্য যাহার—আ-প্রত্যয়) ; লাল-পাগড়ী ; লাল-পাড়িয়া বা লালপেড়ে' (লাল পাড় যাহার—ইয়া-প্রত্যয়) ; বিশ-মনী ; তিন-নম্বর বাড়ী (তিন নম্বর অর্থাৎ সংখ্যা যাহার) ; সুবুদ্ধি ; পিছপা ; বদ্‌গন্ধ ; স-বুট পদাঘাত (বুটের সহিত বিদ্যমান) ; মতিচ্ছন্ন ; নাক-কাটা ; বেহেড (বে অর্থাৎ বিগত বা নষ্ট 'হেড' অর্থাৎ মাথা বা বুদ্ধি যাহার) , বেরাল-চোখুয়া বা চোখো (উয়া-প্রত্যয়) ; নাম-কাটা ; একগুঁয়ে (এক গোঁ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহার—এক+গোঁ+ইয়া প্রত্যয়) ; নেয়াই-আঁকড়িয়া বা নেই-আঁকুড়ে' (নেয়াই বা ন্যায় অর্থাৎ তর্কে আঁকড় বা আগ্রহ যাহার—ন্যায়+আঁকড় +ইয়া) ; সাত-নহরিয়া হার বা মালা ; শুচিবাইয়া, শুচিবেয়ে' (শুচি বাই বা বায়ু যাহার—ইয়া-প্রত্যয়) ; বিশ-বাঁও জল (বিশ বা কুড়ি বাঁও বা ব্যাম মাপ যাহার, এমন গভীর জল) ; বরাখুরিয়া বা বরাখুরে' (বরাহের মত খুর বা পা যাহার) ; গঙ্গাজলিয়া বা গঙ্গাজলে' চড়ামেজাজ ; উন-পাঁজরিয়া বা উন-পাঁজুরে' (উন অর্থাৎ একখানা কম পাঁজর বা পঞ্জরাস্থি যাহার) ; সোনালী-পাড় ধুতি ; ছয়-নলা ; দেখন-হাসি (দেখন মাত্র হাসি যাহার) ; গোঁফ-খেজুরে' ; লক্ষ্মীছাড়া ; অলক্ষণিয়া (অলক্ষণে', 'ওলুক্‌খুনে') ; উট-কপালী ; চিরুন-দাঁতী ; ডাকা-বুকা ; মুখপোড়া ; মণিহারা ; জলপানি-পাওয়া ; পাস-করা ; লুচি-ভাজা বামুন (লুচি ভাজে যে) ; লুচি-ভাজা খোলা (লুচি ভাজে যাহাতে) ; মড়াপোড়া ; কুলমপেড়ে ; মা-মরা ; মন-মরা ; পল-তোলা ; ফুল-তোলা ; কড়ি-প্যাটার্ন হার ; ডায়মণ্ড-কাটা বালা ; দিল-দরিয়া ; নিখাউস্তি ; নির্জলা ; নিনাই (নি অর্থাৎ নাই, না বা নৌকা যার সে নিনাই) ; আভাগিয়া, আবাগে' ; হাভাতিয়া, হাবাতে' ; দুখ-দিয়নিয়া ; সুখ-জাগানিয়া ; মিছ-কহনিয়া, মিছকউনে' ; ছা-পোষা (ছা বা সন্তান পোষে বা পালন করে, এমন লোক) ; ট্যাঁক-সর্বস্ব, পেট-সর্বস্ব ; অবুঝ ; না-ছোড় ; পেঁচামুখা » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ব্যতিহার-বহুব্রীহি—« কোলাকুলি, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, রক্তারক্তি, খুনাখুনি, টানাটানি, টানাহুঁনি » ইত্যাদি।

বিভক্তি লোপ না করিয়া, **অলুক্-বহুব্রীহিও** বাঙ্গালায় মিলে; যথা—« ছড়ি-হাতে, কোঁচা-হাতে বাবু; পাঞ্জাবী-গায়ে ছোকরা; জুতা-পায়ে; ঘাড়ে-পড়া, গায়ে-পড়া; গায়ে-হলুদ (গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে); 'সব-পেয়েছি'র দেশ; যাচ্ছেতাই; 'আপ-কা-ওয়াস্তে' লোক; মাথায়-ছাতি বাবু » ইত্যাদি।

সংস্কৃত বহুব্রীহি : « ধৃতরাষ্ট্র; এক-চক্রা; কলস-কক্ষা (স্ত্রী); দ্বিচক্র (যান); বাক্-সর্বস্ব; বৃহদ্রথ; ক্ষুধিত-হৃদয়; গৌর-তনু; চিত্রাশ্ব; দুর্ধর্ষতেজাঃ; অশ্রুমুখী; জিতেন্দ্রিয়; ক্ষীণ-হৃদয়; প্রবল-প্রতাপ; কৃদন্ত; ইন্দ্রাদি; দীর্ঘকায়; মহাশয় (মহদাশয়=মহত্তর আশয়); ত্রিনয়ন; কৃতকার্য; তীক্ষ্ণধী; রুদ্ধবায়ু-কক্ষ; হতশ্রী; স্থিরমতি; সুহৃৎ; সুমনাঃ; সুদর্শন; নির্জন; অমূল্য; অনন্ত; অনাদি; অধৈর্য; অবোধ; নির্লোভ; নির্দোষ; অদ্যাবধি; সগোত্র » ইত্যাদি।

সংস্কৃত বহুব্রীহির অন্তে প্রত্যয়ের উদাহরণ—« দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; গতনিদ্র; সত্যসন্ধ; বীতস্পৃহ; হতাশ; ছিন্নশাখ; কৃতবিদ্য; হেমান্ত; স্থিরপ্রজ্ঞ; বীতশ্রদ্ধ; নির্লজ্জ; লব্ধপ্রতিষ্ঠ; নির্গুণ; ব্রাহ্মণীভার্য; নিষ্করুণ; ক্ষীণজ্যোৎস্ন গগন; প্রাপ্তভিক্ষ; অপুত্র, অপুত্রক; বহুসংখ্য, বহুসংখ্যক; সমার্থ, সমার্থক; অনর্থ, অনর্থক (=অর্থ বা উপকার নাই যাহাতে; এই দুই সমার্থক শব্দে অর্থের পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে,—'অনর্থক' শব্দ ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং 'অনর্থ' শব্দ 'সর্বনাশ'- অর্থে প্রযুক্ত হয়); অল্পবয়াঃ, অল্পবয়স্ক; অন্যমনাঃ, অন্যমনস্ক; প্রোষিত-ভর্তৃকা; সস্ত্রীক; বিপত্নীক; বহুপত্নীক; নির্ভীক; স্থূলত্বক্; নদীমাতৃক; সমাতৃক; দেবমাতৃক; পদ্মনাভ (পদ্ম নাভিতে আছে যাঁহার=বিষ্ণু—'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ'; তদ্রূপ 'ঊর্ণনাভ'); বিশালাক্ষ; পুণ্ডরীকাক্ষ ('অক্ষি' স্থলে 'অক্ষ'); বিধর্মা (বিগত ধর্ম যার—বিধর্মন্ শব্দ); সপত্নী (সমান পতি যাহার); সুধন্বা, পুষ্পধন্বা ('ধনু' শব্দের 'ধন্বন্' রূপ পরিবর্তন); যুবজানি (যুবতী জানি অর্থাৎ জায়া যাহার; তদ্রূপ 'সীতাজানি, প্রিয়জানি'—জায়া-শব্দের পরিবর্তে সংস্কৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত শব্দ 'জানি'র প্রয়োগ); একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ ('পাদ' শব্দের 'পদ' রূপ); সোদর (সহ স্থানে 'সো'); কদাচার (কু-স্থলে 'কৎ'); যাপদ (বদ্+পদ—বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ); অষ্টাবক্র (বিশেষ নিয়মে); সুগন্ধি দ্রব্য ('গন্ধ' স্থলে 'গন্ধি'; কিন্তু 'সুগন্ধ বায়ু'—ই-প্রত্যয় হইল না, গন্ধ বায়ুর নিজের নহে, এই জন্য; তদ্রূপ 'পূতিগন্ধি ও পূতিগন্ধ, পদ্মগন্ধি ও পদ্মগন্ধ'); দ্বীপ (দুই দিকে জল যাহার; তদ্রূপ 'অন্তরীপ';—এই দুই শব্দে, 'অপ্' স্থলে 'ঈপ্') » ইত্যাদি।

[৩.০৪৪] সংস্কৃত পদের সমাস

দুইটী বা তদধিক সংস্কৃত পদ মিলিয়া একটী সমস্ত-পদ সৃষ্টি করিলে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে পূর্বপদের যে প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত ; যথা—* পিতৃপুরুষ, উপনিষৎপাঠ, বাগ্‌যন্ত্র, তৎসম, তদ্ভব, রাজসভা, গুণিগণ, মনোবিজ্ঞান, মাতৃবিয়োগ, ঈষদ্ধাস্য, চলচ্ছক্তিরহিত * ইত্যাদি। কচিৎ সংস্কৃত পদ, বাঙ্গালায় সমধিক প্রচলিত থাকা হেতু, বাঙ্গালা পদের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সেইরূপ পদ সমাসে আসিলে, সমাসটীকে বাঙ্গালা রীতি-অনুসারে সমস্ত-পদ বলিয়া ধরিতে পারা যায়, এবং এইরূপ করিলে সংস্কৃত নিয়ম-অনুসারে যে ভুল বা ত্রুটি হয় তাহার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ; যথা—* মন-মোহন (সংস্কৃতে মনোমোহন), ছন্দ-পতন (ছন্দঃপতন), ছন্দবিচার (ছন্দোবিচার), মন-আগুন (মনোঽগ্নি), সন্ন্যাসী-দল (সন্ন্যাসি-দল), বিধাতা-দত্ত (বিধাতৃদত্ত), তেজ-চন্দ্র (তেজশ্চন্দ্র) * ইত্যাদি। * তেজেশচন্দ্র, জ্যোতীন্দ্রনাথ, জ্যোতীশচন্দ্র * প্রভৃতি অশুদ্ধ সংস্কৃত সমাস বাঙ্গালায় এখনও বহুল প্রচলিত হয় নাই—এরূপ সমাস গ্রহণ না করাই উচিত। সংযোজক-চিহ্ন (-) -দ্বারা সমস্ত-পদের অঙ্গগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃতের নিয়মই অনুসরণ করা উচিত।

সমস্ত-পদের সহিত অন্য পদের অন্বয়ের অভাব বহুস্থলে লক্ষিত হয় ; যথা—* তোমার মুখদর্শন বা নামগ্রহণ করিব না ('তোমার' পদের অন্বয় 'মুখ' ও 'নাম' এই দুই সমস্ত-পদের অংশের সহিত) ; আপনার পরিশ্রম-জনিত সাফল্য * ইত্যাদি।

[৩.০৪৫] * অসংলগ্ন সমাস *—সংস্কৃত সমস্ত-পদের ভিন্ন অংশের পৃথক্ লিখন

সংস্কৃত সমস্ত-পদকে একপদ-রূপে লেখা উচিত। কিন্তু বাঙ্গালায় অনেক সময়ে বহুপদময় সমাস একপদ-রূপে লিখিলে অত্যন্ত দীর্ঘ দেখাইবে বলিয়া, সমাসে বা বদ্ধ

পদগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ পদ- বা শব্দ-রূপে লেখা হইয়া থাকে। হাইফেন বা সংযোজক-চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা দীর্ঘাকার-পদ-দর্শন-জনিত চক্ষুঃপীড়া দূর করিবার চেষ্টাও হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ লেখকেরা সংযোজক-চিহ্ন ব্যবহার-বিষয়ে, আলস্য-বশতঃ অথবা অনভ্যাস-বশতঃ, অনবধান হন। এই জন্য বাঙ্গালায় সমস্ত-পদকে ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক্ পদ-রূপে লিখিবার রীতি দেখা যায়; যথা—« এই কথা, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রণোদিত; একাধিক উপসর্গ প্রত্যয় বিভক্তি নিষ্পন্ন পদ সমষ্টি; নব নব বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি কার্যে তাঁহার শিল্প সাধনা সার্থক হইয়াছিল; সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ জাত; ভাষাগত শব্দাবলী সম্বন্ধে; প্রবল স্বরাঘাত বিহীন: জাপানে মহিলা প্রগতি; প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন; নিখিল ভারত আর্য সমাজ মহা সম্মেলন; মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কল্পে সরকারী পরামর্শ সভা সংগঠন চেষ্টা » ইত্যাদি। ছোট ছোট সমস্ত-পদ এক-শব্দ-রূপে লেখা উচিত; যথা—« ব্যাঘ্রচর্ম ('ব্যাঘ্র' একদিকে, আর 'চর্ম' আর একদিকে নহে); তদ্রূপ, হস্তিপৃষ্ঠ, হরিপদ, কালীচরণ, দেবগৃহ, দেবদূত, ঈশ্বরকৃপা, বাঘছাল, চাঁদমুখ, হাওটান, হাসিমুখ » ইত্যাদি। বড় বড় সমাস বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; এবং বড় সমাস একপদ-রূপে দেখিতে বাঙ্গালী পাঠক অভ্যস্ত নহে। সংযোগ-চিহ্নের ব্যবহার সর্বত্র কষ্টকর হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় এইরূপ পৃথক করিয়া লেখা চলিতে পারে, এবং এরূপ পৃথক্-লিখিত সমাসকে বাঙ্গালায় **অসংলগ্ন সমাস (Loose Compounds)** বলা চলে।

ইংরেজীতে এরূপ Loose Compounds খুবই সাধারণ; যথা—Howrah Sheakhala Light Railway; United North India Life Assurance Company; Hindu Joint Family System; Hindu Widow Remarriage Act; All-India Cow Conference; Cash Sale Department; Free Lunch Counter; District Agricultural Exhibition Cattle Show; East Somerset Light Infantry Football Team ইত্যাদি। অসংলগ্ন সমাসে অর্থগ্রহের অসুবিধা হয় না, কিন্তু ব্যাকরণ-গত অন্বয়ের অসামঞ্জস্য বহু স্থলে আসিয়া যায়; যথা—« শ্রী ও শোভা মণ্ডিত; রাম সীতা ও লক্ষ্মণ নির্বাসন; গম্ভীরনাদী বারিধি-তীরে ('গম্ভীরনাদী' পদের অন্বয়, 'বারিধি-তীর' এই পৃথক্ লিখিত সমস্ত-পদের 'বারিধি' এই অংশের সহিত); অনুকার বা বিকার জাত শব্দ; কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা নির্মিত পাত্র » ইত্যাদি।

[৩.০৩] শব্দদ্বৈত (Reduplication of Words)।

('ইত্যাদি' অর্থে দ্বন্দ্ব-সমাস পর্য্যায় দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২১০)

বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি সকল প্রকার পদের দ্বিত্ব-অবস্থান একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিত্ব করার পদ্ধতিকে অনেক স্থলে সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরা যায়; এতদ্ভিন্ন, দ্বিত্ব করার অন্য প্রয়োগও আছে। শব্দদ্বৈত বাঙ্গালায় তিন প্রকারের হইয়া থাকে :

(১) একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা; যথা—« ভালয়-ভালয়, শঠে-শঠে, বছর-বছর, বাটি-বাটি, হাসি-হাসি মুখ, চোর-চোর খেলা » ইত্যাদি।

(২) একটী শব্দের সঙ্গে সমার্থক আর একটী শব্দ সংযোগ করিয়া; যথা—« কাপড়-চোপড়, হাট-হদ্দ, হাঁড়ি-কুঁড়ি, খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বাড়া » ইত্যাদি।

(৩) অনুকার- বা বিকার-জাত শব্দ-যোগে; যথা—« জল-টল, সাফ-সোফ, আঁট-সাঁট, জোগাড়-জাগাড়, হুপ-হাপ, ধার-ধোর, অলি-গলি, আশে-পাশে, বকা-ঝকা » ইত্যাদি।

[৩.০৩১] দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

নিম্ন-লিখিত উদ্দেশ্যে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয় :

(১) পৌনঃপুন্য বা পুনরাবৃত্তি অর্থে। এতদ্ভিন্ন সম্পূর্ণতা, প্রকর্ষ ও সংযোগ অর্থে, এবং বিশেষ্য অথবা বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়া বিশেষ্যের বহুবচন অর্থে, প্রয়োগ করা হয়; যথা—« বাড়ী-বাড়ী, গলি-গলি, বছর-বছর, দেশ-দেশ, পর-পর, পাতি-পাতি করিয়া খোজা, পিছু-পিছু, দিন-দিন, গরম-গরম বা গরমাগরম, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, হাঁড়ি-হাঁড়ি সন্দেশ, মুঠা-মুঠা টাকা, থাবা-থাবা চিনি, গাড়ী-গাড়ী ইট, ধামা-ধামা মুড়ি,

লাল-লাল ফুল (অর্থাৎ অনেকগুলি ফুল, সেগুলির মধ্যে প্রত্যেকটীই লাল), বড়-বড় বাঁদর, লাল-লাল ঘোড়া, ইয়া-ইয়া বাঘ (অর্থাৎ এই রকম বৃহৎ আকারের অনেকগুলি বাঘ); ব'লে-ব'লে হা'র মানলুম, দেখে-দেখে, ফিরিয়া-ফিরিয়া, আশায়-আশায়, বুকে-বুকে, চোখে-চোখে, কাঠে-কাঠে, ঠগে-ঠগে, মানুষে-মানুষে, নিজে-নিজে, হাতে-হাতে, সকাল-সকাল, দিনে-দিনে, রাতে-রাতে » ইত্যাদি।

(২) বিভিন্ন শব্দ-যোগে সৃষ্ট শব্দদ্বৈত—সম্পূর্ণতা-দ্যোতক। « ভাবিয়া-চিন্তিয়া বা ভেবে-চিন্তে, করিয়া-কর্মিয়া বা ক'রে-ক'র্মে, বাঁচিয়া-বর্তিয়া, রাঁধা-বাড়া, খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো, মাগিয়া-পাতিয়া, গা-গতর, ঘর-গৃহস্থালী, লোক-লস্কর, মাথা-মুণ্ডু, হিসাব-কেতাব, শোর-গোল, বিদেশ-বিভূঁই, লজ্জা-সরম, বন্ধু-বান্ধব, কাগজ-পত্র, জন-মানব, আণ্ডা-বাচ্ছা » ইত্যাদি।

এইরূপ শব্দদ্বৈত-দ্বারা দ্বন্দ্ব-সমাসের কার্যও প্রকাশিত হয়। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

(৩) সাদৃশ্য বা ঈষদ্ভাব অর্থে। দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি ভাব প্রদর্শনের জন্যও শব্দের দ্বিরুক্তি হয়; যথা— « জর-জর ভাব, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া, ভাল-মানুষ-ভাল-মানুষ চেহারা, কাদা-কাদা ভাত, হাসি-হাসি মুখ, ঢুলু-ঢুলু আঁখি, রাগো-রাগো ভাব, শীত-শীত, শিহর-শিহর > শির-শির (গা শির-শির করা), মানে-মানে, ভাগ্যে-ভাগ্যে, ঘোড়া-ঘোড়া খেলা, চোর-চোর খেলা » ইত্যাদি।

কর্-ধাতু-যোগে, এই প্রকার শব্দদ্বৈত; আগ্রহ বা ইচ্ছার ভাবও প্রকাশ করে ; যথা— « মন বাড়ী-বাড়ী করে, দাদা-দাদা করিয়া সে পাগল হইয়াছে, যাই-যাই করা, যাবো-যাবো করা, উঠি-উঠি করা » ইত্যাদি।

(৪) ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, এই অর্থে « ইত »-প্রত্যয়ান্ত শতৃ-পদ বাঙ্গালায় দ্বিত্ব করিয়াই ব্যবহৃত হয়। « চলিতে-চলিতে,

খাইতে-খাইতে, বলিতে-বলিতে »। ক্রিয়া-বিশেষণেও এই শতৃ-পদের প্রয়োগ হয়; যথা—« দেখ্‌তে-দেখ্‌তে, পঁহুছিতে-পঁহুছিতে » ইত্যাদি। « ইয়া » প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াও এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হয়; যথা—« হাসিয়া-হাসিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া »।

(৫) **ব্যতিহার বা পারম্পরিক ভাব, তাহা হইতে পৌনঃপুন্য, প্রকর্ষ বা সম্পূর্ণতা।** ব্যতিহার ভাব-প্রকাশের জন্য শব্দটীকে দ্বিত্ব করিবার পূর্বে, মধ্যে « আ » ও অন্তে « ই » প্রত্যয় যুক্ত হয়। এইরূপ শব্দদ্বৈত বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে পড়ে; যথা—« মারামারি, কাটাকাটি, খাওয়াখায়ি বা খেওখেই, মুখামুখি, হাতাহাতি, কোলাকুলি, হাটাহাটি, ছুটাছুটি, পাশাপাশি, সোজাসুজি, মাঝামাঝি, গোড়াগুড়ি, ধাক্কাধুক্কি, পিঠাপিঠি, নড়ানড়ি, হাঁকাহাঁকি, চলাচলি, চালাচালি, গড়াগড়ি, ধরাধরি, চেঁচাচেঁচি, দেখাদেখি, বাঁধাবাঁধি, পারাপারি » ইত্যাদি।

(৬) **ইত্যাদি অর্থে,** সহচর, অনুচর, প্রতিচর, ও বিকারজ শব্দের সাহায্যে সৃষ্ট শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হয়। « ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস » পর্যায় দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ২১০, ২১১)।

(৭) **অনুকার-ধ্বনিতে শব্দদ্বৈত বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ।** « টক্‌টক্‌, কচ্‌মচ্‌, কচ্‌কচ্‌, গশ্‌গশ্‌, বিল্‌বিল্‌, কচর-মচর »। কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ আবার ধ্বনির ভাব ব্যতীত অন্য-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশক হইয়া থাকে; যথা—« ব্যথায় টন্‌টন্‌ (কট্‌কট্‌) করে, জ্বালায় কর্‌-কর্‌ করে, হাত নিশ্‌-পিশ্‌ করে, লাল টুকটুক ক'রছে, টক্‌-টকে' লাল, ঢ্যাব্‌ঢেবে লাল » ইত্যাদি। কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বারা বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়, যে গুণ বস্তুতে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে; যথা—« ধূ ধূ, খাঁ খাঁ, ধক্‌-ধক্‌, টুক্‌-টুক » ইত্যাদি। এইরূপ ধ্বনি-দ্যোতক শব্দদ্বৈতের মাঝে আ-কার যোগ করিলে, ধ্বনি-প্রকাশের মূলে যে ক্রিয়া তাহার মধ্যে ক্ষণিক বিরতির ভাব, অথবা প্রত্যুত্তরের ভাব, প্রকাশ

করে ; যথা—« টকাটক্, ঝনাঝন্, ধড়াধড়্, ঠকাঠক্, সনাসন্, টপাটপ্ » ইত্যাদি। ব্যঞ্জন-ধ্বনির দীর্ঘীকরণ বা দ্বিত্ব করিলে, ক্রিয়ার-ক্ষণ বিরত ভাবের প্রসারণ ইঙ্গিত করে ; যথা—« কলকল চলচ্চল টলটুল তরঙ্গ »।

এই প্রকারের দ্বিরুক্ত অনুকার-ধ্বনির প্রয়োগ, বাঙ্গালা ও অন্য আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষার একটী লক্ষণীয় বিশিষ্টতা।

[৩.০৩২] অনুকার-বিকারময় শব্দদ্বৈতে ভাবার ইঙ্গিত

বাঙ্গালা ভাষায় অনুকার- বা বিকার-জাত শব্দ, মূল শব্দের প্রতিধ্বনি-স্বরূপ, ইহার অর্থের সঙ্কোচ, প্রসারণ ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন ইঙ্গিত করে ; যথা—

(১) মূল শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন করিয়া—

(ক) ধ্বনি-বাচক শব্দে—ঈষৎ পরিবর্তিত ধ্বনির ভাব আনয়ন করে ; যথা—« টুপটুপ ও টুপটাপ্ ; কুপ্‌কাপ্ ; টুপুর-টাপুর ; হুপহাপ্ ; দুপ্-দাপ্ ; দুড়্-দাড় > দুদ্দাড় ; ঠাকুর-ঠুকুর ; টিপ্-টাপ্ » ইত্যাদি।

(খ) অন্য শব্দে—হয় ভাবের প্রকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রকাশ করে ; যথা—« চুপ-চাপ, ছিম-ছাম, ঘুষ-ঘাষ, তুক্-তাক্, ফিট্-ফাট » ; না হয় স্বার্থে অথবা অর্থের প্রসারণে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« দাগ-দোগ, ডাক-ডোক, সাজ-গোজ, বাছ-বোছ, চাল-চুল, ধার-ধোর, ভিড়-ভাড়, মিট-মাট, যোগে-যাগে, হুকুম-হাকাম, টুক্‌রো-টাক্‌রা, শুখনা-শাখনা, গোছ-গাছ, মোট-মাট, ফুটা-ফাটা, কালো-কোলো, ভুজং-ভাজং, খোঁচ-খাঁচ, গাট্টা-গোট্টা, জোগাড়-জাগাড় » ইত্যাদি। ক্রিয়াতে ঐ সকল ভাব পাওয়া যায়—« সাজা-গোজা, ঠাসা-ঠোসা, দাগা-দোগা » ইত্যাদি।

(২) মূল শব্দের ব্যঞ্জন-ধ্বনি পরিবর্তন করিয়া, « ইত্যাদি » অর্থে শব্দের প্রসার হয়। চলিত ভাষাতেই এইরূপ অনুকার শব্দের ব্যবহার সমধিক দৃষ্ট হয় ; যথা—

(ক) ট-বর্গ-যোগে, সাধারণ-ভাবের শব্দে প্রসার—অনুরূপ বস্তু অর্থে। (বাঙ্গালা ভাষায় ট-বর্গ ই এইরূপ অনুকার-শব্দদ্বৈতের বৈশিষ্ট্য।) উদাহরণ—« হাত-টাত, জল-টল, বই-টই, বাড়ী-টাড়ী » ইত্যাদি। ক্রিয়ায়—« গিয়ে-টিয়ে, বল্'লে-ট'ল্'লে »।

(খ) ফ-যোগে—অবজ্ঞায়। « কাজ-ফাজ, লুচি-ফুচি, টাকা-ফাকা, মুড়ি-ফুড়ি, কাট-ফাট, তাস-ফাস »; বহুল প্রযুক্ত নহে। ক্রিয়ায়—« সেখানে গিয়ে-ফিয়ে কাজ নেই »।

(গ) স-যোগে—সাধারণ-ভাবে, একটু আদর বা কোমলতার আভাস; যথা—« মুড়ি-সুড়ি, জড়-সড়, মোটা-সোটা, রকম-সকম, নরম-সরম, বোকা-সোকা, জো-সো, বুড়ো-সুড়ো, আঁট-সাঁট, 'গুটিয়ে'-সুটিয়ে' »।

(ঘ) ম-যোগে—অপ্রীতি বা রুক্ষতার ভাব; খুব অল্প ব্যবহৃত; যথা—« লুচি-মুচি, ঘুষো-মুষো, তেল-মেল »।

(ঙ) অন্য বর্ণ (স্বর ও ব্যঞ্জন—উভয়) পরিবর্তন করিয়া যে শব্দদ্বৈত হয়, তাহাতে বহু স্থলে অনুকার-শব্দটী মৌলিক শব্দ ছিল; যথা—« কাপড়-চোপড় (= চুপড়ী), আশ-পাশ (= সংস্কৃতে 'অগ্রে পার্শ্বে'), রস-কষ, চুল-বুল (= চল-বুল), তাড়া-হুড়া, চোট-পাট, হাঁড়ি-কুঁড়ি, আলাপ-সালাপ (= আলাপ ও সংলাপ), ছুতা-নাতা (= সূত্র ও নক্তক = 'কাপড়ের টুকরা'), খাবার-দাবার (খাওয়া-দাওয়া দ্রষ্টব্য), জাঁক-জোখ, সেজে-গুজে, চুকে'-বুকে', জুটে'-পুটে', লুটে'-পুটে', ঝ'কে-ঝ'কে, মিল-জুল, মাথা-চোথা, বাছা-গোছা » ইত্যাদি। এই শ্রেণীর শব্দদ্বৈত, « কাজ-কর্ম, লোক-জন, গরীব-দুঃখী, আলাপ-পরিচয়, হাক-ডাক, হাসি-খুশী » প্রভৃতি সমার্থক বা সদৃশার্থক শব্দের (অথবা অনুবাদাত্মক দ্বন্দ্ব) সমাসের অনুরূপ।

(চ) কোনও-কোনও স্থলে আদ্য বা অন্ত্য শব্দটী পরে অথবা পূর্বে স্থিত মূল শব্দের নিরর্থক প্রতিধ্বনিমাত্র, এবং মূল শব্দটীও বহু স্থলে

ধ্বনি-দ্যোতক, বিশেষ-অর্থহীন শব্দমাত্র ; যথা—* উস্-খুস্, উস্‌কা-খুস্‌কা (< খুশ্‌ক্ – ফারসী শব্দ – 'শুষ্ক'), নজ-গজ, হাঁস-ফাঁস, আই-ঢাই, কাচু-মাচু, নিশ্-পিশ্, আবোল-তাবোল, আগড়ম-বাগড়ম, আবুড়া-খাবুড়া> এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, ছট্‌-ফট্‌, তড়-বড়, হিজি-বিজি, ফষ্টি-নষ্টি ('নষ্ট' মূলশব্দ), আঁকু-পাঁকু বা আঁকু-বাঁকু, হাব্‌জা-গোব্‌জা লট্‌-খটে', তড়-বড়ে' * ইত্যাদি ।

[৩.০৬] শব্দ-রূপ

নাম-পর্যায়

[৩.০৬১] বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারা এবং অন্তরিন্দ্রিয় মন ও অনুভূতি প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ শক্তি-দ্বারা যাহার ধারণা করা যায়, এইরূপ বস্তু, গুণ বা সত্তার উল্লেখ, **নাম** বা **বিশেষ্য** শব্দের দ্বারা হইয়া থাকে ।

ইংরেজী ব্যাকরণে সাধারণতঃ বিশেষ্য-শব্দের শ্রেণী- বা জাতি-বিভাগ এইরূপে করা হয় :

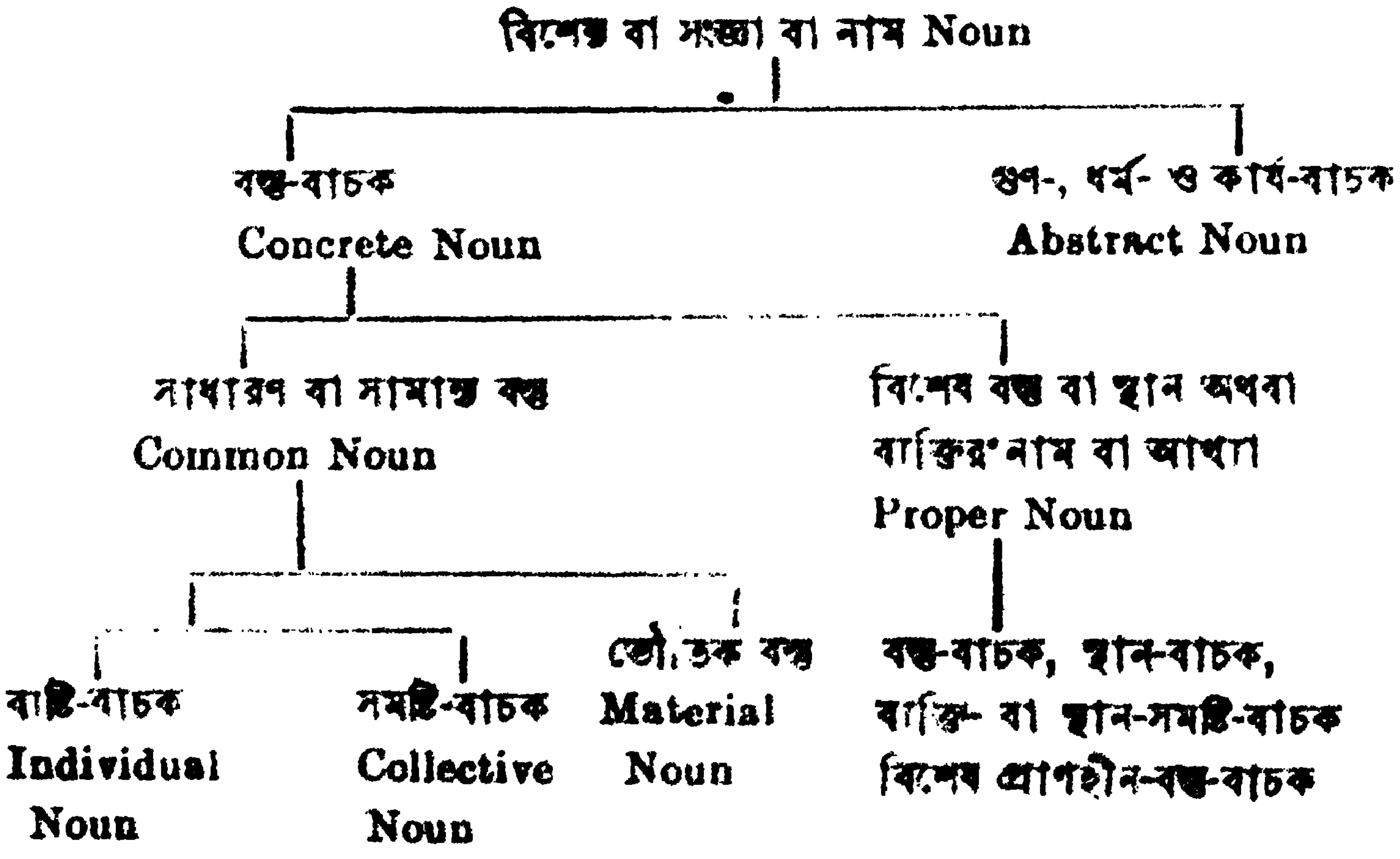

বাঙ্গালায় এই প্রকারের শ্রেণী বিভাগের বিশেষ সার্থকতা নাই ।

[৩.০৩২] লিঙ্গ

জগতে বা প্রকৃতিতে বস্তু-সমূহ পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক বা ক্লীব—এই তিন জাতি বা শ্রেণীতে পড়ে। বহু স্থলে ভাষাতেও প্রাকৃতিক অবস্থা-অনুসারে নাম-বাচক শব্দগুলিকেও এই তিন শ্রেণীতে ফেলা হয়। পুরুষ-জাতীয় বস্তুর নামকে **পুংলিঙ্গ,** স্ত্রী-জাতীয় বস্তুর নামকে **স্ত্রীলিঙ্গ,** এবং ক্লীব- বা নপুংসক-জাতীয় বস্তুর নামকে **ক্লীবলিঙ্গ** বলা হয়। বহু ভাষায় আবার বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়- ও বিভক্তি-দ্বারা নাম-শব্দে লিঙ্গের পার্থক্য দেখানো হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় তিনটী লিঙ্গ স্বীকৃত হয়: পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীব-লিঙ্গ। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ শব্দ ভিন্ন সাধারণতঃ প্রত্যয়- বা বিভক্তি-দ্বারা লিঙ্গের এই পার্থক্য বাঙ্গালায় জানানো হয় না। কোথায়-কোথায় বাঙ্গালা বিশেষ্য-শব্দে লিঙ্গের পার্থক্য প্রত্যয়-দ্বারা দেখানো হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু সর্বত্রই লিঙ্গ-বিভেদ প্রদর্শনের জন্য বিশেষ-বিশেষ প্রত্যয় ও বিভক্তির প্রয়োগ বিদ্যমান।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রাকৃতিক অবস্থান-অনুসারে লিঙ্গ-বিচার হইয়া থাকে—ইংরেজীতেও এইরূপ রীতি। প্রাণীদিগের-মধ্যে পুরুষগণের নাম পুংলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, স্ত্রীদিগের নাম স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, এবং প্রাণহীন বা সংজ্ঞাহীন অথবা স্বভাবতঃ গমন-শক্তি-হীন বস্তুর, অথবা ক্রিয়া বা ভাবের নাম, ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়; যথা—« বালক, ষাঁড়, পুরুষ (boy, bull, male) », এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ; « বালিকা, গাই বা গাভী, স্ত্রী (girl, cow, woman) », এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; এবং « পাথর, গাছ, আকাশ, জল, পর্বত, রোদ, ছুরী, সমুদ্র, ঘুম, বই, শরম, রাগ, গাঙ্ (stone, tree, sky, water, mountain, sunshine, knife, sea, sleep, book, shame, passion, river) », এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। সংস্কৃতে, হিন্দুস্থানীতে (হিন্দী বা উর্দুতে), ফরাসীতে, জর্মানে কিন্তু এরূপ হয় না—কেবল প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণের লিঙ্গ-বিভাগ করে না। প্রাণ-হীন বস্তু বা ক্রিয়া বা গুণ অথবা ধর্ম প্রকাশ করে, এমন বহু নামে, লিঙ্গ-প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে, এবং

শব্দের প্রত্যয়-অনুসারে নামের লিঙ্গ নির্ণীত হয়,—পুরুষ-বাচক ও স্ত্রী-বাচক বিশেষ্যও ব্যাকরণে ক্লীবলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন—সংস্কৃত «বৃক্ষঃ, প্রস্তরঃ, আকাশঃ, পর্বতঃ, সমুদ্রঃ, রাগঃ»—এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ; «জলম্, মিত্রম্ (=বন্ধু), রৌদ্রম্, কলত্রম্ (=স্ত্রী)»—এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ; এবং «নিদ্রা, ছুরিকা, পুস্তিকা, লজ্জা, গঙ্গা»—এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তদ্রূপ জর্মান ভাষায় Stein (ষ্টাইন্=পাথর), Baum (বাউম=গাছ), Fuss (ফুস্=পা), Berg (বের্গ্=পর্বত), Wolken (ভোল্কেন্=আকাশ)—এগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ; Sonne (জ়ন্নে=সূর্য), Hand (হান্ট্=হাত),—স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; Meer (মের্=সাগর), Weib (ভাইব্=স্ত্রীলোক), Maedchen (মেৎশেন্=মেয়ে)—এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। হিন্দুস্থানী ও ফরাসীতে ক্লীবলিঙ্গ নাই—বিশেষ্য-পদ, হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ; হিন্দুস্থানীতে «ভাত, কাগজ, আদমী (=মানুষ), লড়কা, কাম (=কাজ), গুণ, কাঁটা, পেড়া (=ক্ষীরের মিষ্টান্ন)»—পুংলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু «দাল (=ডাইল), কিতাব (=বই), ঔরৎ (=স্ত্রীলোক), লড়কী (=কন্যা), কচৌরী (=কচুরী), মিঠাঈ (=মিষ্টান্ন), ছুরী, বাত (=কথা), নীঁদ (=নিদ্রা), লাজ (=লজ্জা)»—এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; ফরাসীতে couteau (কুতো=ছুরী) পুংলিঙ্গ শব্দ, fourchette (ফুর্শেৎ=কাঁটা) স্ত্রীলিঙ্গ, livre (লিভ্র্=বই) পুংলিঙ্গ, plume (প্ল্যুম্=কলম) স্ত্রীলিঙ্গ। যে-সমস্ত ভাষায় প্রকৃতির বিরোধী অথচ ব্যাকরণানুযায়ী লিঙ্গ-বিভাগ বিদ্যমান, সেই সকল ভাষায়, স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষ্যের পূর্বে যে বিশেষণ বসে, সেই বিশেষণের পরিবর্তন হয়; যেমন—সংস্কৃত «সুন্দরঃ পুরুষঃ, সুন্দরী নারী, মহান্ পর্বতঃ, বিশালঃ সাগরঃ, সুগন্ধঃ সমীরঃ, সুখদা গঙ্গা, শীতলং জলম্»; হিন্দুস্থানীতে «অচ্ছী বাত, ভাত অচ্ছা বনা, দাল অচ্ছী বনী, মীঠী বাত, মীঠা পানী, নয়া কাগজ, নঈ কিতাব বা নঈ পুস্তক» ইত্যাদি; ফরাসীতে le beau livre (লা বো লিভ্র্=সুন্দর বইটী), la belle dame (লা বেল্ দাম্=সুন্দরী নারী), le nouveau cuoteau (লা নুভো কুতো=নূতন ছুরী—পুং), la nouvelle fourchette (লা নুভেল্ ফুর্শেৎ=নূতন কাঁটা—স্ত্রী); জর্মানে der Stein (ডের্ ষ্টাইন্=পাথরটা—পুং), die Hand (দী হান্ট্=হাতটা—স্ত্রী), ও das Meer (দাস্ মের্=সাগরটা—ক্লীবলিঙ্গ)।

বাঙ্গালা ভাষায়—বিশেষ-করিয়া চলিত-ভাষায়—উপর্যুক্ত প্রকারের লিঙ্গ-বিচার বা প্রয়োগ এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। আমরা বলি—«ভাল ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভালো বা সুন্দর মেয়ে; লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী

ছেলে ; বড় ছেলে, বড় বউ (হিন্দীতে কিন্তু 'বড়া লড়কা, বড়ী বহূ), বড় গাছ, বড় ফুল » ইত্যাদি। কিন্তু সাধু-ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত প্রয়োগের অনুকরণে বহু স্থলে স্ত্রীলিঙ্গবৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। রচনাশৈলী যখন গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতের অনুকারী করা হয়, তখন এই প্রকার স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রয়োগ অধিক করিয়া ঘটে ; যথা—« সুন্দরী দুহিতা, কন্যা, রমণী ; বিদ্বান্ পুরুষ, বিদুষী নারী ; মহান্ জনসমাগম, মহতী সভা ; মহীয়সী মহিলা ; রোরুদ্যমানা বালিকা ; মৃন্ময় গৃহ, মৃন্ময়ী মূর্তি ; সুশীল বালক, সুশীলা কন্যা ; স্নেহময়ী মাতা ; সন্তাপহারিণী নিদ্রা ; সুখময়ী উষা ; প্রধানা নায়িকা ; বিরহবিধুরা রাধা ; একাকিনী শোকাকুলা সীতা ; রত্নগর্ভা জননী ; কোকিল-কণ্ঠী গায়িকা ; মুখরা, প্রগল্‌ভা স্ত্রী ; সাধ্বী, পতিব্রতা নারী » ইত্যাদি। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত ও তি-প্রত্যয়ান্ত বহু বস্তু- ও ভাব-ব্যঞ্জক বিশেষ্য-শব্দ সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ—বাঙ্গালাতেও তাহার অনুকরণ হয় ; যথা—« অর্থকরী বিদ্যা, পরা বিদ্যা, সর্বংসহা ধরিত্রী, ধৈর্যশীলা নারী, স্বর্ণময়ী কাশী, তমিস্রা রজনী, যামিনী জ্যোৎস্না-মত্তা, ঘোরা যামিনী, ঐকান্তিকী নিষ্ঠা (সেবা, প্রীতি, ভক্তি), অচলা ভক্তি, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, পুষ্পময়ী লতা, বেগবতী নদী, কুলুকুলুনাদিনী স্রোতস্বতী, পয়স্বিনী ধেনু (গাভী), সবৎসা গাভী, পঞ্চমবার্ষিকী জয়ন্তী, বার্ষিকী সভা, চঞ্চলা ক্ষণপ্রভা, মনোহারিণী জ্যোৎস্না, কিবা শোভা মনোলোভা, মায়াবিনী মরীচিকা, আশা কুহকিনী » ইত্যাদি।

কখনও-কখনও লেখকের অনবধানতা-বশতঃ ভুল হয় ; যথা—« ভীম অসি » স্থলে « ভীমা অসি » ; এবং সমস্ত-পদের সহিত অন্বয়ের অভাবও ঘটে ; যথা—« সুন্দরী স্ত্রীলোক (=সুন্দরী স্ত্রী), পয়স্বিনী ধেনুকুল (=পয়স্বিনী ধেনু+কুল) » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া পুংবাচক শব্দের স্ত্রী-রূপ গঠিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, কোনও কোনও স্থলে পৃথক্

শব্দ-দ্বারা পুংবাচক শব্দের স্ত্রী-রূপ দ্যোতিত হয়। উভয়লিঙ্গ-বাচক সাধারণ শব্দে পুং-বাচক ও স্ত্রী-বাচক শব্দ যোগ করিয়াও লিঙ্গ-নির্দেশ হইয়া থাকে।

পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-রূপ দুই প্রকারের হয়: (১) সেই শ্রেণীর বা জাতির স্ত্রীলোক বুঝাইবার জন্য, এবং (২) কোনও শ্রেণী বা জাতির পুরুষের পত্নীকে বুঝাইবার জন্য; যেমন—« ভাই » এই শ্রেণী বা পর্যায়ের স্ত্রী-রূপ হইতেছে « বোন » বা « ভগ্নী, ভগিনী », কিন্তু ভাইয়ের পত্নী অর্থে « ভাজ » শব্দ আছে। তদ্রূপ « নাতী—(১) নাতিনী, নাতনী—(২) নাত-বউ; ভাগিনা, ভাগ্নে—(১) ভাগিনেয়ী, ভাগনী—(২) ভাগিনেয়-বধূ, ভাগনে-বউ »।

বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রী-বাচক শব্দ তিনটী উপায়ে গঠিত হয়:

[১] পৃথক্ শব্দ-দ্বারা পুংলিঙ্গ- ও স্ত্রীলিঙ্গ-নির্দেশ

(ক) বাঙ্গালা শব্দ

« বাবা, বাপ—মা; ছেলে—মেয়ে (জাতি অর্থে; পত্নী অর্থে, 'বউ, পুত্রবধূ'); ভাই—বহিন্, বোন্, ভগ্নী, ভগিনী (ভাইয়ের পত্নী = 'ভাজ', 'ভাই-বউ'; 'ভ্রাতৃবধূ', চলিত উচ্চারণে 'ভাদ্রবধূ, ভাদ্দরবউ'; 'বউ-দিদি' = বড়-ভাইয়ের স্ত্রী); পো—ঝী (জাতি অর্থে), বউ (পত্নী অর্থে); জামাই—ঝী, মেয়ে (স্ত্রী অর্থে); ভাশুর, দেওর, দেবর—ননদ (জাতি অর্থে; দেওরের স্ত্রী = 'জা, যা'; ভাশুরের স্ত্রী—'বড়-জা'); দাদা—দিদি (দাদার স্ত্রী = 'বউ-দিদি'); শ্বশুর—শাশড়ী, শাশুড়ী; তালুই, তাউই, তাঐ (= ভাই বা বোনের শ্বশুর)—মাউই, মাঐ (= ভাই বা বোনের শাশুড়ী); সোয়ামী, ভাতার—বউ, মাগ (নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত); দাদামহাশয়, দাদাবাবু, ঠাকুরদাদা—ঠানদিদি (ঠাকুরদাদা বা পিতামহের স্ত্রী = 'ঠাকুরমা', মাতামহ বা দাদামহাশয়ের স্ত্রী = 'দিদিমা'); মিন্সা, মিন্ষে—মাগী (নিন্দায়); রাজা, রায়,—রাণী, রানী; ষাঁড়—গাই, গাভী। »

(খ) সংস্কৃত শব্দ

* পিতা—মাতা; জনক—জননী; স্বামী—স্ত্রী, জায়া, সহধর্মিণী, ভার্যা, গৃহিণী; পতি—পত্নী; বর—বধূ, কন্যা (অর্ধতৎসম 'ক'নে'); যুবা, যুবক—যুবতী, যুবতি; নর—নারী; পুত্র—কন্যা (পুত্রের স্ত্রী অর্থে 'পুত্র-বধূ, স্নুষা'); শ্বশুর—শ্বশ্রূ (প্রাকৃতজ 'শাশুড়ী', সমাসে 'শাশ'; যথা—'পিশ-শাশ, মাস-শাশ'); রাজা—রাজ্ঞী (রাণী, রানী), মহিষী, রাজমহিষী; পুরুষ—প্রকৃতি, স্ত্রী, রমণী, নারী; সখা—সখী; কর্তা—গৃহিণী (অর্ধতৎসম —'কত্তা—গিন্নী'), কর্ত্রী; বিপত্নীক—বিধবা; ভূত, প্রেত—প্রেতিনী (অর্ধতৎসম 'পেত্নী'); ভদ্রমহোদয়—ভদ্রমহোদয়া; ভদ্রলোক—ভদ্র-মহিলা; বৃষ, ষণ্ড—গাবী (প্রাকৃতজ 'গাভী'); শুক—সারী, সারিকা (বস্তুতঃ 'শুক' অর্থে 'টিয়া', 'সারিকা' বা 'সারী' অর্থে 'সালিক বা ময়না-জাতীয় পক্ষী',—বিভিন্ন জাতীয়, হিন্দীতে 'তোতা-মৈনা'; কিন্তু বাঙ্গালায় শব্দ দুইটী অজ্ঞ সাধারণের বিচারে পুং- ও স্ত্রী-বাচক হইয়া গিয়াছে)।

(গ) বিদেশী শব্দ

* পাতিশাহ, বাদশাহ, বাদশা, নবাব—বেগম; সাহেব—বিবি, মেম্ (= ইংরেজী ma'am = madam, ইউরোপীয় ও ফিরাঙ্গী সমাজে); গোরা—মেম; গোলাম—বাঁদী; লর্ড, লাট—লেডি; মিষ্টার, মিস্টার (= শ্রীযুক্ত)—মিস্ (= কুমারী), মিসেস্ (= বিবাহিতা নারী)—এই তিনটী শব্দ নাম বা পদবীর পূর্বে বসে; সাহেব—সাহেবা, বিবি, খানুম, খাতুন (মুসলমান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার নামের পরে বসে); চাকর (ফারসী শব্দ)—ঝী (প্রাকৃতজ), চাকরানী; খানসামা, খিদমদ্‌গার (ফারসী) —আয়া (পোর্তুগীস শব্দ; ইউরোপীয় বাড়ীর চাকর-চাকরানী); নওশাহ্ (= বর, ফারসী) দুলা—দুলহিন (হিন্দী—মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত) * ইত্যাদি।

[২] সাধারণ শব্দে পুরুষ- অথবা স্ত্রী-বাচক শব্দ-যোগে লিঙ্গ-নির্দেশ

« বেটা, পুরুষ—মেয়ে, নারী, স্ত্রী, মহিলা; মর্দ, মদ্দা (<ফারসী 'মর্দ্') নর—নারী, মাদী (<ফারসী 'মাদা') » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-যোগে, বিশেষ্যের লিঙ্গ-নির্দেশ হয়। « বউ, পত্নী » প্রভৃতি শব্দও স্ত্রীলিঙ্গে যুক্ত হয়; যথা—« বেটা-ছেলে—মেয়ে-ছেলে; পুরুষ-মানুষ—মেয়ে-মানুষ, স্ত্রীলোক, মেয়ে-লোক; কবি (=পুরুষ-কবি)—মেয়ে-কবি, স্ত্রী-কবি, মহিলা-কবি; (পুরুষ) যাত্রী—মেয়ে-যাত্রী, স্ত্রী-যাত্রী; গোসাঁই—মা-গোসাঁই; (পুরুষ) সৈন্য—মেয়ে-সৈন্য, স্ত্রী-সৈন্য, মেয়ে-ফৌজ; মর্দ—মেয়ে-মর্দ, মেয়ে-মর্দানী; (পুরুষ) প্রতিনিধি—মহিলা-প্রতিনিধি; নর-হাতী—মাদী-হাতী; মদ্দা-চিল বা নর-চিল—মাদী-চিল, স্ত্রী-চিল; নর-উট, মদ্দা-উট—মাদী-উট, উটনী; বৃষ, ষাঁড়, বলদ, ষাঁড়-গোরু—গাই-গোরু; আঁড়িয়া বা এঁড়ে-বাছুর—নই-বাছুর, বকনা (-বাছুর) » ইত্যাদি।

বহু স্থলে উভয়-লিঙ্গ-বাচক একটীমাত্র শব্দ-দ্বারা কার্য চলে, বাক্যের অর্থ ধরিয়া লিঙ্গ-নির্ণয় করিতে হয়; যথা—« গোরুতে গাড়ী টানে (এখানে গোরু=বৃষ), গোরু দুধ দেয় (গোরু=গাভী) »; তদ্রূপ « মহিষ » শব্দ—« মহিষে গাড়ী টানে, মহিষে দুধ দেয় »; « পয়সায় বাঘের দুধ মিলে; মধ্য-এশিয়ায় তুর্কীরা ঘোড়ার দুধ খায় » ইত্যাদি।

(৩) পুং-বাচক নামের অন্তে প্রত্যয়-যোগে স্ত্রী-বাচক নাম-গঠন

(ক) বাঙ্গালা প্রত্যয়

(১) « ঈ (ই) » (সংস্কৃত « ঈ »-প্রত্যয়ও আছে; নিম্নে দ্রষ্টব্য), তৎপত্নী বা তজ্জাতীয়া অর্থে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করে; যথা—

« মামা—মামী (মামী-মা) ; কাকা—কাকী (কাকী-মা) ; খুড়া—খুড়ী (খুড়ী-মা) ; জেঠা—জেঠী, জেঠাই (জেঠাই-মা, জেঠী-মা) ; বামুন—বামনী ; ঘোড়া—ঘুড়ী (<ঘোড়ী) »। স্ত্রীলিঙ্গার্থে « ঈ (ই) »-প্রত্যয় আজকাল বাঙ্গালায় অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। « পাগল, পাগলা —পাগলী ; পেটুক—পেটুকী ; মুসলমান—মুসলমানী : ভাগিনা—ভাগিনী, ভাগ্নী » ; বেঙ্গমা ('বিহঙ্গম'-শব্দ-জাত)—বেঙ্গমী ; মোরগ—মুরগী ; ভেড়া —ভেড়ী : ভালুক—ভালুকী »। « রূপসী, সজনী, ধনী »—এই তিনটী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংরূপ বাঙ্গালায় নাই।

(২) « ন্ », প্রসারে « নী, নি, আনী, ইনি, উনি, উন্ » ইত্যাদি। (« আনী, ইনী » সংস্কৃতেও আছে)। « বেহাই—বেহাইন্, বেয়ান ; নাতী—নাতিন, নাতিনী, নাতনী ; কামার—কামারনী ; কুমার—কুমারনী ; কায়েত—কায়েতনী ; গোয়ালা (গয়লা)—গোয়ালিনী (গয়লানী) ; ভিখারী —ভিখারিনী ; নাপিত—নাপিতানী, নাপ্তিনী ; ওস্তাদ—ওস্তাদ্নী ; ডোম —ডোমনী : পণ্ডিত—(কাশ্মীরী) পণ্ডিতানী (পণ্ডিতা) » ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে দুইপ্রস্থ স্ত্রী-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে : যথা—« সতীন্ ('সপত্নী' হইতে 'সৎ' বা 'সতা' শব্দ, যেমন 'সৎ-মা' ; 'সৎ+ঈনী, ঈন = সতীনী, সতীন') ; ননদ (মূল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—তাহাতে স্ত্রী-প্রত্যয় 'ইনী' যোগ করিয়া কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ 'ননদিনী') » ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত প্রত্যয়

(১) « আ » (ফারসী আ-প্রত্যয়ও আছে) ; যথা—« বৈবাহিকা ; দ্বিজা ; আর্যা ; কৃশা ; স্থূলা ; প্রাচীনা ; মহাশয়া ; সদাশয়া ; মাতুলা ; বলাকা ; প্রবীণা ; নবীনা ; সরলা ; কোকিলা ; অশ্বা (অশ্বী) ; চটকা ; ক্রৌঞ্চা ; কুটিলা ; নিবেদিতা ; মৃতা ; জীবিতা ; পণ্ডিতা ; মূর্খা ; সেবকা » ইত্যাদি।

(২) « আনী »; পত্নী অর্থে—« ভবানী (ভব); ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মা); ইন্দ্রাণী, মহেন্দ্রাণী; বরুণানী ('বারুণী'—বরুণের স্ত্রী অর্থে—উপরন্তু পাওয়া যায়); মাতুলানী (মাতুলা, মাতুলী); উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (পত্ন্যর্থে; স্ত্রীজাতীয় উপাধ্যায়-অর্থে 'উপাধ্যায়া' বা 'উপাধ্যায়ী'); শূদ্রাণী (বা শূদ্রী); ক্ষত্রিয়াণী (বা ক্ষত্রিয়ী); বৈশ্যানী (পত্ন্যর্থে; তত্তৎজাতীয়া স্ত্রী-অর্থে—'শূদ্রা, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা'); আচার্য্যানী (স্ত্রী-আচার্য =আচার্য্যা) »। « হিমানী, অরণ্যানী, বনানী »—এখানে ধরা যায়; এগুলি কিন্তু 'নিপাতনে সিদ্ধ' (অর্থাৎ রীতি-বহির্ভূত)।

(৩) « ইকা »; « অক »-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে « ইকা » হয়; যথা—« লেখিকা, পাচিকা, প্রচারিকা, সংস্কারিকা, বালিকা, বাহিকা, চালিকা, ভক্ষিকা, প্রেরিকা »। নব-সৃষ্ট শব্দ—« ব্রাহ্ম— ব্রাহ্মিকা »। কিন্তু « রজক—রজকী (রজকিনী), নর্তক—নর্তকী »। সেবকের স্ত্রী অর্থে বাঙ্গালায় 'সেবিকা' চলে। ক্ষুদ্র অর্থে « ইকা » -প্রত্যয় হয়—« পুস্তক—পুস্তিকা; মালা—মালিকা; চয়ন—চয়নিকা » ইত্যাদি।

(৪) « ঈ »; « কুমারী, কিশোরী, পুত্রী, নর্তকী, সুন্দরী, নটী, ব্রাহ্মণী, দৌহিত্রী, ভাগিনেয়ী, গোপী, পিতামহী, পাত্রী, ময়ূরী, উষ্ট্রী, হংসী, অশ্বী (অশ্বা), মৎসী, ভুজঙ্গী (ভুজঙ্গিনী), কুরঙ্গী, ব্যাঘ্রী, গর্দভী, কুক্কুরী, বিড়ালী, শূকরী, সারমেয়ী, হরিণী, শার্দূলী, ঘোটকী, ভল্লুকী, মৃগী, সিংহী, বিহঙ্গী, কপোতী, হেমাঙ্গী, তন্বী (তনু), কিঙ্করী, পিশাচী, গুর্বী (গুরু), লঘ্বী (লঘু), বৈষ্ণবী, দেবী, মানবী, ঈশ্বরী, শঙ্করী, নারায়ণী » ইত্যাদি। « নর—নারী » —এখানে « ঈ » প্রত্যয়ের সাধন, রীতি-বহির্ভূত। « নদ—নদী »—এখানে স্থূলার্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার। অন্য « ঈ »-প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; যথা—« অনুচরী; অর্থকরী বিদ্যা, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শুভঙ্করী, কিঙ্করী; সহচরী; মাদৃশী, ঈদৃশী, সদৃশী,

দ্বাদশী; স্বর্ণময়ী, মৃন্ময়ী, জলময়ী; চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী, ষোড়শী, সপ্তদশী, অষ্টাদশী »;—« চতুর্দশী » পর্যন্ত এই ক্রম-বাচক শব্দগুলি, ক্রম জানাইতে ও তিথি জানাইতে প্রযুক্ত হয়; কিন্তু « প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া »—এইগুলির বেলায় « আ »-প্রত্যয় হয়; এবং এই শব্দগুলির মধ্যে « ষোড়শী » ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ, তত্তদ্‌বর্ষ-বয়স্কা কন্যা-অর্থে বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্তব্য: জাতি- বা শ্রেণী-বাচক অকারান্ত সংস্কৃত শব্দে (মানব ও ইতর-প্রাণী, উভয়-দ্যোতক) « ঈ » -প্রত্যয় সাধারণ নিয়ম (« মানব—মানবী, হংস—হংসী » ইত্যাদি); কিন্তু ক্বচিৎ « আ » -প্রত্যয়ও হয়; যথা: « শূদ্র—শূদ্রা, কোকিল—কোকিলা, অশ্ব—অশ্বা, অজ—অজা »। কতকগুলি « ক »- বা « অক »-প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-রূপে « ইকা »-প্রত্যয়ের পরিবর্তে « কী » বা « অকী » হয়: যথা—« রজক—রজকী, নর্তক—নর্তকী, খনক—খনকী »।

(৪ক) « ইনী »: « ইন্ »-প্রত্যয়ান্ত (পৃষ্ঠা ১৭৫, ১৭৬ দ্রষ্টব্য) নামের উত্তর স্ত্রী-লিঙ্গে « ইনী » (ইন্+ঈ) হয়; অতএব এই প্রত্যয় « ঈ »-প্রত্যয়েরই অন্তর্গত। « পক্ষিণী, হস্তিনী, করিণী, বিদেশিনী, তরঙ্গিণী, বিনোদিনী, কামিনী, ধারিণী, গামিনী, দুঃখিনী (অর্ধতৎসম 'দুখিনী'), ধনশালিনী, মালিনী (অর্থ—'যে স্ত্রীলোকের মালা আছে'; 'মালী' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যে 'মালিনী' তাহা হইতেছে 'মালী+নী'); সন্ন্যাসিনী, নিবাসিনী, বিলাসিনী, আলাপিনী, কল্লোলিনী » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় বহুশঃ ন-কারযুক্ত এই প্রত্যয়, শুদ্ধ « ঈ » -প্রত্যয়ের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালায়, « ইনী »-প্রত্যয়ের প্রতি লোকের একটা আসক্তি পাওয়া যায়, তজ্জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে অসিদ্ধ বহু « ইনী » -যুক্ত স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ বাঙ্গালায় গঠিত হয়; যথা—« কুরঙ্গিণী, চাতকিনী,

হেমাঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, পাগলিনী, রঙ্গকিনী, ভুজঙ্গিনী, গোয়ালিনী, সাপিনী, বাঘিনী, সিংহিনী, বিহঙ্গিনী, কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী, শেতাঙ্গিনী, হংসিনী, গৃধিনী (< গৃধ্র) » ইত্যাদি। « অধীন » শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে « অধীনা », ক্বচিৎ ভ্রমক্রমে ইহা « অধীনী » বা « অধিনী » রূপেও লিখিত হয় (যেন « ইনী »-প্রত্যয়ান্ত রূপ)।

(৪খ) « বিন্‌+ঈ=বিনী » : « যশস্বিনী, তেজস্বিনী, পয়স্বিনী, মায়াবিনী, মেধাবিনী, ওজস্বিনী, স্রোতস্বিনী »।

(৪গ) « তৃ (প্রথমায় -তা) »-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের স্ত্রী-লিঙ্গে « তৃ= ত্র +ঈ=ত্রী » হয় ; যথা—« কর্তা=(কর্তৃ)—কর্ত্রী ; দাতা=(দাতৃ)—দাত্রী ; ধাত্রী, জগদ্ধাত্রী ; জনয়িত্রী : পাত্রী (< 'পাতা'=পালনকারী ; 'পাত্র' হইতেও « ঈ »-প্রত্যয় যোগে « পাত্রী ») : প্রসবিত্রী, গন্ত্রী »।

« তৃ »-প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর « ঈ (ত্রী) » হয় না : « মাতা (মাতৃ), স্বসা (স্বসৃ), ননন্দা (ননন্দৃ), যাতা (যাতৃ= 'জা'—স্বামীর ভ্রাতার স্ত্রী অর্থে) »।

(৪ঘ) শতৃ (অৎ বা অন্ত)-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর « অৎ+ঈ=অতী (ক্বচিৎ অন্তী) » প্রত্যয় হয় ; যথা—« সৎ—সতী ; বৃহৎ—বৃহতী ; মহান্‌, মহৎ—মহতী ; সুদন্ত—সুদতী (সুদন্তী, সুদন্তা) ; ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতী বা ভবিষ্যন্তী »।

(৪ঙ) « বৎ, মৎ, ঈয়স্‌ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে পুংলিঙ্গে « বান্‌, মান্‌, ঈয়ান্‌ » হয় ; স্ত্রী-লিঙ্গে « বতী, মতী, ঈয়সী » হয় ; যথা—« ধনবান্‌—ধনবতী ; রূপবান্‌—রূপবতী ; গুণবান্‌—গুণবতী ; শ্রীমান্‌—শ্রীমতী ; আয়ুষ্মান্‌—আয়ুষ্মতী ; সরস্বতী ; বিদ্যাবান্‌—বিদ্যাবতী (কিন্তু বিদ্বান্‌ < বিদ্বস্‌—বিদুষী) ; বিলাসবতী ; ভগবান্‌—ভগবতী ; গরীয়ান্‌—গরীয়সী ; মহীয়ান্‌—মহীয়সী ; প্রেয়ান্‌ (প্রেয়ঃ)—প্রেয়সী ; শ্রেয়ান্‌ (শ্রেয়ঃ)—শ্রেয়সী ; ভূয়ান্‌ (ভূয়ঃ)—ভূয়সী »।

(৪চ) « রাজন্ (রাজা)+ঈ=রাজ্ঞী ; খ্যাতনামন্ (খ্যাতনামা) +ঈ=খ্যাতনাম্নী ; নর+ঈ=নারী »।

(৫) কতকগুলি শব্দের বিকল্পে « আ » বা « ঈ » হয় : « বিশাল—বিশালা, বিশালী ; চণ্ড—চণ্ডা, চণ্ডী ; কৃপণ—কৃপণা, কৃপণী ; কামুক—কামুকা, কামুকী ; ভাবুক—ভাবুকা, ভাবুকী »।

(৬) বহুব্রীহি-সমাসের পরবর্তী, অঙ্গ-বাচক শব্দে বিকল্পে « ঈ » বা « আ » হয় ; যথা—« সুকেশা, সুকেশী ; চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী ; সুমুখা, সুমুখী ; কৃশোদরা, কৃশোদরী ; সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী ; তাম্রনখা, তাম্রনখী ; সুদন্তা, সুদন্তী, সুদতী » (বাঙ্গালায় « ঈ »-কারান্ত রূপই অধিক প্রচলিত)।

কিন্তু « নেত্র » ও « ভুজ » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ, এবং « নাসিকা » ও « উদর » ভিন্ন দুইয়ের-অধিক-স্বর-বিশিষ্ট অঙ্গ-বাচক শব্দের উত্তর « ঈ » হয় না ; যথা—« দশভুজা, ত্রিনেত্রা, দ্বিভুজা, শশিবদনা, মৃগনয়না » (কিন্তু « শশিবদনী, মৃগনয়নী » বাঙ্গালা কবিতায় ব্যবহৃত হয়)।

(গ) **স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গ** : কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের আধারের উপর প্রস্তুত হইয়াছে ; যথা—« নন্দাই (=ননন্দৃপতি), বোনাই (=ভগিনীপতি), পিসা (=পিউসা < পিউসী বা পিসী), মেসো (=মাস্বয়া, মাউসা < মাসী বা মাউসী) ; (তদ্রূপ মুসলমান সমাজে) খালু (=মেসো,< খালা) ; ফুফা (=পিসা,< ফুফু) »।

(ঘ) **দুই-একটী শব্দ নিত্য পুং, বা নিত্য স্ত্রী** : « বিপত্নীক, সভাপতি (সংস্কৃতে পুং ও স্ত্রী, বাঙ্গালায় কেবল পুং), অঙ্গনা »।

(ঙ) **বিদেশী স্ত্রী প্রত্যয়**—(১) তুর্কী « অম্ » : « বেগ্—বেগম্ ; খান—খানম্, খানুম্ » ; (২) আরবী ও ফারসী « অহ্=আ » : « সুলতান—সুলতানা ; মাহমূদ—মাহমূদা » ; তদ্রূপ, মুসলমান মেয়েদের নামে—« হালিমা, জরীনা, ফাতিমা, সাকিনা, লায়্লা » প্রভৃতি।

[৩.০৬৩] বচন

যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাহাকে **বচন (Number)** বলে। বচন-দ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের দ্বারা কোনও বস্তুর একত্ব বা বহুত্ব বুঝা যায়। যে বচন-দ্বারা কেবল একটী বস্তুকে বুঝায়, তাহাকে **এক-বচন** বলে; যেমন—« মানুষ, গাছ, পাখী, ধ্বনি, ধর্ম »। যে বচন-দ্বারা একাধিক পদার্থকে বুঝায়, তাহাকে **বহু-বচন** বলে; যেমন—« মানুষেরা, গাছগুলি, পাখীসব, ধ্বনিসমূহ, ধর্মসকল »। বাঙ্গালা-ভাষায় একবচন ও বহুবচন-মাত্র স্বীকৃত হয়। কেবল, বহুবচনের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট প্রত্যয় এবং সংযোজিত শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

কোনও-কোনও ভাষায় একবচন ও বহুবচন ব্যতীত একটী দ্বিবচনও স্বীকৃত হয়; যেমন—সংস্কৃতে, প্রাচীন গ্রীকে, প্রাচীন আরবীতে ও সাঁওতালীতে: সংস্কৃতে « অশ্বঃ (=একটী ঘোড়া), অশ্বৌ (=দুইটী ঘোড়া)—অশ্বাঃ (=ঘোড়াসকল) »; গ্রীকে « hippos হিপ্পস্—hippō হিপ্পো—hippoi হিপ্পই »; আরবীতে « ফরসুন্—ফরসানি—অফ্‌রাসুন্ »; সাঁওতালীতে « সাদম্—সাদম্‌কিন্—সাদম্‌কো »। কিন্তু সাধারণতঃ আধুনিক ভাষাগুলিতে দুইটী বচনই স্বীকৃত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় একবচনের জন্য বিশেষ কোনও প্রত্যয় নাই—নাম বা শব্দ স্বয়ংই একবচনে ব্যবহৃত হয়। বহুবচনের জন্য শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় যুক্ত হয়, এবং সমষ্টি-বাচক কতকগুলি শব্দও সংযোজিত হয়। প্রত্যয়: « রা, এরা, দিগ, দিগের, দের, গুলি, গুলা »; সমষ্টি-বাচক শব্দ: « গণ; কুল; বৃন্দ; জন; আদি, আদিক; লোক; সকল; সব; সভা; বর্গ; রাশি; সমূহ; সমুচ্চয়; নিচয়; মালা; আবলী » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কখনও-কখনও বহুবচনের জন্য কোনও প্রত্যয় অথবা সমষ্টি-বাচক শব্দ যুক্ত হয় না, একবচনের রূপের দ্বারাই বহুবচন দ্যোতিত

হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে, বাক্যের অর্থ ধরিয়া একবচন অথবা বহুবচন বুঝিতে হয়। শব্দের পূর্বে বহুত্ব-জ্ঞাপক বা সংখ্যা-বাচক বিশেষণ বসিলে, বহুবচনের চিহ্ন যুক্ত হয় না ; যথা—« পাঁচজন মানুষ ('পাঁচজন মানুষেরা' নহে), দুইটী ঘোড়া, তিনটী মনোবৃত্তি » ইত্যাদি। কখনও-কখনও সংখ্যা- বা সমষ্টি-বাচক শব্দ, নাম-শব্দের পরে বসে—তাহাতে নামটী বিশেষিত হয় ; যথা—« মানুষ পাঁচজন, মেয়ে তিনটী (= বিশেষ পাঁচ-জন মানুষ, বিশেষ তিনটী মেয়ে) »। ভৌতিক-পদার্থ-বাচক ও অন্যান্য নাম-শব্দের উত্তর বচন-চিহ্ন বহু স্থলে অপ্রযুক্ত থাকে ; যথা—« হাওয়া ; রূপা ; সোনা ; জল » ; বহুবচনের চিহ্ন প্রয়োগ করিলে, এরূপ স্থলে পরিমাণের আধিক্যই বুঝাইয়া থাকে।

সর্বনাম-পদ নাম-শব্দের বিশেষণ-রূপে বসিলে, সমষ্টি-বাচক শব্দগুলি সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে ; যথা—« যে-সকল মানুষ ('যে মানুষ-সকল' নহে) ; সে-সব কথা ; যত-সব দুষ্ট ছেলের কাজ » ইত্যাদি।

বহুবচন-জ্ঞাপক প্রত্যয়ের প্রয়োগ

(১) « রা, এরা » : মুখ্যতঃ চলিত-ভাষার প্রয়োগ, সাধু-ভাষাতেও ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু সাধু-ভাষায় « গণ, সমূহ, বর্গ, বৃন্দ » প্রভৃতি সংস্কৃত সমষ্টি-বাচক শব্দই বেশী প্রযুক্ত হয়। « রা, এরা » : সর্বনাম, এবং দেবতা ও মানবের নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, এবং ক্বচিৎ (বক্তার সহানুভূতি-জ্ঞাপনার্থ) ইতর-প্রাণি-বাচক নামেও যুক্ত হয় ; যেমন—« আমরা, তোমরা, এরা, তাহারা ; দেবতারা, গন্ধর্বেরা, মুনিরা, ব্রাহ্মণেরা, শিশুরা, ফেরেস্তারা, ইউরোপীয়েরা, পণ্ডিতেরা » ইত্যাদি ; তদ্রূপ « পাখীরা, পশুরা »। অপ্রাণি-বাচক শব্দে « রা »-প্রত্যয় হয় না ; « গাছেরা, পাতারা » অপপ্রয়োগ-জাত। তবে অপ্রাণি-বাচক বস্তুতে প্রাণ বা চেতনা-শক্তি কল্পনা করিয়া, « রা »-প্রত্যয় চলিতে পারে :

« আকাশের তারারা অতন্দ্র নয়নে চাহিয়া আছে »। অনেক সময়ে « রা, এরা » -প্রত্যয়ের সহিত « সব » এই শব্দটীও ব্যবহৃত হয় ; যথা— « পণ্ডিতেরা সব, তাহারা সব, পশুরা সব »।

শব্দটী উচ্চারণে ব্যঞ্জনান্ত হইলে, « এরা » প্রযুক্ত হয় ; স্বরান্ত হইলে, « রা » যুক্ত হয়। কিন্তু « অ »-কারান্ত পদে বিকল্পে « এরা » যুক্ত হয় ; এবং কচিৎ ব্যঞ্জনান্ত শব্দে « এরা » না হইয়া « রা » দেখা যায়, কিন্তু তাহা বিরল ; যথা—« রাখাল, রাখালেরা ; পণ্ডিত—পণ্ডিতেরা ; রাজা—রাজারা ; মুনিরা ; সুধীরা ; সাধুরা ; বধূরা ; গোরারা ; মন্দরা মন্দেরা ; মর্দরা, মর্দেরা ; অন্ধরা, অন্ধেরা ; (কিন্তু « ভালরা, কালরা »— উচ্চারণ [ভালো, কালো]—« ভালেরা কালেরা » হইবে না) ; গাড়োয়ানরা, গাড়োয়ানেরা ; মুসলমানরা, মুসলমানেরা »। লক্ষণীয়—« মা—মায়েরা » (« মারা » ঠিক নহে—প্রাচীন বাঙ্গালায় 'মা'-শব্দের পূর্ণ রূপ ছিল « মাঅ » বা « মায় », তাহা হইতে « মায়েরা ») ; « সেপাই—সেপাইরা, বা সেপাইয়েরা (অর্থাৎ সেপায়+এরা) »।

« রা, এরা » কেবল কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয়। কর্তা ব্যতীত অন্য কারকে—

(২) « দিগ, দিগের, দিগে, দিকে, দে, এদের, দের »—এই প্রত্যয়-গুলি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যেখানে কর্তায় « রা, এরা » আইসে, সেখানে অন্য কারকে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। এগুলি সংস্কৃত « আদি, আদিক » শব্দ ও তাহার ষষ্ঠী ও অন্য বিভক্তির রূপ « আদির, আদিকের, আদিয়ে, আদিকে » হইতে উৎপন্ন ; যথা—« বালকদিগ-কে, শিক্ষকদিগের, তোমাদিকে, ভদ্রলোকেদের বা ভদ্রলোকদের, ব্রাহ্মণদের » ইত্যাদি।

(৩) « গুলা, গুলি »—এই প্রত্যয়টী সংস্কৃত সমষ্টি-বাচক « কুল »-শব্দ হইতে জাত, কিন্তু ইহার রূপ-পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালায় « গুলা, গুলি »-র উৎপত্তি ও অর্থ সাধারণ্যে অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহা কেবল বহুবচন-দ্যোতক প্রত্যয়-রূপেই ব্যবহৃত হয়। প্রাণি-বাচক ও অপ্রাণি-বাচক, উভয় প্রকার নামের সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়।

অনাদরে—« গুলা » (চলিত ভাষায় « গুলা » -র পরিবর্তন « গুলো »—স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে), আদরে « গুলি »; যথা—গোরুগুলি, শূয়ারগুলা, বদমাইশগুলা, ফুলগুলি, লক্ষ্মী মেয়েগুলি, পাজী ছেলেগুলা, পাহাড়গুলি, ঝরনাগুলি » ইত্যাদি। « গুলান, গুলিন, গুলাক »—এই রূপগুলি সাধুভাষাতে এখন অপ্রচলিত, তবে প্রাদেশিক ভাষায় এগুলি ব্যবহৃত হয়। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নামবাচক শব্দে « গুলা » বা « গুলি » প্রযুক্ত হয় না; যথা—« দেবতাগণ, ঋষিগণ, শিক্ষকগণ »—« গুলা » বা « গুলি » নহে।

« গুলা, গুলি », কর্তা ও অন্য সমস্ত কারকেই ব্যবহৃত হয়।

বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দাবলী

বাঙ্গালায় নামের সহিত যুক্ত বহুবচন-দ্যোতক শব্দাবলী সাধারণতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত, এবং এগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সহিতই প্রযুক্ত হয়, প্রাকৃতজ শব্দের সহিত হয় না; যেমন—« বালকবৃন্দ » (কিন্তু « ছেলেবৃন্দ » নহে—« ছেলেরা » বা « ছেলেগুলি »); « আম্রসমূহ » (কিন্তু « আমগুলা, আমগুলি »)। কিন্তু বিদেশীয় শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয়; যথা—« নবাবগণ, ইউরোপীয়গণ, মুরীদ-সমূহ »; « মুসলমানগণ », কিন্তু « গোরাগণ » নহে (গোরা—'গৌর' হইতে, প্রাকৃতজ শব্দ)।

মূল শব্দে সমষ্টি-বাচক শব্দ মিলিত হইয়া, সংস্কৃতের অনুযায়ী একটী সমস্ত-পদ সৃষ্টি করে। তদনন্তর এই প্রকার সমস্ত-পদে, বাঙ্গালা বিভক্তি, প্রত্যয়াদি যোজিত হয়। এই জন্যই সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দের সংযোগ প্রশস্ত; অসংস্কৃত শব্দের মধ্যে, বিদেশী শব্দের দীর্ঘত্ব, ও শ্রুতিতে সংস্কৃত ভাব থাকিলে, তদ্রূপ বিদেশীয় শব্দেও চলিতে পারে।

« গণ, সকল, সমূহ, নিচয়, বৃন্দ » প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলি

সাধারণ-ভাবে সমস্ত প্রকার বিশেষ্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে, আবার কতকগুলি কেবল বিশেষ-বিশেষ অর্থের বিশেষ্য-পদের সহিতই যুক্ত হয়। এগুলির কোন্‌টী কি প্রকারের মূল-শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইবে, তাহা অনেকটা সংস্কৃতের রীতি-অনুসারেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন—« নক্ষত্রমালা » (কিন্তু « অধ্যাপক-মালা » নহে : অপর, « নক্ষত্র-সমূহ, অধ্যাপক-সমূহ »)। নিম্নে এইরূপ বহুবচন-দ্যোতক পদ-সম্বন্ধে সাধারণ রীতি নির্দিষ্ট হইতেছে।

(১) « আবলী »—অপ্রাণি-বাচক : « চরিতাবলী, রত্নাবলী, নামাবলী, নক্ষত্রাবলী »; ক্বচিৎ প্রাণি-বাচক—« পক্ষাবলী »।

(২) « কুল »—প্রাণি-বাচক।

(৩) « গণ »—প্রাণি-বাচক, বিশেষতঃ মনুষ্য ও দেবতা-বাচক।

(৪) « গ্রাম »—অপ্রাণি-বাচক ও প্রাণি-বাচক।

(৫) « চয় »—অপ্রাণি-বাচক।

(৬) « জন »—প্রাণি-বাচক : « বিদ্বজ্জন, পণ্ডিতজন »।

(৭) « দাম »—অপ্রাণি-বাচক : « লতাদাম, বিদ্যুদ্দাম »।

(৮) « নিকর »—অপ্রাণি-বাচক।

(৯) « নিচয় »—অপ্রাণি-বাচক।

(১০) « মণ্ডল »—অপ্রাণি-বাচক : « মেঘ-মণ্ডল »। « মণ্ডলী »—প্রাণি-বাচক : « ভদ্র-মণ্ডলী »।

(১১) « মালা »—অপ্রাণি-বাচক।

(১২) « রাজি »—অপ্রাণি-বাচক : « বৃক্ষরাজি, রত্নরাজি »।

(১৩) « লোক »—প্রাণি-বাচক ; বাঙ্গালায় বিশেষ ব্যবহৃত হয় না : « পণ্ডিতলোক »।

(১৪) « বর্গ »—প্রাণি-বাচক : « নেতৃবর্গ, রাজন্যবর্গ »।

(১৫) « বৃন্দ »—প্রাণি-বাচক : « সভ্যবৃন্দ »।

(১৬) « সকল »—সাধারণ।

(১৭) « সব »—সাধারণ।

(১৮) « সভা »—প্রাণি-বাচক : « পণ্ডিতসভা, যুবতীসভা »।

(১৯) « সমূচয় »—সাধারণ।

(২০) « সমূহ »—সাধারণ।

(২১) « মহল » (আরবী শব্দ)—প্রাণি-বাচক : « রাজনৈতিক-মহলে, বন্ধু-মহলে » (সাধারণতঃ সপ্তমীতে প্রযুক্ত = « -দিগের মধ্যে », এই অর্থে)।

সমাস-বদ্ধ হইয়া সমস্ত-পদের আদিতে বসিলে, সংস্কৃতে শব্দ বহুস্থলে যে রূপ (প্রাতিপদিক রূপ) গ্রহণ করে, তাহা সেই শব্দের প্রথমা বিভক্তি বা কর্তৃকারকের একবচনের রূপ হইতে কখনও-কখনও একটু ভিন্ন হইয়া থাকে : যেমন « ইন্ »-প্রত্যয়ান্ত « গুণিন্ » শব্দ : সংস্কৃতে ইহার কর্তৃকারকের (প্রথমা বিভক্তির) একবচনের রূপ হইতেছে « গুণী » : কিন্তু সমাসে « গুণী » হইবে না, « গুণি- » হইবে « গুণিগণ » (« গুণীগণ » নহে) ; তদ্রূপ « গুণিসমূহ »। বাঙ্গালায় কিন্তু কর্তৃ-কারকের একবচনে দীর্ঘ-ঈকারান্ত রূপ « গুণী »-ই সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে, সংস্কৃতের প্রাতিপদিক রূপ « গুণি- » অজ্ঞাত। সংস্কৃতের ব্যাকরণ-অনুসারে « গুণিগণ » সিদ্ধ, « গুণীগণ » অসিদ্ধ ও ভুল। তদ্রূপ সংস্কৃত « পিতৃ » শব্দের কর্তৃকারকে একবচনের রূপ « পিতা » বাঙ্গালায় গৃহীত, সংস্কৃত সমাগত প্রাতিপদিক রূপ « পিতৃ » বাঙ্গালায় অপ্রচলিত ; কিন্তু সংস্কৃত-নিয়মানুসারে « পিতৃগণ » লিখিতে হইবে, « পিতাগণ » ভুল। বাঙ্গালায় « গুণি, পিতৃ » প্রভৃতি রূপের ব্যবহার না থাকায়, কেহ-কেহ বলেন যে বাঙ্গালায় প্রচলিত « গুণী, পিতা » প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে, « গণ » প্রভৃতি শব্দকে « গুলা, দিগ » প্রভৃতি বাঙ্গালা বহুবচন-দ্যোতক শব্দের সহিত সম-পর্যায়ের ধরিয়া লইয়া, ইহাদের জুড়িয়া

দিতে পারা যায়; যেমন—« ধনীরা, পিতারা, গুণীদিগের », তদ্রূপ খাঁটী বাঙ্গালা ব্যাকরণ ধরিয়া « গুণী-গণ, পিতা-গণ, ধনী-সমূহ, প্রাণী-বর্গ »-ও চলিতে পারে।

দুই মতের পক্ষে যৌক্তিকতা আছে; তবে এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিলেই ভাল হয়, কারণ এই প্রকার সমাস-দ্বারা বহুবচন প্রকাশ করা, চলিত বা মৌখিক ভাষার অনুমোদিত নহে, সাধু-ভাষাতেই ইহা সমধিক প্রযুক্ত হইয়া থাকে;—এবং ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতেরই অধিক অনুগামী। তবে ইহাও স্বীকার্য যে, « নেতা-গণ, গুণী-গণ, বুদ্ধিমান্-গণ » ইত্যাদি লিখিলে বা বলিলে, খাঁটী বা প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, ভুল বলিয়া নাও ধরা যাইতে পারে; পদ-দ্বয়ের মধ্যে একটী সংযোজক চিহ্ন দিয়া রাখিলে চলিতে পারে।

নিম্নে কতকগুলি শব্দের মূল রূপ, প্রথমার রূপ ও সমাস-গত প্রাতিপদিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

মূল শব্দ	প্রথমার একবচন	সমাস-গত রূপ
(১) -অন্	-আ (পুং), অ (ক্লী),	অ
রাজন্, যুবন্, কর্মন্	রাজা, যুবা, কর্ম	রাজগণ, যুবগণ, কর্মসমূহ
(২) -অন্তু, -বন্তু	আন্ (পুং), অৎ (ক্লী), অন্তী, অতী (স্ত্রী)	-অৎ, -অদ্, -অন্
শ্রীমন্তু	শ্রীমান্, শ্রীমতী, শ্রীমৎ	শ্রীমন্নরপতি-সকাশে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, শ্রীমৎসজ্জন প্রতিপালক
(৩) -ইন্	-ঈ (পুং), -ইনী (স্ত্রী), -ই (ক্লী)	ই
গুণিন্	গুণী, গুণিনী	গুণিগণ
(৪) -বিন্	-বী, -বিনী	বি
তপস্বিন্	তপস্বী, তপস্বিনী	তপস্বিগণ

মূল শব্দ	প্রথমার একবচন	সমাস-গত রূপ
(৫) -অস্	-আঃ (বাঙ্গালায় আ)	অঃ, ও
অপ্সরস্	অপ্সরাঃ, অপ্সরা	অপ্সরোগণ
(৬) -বস্	-বান্, উষা	বৎ, বদ্, বন্
বিদ্বস্	বিদ্বান্, বিদুষী	বিদ্বৎকুল, বিদ্বদ্বর্গ, বিদ্বন্মণ্ডলী
(৭) -রাজ্	রাট্, রাজ্ঞী	রাট্, রাড্
সম্রাজ্	সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী	সম্রাট্সমূহ, সম্রাড্বর্গ ইত্যাদি।

বিদেশী বহুবচন-প্রত্যয়

আদালতে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষায়, ফারসী হইতে আগত « হায় » ও « আৎ » বিভক্তি বহুবচনে পাওয়া যায়; যথা—« আমলাহায়, প্রজাহায়; কাগজাৎ, বাগাৎ, দলিলাৎ »। « মেওয়া » (=ফল)—« মেওয়াজাৎ, মেওয়াজাত »; এতদনুরূপ « দ্রব্য—দ্রব্যজাত », যদিও « দ্রব্যজাত » শব্দ সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে। কচিৎ ফারসী « আন্ » বিভক্তিও মেলে: « সাহেবান্, বাবুয়ান্ »; তুলনীয়: ফারসী বহুবচন শব্দ—« বোজর্গ বা বুজুর্গ (মহৎ ব্যক্তি—একবচন)—বুজুর্গান্, বোজর্গান্ (বহুবচন) »। বহুবচনে ফারসী « দিগর »-ও পাওয়া যায়; যথা—গোপাল দত্ত দিগর (=গোপাল দত্তেরা, গোপাল দত্ত ও তাহার সহযোগীরা) জাহির করিতেছে যে » ইত্যাদি।

দ্বিরুক্তি-দ্বারা বহুবচন-প্রকাশ

শব্দকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া, বহুবচনের ভাব প্রকাশিত হয়:

(১) বিশেষ্য-শব্দ « বনে বনে (=নানা বনে); ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই; জিজ্ঞাসিব জনে জনে »। পৃথক্ সত্তার ভাব উহ্য থাকে।

(২) বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়া; যথা—« লাল লাল ফুল; বড় বড় গাছ; উঁচু উঁচু পাহাড় » ইত্যাদি। এইরূপ প্রয়োগ বহুবচন বুঝাইলেও, বহুবচনের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থটার পৃথক্ সত্তার ভাব স্পষ্ট দ্যোতিত হয়।

[৩.০৬৪] পদাশ্রিত-নির্দেশক
(Enclitic Definitives ; Articles)

কোনও বিশেষ্য-দ্বারা দ্যোতিত পদার্থের রূপ বা প্রকৃতি, অথবা তৎ-সম্বন্ধে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করিবার একটী বিশেষ উপায় বাঙ্গালা ভাষায় আছে। « টা, টী, টুকু, টুক্, খানা, খানী (খানি), জন » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ আছে, যেগুলি বিশেষ্যের সহিত (অথবা বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যা-বাচক বিশেষণের সহিত) সংযুক্ত হইয়া যায়, এবং পদার্থ বা বস্তুর গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করে। এইরূপ শব্দ বা শব্দাংশকে **পদাশ্রিত-নির্দেশক** বলা যাইতে পারে। বিশেষ্য-শব্দ অথবা সংখ্যা-বাচক বিশেষণের সহিত যুক্ত হইয়া গেলে, বিভক্তি-সূচক প্রত্যয়, সমগ্র সংযুক্ত পদটীর পরে আসিয়া বসে ; যথা—« বাড়ী-খানা-র, মানুষ-টী-কে, মানুষ-গু-টী-র-জন্য, হাঁড়ী-টা-থেকে » ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এই প্রকার নির্দেশক, সংখ্যা- বা পরিমাণ-বাচক বিশেষণ-দ্বারা যুক্ত হয়, এবং সমগ্র পদটী বিশেষণ-পদ-রূপে বিশেষ্যটীর পূর্বে বসে, সেখানে নির্দেশক শব্দে বা শব্দাংশে বিভক্তি যুক্ত হয় না, বিভক্তি-যোগ পরবর্তী বিশেষ্যেই হইয়া থাকে ; যথা—« এতটা দুধের দাম এক আনা ? একজন মানুষকে ডাকিয়া আন ; পাঁচজন যাত্রীর ভাড়া » ইত্যাদি।

বিশেষ্যের পরে কেবল এক-বচনে এই সকল নির্দেশক প্রযুক্ত হয় ; এবং তখন বিশেষ করিয়া উক্ত বিশেষ্যের গুণ বা রূপ ব্যতীত তাহার অবস্থানকে নির্দেশ করে ; যথা—« লোকটা, বা লোকটী ; বই-খানা, বই-খানি ; লাঠি-গাছ, লাঠি-গাছা »—এখানে « লোক, বই, লাঠি »—এই তিনটী বিশেষ্যের পরে « টা, টী ; খানা, খানি ; গাছ, গাছা » বসিয়া, ইহাদের আকার- বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে বক্তার ধারণার নির্দেশ করিয়া দিতেছে ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, উক্ত

« লোক, বই, লাঠি », যে-কোনও লোক, বই বা লাঠি নহে,—তাহাদের বিশেষ করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই যেন কিছু বলা হইয়াছে, অথবা শ্রোতা যেন তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানে।

সংখ্যা-বাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে, বিশেষ্যের পরে এই সংখ্যা-বাচক শব্দ বসিলেই এইরূপ সুনির্দিষ্ট-ভাব প্রকটিত হয়; যথা—« তিন-খানা বই = যে কোনও অনির্দিষ্ট তিন খানা বই », কিন্তু « বই তিন-খানা = সুনির্দিষ্ট বা সুপরিজ্ঞাত তিন-খানা বই »; তদ্রূপ « তিনটী ছেলে, ছেলে তিনটী; পাঁচজন প্রজা (অনির্দিষ্ট), প্রজা পাঁচজন (নির্দিষ্ট) »। একবচনে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য « এক » শব্দের প্রয়োগ হয় না, সংখ্যা-বাচক শব্দ যোগ না করিয়াই একবচনে সুস্পষ্টতা আসিয়া যায়: যথা—« লোকটা (সুনির্দিষ্ট), একটা লোক বা লোক একটা (অনির্দিষ্ট) »।

অনির্দিষ্ট ভাব জানাইবার আর একটী উপায় আছে—সংখ্যা-বাচক বিশেষণের পূর্বে কতকগুলি নির্দেশক-শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা (কেবল « টা, টী, খানা, খানি, গাছা, গাছি » শব্দাংশ সংখ্যা-বাচক শব্দের পূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয় না); যথা—« জন-দুই মানুষ, খান-চার কাপড়, গাছ-কতক লাঠি » (কিন্তু « টা-দুই মানুষ, খানা-চার কাপড়, গাছা-কতক লাঠি »—এরূপ প্রয়োগ হয় না; « আ » বা « ই (ঈ) » -কারান্ত শব্দাংশ কতকটা সুনির্দিষ্টতার ইঙ্গিত করে)। এরূপ ক্ষেত্রে, অনির্দেশ-ভাবকে আরও ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য, সংখ্যা-বাচক শব্দে অনিশ্চয়-বোধক প্রত্যয় « এক » যুক্ত করা যাইতে পারে; যথা—« জন-দুইয়েক মানুষ, খান-চারেক কাপড়, গাছ-পাঁচেক লাঠি, খান-আষ্টেক রুটী » ইত্যাদি।

পরিমান-বাচক বিশেষণের সঙ্গেও ঐরূপ নির্দেশক প্রযুক্ত হয়; যথা—« এতটা জল, এতখানি বেলা, এইটুকু দুধ, দুধটুকু » ইত্যাদি।

« টা, টী, টুকু, খানা » প্রভৃতির দ্বারা বক্ষ্যমাণ বস্তুর আকার-বা

প্রকৃতি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত থাকে। «টী, খানি, গাছি»—এই প্রকার ই-কারান্ত রূপের দ্বারা বস্তুর হ্রস্ব-ভাব বা ইহার প্রতি বক্তার আদর জ্ঞাপন করা হয়।

«-টা»-র উৎপত্তি সংস্কৃত «বৃত্ত-» হইতে (বৃত্ত- > বট্ট- > অট্ট- > টা, টী); «খানা» আসিয়াছে «খণ্ড» শব্দ হইতে।

«টা, টী»—যেখানে বস্তুটী পূর্ণ বা অখণ্ড রূপে কল্পিত হয়, ও তাহার সমগ্র গুণাবলী প্রকৃতিতে যুক্ত বলিয়া ধরা হয়, সেখানেই «টা» (হ্রস্বার্থে ও আদরে «টী») প্রযুক্ত হয়। অপ্রাণি-বাচক শব্দের উত্তর সাধারণতঃ «টা, টী» এই নির্দেশক প্রযুক্ত হয় বলিয়া, মানব ও উচ্চশ্রেণীর প্রাণি-বাচক শব্দে «টা» যোগ করিলে অনাদর প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে «টী» যোগ করিলে কিঞ্চিৎ স্নেহভাব বা অনুকম্পা অথবা আদরের দ্যোতনা আইসে; যথা—«লোকটা অতি পাজি; মানুষটী বেশ ভাল; দুটো (চলিত বাঙ্গালায় 'দুটো') ভাতের জন্য ছুটাছুটী; দুটী ভাত দাও; 'ওদের বাড়ীর ছেলেটা খায় এতটা, নাচে যেন বুড়ো ভালুকটা—আর আমাদের বাড়ীর ছেলেটী খায় এতটী, আর নাচে যেন ঠাকুরটী' » ইত্যাদি।

«খান, খানা» (হ্রস্বার্থে, আদরে বা অনুকম্পায় «খানি»)—সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। সজীব পদার্থের নামের সহিত প্রায় যুক্ত হয় না; «খান, খানা, খানি» শব্দ «খণ্ড» শব্দ হইতে জাত। যে বস্তু বিখণ্ডিত-রূপে কল্পিত হইতে পারে, এবং যাহার খণ্ড-বিশেষের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না, এরূপ স্থলে «খান, খানা, খানি» শব্দের প্রয়োগ হয়। বৃত্তাকার বস্তুর নামের সঙ্গে «খান, খানা, খানি» সাধারণতঃ বসে না; সমতল ও চতুরস্র বস্তুর নামের সঙ্গেই এই শব্দ যুক্ত হয়; যথা—«গোলা-খানা, বল-খানা, রসগোল্লা-খানা» নহে, কিন্তু «কাপড়-খানা» (ভাঁজ করা অবস্থায় কল্পনা করিয়া; ভাঁজ না করা অবস্থা কল্পনা করিয়া «কাপড়টা» বলা হয়, যেমন «কাপড়টা খোঁচ লাগিয়া ছিঁড়িয়া গেল»); «আমটা», কিন্তু «আমের চাকলা-খানা»; «মুণ্ডটা», কিন্তু «মুখখানি, মুখখানা» (বদনমণ্ডলের চিত্রলিখিতবৎ সমতল ভাবের কল্পনায়); তদ্রূপ «দেহখানা, শরীরখানা, হাতখানা, পাখানা»—আবার এই সব অঙ্গের বৃত্ত-ভাব কল্পনায়, «দেহটা, শরীরটা, হাতটা, পাটা»; «থালাখানা», কিন্তু «ঘটীটা, বাটীটা»; «গামলা-খানা» (এখানে গামলার পিতলের চাদরের বা মাটির পাত্রের অথবা তলদেশের সমতল ভাব ইঙ্গিত করা হইতেছে), «গামলাটা» (সমগ্র বৃত্তাকার গামলা) ইত্যাদি।

গুণ-বাচক বস্তুর নামের সঙ্গে কচিৎ «খানা, খানি»-র প্রয়োগ হইতে পারে; «ভাব-খানা ভাল নয়; টুটি' গেল সরম-খানি»। পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সহযোগেও «টা, টী, খানা, খানি» প্রযুক্ত হয়; «এতখানি বা এতটা বেলা, এতখানা কাণ্ড হইয়া গেল, এতখানি জমি ছাড়া হইবে না, অনেকখানি বা অনেকটা সোনা» ইত্যাদি।

প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাণি-বাচক বস্তুর নামের সঙ্গে আদরে «খানি» পদের প্রয়োগ পাওয়া যায়: «সোনার নাতিনীখানি»।

পরিমাণে, অল্পার্থে ও আদরে, «টু, টুক্, টুকু» প্রযুক্ত হয়: «এতটু জল, এতটুকু ছেলে»। ক্ষুদ্রতার আধিক্য বুঝাইতে গেলে, «টুকুন, টুকুনি» প্রযুক্ত হয়।

«গাছ, গাছা, গাছি»—ইহা বৃক্ষার্থক বাঙ্গালা «গাছ» শব্দের সঙ্গে অভিন্ন। এই নির্দেশকটী অখণ্ড, সরু, বা দীর্ঘ বস্তুর নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়; যথা—«লাঠি-গাছি, খড়-গাছ, আধ-গাছা»। «গাছ+টা, গাছ+টী» মিলিত ভাবেও কচিৎ ব্যবহৃত হয়; যথা—«লাঠি গাছটী»।

«গোটা», ক্ষুদ্রার্থে «গুটী», কচিৎ «গোট»—অখণ্ড এবং সাধারণতঃ বৃত্তাকার বস্তুর নামের সহিত ব্যবহৃত হইত; আধুনিক বাঙ্গালায় আর ততটা সাধারণ নহে। অনির্দিষ্ট ভাব জানাইতেই অধিক ব্যবহৃত হয়; যথা—«গোটা টাকাটা; গোটা পাঁচেক টাকা, পেয়ারা গোটা-আষ্টেক, গুটী-পাঁচেক ছোকরা» ইত্যাদি।

বর্ণিত বা প্রদর্শ্যমান বস্তু নির্দেশ করিবার জন্য, উপর্যুক্ত নির্দেশক শব্দ বা শব্দাংশগুলির বিশেষ্যবৎ প্রয়োগও আছে; যথা—«উপরের-টা বেশ দেখতে, নীচের-টা তত ভাল নয়; ও-খানা চাই না, হেথায় যে-খানা আছে সেই-খানা চাই; চৌকীর উপরের পাঁচখানা বইয়ের মধ্যে মাঝের খানার ভিতরে চিঠি-খানা আছে» ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলি বক্ষ্যমাণ বিশেষ্যের রূপ- বা প্রকৃতি-নির্দেশের জন্য, সংখ্যা-বাচক বিশেষণের সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা—

«জন»—মানব-বাচক নামের সহিত ব্যবহৃত হয়।

«খান»—বস্ত্র-বাচক-নির্দেশক: «কাপড় দুখান, দুখান গরদ, ধুব পাঁচখান» ইত্যাদি।

«তা»—কাগজ-নির্দেশক: «দুই তা কাগজ, বালীর কাগজ পাঁচ তা»।

«কেতা»—«পাঁচ কেতা নোট»।

«মূর্তি»—«পাঁচ মূর্তি বৈষ্ণব; তিন মূর্তি সাধু»।

তুলনীয়—ইংরেজী two *sail* of ship, ten *head* of cattle; ফারসী du rās 'asp « দু রাস্ অস্প্—'দুই রাস ঘোড়া=দুইটী ঘোড়া' » ইত্যাদি।

« টা, টী, খানা, খানি, গাছ, গাছি, গাছা »—এগুলির যেরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়, সেরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত, ইংরেজীতে অথবা শুদ্ধ-হিন্দুস্থানীতে অজ্ঞাত।

[৩.০৬৩] শব্দ-বিভক্তি ও বিভক্তিবৎ ব্যবহৃত পদ

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়া-পদের সহিত নাম-পদের বা বিশেষ্যের অন্বয় বা সম্বন্ধকে, সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতে, **কারক (Case)** বলে।

ইংরেজী Case [কেয়্স্] শব্দ, লাতীন Casus [কাসুস্] হইতে গৃহীত। Casus অর্থে 'পতন'; অর্থাৎ কর্তৃকারকে যেন বিশেষ্যের উন্নত অবস্থান; স্বয়ং কিংবা মাত্র বাক্যস্থিত ক্রিয়া-পদের সাহায্যে, একাই কর্তৃকারক পূর্ণ অর্থ দ্যোতন করিতে পারে। কিন্তু কর্তৃকারক ব্যতীত অন্য কারকে, বিশেষ্যের উপরে অন্য পদের প্রভাব পড়ে, বিশেষ্য তখন যেন আর স্থির দণ্ডায়মান থাকে না, ক্রিয়া-পদ বা সম্বন্ধ-বাচক পদের আঘাতে বা প্রভাবে যেন বিশেষ্যের 'পতন' ঘটে। এই অর্থ বা ব্যাখ্যা ধরিয়া, রাজা রামমোহন রায় Case-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ করিয়াছিলেন « পরিণমন »।

বাঙ্গালা ভাষায় নানা বিভক্তি দ্বারা, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ্য ও ক্রিয়া-পদের সহযোগে, কারক নির্দিষ্ট হয়; যেমন—« লোকে বলে »; এখানে, « বলা »-ক্রিয়ার সঙ্গে, « লোক »-শব্দের সম্বন্ধ, « -এ » -বিভক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে; « লোকে » এই বিশেষ্য শব্দ বা পদ, « বলে » এই ক্রিয়া-পদের কর্তা—« লোকে » এই বিভক্ত্যন্ত বা বিভক্তি-যুক্ত পদটী, এই বাক্যে কর্তৃকারকে প্রযুক্ত; তদ্রূপ, « ছুরী দিয়া ফল কাটে », « ঘর হইতে বাহির হইল »—এই বাক্য দুইটীতে, « কাটা » কার্য « ছুরী »-র সহায়তায় নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং « বাহির হওয়া » কার্য, « ঘর » -হইতে ঘটিয়াছে; « ছুরী » শব্দ

করণ, এবং এই করণ-ভাব অসমাপিকা ক্রিয়া « দিয়া »-দ্বারা দ্যোতিত হইয়াছে—বাক্যস্থ ক্রিয়ার সহিত « ছুরী »-র করণ-কারক-সম্বন্ধ; এবং « ঘর » এই শব্দ, « বাহির হওয়া » ক্রিয়ার উৎপত্তি-স্থান, অথবা আগম- বা আদান-স্থান, সেই হেতু বাক্যস্থ ক্রিয়ার সহিত « ঘর » -এর যে সম্বন্ধ, তাহা আদান- বা অপাদান-সম্বন্ধে, « হইতে » এই ক্রিয়া-পদের সাহায্যে সেই সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে; « ঘর -হইতে », ইহা অপাদান কারক।

ক্রিয়া-পদ ভিন্ন অন্যান্য পদের সহিত বিশেষ্যের বা নাম-পদের যে সম্বন্ধ, তাহা যথার্থ কারক-পদ-বাচ্য নহে:—এই প্রকারের সম্বন্ধও, কারকের ন্যায় বিভক্তি বা বিশেষ বিশেষ্য অথবা ক্রিয়া-পদ-সংযোগে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; যেমন—« রামের হাত »; এখানে « হাত » এই বিশেষ্যের সঙ্গে « রাম » এই শব্দের অন্বয় বা সম্বন্ধ « -এর » এই বিভক্তির দ্বারা দেখানো হইয়াছে; « রাম » ও « হাত » উভয় শব্দের মধ্যে কোনও কার্য বা ক্রিয়া বা ঘটনার স্থান নাই, এখানে « রামের » হইতেছে « সম্বন্ধ-পদ »। আমরা মোটামুটি-ভাবে এই দ্বিতীয় প্রকারের সম্বন্ধ বা অন্বয়কেও কারক-পর্যায়েরই অন্তর্গত করিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল বিশেষ পদাংশের যোগে ও পদের সাহায্যে বিশেষ্যের ভিন্ন-ভিন্ন কারক নির্দিষ্ট হয়, সেই সব পদাংশ ও পদকে বাঙ্গালায় **বিভক্তি** বলে। বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি দুই প্রকারের—

[১] **যথার্থ বিভক্তি (Inflexions Proper)**: এগুলি পদের অংশ-রূপে যুক্ত হয়, ভাষায় এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পৃথক্ করিয়া দেখিলে, এগুলির কোনও অর্থই হয় না, কিন্তু বিশেষ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বিশেষ্যকে বিভিন্ন কারকে অবনমিত করিয়াই ইহাদের সার্থকতা; যেমন—« -এ, -কে, -রে, -তে »।

শব্দের বিভক্তি বাঙ্গালায় এই কয়টী—

কর্তৃকারকে—« ০ (শূন্য); -এ (-য়ে, -য়), -তে (-এতে) »;

কর্মকারকে ও সম্প্রদানে—« -এ (-য়ে, -য়) ; -কে , -রে (-এরে) ;
করণকারকে ও অধিকরণে—« -এ (-য়ে, -য়) ; -তে (-এতে) » ;
সম্বন্ধে—« -র, -এর (-য়ের) » ।

« -এ » -প্রত্যয় বা বিভক্তি, এক সম্বন্ধ-পদ ব্যতীত, অন্য সমস্ত কারকেই মিলে। এই প্রত্যয়-যোগে সাধারণতঃ শব্দটী ক্রিয়ার লক্ষ্য-স্থল কারক হইয়া পড়ে, শব্দটী যেন ক্রিয়ার প্রভাব-স্থলে পরিণত হয় ; ইহার কর্তৃকারকোচিত স্বাধীনতা বা ঋজুতা যেন আর থাকে না, ইহা যেন তির্যক্- বা বক্র-ভাব প্রাপ্ত হয় ; এই জন্য, এই « -এ » -প্রত্যয় বা বিভক্তিকে « তির্যক্ বিভক্তি » (Oblique Affix) বলা হইয়া থাকে। « -এ » -প্রত্যয়ের সহিত সম-পর্যায়ের এবং সমার্থক বলিয়া, « -তে, -এতে »-কে-ও তদ্রূপ « তির্যক্ বিভক্তি » বলা যাইতে পারে।

পূর্বে প্রদত্ত বিভক্তি ভিন্ন, প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় অন্য কতকগুলি বিভক্তি আছে ; সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় সেগুলির প্রয়োগ হয় না।

[২] বিভক্তি-রূপে ব্যবহৃত পদ (Post-positional Words): ভাষায় এগুলির পৃথক্ অবস্থান দেখা যায়। এগুলির অর্থ আছে, এবং অন্য পদের মত ভাষায় এগুলি স্বাধীন-পদ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু বিশেষ্যের পরে আসিয়া, বিশেষ্যকে কোনও বিশিষ্ট কারকে আনয়ন করে। বিশেষ্যের পরে আসে বলিয়া, এইরূপ পদকে ইংরেজীতে **Post-position** বলা হয় ; বাঙ্গালায় এগুলিকে **কর্মপ্রবচনীয়**, **সম্বন্ধীয়**, **পরসর্গ** বা **অনুসর্গ**, এই প্রকারের নাম দেওয়া যায়। সংক্ষেপে আমরা এগুলিকে **অনুসর্গ** বলিতে পারি ; যথা—« বাড়ী হইতে ; কলম দিয়া লিখ ; তাহাকে দিয়া ; দেশ থাকিয়া (>থেকে) » প্রভৃতি।

বাঙ্গালায় নিম্ন-লিখিত পদগুলি কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ-রূপে ব্যবহৃত হয়—এগুলি বিভক্তির মত শব্দের পরে অবিকৃত-রূপে, অথবা স্বয়ং বিভক্তি-যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় ; যথা—

করণে—« দিয়া (*দিয়ে, *দে) ; দ্বারা ; কর্তৃক ; করিয়া (*ক'রে) » ;

সম্প্রদানে—« তরে (<অন্তরে, আন্তরে) ; জন্য (*জন্যে) ; লাগিয়া (> *লেগে) ; কারণ (কারণে) ; হেতু (হেতুতে) ;

অপাদানে—« হইতে (> *হ'তে) ; থাকিয়া (> *থেকে) ; কাছ থেকে, নিকট হইতে » ;

অধিকরণে—« কাছে, নিকটে, মধ্যে »।

এইগুলিই বিশেষ প্রচলিত কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ ; এতদ্ভিন্ন, ইংরেজী Preposition-এর মত বিশেষ-বিশেষ অর্থে আরও কতকগুলি এই প্রকারের শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পরে উল্লিখিত হইবে।

প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় আরও কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় ; যথা—« ঠাইয়ে > ঠেঁয়ে ; লগে ; থন্, থুন্, তুন » ইত্যাদি।

বিভক্তির প্রয়োগ-অনুসারে, সংস্কৃতে সাতটী কারক ধরা হইয়াছে—« কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ »। এতদ্ভিন্ন, সম্বোধনের একটী বিশেষ রূপও ধরা হয়। আবার ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণে, সম্বন্ধ কারক-পদ-বাচ্য নহে। কারকগুলি যে ক্রমে নির্দিষ্ট হইল, সেই ক্রম সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় ; এবং এই ক্রম ধরিয়া সংস্কৃতে—

কর্তৃকারকের বিভক্তিকে—প্রথমা বিভক্তি,
কর্মকারকের „ —দ্বিতীয়া বিভক্তি,
করণকারকের „ —তৃতীয়া বিভক্তি,
সম্প্রদানের „ —চতুর্থী বিভক্তি,
অপাদানের „ —পঞ্চমী বিভক্তি,
সম্বন্ধ-পদের „ —ষষ্ঠী বিভক্তি, এবং
অধিকরণের „ —সপ্তমী বিভক্তি

বলা হয়। সংস্কৃতের ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার ব্যাকরণ প্রায়শঃ লিখিত ও আলোচিত হয় বলিয়া, বাঙ্গালাতেও সংস্কৃতের অনুরূপ সাতটী

(অথবা সম্বোধন লইয়া আটটী) কারক ধরা হয় ; তদনুসারেই বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিশেষ্য-শব্দের রূপ, নির্দিষ্ট বা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাঙ্গালা শব্দ-রূপ, সংস্কৃতের শব্দ-রূপ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্। বাঙ্গালায় কর্ম-কারক ও সম্প্রদান-কারকের মধ্যে সাধারণতঃ পার্থক্য দেখা যায় না, এবং কর্তৃ-কারক, করণ-কারক ও অধিকরণ-কারকের রূপ অনেক সময়ে এক হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় মাত্র একটী বিভক্তি-মালা বিদ্যমান, শব্দ-নির্বিশেষে সমান-ভাবে এই একটী বিভক্তি-মালার অন্তর্গত বিভক্তিরই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় শব্দ-রূপে শব্দের অন্তের স্বর- বা ব্যঞ্জন-ধ্বনি-অনুসারে, এবং শব্দের লিঙ্গ-অনুসারে, বিভিন্ন প্রকারের বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে : যেমন—সম্বন্ধ-পদে (ষষ্ঠী বিভক্তিতে) বাঙ্গালায় « -র » বা « -এর » মাত্র এই বিভক্তিটি ব্যবহৃত হয়, তাহা শব্দ যে কোন লিঙ্গের হউক না কেন, বা শব্দের অন্তে যে কোন ধ্বনি থাকুক না কেন ; সম্বন্ধ-নির্দেশের জন্য বাঙ্গালায় আর কোন বিভক্তি নাই। কিন্তু সংস্কৃতে সম্বন্ধ-পদের বিভক্তি শব্দ-বিশেষে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে ; যেমন—« -স্য » (অকারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দে)—« নরস্য, ফলস্য » ; « -এঃ » (ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে)—« মুনি—মুনেঃ » ; « -ইনঃ » (ইকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দে)—« বারি—বারিণঃ » ; « -ইয়ঃ » (ঈকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দে)—« সুধী—সুধিয়ঃ » ; তদ্রূপ, « লতা—লতায়াঃ ; পিতৃ—পিতুঃ ; নদী—নদ্যাঃ ; বধূ—বধ্বাঃ ; সাধু—সাধোঃ ; মনস্—মনসঃ ; রাজন্—রাজ্ঞঃ ; বিদ্বস্—বিদুষঃ ; গুণিন্—গুণিনঃ » ইত্যাদি বহুবিধ রূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল সংস্কৃত শব্দের সম্বন্ধ-রূপে পাই, « -র, -এর » -বিভক্তি মাত্র ; যথা—« নরের, ফলের, মুনির, বারির, সুধীর, লতার, পিতার, নদীর, বধূর, সাধুর, মনের, রাজার, বিদ্বানের, গুণীর »। খাঁটী বাঙ্গালা শব্দে, এবং বিদেশী ভাষা হইতে আগত বাঙ্গালা শব্দেও তদ্রূপ ; যথা—« হাতীর, হাতের, ঘোড়ার, মাথার, মায়ের (মার) ; নবাবের, ডেপুটীর, সোল্জিয়েটর » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় শব্দ-রূপ, মাত্র এক প্রকারের হইয়া থাকে ; সংস্কৃতের মত এত প্রকারের বৈচিত্র্য বাঙ্গালা ভাষায় নাই ; সামান্য দুই-একটী বৈশিষ্ট্য যাহা দেখা যায়, তাহা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্য, এবং কচিৎ বস্তু-নির্দেশের জন্য ঘটিয়া থাকে।

[৩.০৬৬] বাঙ্গালা শব্দ-রূপের বিভক্তি ইত্যাদি

☞ নিম্নে, চলিত-ভাষায় বিশেষ-ভাবে প্রযুক্ত ও সাধু-ভাষায় অব্যবহৃত বিভক্তি ও বিভক্তি-স্থানীয় শব্দগুলি,* তারকা-চিহ্নিত করিয়া দেখানো হইল।

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা (=প্রথমা বিভক্তি)	[১] মূল শব্দ—কোনও বিভক্তি-যুক্ত হয় না। [২] « -এ, -য়ে, -য় » (মূলতঃ এই বিভক্তির রূপ হইতেছে « -এ », কিন্তু ইহা « -য়ে »-রূপে, এবং « -অ, -আ, -ও »-কারান্ত শব্দের পরে সাধারণতঃ « -য় »-রূপে, লিখিত হয়। অনির্দিষ্ট কর্তা হইলে এই বিভক্তি ব্যবহৃত হয়)। [৩] « -এতে » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দ এবং « -অ, -আ, -ও » -কারান্ত শব্দের উত্তর), « -তে » (« -ই, -ঈ, -উ, -ঊ »-কারান্ত শব্দের উত্তর)।	[১] মূল শব্দ—অপরিবর্তিত। [২] « -রা » (স্বরান্ত শব্দের পরে), « -এরা » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে, ক্বচিৎ স্বরান্ত —অ-কারান্ত শব্দেরও পরে) ; এই প্রত্যয়টীর প্রয়োগ, প্রাণি-বাচক এবং অপ্রাণি-বাচক অথচ প্রাণি-ধর্ম-বিশিষ্ট শব্দে হইয়া থাকে। « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, -গুলান »। [৩] « সকল, সমূহ, সমস্ত, গণ, কুল, নিকর, নিচয় » প্রভৃতি শব্দ-যোগ। [৪] « -গুলায়, -গুলাতে, -গুলিতে, সকলে » ([২] ও [৩] -এর প্রত্যয় ও শব্দ + « -এ, -তে » -প্রত্যয়-যোগ)। [৫] কতকগুলি শব্দে—« -এ »। ☞ যদি কোনও পরিমাণ- বা সংখ্যা-বাচক বিশেষণ পূর্বে

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা (=প্রথমা বিভক্তি)		থাকে, তাহা হইলে বহুবচনের বিভক্তি, শব্দে সংযুক্ত হয় না ; বহুবচনান্ত সর্বনাম-জাত বিশেষণ থাকিলেও, বহুবচনের বিভক্তি বিশেষ্যে যুক্ত হয় না।
কর্ম (=দ্বিতীয়া)	[১] বিভক্তি-হীন রূপ (অপ্রাণি-বাচক তথা ক্লীবলিঙ্গের শব্দে, এবং অনির্দিষ্ট প্রাণি-বাচক শব্দে, কর্মকারকে বিভক্তি যুক্ত হয় না)।	[১] « দিগকে, -দিগে, « দিকে »।
	[২] « -কে » — সাধারণ বিভক্তি (সুনির্দিষ্ট বিশেষ্যে যুক্ত হয়)।	[২] « দের, -দেরে, -দেরকে »।
	[৩] « -রে, -এরে » (পদ্যে সমধিক ব্যবহৃত, উচ্চ-ভাবের গদ্যেও মিলে ; চলিত-ভাষা ব্যতীত অন্য কথ্য ভাষাতেও পাওয়া যায়)।	[৩] « -গুলা, -গুলি, « -গুলো, সকল, -সমূহ » ইত্যাদি+ « -কে, -রে, -এরে »।
	[৪] « -এ, -রে, -য় » (কবিতায়)।	
করণ (=তৃতীয়া)	[১] « -এ », স্বরান্ত শব্দে « -য় »।	[১] -দিগ-দ্বারা, -দিগের দ্বারা, দিগ-কর্তৃক, -দের দ্বারা, -দের দিয়া, « দের দিয়ে »।

কারক	একবচন	বহুবচন
করণ (=তৃতীয়া)	[২] « -তে, -এতে »। [৩] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « দিয়া, * দিয়ে, * -দে »—মূল শব্দে, বা তাহার দ্বিতীয়ার বা চতুর্থীর বিভক্তি « -কে, -রে, -এরে » যোগান্তে প্রযুক্ত হয়। [৪] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « করিয়া, * ক'রে »;—অপ্রাণি-বাচক শব্দে « -এ » বিভক্তি বা « -তে, -এতে » বিভক্তি যোগান্তে « করিয়া, * ক'রে » প্রযুক্ত হয়। [৫] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « হইতে, * হ'তে »—অন্য-বিভক্তি-হীন মূল শব্দে যোগ করিয়া। [৬] সংস্কৃত বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ « দ্বারা » ও « কর্তৃক »—মূল শব্দে অথবা, তাহার ষষ্ঠীর রূপ যুক্ত করিয়া।	[২] « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, সকল, -সমূহ » ইত্যাদি+ « দ্বারা, কর্তৃক »; ষষ্ঠ্যন্তে « -গুলার, -গুলির, সকলের » ইত্যাদি + « দ্বারা, দিয়া, * দিয়ে »; « -গুলাকে, -গুলারে, -গুলিকে, -গুলিরে, সকলেরে, সকলকে » ইত্যাদি (দ্বিতীয়ান্ত বা চতুর্থ্যন্ত রূপ) + « দিয়া, * দিয়ে »। অপ্রাণি-বাচক বিশেষ্য হইলে, মূল শব্দে কেবল « দ্বারা, দিয়া, * দিয়ে » যোগে, বহুবচনে করণ-কারক নির্দিষ্ট হইতে পারে।
সম্প্রদান (=চতুর্থী)	[১] « -কে », [২] « -রে, -এরে », [৩] « -এ, -য় »—কর্মকারকবৎ।	[১] « -দিগকে, -দিগে, *-দিকে » [২] « -দের, *-দেরকে »; [৩] « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, সকল, -সমূহ » ইত্যাদি +« -কে, -রে, -এরে » (কর্মকারকবৎ)।

কারক	একবচন	বহুবচন
(সম্প্রদান=চতুর্থী)	[৪] ষষ্ঠীর রূপের উত্তর « তরে, জন্য, *জন্যে, (কবিতায় লাগিয়া, লাগি') » পদ যোগ করিয়া।	[৪] বহুবচনে ষষ্ঠীর রূপে « তরে, জন্য, *জন্যে, লাগিয়া, লাগি' » পদ যোগ করিয়া।
অপাদান (=পঞ্চমী)	[১] বিভক্তি-স্থানীয় প্রত্যয় « থাকিয়া, থেকে, হইতে, *হ'তে » মূল শব্দে অথবা ষষ্ঠীর রূপে যোগ করিয়া। [২] ষষ্ঠ্যন্ত রূপ + « কাছ হইতে, নিকট হইতে, *কাছ থেকে »। [৩] তারতম্য বা তুলনা-বাচক অপাদানে অধিকন্তু বিশেষ্যের বিভক্তি-হীন রূপ + « অপেক্ষা »; অথবা ষষ্ঠ্যন্ত একবচনের রূপ + « চাহিয়া, *চেয়ে »।	[১] « -দিগ, -গুলা, -গুলি, *-গুলো, সকল » ইত্যাদি (অথবা ষষ্ঠ্যন্ত « দিগের, *-দের, -গুলির, -গুলার, সকলের » ইত্যাদি) + বিভক্তি-স্থানীয় পদ « থাকিয়া, *থেকে, হইতে, *হ'তে »। [২] ষষ্ঠ্যন্ত বহুবচনের রূপ + « কাছ বা নিকট হইতে, *কাছ থেকে »। [৩] তারতম্য বা তুলনা-বাচক অপাদানে, ষষ্ঠ্যন্ত বহুবচন + « চাহিয়া, *চেয়ে, অপেক্ষা »।
সম্বন্ধ পদ (=ষষ্ঠী)	[১] « -এর (-য়ের), -র » (সাধারণতঃ স্বরান্ত শব্দের উত্তর « -র » হয়; ক্বচিৎ অ-কারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে বা অধিকন্তু « -এর (-য়ের) » বিভক্তি যুক্ত হয়।	[১] « -দিগের, *-দের, -এদের, -য়েদের »।

কারক	একবচন	বহুবচন
সম্বন্ধ পদ (=ষষ্ঠী)	[২] « -কার, -কের » (কতক-গুলি বিশেষ শব্দে)।	[২] « -গুলার, -গুলির, * -গুলোর, সকলের, সবার, -সমূহের » ইত্যাদি।
অধিকরণ (=সপ্তমী)	[১] « -এ (-য়ে), -য় »। [২] « -তে, -এতে (=-এ+-তে) » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দে « -এ, -য় »-র পরিবর্তে বিকল্পে «-এতে », স্বরান্ত শব্দে « -তে »)। [৩] ষষ্ঠ্যন্ত রূপ+« কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, উপরে » ইত্যাদি।	[১] « -দিগতে, -দিগেতে (*-দেরতে) »। [২] « -গুলা, -গুলি, *-গুলো, সকল, -সমূহ » ইত্যাদি+« -এ (-য়), -তে, -এতে »। [৩] বহুবচন ষষ্ঠ্যন্ত রূপ+« কাছে, নিকটে, মধ্যে, উপরে » ইত্যাদি।
সম্বোধন-পদ	[১] মূল শব্দ—পূর্বে (বা পরে) « হে, ওহে, রে, ওরে, ওগো, গো » প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক অব্যয় প্রযুক্ত হয় (নিম্নে দ্রষ্টব্য—অব্যয় পর্যায়)। [২] বহু স্থলে, সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দে মূল সংস্কৃতে প্রযুক্ত সম্বোধন-পদের রূপ ব্যবহৃত হয় (এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য, ৩.৭৭ পর্যায়, পৃষ্ঠা ২৭১-৭৩)।	[১] প্রথমাবৎ; শব্দের পূর্বে অথবা পরে সম্বোধন-সূচক অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য—« -দিগ, -দিগের, -দিগকে, -দের » বিভক্তি, মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় বহুবচনার্থে ব্যবহৃত « আদিক, আদি » শব্দ হইতে উদ্ভূত। আধুনিক বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে « -দিগ, -দের » ইত্যাদির প্রয়োগ নাই, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহাদের মূল-স্থানীয় « আদি, আদিক » শব্দ কর্তৃকারকেও ব্যবহৃত হইত।

ষষ্ঠীতে ও সপ্তমীতে স্বরান্ত শব্দের উত্তর যেখানে « -এর (-য়ের) » ও « -এ (-য়ে) » বিভক্তি প্রযুক্ত হয়; যেমন—অ-কারান্ত একাক্ষর শব্দে (যথা—« মা, পা, বা, জা, দা, ছা, তা ») এবং ই-কার, উ-কার, ঐ-কার, ঔ-কার-অন্ত শব্দে—সেখানে « -য়ের, -য়ে » লেখাই ভাল, « য় » না দিয়া কেবল « -এর, -এ » লিখিলে বিভক্তিকে যেন পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়; যথা—« মায়ের, ভাইয়ের, বোম্বাইয়ে, লখ্‌নউয়ে (লখ্‌নৌয়ে), ঢেউয়ে »। যেখানে বিশেষ্য শব্দটীকে উদ্ধার-চিহ্ন দিয়া পৃথক্ করিয়া দেখানো হয় (যেমন বিদেশী নামের বা পদের বেলায়), সেখানে হাইফেন বা শব্দ-বিশ্লেষ-চিহ্ন (-) দিয়া, বিশেষ্য ও বিভক্তি উভয়ের মধ্যে বিশ্লেষ দেখানো উচিত; যেমন—« 'রেনেসাঁস'-এর (রেনেসাঁসের নহে), নান্‌কিন্‌-এ, হনোলুলু-তে, ভারহুৎ-এ, প্রাগ্‌-এর, সোভিয়েট্‌-এর; 'রামচরিত-মানস'-এ » ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শব্দ-রূপের উদাহরণ

« মানুষ » শব্দ

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	[১] মানুষ। [২] মানুষ+এ=মানুষে। [৩] মানুষ+এ-তে=মানুষেতে।	[১] মানুষ+এরা=মানুষেরা। [২] মানুষগুলা, মানুষগুলি, *মানুষগুলো। [৩] মানুষ সকল, মানুষ-সমূহ, মানুষগণ (ইত্যাদি)। [৪] মানুষগুলার (সুপ্রচলিত নহে); মানুষেরা সব। [৫] লোকে বলে; দশে মিলি করি কাজ; সবে মিলি। ☞ অনেক মানুষ, সব মানুষ, চারজন মানুষ, একশত মানুষ; যত মানুষ, অত মানুষ।

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্ম	[১] মানুষ (বাঘে মানুষ মারে)। [২] মানুষকে। [৩] মানুষেরে। [৪] মানুষে (যথা—জিজ্ঞাসিব জনে জনে)।	[১] মানুষদিগকে, *মানুষদিগে, *মানুষদিকে। [২] মানুষদের, *মানুষদেরে, *মানুষদেরকে। [৩] মানুষগুলাকে, মানুষগুলারে, মানুষ সকলকে, -সমূহেরে (ইত্যাদি)।
করণ	[১] মানুষে। [২] মানুষেতে। [৩] মানুষ দিয়া, *মানুষ দিয়ে; *মানুষকে দিয়ে; মানুষেরে দিয়া। [৪] *হাতে ক'রে, ছুরীতে করিয়া। [৫] মানুষ হইতে, *মানুষ হ'তে। [৬] মানুষ-দ্বারা, মানুষের দ্বারা; মানুষ-কর্তৃক, মানুষের কর্তৃক।	[১] মানুষ-দিগ-দ্বারা, মানুষ-দিগ-কর্তৃক, মানুষদিগের দ্বারা, মানুষদের দ্বারা, মানুষদের দিয়া, *মানুষদের দিয়ে। [২] মানুষগুলি-দ্বারা, মানুষগুলির দ্বারা, মানুষগুলি(র)-কর্তৃক; মানুষ সকল-দ্বারা, মানুষ সকলের দ্বারা; মানুষগুলিকে দিয়া, *মানুষগুলোকে দিয়ে, মানুষগুলারে দিয়া, মানুষ সকলেরে দিয়া।
সম্প্রদান	[১] মানুষকে। [২] মানুষেরে। [৩] মানুষে। [৪] মানুষের জন্য, *মানুষের জন্যে, মানুষের তরে; মানুষের লাগিয়া।	[১], [২], [৩]—কর্মবৎ। [৪] মানুষগুলার তরে, *মানুষগুলার তরে, মানুষ সকলের জন্য, মানুষ সকলের লাগিয়া।

কারক	একবচন	বহুবচন
অপাদান	[১] মানুষ হইতে, *হতে; মানুষ থেকে, মানুষের থেকে। [২] মানুষের কাছ হইতে, *কাছ থেকে, নিকট হইতে। [৩] *মানুষের চেয়ে; মানুষ অপেক্ষা।	[১] মানুষ-দিগ হইতে, *মানুষ-গুলো থেকে, *মানুষ-দিগ হতে, মানুষ সকলের থেকে, মানুষদিগের থেকে (ইত্যাদি)। [২] মানুষদিগের নিকট হইতে, *মানুষদের কাছ থেকে (ইত্যাদি)। [৩] মানুষগুলি অপেক্ষা, *মানুষ সকলের চেয়ে।
সম্বন্ধ-পদ	[১] মানুষের। ([২] সন্ধ্যাকার, সকলকার, আজিকার, কালিকার; কতকের, কালকের।)	[১] মানুষদিগের, মানুষদের। [২] মানুষগুলির, মানুষ-সমূহের (ইত্যাদি।)
অধিকরণ	[১] মানুষে। [২] মানুষেতে। [৩] মানুষের কাছে, মধ্যে (ইত্যাদি)।	[১] মানুষদিগেতে, মানুষদিগেতে, *মানুষদেরতে। [২] মানুষগুলায়, মানুষগুলিতে, মানুষ সকলেতে। [৩] মানুষদিগের মধ্যে, *মানুষ-দের মাঝে।
সম্বোধন-পদ	হে মানুষ, ওহে মানুষ, ওরে মানুষ, মানুষ রে (ইত্যাদি)।	হে মানুষেরা, ওগো মানুষেরা, ওরে মানুষগুলা, ওগো মানুষগুলি, হে মানুষ সকল (ইত্যাদি)।

অন্যান্য যাবতীয় বাঙ্গালা শব্দের রূপ, উপরে প্রদর্শিত « মানুষ » শব্দের মতই সাধিত হয়। কি প্রকারের বিভক্তি বা বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইবে, তাহা মূল শব্দটীর প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে; যথা—অপ্রাণি-বাচক শব্দে « রা, এরা » বিভক্তি যুক্ত হইবে না; সংস্কৃত শব্দ হইলে, বহুবচন-দ্যোতক বিশেষ সংস্কৃত শব্দ সংযুক্ত হইবে; ইত্যাদি।

বাঙ্গালা শব্দ-রূপের নিদর্শন—

অ-কারান্ত শব্দ—« ধর্ম—ধর্মে, ধর্মেতে, ধর্মের, ধর্মকে, ধর্মেরে, ধর্ম সকল, ধর্ম-সমূহের; চন্দ্র—চন্দ্রে, চন্দ্রেতে, চন্দ্রের, চন্দ্রকে, চন্দ্রেরে; মন্দ—মন্দের, মন্দে, মন্দেতে » (ও-কারান্ত শব্দ-সম্বন্ধে নিয়মও নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

আ-কারান্ত শব্দ—« লতা—লতায়, লতাতে, লতার, লতাকে, লতারে, লতাগুলি, লতাগুলির; মা (= প্রাচীন বাঙ্গালায় 'মাঅ'.)—মায়ে, মায়েতে বা মাতে, মায়ের বা মার, মায়েরা, মাতে বা মায়েতে, মাকে, মায়েরে, মায়েদের; মাথা—মাথায়, মাথাতে, মাথার, মাথাগুলার; দাদা—দাদায়, দাদাতে, দাদাকে, দাদার » ইত্যাদি।

ই, ঈ-কারান্ত শব্দ—« ভাই—ভাইয়ে, ভাইয়ের, ভাইকে, ভাইয়েরে, ভাই সকল, ভাইয়েরা; ছবি—ছবিতে, ছবির, ছবিকে; নদী—নদীর, নদীতে, নদীকে; হাতী—হাতীতে, হাতীর, হাতীকে; রানী—রানীর, রানীরা, রানী সকল, রানীকে; দই—দইয়ের, দইয়ে, দইতে; বই—বইয়ে, বইগুলি, বইতে, বইয়েতে; উই—উইয়ের, উই সকল, উইয়ে, উইকে। »

উ, ঊ-কারান্ত শব্দ—« বাবু—বাবুতে, বাবুর, বাবুকে, বাবুরা, বাবু সকল, বাবুদের; গোরু—গোরুতে, গোরুর, গোরুকে, গোরুগুলা, গোরুগুলি; সাধু—সাধুতে, সাধুর, সাধুকে, সাধুরে, সাধুরা, সাধুদিগ হইতে; ঢেউ—ঢেউয়ের, ঢেউতে, ঢেউয়েতে, ঢেউকে; বউ—বউয়ের, বউকে, বউরা, বউয়েরা। »

এ-কারান্ত শব্দ—« মেয়ে—মেয়ের, মেয়েকে, মেয়েতে, মেয়েরা; ছেলে; নেয়ে »।

ও-কারান্ত শব্দ—« সেখো—সেখোর, সেখোকে, সেখোতে, সেখোরা; (পটুয়া>) প'টো—প'টোরা, প'টোর, প'টোকে; আলো—আলোর, আলোতে, আলো হইতে »।

বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তর অসংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দ, লিখনে অ-কারান্ত, উচ্চারণে কিন্তু ও-কারান্ত : এই-সকল শব্দে ষষ্ঠীতে (সম্বন্ধে) « -র » যুক্ত হয়, « -এর » নহে; এতাদৃশ অসংস্কৃত শব্দ, ও-কার-যুক্ত করিয়া লিখিলে ভাল হয় ; যথা—« ভাল [=ভালো] —ভালর ('ভালের' নহে) ; বড় [=বড়ো] —বড়র ('বড়ের' নহে) ; ছোট [=ছোটো]—ছোটর ('ছোটের' নহে) ; দেখান [=দেখানো]—দেখানর ('দেখানের' নহে) »। কতকগুলি অ-কারান্ত সংস্কৃত শব্দও, ও-কারান্ত-বৎ উচ্চারিত হয়, এবং বিকল্পে ষষ্ঠীতে « -এর » স্থানে « -র » বিভক্তি গ্রহণ করে ; যথা—« গুণ [=গুণো]—গুণের, গুণর ; মন্দ—মন্দের, মন্দর।

ব্যঞ্জনান্ত শব্দ—ষষ্ঠীতে ও অন্য বিভক্তিতে « -এর, -এ-র, -এতে » গ্রহণ করে ; যথা—« বক, অভিভাবক, নায়ক, ফাঁক, শাঁখ, সুখ, দখ বা শখ (আরবী 'শৌক্' হইতে), রাগ, রগ, বাঘ, রঙ ; ছাঁচ, মাছ, গাছ, রোজ, বীজ, তেজ, কাজ, সাঁঝ, মাঝ ; পাট, কপাট, কাঠ, হাড়, রাঢ়, বাণ ; ছাত, মত, হাত, রথ, পথ, বলদ, অবসাদ, নাদ, সাধ, কান, দান, ধান ; সাপ, অভিশাপ, গোঁফ, নাক, আব, ভাব, লোভ, নাম, আম ; উদয় (বাস্তবিক পক্ষে উচ্চারণে একারান্ত—'উদএ'), কায়, ঘর, শর, কর, কল, মাকাল, রাখাল ; দেশ, শেষ, হাঁস » ইত্যাদি।

[৩.০৬৭] বাঙ্গালায় আগত সংস্কৃত শব্দের প্রাতিপদিক ও সম্বোধনের রূপ

তৎসম বা মূল সংস্কৃত রূপে সংস্কৃত শব্দ যখন বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়, তখন সেগুলির প্রথমার একবচনের রূপটি-ই বাঙ্গালায় স্বীকার করা হয়, এবং তাহাতেই বাঙ্গালার বিভক্তি প্রভৃতি সংযুক্ত হয় ; যেমন—« শ্রীমৎ » শব্দ ; সংস্কৃতের প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে ইহার রূপ হয় « শ্রীমান্ », স্ত্রীলিঙ্গে « শ্রীমতী » এবং বাঙ্গালায় এই « শ্রীমান্, শ্রীমতী » রূপ দুইটী গৃহীত হইয়াছে (যথা—« শ্রীমানের, শ্রীমান্‌কে, শ্রীমতীকে, শ্রীমতীদের, শ্রীমানেরা ») ; সংস্কৃতের অন্যান্য রূপ, যেমন « শ্রীমন্তঃ (প্রথমার বহুবচন), শ্রীমতা (তৃতীয়ার একবচন), শ্রীমদ্ভিঃ (তৃতীয়ার বহুবচন) » —এ সব বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। তদ্রূপ « রাজন্ » শব্দের, মাত্র « রাজা », স্ত্রীলিঙ্গে « রাজ্ঞী »,

প্রথমার একবচনের এই রূপ দুইটা বাঙ্গালা শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়, « রাজানঃ, রাজ্ঞঃ, রাজ্ঞা » প্রভৃতি অজ্ঞাত। তদ্রূপ—« আত্মন্—আত্মা; সখি—সখা; পিতৃ—পিতা; যুবন্—যুবা; আশিস্—আশিস্, আশীঃ বা আশীষ্; গুণিন্—গুণী; চন্দ্রমস্—চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমা; তপস্বিন্—তপস্বী, তপস্বিনী; গরিমন্—গরিমা; দিশ্—দিক্; ত্বচ্—ত্বক্; বাচ্—বাক্; সম্রাজ্—সম্রাট্; অনুষ্টুভ্—অনুষ্টুপ্; ব্রহ্মন্—[পুংলিঙ্গ] ব্রহ্মা (দেবতা), [ক্লীবলিঙ্গ] ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম); একাকিন্—একাকী, একাকিনী » ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় « আত্মা, সখা, পিতা, রাজা, যুবা, চন্দ্রমা, গরিমা, ব্রহ্মা »— আ-কারান্ত শব্দ; « রাজ্ঞী, গুণী, যুবতী, শ্রীমতী, তপস্বী, তপস্বিনী, সম্রাজ্ঞী, একাকী, একাকিনী », —ঈ-কারান্ত শব্দ; « ব্রহ্ম »—অ-কারান্ত শব্দ; এবং « শ্রীমান্, আশিস্, দিক্, ত্বক্, বাক্, সম্রাট্ »—ব্যঞ্জনান্ত শব্দ।

বাঙ্গালায় আগত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ আবার সংস্কৃত শব্দ-রূপের প্রভাবে একটু পরিবর্তন আসিয়া যায়। কতকগুলি শব্দ বিভক্তি-যুক্ত অবস্থায় « ত্ (ৎ) » পরিবর্তিত হইয়া « দ্ » হইয়া যায়; যথা—« উপনিষৎ (প্রথমা; 'উপনিষদ্'-এর মূলে)—কিন্তু উপনিষদে, উপনিষদের; পরিষৎ—পরিষদের; সংসৎ—সংসদের; সম্পদ্, সম্পৎ—সম্পদে, ধন-সম্পদের; বেদবিৎ—বেদবিদের; সুহৃৎ—সুহৃদের » ইত্যাদি। সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের মূল-রূপে « দ্ » থাকিলেই এইরূপ হয়; উপর্যুক্ত শব্দগুলির ধাতুতে বা মূল রূপে « দ্ » আছে— « সদ্, পদ্, বিদ্, হৃদ্ »। কিন্তু « উদ্ভিদ্ » শব্দের কর্তৃকারকে বাঙ্গালায় « উদ্ভিৎ » হয় না, « উদ্ভিদ্, উদ্ভিদের »। « শরৎ—শরতের ('শরদের' নহে)»—এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে; সংস্কৃত শব্দটী হইতেছে « শরদ্ »। « ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিতের, পথিকৃৎ—পথিকৃতের »—মূল রূপে « ৎ » থাকায়, বিভক্ত্যন্ত রূপে বাঙ্গালায় « দ্ » আসিল না।

সংস্কৃতের « অস্ » -প্রত্যয়-জাত অথবা অন্য প্রত্যয়-জাত বিসর্গ, সাধারণ প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দে লুপ্ত হয়: « ছন্দ, বপু, স্রোত, চক্ষু, ধনু, যশ, জ্যোতি » ইত্যাদি। কিন্তু যে শব্দগুলি তাদৃশ প্রচলিত নহে, সেগুলিতে ক্লীবলিঙ্গে ও বিকল্পে পুংলিঙ্গে প্রথমায় বিসর্গ থাকে, এবং পুংলিঙ্গ হইলে শব্দটীতে আ-কারান্তবৎ ও ক্লীবলিঙ্গে অ-কারান্তবৎ ধরা হয়; যথা— « শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ, রজঃ, তমঃ, সরঃ, চেতঃ, শিরঃ, সুমনাঃ (সুমনা), লঘুচেতাঃ, উন্নতচেতাঃ, দীর্ঘতমাঃ (দীর্ঘতমা), উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ভূরিশ্রবাঃ (ভূরিশ্রবা) » ইত্যাদি।

সাধু-ভাষায় যেখানে অত্যধিক সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়, এবং ভাষাকে একটু বেশী করিয়া সংস্কৃতের অনুকারী করা হয় (যেমন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে বা অনুকরণে), সেখানে অনেক সময়ে সম্বোধন-পদে একবচনে সংস্কৃতের সম্বোধন পদের রূপই বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয়; যথা—« হে পিতা »-স্থলে « পিতঃ ! »; তদ্রূপ « হে মুনি »-স্থলে « মুনে ! »; « হে রাজা »-স্থলে « রাজন্ ! »; « লতা »-স্থলে « লতে », « নদী »-স্থলে « নদি » ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি দ্রষ্টব্য :—

(১) সংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দে (বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত করিয়া উচ্চারণ করিলেও), সম্বোধনে ও প্রথমায় কোনও পার্থক্য নাই; যথা—« মনুষ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, বালক, রাম, দেব, শিব, মহাদেব, কৃষ্ণ, নারায়ণ » ইত্যাদি।

(২) সংস্কৃত আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে, সম্বোধনে « আ »-স্থলে « এ » হয়; যথা—« লতা—লতে, রাধা—রাধে, সীতা—সীতে, ললিতা—ললিতে, গঙ্গা—গঙ্গে (পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে), সন্ধ্যা—সন্ধ্যে (অয়ি সন্ধ্যে !) » ইত্যাদি।

(৩) পুংলিঙ্গ « ই »-কারান্ত শব্দে, সম্বোধনে « ই »-স্থলে « এ » হয়; যথা—« হরি—হরে (হরে কৃষ্ণ, হরে রাম), সখি বা সখা—সখে, যদুপতি—যদুপতে, মুনি—মুনে » ইত্যাদি।

(৪) পুংলিঙ্গ « উ »-কারান্ত শব্দে, « উ »-স্থলে « ও »; যথা—« সাধু—সাধো, মনু—মনো, বন্ধু—বন্ধো, প্রভু—প্রভো, বিভু—বিভো, শম্ভু—শম্ভো » ইত্যাদি।

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ « ঈ »-কারান্ত শব্দে, « ঈ »-স্থলে « ই »: « নদী—নদি, উর্বশী—উর্বশি, দয়াময়ী—দয়াময়ি, জননী—জননি » ইত্যাদি।

(৬) স্ত্রীলিঙ্গ « ঊ »-কারান্ত শব্দে, « ঊ »-স্থলে « উ »: « বধূ—বধু » ইত্যাদি।

(৭) সংস্কৃত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ « ঋ »-কারান্ত শব্দে, সম্বোধনে « অঃ » হয় ; যথা—« পিতৃ, পিতা—পিতঃ ; মাতৃ, মাতা—মাতঃ ; ভ্রাতৃ, ভ্রাতা —ভ্রাতঃ ; বিধাতৃ, বিধাতা—বিধাতঃ » ইত্যাদি।

(৮) সংস্কৃত « অন্ »-অন্ত শব্দে সম্বোধনে « অন্ » হয় ; যথা—« রাজন্, রাজা—রাজন্ » ইত্যাদি।

(৯) « মৎ, বৎ (বা মন্ত্, বন্ত্) »-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে, « মন্, বন্ » (পুংলিঙ্গে), « মতি, বতি » (স্ত্রীলিঙ্গে) : « শ্রীমৎ, শ্রীমন্ত্—প্রথমায় শ্রীমান্, শ্রীমতী—সম্বোধনে শ্রীমন্, শ্রীমতি ; ভগবৎ, ভগবন্ত্ (ভগবান্, ভগবতী)—ভগবন্, ভগবতি ; আয়ুষ্মৎ, আয়ুষ্মন্ত্ (আয়ুষ্মান্, আয়ুষ্মতী) — আয়ুষ্মন্, আয়ুষ্মতি » ইত্যাদি।

(১০) « বস্ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে—« বন্ » : « বিদ্বস্ (বিদ্বান্)—বিদ্বন্ » ইত্যাদি।

(১১) « ঈয়স্ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে, « ঈয়ন্ » : « মহীয়স্ (মহীয়ান্)—মহীয়ন্ » ইত্যাদি।

(১২) « ইন্, বিন্ »-প্রত্যয়ান্ত শব্দে, « ইন্ » : « ধনিন্ (ধনী)—ধনিন্ ; মেধাবিন্ (মেধাবী)—মেধাবিন্ ; যশস্বিন্ (যশস্বী)—যশস্বিন্ » ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় প্রযুক্ত সংস্কৃত বিভক্তি

সংস্কৃতের দুইটী বিভক্তি বাঙ্গালায় সাধারণতঃ পত্রাদি-লিখন-কালে ব্যবহৃত হয় :

(১) সপ্তমী বা অধিকরণের বহুবচনে, পুংলিঙ্গে « -এষু », স্ত্রীলিঙ্গে « -আসু, ষু » (ব্যঞ্জনান্ত শব্দে « সু ») ; পত্রের শিরোনামায় নামের সঙ্গে এবং পত্রারম্ভে শিষ্টতা-সূচক শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। 'সমীপে' বা 'নিকটে', মোটামুটি এই অর্থে এই প্রয়োগ হয় ; যথা—« মহামহিম শ্রীযুক্ত

দেবকুমার রায় মহিমার্ণবেষু ; শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, সমীপেষু, মহাশয়েষু, স্নেহাস্পদেষু, প্রিয়বরেষু, ধর্মাবতারেষু, প্রতিপালকবরেষু ; সুচরিতাসু, মাননীয়াসু, সাবিত্রীসমানাসু, পূতশীলাসু » ইত্যাদি। ক্বচিৎ আরবী ও ফারসী শব্দেও এই « এষু, আসু » প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় ; যথা—« শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল কাদের চৌধুরী সাহেব বরাবরেষু ; হুজুরেষু, জোনাবেষু ; বেগম-সাহেবাসু ; ওয়ালিদা সাহেবাসু (—মাতৃদেবীষু) » ইত্যাদি।

(২) পত্রের আরম্ভে বা শেষে, « নিবেদন » এই শব্দ অথবা অনুরূপ শব্দের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য, লেখকের পদবী সংস্কৃত নিয়মে ষষ্ঠী বিভক্তিতে লেখার রীতি বাঙ্গালায় আছে ; যথা—পত্রের আরম্ভে : « যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন » অথবা « নমস্কারান্তে নিবেদন », বা পত্রের শেষে « ইতি নিবেদন », এইরূপ উক্তি যে পত্রলেখকের উক্তি, তাহা পত্রলেখক নাম সহি করিবার কালে নিজ নাম সংস্কৃত রীতিতে ষষ্ঠী-বিভক্তির করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করেন ; যথা—« (নিবেদন) শ্রীগৌরীশঙ্কর শর্মণঃ, দেবশর্মণঃ ('দেবশর্মা' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন) ; দেবস্য ; মিত্রস্য ; ঘোষস্য ; দাসস্য ; ঘোষদাসস্য ; গুপ্তস্য ; বর্মণঃ » ইত্যাদি ; স্ত্রীলিঙ্গে—« শ্রীমত্যাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ »।

প্রাচীন বাঙ্গালা চিঠি-পত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে স্ত্রীলোকের বিষয়-কর্ম-সম্বন্ধে কিছু কথা থাকিলে, প্রথমায় « শ্রীমতী......দেবী » (বা « দাসী »—ব্রাহ্মণেতর হইলে) ব্যবহৃত হইত ; কিন্তু অন্য কারকে বা পদে সংস্কৃতের ষষ্ঠীর রূপ « শ্রীমত্যাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ » এইগুলির আধারের উপরে গঠিত « শ্রীমত্যা, দেব্যা, দাস্যা » ব্যবহৃত হইত ; যথা—« শ্রীমত্যাকে, অমুক দেব্যার, অমুক দাস্যার » ইত্যাদি। সধবা বা কুমারী অপেক্ষা বিধবাগণকেই বেশীর ভাগ সম্পত্তি-পরিদর্শন অথবা -রক্ষা-হেতু এইরূপে নিজনাম ব্যবহার করিতে হইত বলিয়া, ক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় বিধবাগণের নামের সহিত, এমন কি প্রথমা-বিভক্তিতেও, « শ্রীমতী, দেবী, দাসী »-র পরিবর্তে « শ্রীমত্যা, দেব্যা, দাস্যা » এই কয়টী বিকৃত রূপ ব্যবহারের পদ্ধতি আসিয়া যায় ; যথা—« শ্রীমত্যা দুর্গামণি দেব্যা

(= বিধবা); মহামহিম রানী শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবী » ইত্যাদি। আজকাল « শ্রীমতী, দেবী, দাসী » অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এবং « শ্রীমতী……দেবী » যথারীতি প্রযুক্ত হয়; « দাসী » শব্দও অব্যবহৃত হইতেছে।

[৩.০৩৮] কর্মপ্রবচনীয় শব্দ, সম্বন্ধনীয়, অনুসর্গ বা পরসর্গ (Post-positions)

পূর্বে (পৃষ্ঠা ২৬০-৬১) বাঙ্গালা শব্দ-রূপে যে কতকগুলি পদ, কর্ম-প্রবচনীয় বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্থানীয় হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি ভিন্ন, অতিরিক্ত প্রদত্ত পদগুলিও বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাষায় উক্ত রূপে, ইংরেজী preposition-এর অর্থে, শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়।

(১) « আগে, আগেতে »: কবিতার ভাষায় অধিক পাওয়া যায়। 'সমক্ষে' অর্থে—অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত হয়; মূল অথবা ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে বসে; যথা—« রাজার আগে করিব গোহারী » (চণ্ডীদাস)।

(২) « উপর, উপরে »: ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত, অধিকরণে।

(৩) « ঘরে »: বহুবচনে, কর্ম, সম্প্রদান অথবা অধিকরণ-কারকে চলিত-ভাষায় কচিৎ প্রযুক্ত হয়, যথা—« ইংরেজদের ঘরে = ইংরেজদের মধ্যে »।

(৪) « ছাড়া »: 'ব্যতীত' অর্থে, মূল অবিকৃত শব্দে প্রযুক্ত হয়; যথা—« হুঁকা-ছাড়া, আমি-ছাড়া, আমা-ছাড়া (যথা—আমি-ছাড়া আর কেহ জানে না; আমা-ছাড়া আর কাহাকেও সে জানে না) »।

(৫) « নিমিত্ত »: চতুর্থীতে বা সম্প্রদানে, « জন্য » বা « হেতু » শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

(৬) « নীচে »: ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত, অধিকরণে।

(৭) « পাছে, পিছে »: ষষ্ঠ্যন্ত পদে, অধিকরণে।

(৮) « পানে » : 'দিকে' অর্থে ; মূল অথবা ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের উত্তর ব্যবহৃত হয়। « আমা-পানে, আমার পানে ; ঘর-পানে, ঘরের পানে »।

(৯) « পাশে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত।

(১০) « বই » (প্রাচীন বাঙ্গালায় « বহী, বহি ») : 'ব্যতীত' বা 'বাহির' অর্থে, মূল শব্দে যুক্ত হয়।

(১১) « প্রতি » : কর্ম- বা সম্প্রদান-কারকে, ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের উত্তর বসে।

(১২) « বিনা » (কবিতায় « বিনে, বিনি ») : সংস্কৃত অব্যয় শব্দ, 'ব্যতিরেক' অর্থে। শব্দের পরে ও শব্দের পূর্বে, উভয় প্রকারেই এই কর্মপ্রবচনীয়ের উপযোগ হইয়া থাকে। শব্দের পূর্বে আসিলে শব্দটীকে বিভক্ত্যন্ত করা হয় ; যথা— « হুকুম বিনা, অনুমতি বিনা ; বিনা হুকুমে, বিনা অনুমতিতে ; বিনা জানাশোনায়, জানাশোনা বিনা »।

(১৩) « বাহির, বাহিরে, *বা'র, *বের, *বাইর, বাইরে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত।

(১৪) « বিহনে » : কবিতার ভাষায়, অভাব বা অনবস্থান জানাইতে, মূল অথবা ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়।

(১৫) « ভিতর, ভিতরে » : ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত

(১৬) « মাঝ, মাঝে », কবিতায় ক্বচিৎ « মাঝারে » : মূল বা ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয় ; « বৃন্দাবন-মাঝে, মথুরাপুরের মাঝে, বন-মাঝে কি মন-মাঝে ; হৃদি-মাঝারে ('হৃদ্-মাঝারে'-স্থলে) »।

(১৭) « সঙ্গে » : ষষ্ঠী-বিভক্তির সহিত।

(১৮) « সাথে » : ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত, « সঙ্গে » শব্দের সম-পর্যায়ের। « সাথে » শব্দ বাঙ্গালা সাধু-ভাষার গদ্যে এবং চলিত-ভাষায় তেমন প্রচলিত নহে, কিন্তু কবিতায় বিশেষ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং আজকাল কবিতার প্রভাবে সাধু- ও চলিত-গদ্যে কেহ-কেহ ব্যবহার

করিতেছেন। এই অনুসর্গ চলিত-ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধ—চলিত-ভাষায় « সঙ্গে » ব্যবহার করাই উচিত।

(১৯) « সনে »: « সঙ্গে » ও « সাথে »-র সহিত সম-পর্যায়ের শব্দ, মূল বা ষষ্ঠ্যন্ত রূপের সহিত প্রযুক্ত হয়; কেবল কবিতায় মিলে।

(২০) « সওয়া, সহা, সেওয়া » (আরবী শব্দ, ফারসীর মারফৎ বাঙ্গালায় আসিয়াছে): « বিনা » শব্দের সহিত সম-পর্যায়ের। মূল বা ষষ্ঠ্যন্ত রূপের সহিত প্রযুক্ত হয়।

(২১) « বেগর » (ফারসী শব্দ, মূলে আরবী): « বিনা »-র সহিত সম-পর্যায়ের। মূল শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা—« বেগর ছাতা (বা ছাতা বেগর) জামা বা কেদারা »।

[৩.০৩৯] কারক-বিভক্তির প্রয়োগ

[১] কর্তৃকারক

যে ব্যক্তি বা বস্তু কোনও অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, বা কোনও কার্য করে, অথবা অপর ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্যে কোনও কার্য করায়, তাহাকে বাক্যের 'কর্তা' বলা হয়। 'কর্তা,' বাক্য-স্থিত অন্য পদ হইতে পৃথক্ বা নির্লিপ্ত থাকিয়া, মাত্র ক্রিয়ার সহিত মিলিত-ভাবে সম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশ করে। বাক্য-স্থিত ক্রিয়া-পদের পূর্বে, 'কে' অথবা 'কি' (অর্থাৎ 'কোন্ বস্তু') যোগ করিয়া প্রশ্ন করিলেই, উত্তর-দ্বারা কর্তা নির্ধারিত হইয়া থাকে; যথা—« পাখী ডাকিতেছে »; প্রশ্ন—« কে বা কি ডাকিতেছে? »; উত্তর—« পাখী »: « পাখী » শব্দ এখানে কর্তা। « খোকা ঘুমাইল »; « কে ঘুমাইল? »—« খোকা »: « খোকা » শব্দ এই বাক্যের কর্তা। « তাহার খুড়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন »—« পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হওয়া » এই ক্রিয়ার কর্তা « খুড়া » শব্দ।

যে কার্য করায় তাহাকে « প্রয়োজক কর্তা » বলে; যথা—« শিক্ষক

মহাশয় বালকদিগকে পড়াইতেছেন »: «শিক্ষক মহাশয়» প্রয়োজক কর্তা। «মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন»—«মা» প্রয়োজক কর্তা।

সমাপিকা-ক্রিয়া ব্যতিরেকে, অসমাপিকা-ক্রিয়ারও কর্তৃ-রূপে বিশেষ্য বা সর্বনাম পাওয়া যায়; যথা—«রাম আসিলে যদু যাইবে; আমি যাইতে-না-যাইতে ব্যাপারটা হইয়া গেল»।

ব্যাকরণে বাক্যের ভঙ্গী আলোচিত হয়; বাক্য-গত অর্থ অপেক্ষা, অর্থের প্রকাশ-রীতিই হইতেছে ব্যাকরণের বিচার্য। «এ কাজ তাহার দ্বারা হইয়াছে»—এই বাক্যের অর্থ, «এ কাজ সে করিয়াছে»। «তাহার দ্বারা» এই বাক্যাংশকে অনেকে 'কর্তরি তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্তৃকারকে তৃতীয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবিক পক্ষে, «সে» হইতেছে 'কর্তা'। কিন্তু যেভাবে প্রথম বাক্যটী গঠিত হইয়াছে, তাহাতে «কাজ» শব্দটির উপর একটু জোর দেওয়া হইয়াছে—: «কি হইয়াছে?»—«কাজ»; «কাজ» শব্দ এখানে 'কর্তা'। তদ্রূপ «রামের ভাত-খাওয়া হইল না»: «কি হইল না?»—«ভাত-খাওয়া»; কার্য-বাচক বিশেষ্য-পদ «খাওয়া» বা «ভাত-খাওয়া» এখানে কর্তা। «আমা-হইতে এ কাজ হইবে না»: «কি হইবে না?»—«কাজ»—«কাজ» শব্দ কর্তা, «আমা-হইতে»—অর্থে করণ-কারক, রূপে কিন্তু পঞ্চমী বা অপাদান-কারক। সমার্থক বাক্য: «আমি এ কাজ করিতে পারিব না, বা করিব না»—ইহাতে «আমি» কর্তা। «আমা হ'তে এ কার্য হবে না সাধন»—«কি হবে না?», «কার্য-সাধন» এখানে কর্তা (এ ক্ষেত্রে «কার্য-সাধন হবে না» অথবা «কার্য সাধন-হবে না»—এই দুই রকমে বাক্যটিকে ধরা যায়; পরে দ্রষ্টব্য, § «সংযোগ-মূলক ধাতু»)।

«তাহাকে এই কাজ করিতে হইবে», «রামের গেলে হয় (ক্বচিৎ, রাম গেলে হয়)»—এইরূপ স্থলে, প্রাচীন বাঙ্গালার মূল বাক্য-রীতি অনুসারে, ক্রিয়ার «ভাবে প্রয়োগ» হইয়াছে; অর্থাৎ, এখানে ক্রিয়া যেন কর্তার অপেক্ষা করে না, কর্তৃ-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল ক্রিয়ার স্বতঃ-সিদ্ধ ভাবের প্রকাশ হইতেছে। উপরের দুইটী বাক্যের বিশ্লেষ না করিলে, এগুলির বিচার করা যাইবে না—

(১) সংস্কৃত—«তত্র কুতঃ, এতৎ কার্যং কুর্বতা ভবিতব্যম্»; প্রাকৃত—«তস্স কএ এদং কজ্জং করন্তেণ হোদব্বং»; অপভ্রংশ—«তাহ কই এহং কজ্জং করন্তহি হোঅব্বং»; বাঙ্গালা—«তাহাকে এ কাজ করিতে হইবে»

(অর্থাৎ « তৎ-সম্পর্কে, বা তদ্বিষয়ে, অথবা তাহার-কথা-যদি-ধরা-যায়, এ কাজ সে-করিয়াছে-এরূপ-অবস্থায় তাহাকে-থাকিতে-হইবে » ; এখানে « হইবে »-র কর্তা উহ্য, এবং « তাহাকে » এই চতুর্থ্যন্ত পদকে, « হইবে » ক্রিয়ার কর্তা বলা চলে না।)

(২) সংস্কৃত—« রামস্য গমনেন ভূয়তে » বা « রামে গতে, ভবতি » ; প্রাকৃত—« রামস্‌স-কেরকেণ গমণেণ হুবীঅদি » বা « রামে গদে, হোদি » ; অপভ্রংশ—« রামহ-এর গঅণইঁহি হুঈঅই » বা « রামি গঅইঁহি হোই » ; বাঙ্গালা—« রামের গেলে হয় » বা « রাম গেলে হয় »।

(অর্থাৎ « রামের গমন-কর্ম-দ্বারা অবস্থা-বিশেষ-সংঘটিত-হয় », বা « রাম-যদি-যায়-তাহা-হইলে ইহা-হয় »।)

আধুনিক বাঙ্গালার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপরের বাক্যগুলির এইভাবে ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত মনে হয়—« করিতে », « গেলে », এগুলি বিশেষ-রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়া-পদ, যথা-ক্রমে « হইবে » এবং « হয় » ক্রিয়ার কর্তা, « তাহাকে » ও « রামের » এই দুই পদকে প্রথমা-স্থলে দ্বিতীয়া- ও ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত কর্তৃকারকের পদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক হইবে না (যদিও « রামের » পদকে সাধারণতঃ কর্তায় ষষ্ঠী বলা হয়)। তদ্রূপ—« যুবকটীকে বলবান্ দেখায় »—এখানেও এই impersonal বা ভাবে প্রয়োগ বিদ্যমান: « যুবকটীকে » = দ্বিতীয়া, অর্থ, 'যুবকটী-সম্পর্কে, যুবকটীর-বিষয়-ধরিলে' ; « দেখায় » ক্রিয়া-পদের কর্তা « ইহা, এইরূপ » ইত্যাদি পদ বা খণ্ড-বাক্য উহ্য (« যুবকটীর-বিষয়ে, সে-বলবান্ এইরূপ-প্রতীয়মান হয় ») ; « তাহাকে কি তোমার মনে পড়ে »—« তাহার-সম্পর্কে কি তোমার মনে কিছু-বা-কোনও-ভাব-আইসে ? »।

কর্তৃকারকের বিভক্তির প্রয়োগ

পুরাতন বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে বিভক্তি-হীন রূপ, এবং বিকল্পে « -এ » বিভক্তির প্রয়োগ, উভয়ই রীতি-সিদ্ধ ছিল। আধুনিক বাঙ্গালায় « -এ »-কারের প্রয়োগ কম হইয়া আসিতেছে ; যথা—আধুনিক বাঙ্গালায় « মা বলেন » ; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় ও আধুনিক কথ্য ভাষায়—« মায়ে বলে »। সপ্তমী-বিভক্তি (অধিকরণ-কারকে) « -এ » এবং « -তে » উভয়ই থাকায়, এবং প্রথমায় « -এ »-কার বিভক্তি থাকায়,

« -এ »-কারের সমার্থক প্রত্যয়-হিসাবে সপ্তমীর « -তে » প্রথমাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। এই ব্যাপার আধুনিক বাঙ্গালায় ঘটিয়াছে ; যথা—« ঘোড়া ঘাস খায়, ঘোড়ায় (=ঘোড়াএ) বা ঘোড়াতে ঘাস খায় ; গোরু (গোরুতে) লাঙ্গল টানে ; বাঘ (বাঘে, কচিৎ বাঘেতে) মানুষ মারে ; মূর্খে (মূর্খেতে) কি না বলে » ইত্যাদি।

প্রবাদাত্মক বাক্যে প্রাচীন ভাষার রীতি বজায় থাকে বলিয়া, এইরূপ বাক্যে বহু সময়ে কর্তৃকারকে « -এ »-কার পাওয়া যায় ; যথা—« রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মরিবে ; 'গাধায় খায় পাকা কলা, শূয়রে খায় পান' ; মানুষে ভাবে এক, হয় আর ; বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ; পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় ; মায়ে-ঝীয়ে আসিবে » ইত্যাদি।

যেখানে কর্তা সুনির্দিষ্ট নহে, এবং ক্রিয়ার নিত্যতা অথবা সম্ভাবনা বুঝায় ; অথবা কর্তায় যেখানে করণের, অপাদানের, অথবা অধিকরণের ভাব থাকে ;—সেখানে « -এ » (« -তে ») প্রত্যয় প্রায়ই পাওয়া যায় ; যথা—« শাস্ত্রে বলে চোরে চুরি করে ; গাধায় ধোবার বোঝা বয় ; স্রোতে নৌকাখানিকে উল্টাইয়া দিল » ইত্যাদি।

কর্তায় বহুত্বের আভাস বা স্পষ্ট নির্দেশ হইলে, কতকগুলি শব্দে « -এ » আসে : « লোকে বলে ; দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ ; সবে মিলি ভারত-সন্তান ; অনেকেই এ রকম করে ; বিপদে পড়িলে সকলেই ঈশ্বর-স্মরণ করে (বা ঈশ্বরকে স্মরণ করে) » ইত্যাদি।

অন্যোন্য অর্থে, এবং সহযোগিতা-স্থলে, দুই কর্তার প্রয়োগ হইলে, « -এ » বিভক্তি (বা « -তে » বিভক্তি) সাধারণতঃ উভয় কর্তাতেই আইসে ; তবে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে প্রথম কর্তায় বিভক্তি না দিলেও চলে ; যথা—« ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই করে ; উকীলে ব্যারিস্টারে বহস (তর্ক) করিতেছে ; ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে না ; ছেলের বুড়োয় (অথবা

ছেলে বুড়োয়) দৌড়া'ল; পিতাপুত্রে (বা বাপ-বেটায়) ছুটিয়া আসিল »। কচিৎ ব্যক্তি-বাচক নাম কর্তৃরূপে আসিলে, « -এ »-বিভক্তির প্রয়োগ হয় না; যথা—« রাম আর শ্যাম মুখ দেখাদেখি করে না; যদু আর গোপাল খাতা দেখাদেখি করিতেছে; লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধী পরস্পর (পরস্পরে) এ বিষয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন » ইত্যাদি।

সংখ্যা-বাচক শব্দ-দ্বারা বিশেষিত কর্তার « -এ » বিভক্তি যুক্ত হইলে, কর্তার সাফল্য বা সমগ্রতা অথবা সম্মিলিতত্বের ভাব প্রকাশ করে, এবং কর্তার সুপরিচিতত্বেরও ঈষৎ দ্যোতনা করে; যথা—« তাহারা দুই জন চলিয়া গেল—তাহারা দুইজনে চলিয়া গেল; পাঁচ জন খাইবে—পাঁচ জনে খাইবে » ইত্যাদি।

[২] কর্মকারক

কর্তা হইতে ক্রিয়ার কার্যের ধারা যাহাতে প্রসৃত বা ব্যাপ্ত হয়, কিংবা যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার কার্য হয়, অথবা যদ্দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, তাহাকে **কর্মকারক** বলে। ক্রিয়াপদের উত্তরে, « কি ? » বা « কাহাকে ? » এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কর্মপদকে জানা যায়; যথা—« রাম ভাত খাইতেছে: কি খাইতেছে?—ভাত »—« ভাত » কর্মকারক; « রামকে ডাক; গোপাল গল্প বলিবে; যদু বইখানি পড়ে নাই; আমায় দুইটী টাকা দাও; মুটিয়া আরও বেশী মজুরী চাহিতেছে; বাবা আমার জন্য কমলালেবু আনিবেন; নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র আবিষ্কার করেন; আলেক্সান্দর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন; গাই দুধ দেয় » ইত্যাদি।

কতকগুলি অবস্থা-বাচক ক্রিয়ার উত্তর কর্ম মিলে না—এগুলি

« **অকর্ম্মক-ক্রিয়া** »; যথা—« খোকা ঘুমাইতেছে; একথা শুনিলে লোকে খুব হাসিবে; সে আসিল না »। অকর্ম্মক-ক্রিয়ার ভাবকে ভাঙ্গিয়া, « কর্ » বা অন্য ধাতু-যোগে, বাক্যটীকে সকর্ম্মক করা যাইতে পারে; যথা—« খোকা, ঘুম কর; এত হাস্য করা উচিত নহে »। স্থান-, কাল- বা পরিমাণ-বাচক শব্দ, গমন, ভ্রমণ প্রভৃতি অর্থযুক্ত কতকগুলি অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর আপাত-দর্শনে কর্ম্মরূপে পাওয়া যায়; যথা—« তিন দিন পথ চলিল; সারারাত জাগিয়া কাটাইয়াছি; যুদ্ধ সমস্ত দিন চলিল; এক ক্রোশ ঘুরিয়া তবে বাড়ী পহুঁছিলাম; সে উঁচু তিন হাত লাফাইয়াছে » ইত্যাদি।

বহুক্ষেত্রে অকর্মক ক্রিয়ার **সম-ধাতুজ কর্ম** (Cognate Object) হইয়া থাকে। এইরূপ সম-ধাতুজ কর্ম প্রায়ই বিশেষণ-যুক্ত হইয়া থাকে, এবং এই কর্ম-দ্বারা ক্রিয়ার কার্যের আতিশয্য, বা গভীরতা, অথবা অন্য বিশেষ গুণ বুঝানো হইয়া থাকে; যথা—« কি মারটাই তাহাকে মারিল; খুব ঠকান্ ঠকাইয়াছে; সে কেবল একটু দেঁতো হাসি হাসিল; ছেলেটীর মা বুক-ফাটা কান্না কাঁদিল; আর তোমার মায়া-কান্না কাঁদিতে হইবে না; তুরকী-নাচন নাচিল; কাষ্ঠ-হাসি হাসিল; আমি গভীর ঘুম ঘুমাইলাম; চারদিক্ জাজ্বল্যমান রাখিয়া বুড়ী খুব মরাই মরিয়াছে; এমন চোরের মত থাকা থাকিতে চাই না » ইত্যাদি।

সকর্মক ক্রিয়ার সহিতও সম-ধাতুজ কর্ম ব্যবহৃত হয়; যথা—« বয়স হ'ল তিন কুড়ি দশ, ঢের দেখা দেখেছি; তাঁহার বাড়ীতে বহু ভোজে অনেক খাওয়া খাইয়াছি » ইত্যাদি।

কখনও-কখনও সমাপিক ক্রিয়ার দুইটী কর্ম থাকে, উহাদের মধ্যে একটাকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া অপরটার দ্বারা কিছু বলা হয়, বা অপরটাকে প্রথমটার উপরে আরোপ করা হয়; যথা—« হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া সম্মান করে; (পাথরকে সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তর বা অশ্ম বলে) মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া পূজা

করিবে ; দিনকে রাত, রাতকে দিন করিয়াছে ; অর্থকেই অনর্থের মূল জানিবে ; 'ঘর কৈনু (=করিলাম) বাহির, বাহির কৈনু ঘর—পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর' ; ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম-কে পঞ্চভূত বলে »—এই বাক্যগুলিতে, « বুদ্ধদেব, পাথর, মাতাপিতা, দিন, রাত, অর্থ, ঘর, বাহির, পর, আপন, ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম » এই পদগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্য শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে ; এইরূপ কর্ম-পদকে **উদ্দেশ্য-কর্ম** বলে ; এবং আরোপিত অন্য কর্মকে **বিধেয়-কর্ম** বলে। উদ্দেশ্য-কর্ম বিভক্তি-যুক্ত হইয়া থাকে, বিধেয়-কর্ম তদ্রূপ হয় না। উদ্দেশ্য-কর্মে কর্মের বিভক্তি যোগ না করিলে উহা প্রকৃতিতে কর্তৃকারক হইয়া দাঁড়ায়, এবং বিধেয়-কর্ম উহার বিধেয়-বিশেষণ হইয়া পড়ে ; যথা—« অর্থকে অনর্থের মূল জানিবে »=« অর্থ (হইতেছে) অনর্থের মূল, (ইহা) জানিবে »।

« দেওয়া, বলা, প্রশ্ন করা » প্রভৃতি অর্থযুক্ত সকর্মক ক্রিয়ার কোনও-কোনও স্থলে দুইটা কর্ম থাকে ; ণিজন্ত বা প্রযোজক ক্রিয়াও তদ্রূপ। এই দুইটা কর্মের একটাকে **মুখ্য-কর্ম** (Direct Object) ও অন্যটাকে **গৌণ-কর্ম** (Indirect Object) বলে। মুখ্য কর্ম না থাকিলে, ক্রিয়ার কার্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না ; গৌণ-কর্মের উপর দিয়া অথবা ইহার সহায়তায় ক্রিয়ার কার্য নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু গৌণ-কর্ম না থাকিলে ক্রিয়ার কার্য সম্পূর্ণ হইতে বাধা থাকে না। « কি ? » এই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য-কর্ম, এবং « কাহাকে ? কাহার জন্য ? » এই প্রশ্নের উত্তরে গৌণ-কর্ম মিলে ; যথা—« লক্ষ্মণ চিত্রপট প্রসারিত করিয়া রামচন্দ্রকে দেখাইলেন ; ছাত্রটীকে শিক্ষক মহাশয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; আমাকে একটী গান শোনাও ; গোরুটাকে জাব দাও ; মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন ; জিজ্ঞাসিব এই কথা জনে জনে » ইত্যাদি।

মুখ্য-কর্মে কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না। গৌণ-কর্মে « -এ (-য়), -কে, -রে » বিভক্তি যুক্ত হয় ; বহুস্থলে গৌণ-কর্ম সম্প্রদান-কারক হইতে অভিন্ন।

কর্মকারকের বিভক্তির প্রয়োগ

(১) দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় মুখ্য- ও বিধেয়-কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় না, গৌণ- ও উদ্দেশ্য-কর্মেই হয় ;—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। একবচন ও বহুবচন, উভয়েই এক নিয়ম।

(২) অপ্রাণিবাচক বা অচেতন পদার্থে, তথা ক্ষুদ্র প্রাণিবাচক শব্দে, সাধারণতঃ বিভক্তি যুক্ত হয় না ; যথা—« বই আনিয়াছ? ফুল তুলিতেছে ; হাত ধোও ; পিঁপড়ে দেখ্‌ছ বুঝি? আল্‌কাৎরা দিয়া উইপোকা নিবারণ করে ; বইখানা ধরো ; ও ফুলটা তুলিও না ; হাত দুটা ধোও গিয়ে ; পিঁপড়েগুলি মেরো না ; জলটুকু খাইয়া ফেলো ; ছুঁচো মেরে হাত কালি করা ; সাগর শুষিয়া ফেলিল ; কি মাছ কুটিতেছে ; পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার? » ইত্যাদি।

কিন্তু বিশেষ-ভাবে কর্মকে নির্দেশ করিতে হইলে, « -কে » বা « -রে » বিভক্তি ব্যবহৃত হয় ; যথা—« আগে বেশ ক'রে হাতটাকে ধুয়ে এস', তার পরে ওষুধ লাগাবে ; মাছটাকে বেশ ছোট-ছোট ক'রে কুট্‌বে ; দুধটুকু ম'রে ক্ষীর হ'য়েছে (কিন্তু, এই দুধটুকুকে মেরে ক্ষীর ক'রে রেখো); জগন্নাথ (=জগন্নাথ মূর্তি) দেখ (কিন্তু, জগন্নাথকে ডাকো—শক্তিশালী দেবতা জগন্নাথকে, অথবা জগন্নাথ নামক ব্যক্তিকে) » ইত্যাদি।

(৩) প্রাণিবাচক শব্দ হইলে, কর্ম যদি অনির্দিষ্ট থাকে, অথবা যদি কেবল জাতি নির্দেশ করে, কিংবা কোনও বিশেষণ-দ্বারা যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেখানে বিভক্তির যোগ হয় না। কিন্তু কর্মপদকে যেখানে সুনির্দিষ্ট করিবার আবশ্যক হয়, কিংবা কর্মপদ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়া যেখানে সুনির্দিষ্ট, সেখানে কর্ম-বিভক্তি যুক্ত হয়। পূর্বে উল্লিখিত গৌণ- ও উদ্দেশ্য কর্ম কতকটা নির্দেশাত্মক বলিয়া, এগুলিতেও কর্মকারকের বিভক্তি আইসে। বহুবচনে কর্মকারকে সর্বত্রই বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে।

কর্মকারকের বিভক্তিগুলির মধ্যে, «-কে» সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় সাধারণ; «-রে» কবিতায় বেশী প্রযুক্ত হয়, কচিৎ চলিত ভাষায় এবং সংস্কৃত-বহুল সাধু-ভাষায় মিলে; এবং «-এ, (-য়)» গদ্যে ও পদ্যে সর্বনাম শব্দে, এবং কবিতায় তথা প্রাচীন প্রবাদাদি উক্তিতে বিশেষ্য-শব্দে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ—« কি দেখিতেছি—মানুষ দেখিতেছি, না গাছ? ; বাঘে (বা বাঘ) মানুষ মারে; এমন মানুষ (এমন অদ্ভুত মানুষ, ভালো মানুষ) কখনও দেখি নাই; মানুষটাকে ডাকো; মুটে ডাকো (=যে কোনও একজন অনির্দিষ্ট মুটে); মুটকে (মুটেদের) পয়সা দাও (=যে মুটে উপস্থিত আছে); রাখাল গোরু চরায় (=সাধারণ-ভাবে); গোরুটাকে গোহালের ভিতরে লইয়া আইস; রামকে দেখিতেছি না? ছেলে নাও,—ছেলেকে (=এই ছেলেটাকে) নাও; আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই (=অপ্রাণিবাচক গঙ্গা নদী)—গঙ্গাকে (=গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রী বিশিষ্ট দেবীকে) প্রণাম করো; হিমালয় দেখিয়া আসিলাম; তাহারে ডাকিয়া আনো; রাজকুমার সসম্ভ্রম-প্রণিপাত-পূর্বক ঋষিরে আহ্বান করিলেন; 'আমারে করহ তোমার বীণা'; 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস' সুদর্শনধারী মুরারে'; আমায় মারছ কেন? তোমায় দেখলেও পাপ » ইত্যাদি।

কবিতায় «-এ» বা «-য়» বিভক্তি-যুক্ত কর্মপদের উদাহরণ—« মানুষ হইয়া তুমি জিনিলে রাবণে; কৃষ্ণে ভাবি মনে; দেহ মোরে সরস বচনে; বৃথা গঞ্জ দশাননে; ষোল উপচার দিয়া, ছাগল মহিষে; ভজো মন নন্দঘোষের নন্দনে » ইত্যাদি।

« লোহা পিটিয়া হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে—লোহাকে পরিবর্তিত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করে; সোনা গলাইয়া গহনা করে—সোনা বা সোনাকে পিটিলে সোনার পাত প্রস্তুত হয় » —এরূপ ক্ষেত্রে বিকল্পে বিভক্তির ব্যবহার চলে।

বিভক্তি-বিহীন রূপই কর্মকারকের—অচেতন-চেতন-নির্বিশেষে—সমস্ত মুখ্য-কর্মে প্রকৃত রূপ; প্রাচীনকালে বাঙ্গালায় এই বিধিই ছিল; যথা—« যীশু ভজ গিয়া; বন্দো মাতা সুরধুনী; পূর্বদিকে বন্দিলাম দেব দিবাকর; গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা;

গুরু-পুছিয়া জাণ (=গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানো) » ইত্যাদি। পরে সম্প্রদান-কারকের বিভক্তি « -কে, -রে » আসিয়া, প্রথমে গৌণ- ও উদ্দেশ্য-কর্ম এবং অবশেষে সুনির্দিষ্ট মুখ্য-কর্মেও প্রযুক্ত হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন, কোনও বিশেষ অর্থ প্রকাশ না করিয়াও, অধিকরণ-কারকের (সপ্তমীর) বিভক্তি « -এ » কর্ম-কারকে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

[৩] করণকারক

কর্তা যাহার সাহায্যে কার্য সম্পাদন করে, তাহাকে **করণ**-কারক বলে। কর্তা কার্য করে; কিন্তু যেখানে কোনও পদার্থ এই কার্যে সাধন- বা উপায়-রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই করণ-পদ-বাচ্য। ক্রিয়ার পূর্বে « কিসের, বা কাহার দ্বারা », অথবা « কিসের, বা কাহার সাহায্যে », কিংবা « কিসে » ইত্যাদি যোগ করিয়া প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তরে করণ-কারক পাওয়া যাইবে; যথা— « হাতে মাথা কাটে »: « কিসে কাটে?—হাতে » — « হাতে » করণ-কারক; তদ্রূপ, « কলম দিয়া লিখিয়াছি: কিসে, বা কিসের সাহায্যে, লিখিয়াছি?—কলম দিয়া »।

করণ-কারক নানা অর্থে হয়; যথা—

[১] **সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণ:** « ছুরী দিয়া পেন্‌সিল কাটো; কুঠার-দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করে, কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটে; পা দিয়া সরাইয়া দিল; চোখে দেখ না? আমরা কানে শুনি; জাহাজে করিয়া সাগর পার হয়; কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে; 'হট্টমালার দেশে, তারা গাই-বলদে চষে'; আলোয় আঁধার কেটে যায়; হাওয়ায় মেঘ উড়ে' যায়; মন দিয়া (=মনের সাহায্যে) পড়ো; কড়িতে (বা টাকায়) বাঘের দুধ মিলে; সোজা পথে চলো না কেন? এক ঘায় শেষ ক'রে দিলে; এই পথ দিয়া আসিব; কলিকাতা দিয়া আসিব; হাতে (গোরুতে, বাষ্পে) কল চালানো হয়; 'দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার হবে না, হবে না'; ঘিয়ে ভাজা » ইত্যাদি।

[২] **উপায়াত্মক করণ** : বাস্তব বা পার্থিব, বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু যেখানে কার্যের সাধন হয় না, সেখানে উপায়াত্মক করণ হয়; যথা—« পরিশ্রম-দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্বাহ কর ; ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে ; সময়ে সবই হয় ; কালে মানুষ পুত্রশোকও ভুলিয়া যায় » ইত্যাদি।

[৩] **হেতুময় করণ** : ইহা উপায়াত্মক করণেরই পর্যায়-ভুক্ত ; যথা—« 'ভয়ে ভুলে' যাই দেবতার নাম' ; তোমার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদিবে ; আনন্দে তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল ; বড় দুঃখে এতগুলি কথা বলিলাম ; গোলমালে (গোলেমালে) তাহার টাকা কয়টা চুরি গেল ; তোমার সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথী ; সেবায় তুষ্ট » ইত্যাদি।

[৪] **কালাত্মক করণ** : « তিন দিনে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল ; দুই দণ্ড চ'লে যায় দুই দিনের পথ »।

[৫] **উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণ** : « রাম নামে একটী ছেলে ; 'দুখের বেশে এসেছ ব'লে, তোমারে নাহি ডরিব হে' ; শিকারী বিড়াল গোঁফে চেনা যায় ; ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র বুঝা যায় ; জাতিতে ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু কাজে অতি পাষণ্ড ; বিদ্যায় বৃহস্পতি ; ক্ষমায় বা ধৈর্যে পৃথিবী-সম ; বীরত্বে অর্জুন, শক্তিতে ভীম » ইত্যাদি। (কোনও-কোনও স্থলে এরূপ প্রয়োগকে অধিকরণ-কারক বলা চলে)।

কোনও-কোনও বাক্যে একাধিক করণ থাকে ; যথা—« মা নিজ হাতে ঝিনুক দিয়া (ঝিনুকে করিয়া) ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন ; সে এক মনে তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছে ; সে চোখে-মুখে কথা কহিতেছে » ইত্যাদি।

যেখানে অপরের পরিচালনায় কোনও কার্য করা হয়, সেখানে করণ-কারকে « কর্তৃক » প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না, « দিয়া («দিয়ে) » প্রত্যয়ই সেখানে চলে।

করণ-কারকের বিভক্তির প্রয়োগ

(১) করণের নিজ বিশিষ্ট বিভক্তি হইতেছে «এ (য়ে, য়)»। সাধারণ বিশেষ্য শব্দে এই «এ (য়ে, য়)» যুক্ত হয়; এবং «এ»-র পর্যায়ভুক্ত— «তে» প্রত্যয়ও আইসে; যথা—«আগুনে সিদ্ধ কর; কলমে লিখ; বইয়ে নাগাল পায়; খইয়ে পেট ভরে না; টাকায় (টাকাতে) সব হয়; এ রকম ছেলের চেয়ে মেয়েয় (মেয়েতে) বংশের মুখ রক্ষা হয়»। «-এ (য়ে, য়)» প্রত্যয় একটু প্রাচীনগন্ধী; ব্যক্তি-বাচক বিশেষ্যে ইহার প্রয়োগ কমিয়া আসিতেছে।

(২) প্রায় তাবৎ শব্দে «দ্বারা» যোগ হয়। «দ্বারা» ষষ্ঠী বিভক্তির পরেও আসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যথা— «মূর্খ-দ্বারাই (মূর্খের দ্বারাই) এ কাজ সম্ভবে; বুদ্ধি-দ্বারা (বুদ্ধির দ্বারা) অসাধ্য-সাধন করা যায়; সেবা-দ্বারা মাতাপিতাকে তুষ্ট করিবে; পুষ্প-দ্বারা দেব-পূজা হয়; মৌলবী-সাহেব-দ্বারা আর বেশী ক্লাস করানো চলিবে না» ইত্যাদি। তদ্রূপ— «পণ্ডিতদিগের দ্বারা, পণ্ডিতদিগ-দ্বারা; পুষ্পসমূহ-দ্বারা»। সাধারণতঃ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উত্তর «দ্বারা» -প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়, কিন্তু অন্য শব্দে প্রযুক্ত হইতেও বাধা নাই।

(৩) সাধারণতঃ ব্যক্তি-বাচক সংস্কৃত শব্দের সহিত «কর্তৃক» পদ প্রযুক্ত হয়। «কর্তৃক» মূল অবিকৃত শব্দেই যুক্ত হয়, ষষ্ঠ্যন্ত রূপে নহে। «দেবতা-কর্তৃক, পণ্ডিতগণ-কর্তৃক, রাম-কর্তৃক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক প্রণীত» ইত্যাদি।

(৪) «দিয়া»: একবচনে সর্ব শ্রেণীর বিশেষ্যের উত্তর করণ-কারকে «দিয়া (দিয়ে)» প্রযুক্ত হয়; যথা— «নিজের লোক দিয়া কাজটা করাইয়া লইবে; তেঁতুল দিয়া অম্বল (অম্ল) রাঁধে; এ বুদ্ধি দিয়া কিছু হইবে না» ইত্যাদি।

কেবল ব্যক্তি-বাচক শব্দে « কে (রে) » প্রত্যয়ান্ত কর্ম- বা সম্প্রদান-কারক-যুক্ত রূপের উত্তর « দিয়া (* দিয়ে) » ব্যবহৃত হয়; যথা—« চাকরকে দিয়া; ব্রাহ্মণকে দিয়া জল তুলাইবে না; উকিলকে দিয়া মোকদ্দমা চালাইবে » ইত্যাদি।

ব্যক্তি-বাচক ব্যতীত অন্য বিশেষ্যে বহুবচনে « কে (রে) » -প্রত্যয়-যুক্ত না করিয়াই « দিয়া (* দিয়ে) » ব্যবহৃত হয়; যথা— « ফুলগুলি দিয়া কি হইবে? »। কিন্তু ব্যক্তি-বাচক শব্দে « কে » যোগ করিয়া, অথবা অন্য উপায়ে শব্দটীকে দ্বিতীয়ান্ত বা চতুর্থ্যন্ত করিয়া, তবে « দিয়া (* দিয়ে) » যোগ হইয়া থাকে; যথা—« চাকরদিগকে দিয়া (* চাকরদের দিয়ে) কোনও কাজ ঠিক-মত হইবার নহে »।

সাধারণতঃ অসংস্কৃত শব্দের সঙ্গেই « দিয়া (* দিয়ে) » -প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত-পদ « দ্বারা, কর্তৃক » -ব্যবহারই প্রশস্ত।

(৫) করণ-বিভক্তির লোপ :

ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক ধাতুর যোগে করণ-কারকে বহুশঃ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না—করণ-কারককে আকারে বিভক্তি-বিহীন কর্ম-কারকবৎ দেখায়; যথা— « বেত মারিল; লাঠি মারিল; বেতের, লাঠির, ছাতার বাড়ি (—যষ্টি) মারিল; ঠেঙ্গা মারিল; বাড়ি মারিল » (কিন্তু « খড়্গে বা খাঁড়ায় কাটিল »)। প্রসারে— « ইটের বাড়ি মাথা ভাঙ্গিয়া দিব; পাশা খেলে; তরবারি খেলে; তাস, ফুটবল খেলে। » ক্রীড়ার্থক বা প্রহারার্থক ধাতুর প্রয়োগ না হইলে, বিভক্তি আসে; যথা— « পাশায় সে হারে না; তরবারি-খেলায় সে চতুর; বিদ্যায় বড়, বয়সে তরুণ; শোভা, শ্রী ও সৌন্দর্যে মনোমোহন »।

(৬) পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর বিভক্তি-দ্বারা কচিৎ করণ-কারকের ভাব প্রকাশিত হয়; যথা— « অস্ত্রের আঘাত; জলের লেখা; কালির দাগ;

নখের আঁচড় ; তাসের খেলা ; পুত্র হইতে (=পুত্র-দ্বারা) যেন বংশ উজ্জ্বল হয় ; 'আমা-হ'তে (=আমার দ্বারা) এই কার্য হবে না সাধন' » ইত্যাদি।

কখনও-কখনও করণ- ও অধিকরণ-কারকের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয় করা কঠিন হইয়া থাকে। এই হেতু, অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি « তে », করণ-কারকের জন্যও প্রসার লাভ করিয়াছে ; যথা— « আকাশ মেঘে ঢাকা ; পীড়ায় দুর্বল ; এই কাহিনী ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য ; তোমার মহিমা যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ; নৌকাতে নদী পার হয় ; দুঃখে (দুঃখেতে) চিত্ত যাহার বিচলিত হয় না » ইত্যাদি।

[৪] সম্প্রদান-কারক

স্বত্বত্যাগ করিয়া যাহাকে কিছু দান করা যায়, অথবা যাহার জন্য বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান-কারক বলে। « কাহাকে, কাহার জন্য, কাহার তরে » ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান-কারক পাওয়া যায়।

সংস্কৃতে সম্প্রদান-কারকে বিশেষ বিভক্তি আছে, বাঙ্গালায় কিন্তু « এ, কে, রে » বিভক্তি-যুক্ত কর্ম-কারক ও সম্প্রদান অভিন্ন। তবে বিশেষ কতকগুলি কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ-দ্বারা সম্প্রদান-কারক দ্যোতিত হয় ; এই হেতু, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, সাধারণতঃ বাঙ্গালাতেও সম্প্রদান-কারক স্বীকার করা হয়। কেহ-কেহ বাঙ্গালায় সম্প্রদান-কারক পৃথক্ স্বীকার না করিয়া, উহাকে কর্ম-কারকের অন্তর্গত করিয়া দেখেন। ইহা এক হিসাবে সমীচীন ; এবং « তরে, জন্য, নিমিত্ত » প্রভৃতি অনুসর্গ-যোগে উদ্দেশ্য-দ্যোতক 'সম্প্রদান', বাঙ্গালা ভাষায় গৌণ-কর্মেরই প্রকার-ভেদ (ক্রিয়া-পদের আলোচনায় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য)।

সম্প্রদান, যথা— « ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা মহাপুণ্য ; সৎপাত্রে কন্যাদান করা উচিত ; তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে (কিন্তু 'তোমায় করি নমস্কার'—এখানে কর্ম-কারক-রূপেই ধরিতে হয়) ;

আমার জন্য এই কাপড় আনা হইয়াছে ; দুঃখীর তরে যার প্রাণ কাঁদে, সে-ই মহাশয় ব্যক্তি » ইত্যাদি।

যেখানে স্বেচ্ছায় স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করা হয় না—স্বত্ব রাখিয়া ভয়ে, বলে, অথবা দেয় বস্তু বলিয়া যেখানে অর্পণ হইতেছে, সেখানে কেহ-কেহ সম্প্রদান-কারক স্বীকার করেন না, সেখানে ক্রিয়া বা অনুসর্গ-যোগে চতুর্থী হয় মাত্র ; যথা—« ডাকাতকে সর্বস্ব দিল ; দরওয়ানকে কিছু ঘুষ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ; রাজাকে কর দিতেছে ; চাকরকে মাহিনা দাও ; ধোপাকে কাপড় দাও » ইত্যাদি। « গুরু শিষ্যকে পাঠ দিতেছেন ; তাহাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় দিল »—এরূপ স্থলেও সম্প্রদান নহে, এইরূপ বাক্যে যে « দে » ধাতু আসিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল বাঙ্গালার প্রচলিত idiom বা বাক্যভঙ্গী-হেতু।

সম্প্রদানে অধিকরণের ভাব কিছু আছে বলিয়া, এবং « এ »-বিভক্তি অধিকরণ ও সম্প্রদান উভয়ের মধ্যে সাধারণ বলিয়া, কচিৎ সম্প্রদানে সপ্তমীর বিভক্তি « তে »-ও প্রযুক্ত হয় ; যথা—« আমাদের সমিতিতে তিনি অনেক টাকা দেন ; 'অন্ধজনে দেহ আলো, মূকে দেহ ভাষা' » ইত্যাদি।

নিমিত্তার্থে—« কিসের সন্ধানে ঘুরিতেছ ? »।

উপভাষায় ও কবিতায় « কে »-যুক্ত উদ্দেশ্য-মূলক সম্প্রদান-কারকের বিশেষ প্রয়োগ আছে ; যথা—« জলকে (= জলের জন্য) চল ; ঘরকে যাও (= ঘরে, ঘরের উদ্দেশে যাও) ; ছাতাকে ছাতা, লাঠিকে লাঠি » ইত্যাদি।

অধিকরণের অর্থে « কে »-প্রত্যয় হয় : « আজকে, কালকে, সে দিনকে, » আর বছরকে » ইত্যাদি।

[৫] অপাদান-কারক

যাহা কোনও ঘটনার উৎপত্তি-স্থান—যাহা হইতে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি উৎপন্ন, চলিত, নির্গত, নিঃসৃত, উত্থিত, পতিত, প্রেরিত, গৃহীত

দৃষ্ট, শ্রুত, সূচিত, নিবারিত, অন্তর্হিত, রক্ষিত ইত্যাদি হয়—তাহাকে অপাদান-কারক বলে। "কি বা কাহা হইতে, কিসের থেকে" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে অপাদান-কারক পাওয়া যাইবে; যথা—« সরিষা হইতে তৈল হয়; সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল; গাছ থেকে ফল পড়িল; হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবাহিত; কূপ হইতে জল তোলে; বাঘ হইতে মৃত্যু ঘটিল; বই থেকে বলিতেছি; পাপ হইতে দূরে থাকিবে; বেহালা হইতে সুন্দর ধ্বনি বাহির হয়; সাগর হইতে মুক্তা পাওয়া যায় » ইত্যাদি।

অপাদান-কারকে পঞ্চমী বিভক্তির, এবং পঞ্চমী বিভক্তির (বা অপাদান-কারকের) কর্মপ্রবচনীয় ক্রিয়াপদময় বিশেষ অনুসর্গের ব্যবহার হয়।

অপাদানের সহিত করণ, সম্বন্ধ ও অধিকরণ, এই তিনের মিশ্রণ স্বাভাবিক; এই জন্য তৃতীয়া ও সপ্তমীর « এ » বা « তে » বিভক্তি এবং ষষ্ঠীর « এর, র » বিভক্তি-যোগেও অপাদান-কারক হয়; যথা—« গুরুমুখে এ শিক্ষা পাইয়াছ; তিলে বা তিল হইতে তেল হয়; খনিতে সোনা পাওয়া যায়; বাঘের (ভূতের) ভয়ে রাত্রিতে ঘরের বাহির হয় না; পড়ায় বিরত হইয়ো না; এ মেঘে বৃষ্টি হয় না; চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হইবার নহে; চোখ দিয়ে জল পড়ে; 'ভয়ে ভুলে' যাই দেবতার নাম'; কি মুখে এ কথা বলিব » ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকারের অপাদান-কারক আছে; যথা—

[ক] **আধার- বা স্থান-বাচক অপাদান**—« কলিকাতা হইতে সপ্তাহে দুই বার জাহাজ রেঙ্গুন-যাত্রা করে; আসন হইতে উঠিবেন না; পরিষৎ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি; ছাত থেকে পড়িয়া গেল; রাজার নিকট হইতে এই সম্মান লাভ করিলেন »। স্থান- বা আধার-বাচক অপাদানে কচিৎ « হইতে » পদের লোপ হয়, এবং কর্মপ্রবচনীয় বিশেষ্য-পদ, হয় অবিভক্ত্যন্ত রূপে, না-হয় সপ্তমী-বিভক্তি-যুক্ত রূপে প্রযুক্ত হয়; যথা—« রাজার নিকট হইতে, অথবা রাজার নিকটে, রাজার নিকট; মহাজনের

ঠাঁইয়ে, ঠাঁই (অথবা ঠাঁই হইতে, স্থান হইতে, নিকট হইতে) কর্জ মিলিল না »।

[খ] **অবস্থানাত্মক অপাদান**—« আমার ঘর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায় ; আমার বাড়ী থেকে আজানের ধ্বনি শুনা যায় ; গাছ থেকে টানিতে লাগিল ; জাহাজ থেকে কথা কহিতে লাগিল »।

[গ] **কাল-বাচক অপাদান**—« ১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা-দেশে ব্রিটিশ অধিকারের আরম্ভ ; চারি দিন হইতে আমার জ্বর হইয়াছে »।

[ঘ] **দূরত্ব-বাচক অপাদান**—« কলিকাতা হইতে কাশী ২০০ ক্রোশের অধিক।»

[ঙ] **তারতম্য-বাচক অপাদান**—« রামের চেয়ে শ্যাম বয়সে ছোট ; স্বর্গ অপেক্ষা জন্মভূমির গৌরব অধিক ; প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় » ইত্যাদি।

[৬] সম্বন্ধ-পদ

যাহার অধিকারে কোনও পদার্থ বিদ্যমান থাকে, বা যাহার সহিত কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে, এবং উক্ত পদার্থকে যাহা বিশিষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকে **সম্বন্ধ-পদীয়** বা **সম্বন্ধ-পদ** (বা ইংরেজী মতে **সম্বন্ধ-কারক—Genitive Case**) বলা হয়। "কাহার" বা "কিসের"—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সম্বন্ধ-পদ পাই। প্রকৃত পক্ষে, সম্বন্ধ-পদ বিশেষ্যের পক্ষে বিশেষণের কার্যই করিয়া থাকে ; এই জন্য ইহাকে Adjective Case বা "বিশেষণাত্মক কারক" বলা যাইতে পারে।

বহু ভাষায় সম্বন্ধ-পদে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তাহা বিশেষণাত্মক প্রত্যয়—সম্বন্ধ-বিশেষ্যের লিঙ্গ-অনুসারে, বিশেষণবৎ সম্বন্ধ-পদের লিঙ্গেরও পরিবর্তন হয় ; যেমন—হিন্দুস্থানীতে « রাম-কা বাপ=রামের পিতা », « রাম-কী মাঁ=রামের মা »—এখানে পরবর্তী সম্বন্ধ-বিশেষ্য « বাপ » পুংলিঙ্গ ও « মাঁ » স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ায়, সম্বন্ধের বিভক্তি যথাক্রমে পুংলিঙ্গে « কা » ও স্ত্রীলিঙ্গে « কী » রূপ ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ, মারহাট্টী « রামা-চা পিতা (চা—পুংলিঙ্গে), রামা-চী মাতা (চী—স্ত্রীলিঙ্গে), রামা-চে

হাত (টৈ—স্ত্রীলিঙ্গে) »। সম্বন্ধ-পদ বিশেষণ-প্রকৃতিক বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে বিশেষণ-অর্থে সম্বন্ধের বিভক্তিযুক্ত পদের প্রয়োগ হয় (এ বিষয়ে নিম্নে দ্রষ্টব্য) ; যথা—« সোনার থালা »। আবার, সম্বন্ধ-পদের পরিবর্তে কোনও স্থলে বিশেষণ-পদও ব্যবহৃত হইতে পারে ; যথা—« পিতার সম্পত্তি=পৈতৃক সম্পত্তি ; আপনার বন্ধু= ভবদীয় বন্ধু ; সূর্যের জগৎ=সৌর জগৎ »।

বাঙ্গালায় সম্বন্ধ-অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি « র, এর » প্রযুক্ত হয়। (কোথায় « র » এবং কোথায় « এর » হয়, তৎসম্বন্ধে পূর্বে পৃষ্ঠা ২৭২, § ৩.০৬৬ দ্রষ্টব্য ; বহুবচনে কোথায় কোথায় « গুলার, গুলির, দের, দিগের, গণের » ইত্যাদি সম্বন্ধ-বাচক অনুসর্গের প্রয়োগ হয়, তৎসম্বন্ধে পৃষ্ঠা ২৪৬-৫০ দ্রষ্টব্য)।

বিভিন্ন অর্থে সম্বন্ধ-পদের প্রয়োগ হয় ; যথা—

(১) সাধারণ সংযোগ, সামীপ্য বা সামান্য সম্বন্ধ : « নদীর তীর, পুখুরের পাড় »।

(২) অধিকার বা স্বামিত্ব : « রাজার রাজ্য, মামার বাড়ী, রামের বই, আমার দেশ, গোপালের মা »।

(৩) অংশ বা অঙ্গ : « পাহাড়ের গা, গাছের ছাল, হাতীর দাঁত, শিশুর মুখ »।

(৪) অধিকরণ সম্বন্ধ : « জলের মাছ, গহীন পানির মীন, ঘরের মানুষ, টোলের ছাত্র, শীতের হাওয়া, গাঁয়ের মোড়ল, পালের গোদা, হাটের পসারী »।

(৫) নিমিত্ত সম্বন্ধ : « বিয়ের বাজনা, রাঁধিবার কাঠ, জপের মালা, ভিক্ষার চাল (অধিকরণেও হয়), ঘোড়ার দানা, দেশের ডাক (অপাদানেও হয়), পড়িবার ঘর, টাকার শোক, পরের দুঃখে কাতর »।

(৬) অপাদান সম্বন্ধ : « সাপের ভয়, বাঘের ভয়, কাশীর দক্ষিণে, গঙ্গার পশ্চিমে »।

(৭) করণ সম্বন্ধ : « লাঠির দ্বারা »।

(৮) উপাদান সম্বন্ধ : « সোনার গহনা, ক্ষীরের পিঠা, তেলের খাবার, সরিষার তেল »।

(৯) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : « এক দিনের পথ, তিন ক্রোশের পাড়ী, দুই সপ্তাহের ছুটী »।

(১০) যোগ্যতা- বা গুণ-বাচক সম্বন্ধ : « খাইবার ঔষধ, মানুষের কৌশল, জমীর দাম, স্নানের বেলা, মূর্খের অবিবেচনা »।

(১১) গতি সম্বন্ধ : « কলের গাড়ী, গোরুর গাড়ী »।

(১২) পূর্ব-পর বা ক্রম সম্বন্ধ : « পাঁচের পৃষ্ঠা »।

(১৩) কার্য-করণ সম্বন্ধ : « অগ্নির উত্তাপ, প্রদীপের আলো, ধোঁয়ার আঁধার »।

(১৪) অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ : « জ্ঞানের আলো, দিনের বেলা, শোকের ঝড় »।

(১৫) কর্ম সম্বন্ধ : « বিদ্যার চর্চা, পরের নিন্দা, ঈশ্বরের উপাসনা, দরিদ্রের সেবা »।

(১৬) জন্য-জনক সম্বন্ধ : « রামের পিতা, জমীদারের পুত্র, গাছের ফল, শাঁখের ধ্বনি »।

(১৭) কর্তা সম্বন্ধ : « আমার পড়া বই, সকলের পূজ্য বা পূজিত »।

(১৮) বিশেষণ সম্বন্ধ : « গুণের ছেলে, দুঃখের ভাত, নিন্দার কথা, চল্লিশের কোঠা, সোনার চাঁদ, চারের নম্বর, দুধের বাছা, লোহার কার্তিক, হাড়ীর হাল, সোনার গৌরাঙ্গ, সাতের সংখ্যা, বজ্জাতের ধাড়ী »।

(১৯) তারতম্য-মূলক সম্বন্ধ : « মধ্যে, অপেক্ষা, চেয়ে » ইত্যাদি পদ-যোগে তারতম্য জানাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয় ; যথা— « রামের চেয়ে, রামের অপেক্ষা (রাম-অপেক্ষা), দুই জনের মধ্যে » ইত্যাদি। কচিৎ এইরূপ তারতম্য-দ্যোতক পদ-ব্যবহার না করিয়াও, কেবল

ষষ্ঠী-প্রয়োগ-দ্বারা এই সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় ; যথা—« আমার বড়, তাহার ছোট, ইহার অধিক, * তার কম »।

(২০) অব্যয়-যোগে ষষ্ঠী : সহার্থক, নৈকট্যার্থক, তুল্যার্থক, হেতু- বা নিমিত্তার্থক, বিরুদ্ধার্থক ও দিগ্‌বাচক শব্দ-যোগে ষষ্ঠী হয় ; যথা—« চন্দ্রের সহিত, বাঘের সঙ্গে, জোরের সঙ্গে, পণ্ডিতের কাছে, গৃহের নিকটে, লক্ষ্মণের মতন, পিতার তুল্য, তাহার নিমিত্ত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গহনার জন্য, শত্রুতার দরুন, ঘরের উত্তরে, এশিয়ার অগ্নি-কোণে, রুষ-দেশের পশ্চিমে »।

(২১) বাক্য-বিবক্ষায় : «তিনি যে বিশেষ সন্তুষ্ট তাহার (= তাহাতে) আর সন্দেহ নাই »।

(২২) Principal sentence অর্থাৎ প্রধান বা মৌলিক বাক্যে « ইলে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া যদি বিশেষ্যের ভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে কর্তৃপদের পরিবর্তে ষষ্ঠীর ব্যবহার চলে ; যথা—« রাম গেলে হয়—রামের গেলে চলিবে না »। অকর্মক ধাতুতেই এইরূপ প্রয়োগ হয়। তদ্রূপ, বিশেষ্য-ভাবগ্রস্ত « ইতে » ও « ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়ার সহিত বিকল্পে ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত কর্তার ব্যবহার হয় ; যথা—« তোমার (তোমায়, তোমাকে) যাইতে হইবে না ; রামের (রাম) গিয়া কোনও ফল নাই ; দরিদ্রের সেবা সকলেরই করিয়া যাওয়া উচিত ; সকলেরই (সকলকেই) দরিদ্রের সেবা করিতে আছে »।

বহুস্থলে ষষ্ঠীর বিভক্তির লোপ হয়। কেবল পাশাপাশি দুইটী শব্দ বসাইলেই প্রথমটীর দ্বারা ষষ্ঠীর অর্থ প্রকাশিত হয়। এইরূপ অবস্থানকে "আলগা" বা "অসংলগ্ন" সমাস বলা যাইতে পারে। (পূর্বে পৃষ্ঠা ২২৭-২৮ দ্রষ্টব্য); যথা—« তোমার অপেক্ষা —তোমা অপেক্ষা (ক্বচিৎ তোমাপেক্ষা) ; তোমার দ্বারা—তোমাদ্বারা ; প্রীতির নিমিত্ত —প্রীতি নিমিত্ত ; খাজনার বাবত—খাজনা বাবত » ইত্যাদি।

সম্বন্ধে « কার » প্রত্যয় :

সময়, দিক্, অবস্থান এবং সমষ্টি-বাচক কতকগুলি শব্দের উত্তর « কার » প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়ের শক্তি কতকটা বিশেষণের মত। চলিত-ভাষায় কচিৎ « কার »-এর পরিবর্তে « -কের » রূপ মিলে ; এই « কের » হয় প্রাকৃতের « কের » শব্দ, না হয় ইহা স্বর-সঙ্গতি-অনুসারে (পৃষ্ঠা ৯৫-১০০, § ২.৭১৩ দ্রষ্টব্য) « কার » হইতে জাত। কতকগুলি শব্দে সপ্তম্যন্ত রূপের পরে ষষ্ঠী বিভক্তির « কার » বসে। যথা—

« পূর্বকার (পূর্বেকার) ; আগেকার ; আজিকার—আজকের, আজকার ; কালিকার—কালকের, কালকার ; পরশুকার ; তরশুকার ; শেষকার, শেষেকার ; প্রথমকার ; ছেলেবেলাকার ; সেদিনকার ; বছরকার দিন, সে বছরকার কথা ; উপরকার, উপরেকার ; নীচুকার, নীচেকার ; ভিতরকার, ভিতরেকার ; বাহিরকার, বাইরেকার ; এখানকার, এখানকের ; যেখানকার, যেখানেকার (* যেখ্‌নেকার) ; সেখানকার ; কখনকার ; কবেকার, যবেকার ; যথাকার, তথাকার ; কোথাকার, হেথাকার, হোথাকার, সেথাকার ; কোনখান্‌কার ; তলাকার ; পিছেকার, পিছুকার ; উত্তরকার ; বাঁ-দিক্‌কার ; দক্ষিণকার, দক্ষিণ-দিক্‌কার, পুবদিক্‌কার ; সকলকার, সবাকার, সকলাইকার, সবাইকার ; দোঁহাকার ; * কত্তকের ; আপনকার »।

উপরের কতকগুলি শব্দে « কার »-প্রত্যয়ের পরিবর্তে সাধারণ ষষ্ঠীর বিভক্তি « -এর, -র » ব্যবহৃত হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ « আজিকার, কালিকার, এখানকার, তখনকার কখনকার, যখনকার »-এর বিকল্প « -এর, -র » -প্রত্যয়-যোগে গঠিত রূপ মিলে না। লক্ষণীয়—« পাঁচজনকার—পাঁচজনের », প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ভিন্ন, « সত্য » শব্দের উত্তর « সত্যকার » (চলিত-ভাষায় « সত্যিকার »— « সত্য > সত্যি, পথ্য—পথ্যি, বজ্র—বজ্জী—বজ্জি » এইরূপ পরিবর্তন-অনুসারে) রূপটী বাঙ্গালায় প্রচলিত ; সাধু-ভাষায় « সত্যিকার » ব্যবহার করা ঠিক নহে, « সত্যকার » ব্যবহার করা উচিত।

[৭] অধিকরণ-কারক

যে স্থান, বিষয়, অবস্থা কিংবা কালকে আধার বা আশ্রয় অথবা অবলম্বন করিয়া কোনও-কিছু ঘটনা ঘটে, অথবা কোনও-কিছু বিদ্যমান থাকে, তাহাকে অধিকরণ বলে। "কোথায়, কিসে, কাহাতে, কখন্, কবে"—এই প্রকার পদ-যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অধিকরণ-কারক পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় অধিকরণে সপ্তমী-বিভক্তির প্রয়োগ হয়।

অধিকরণ তিন প্রকার—[১] আধার-অধিকরণ, [২] কাল-অধিকরণ, ও [৩] ভাব-অধিকরণ।

[১] আধারাধিকরণ—যেখানে স্থান বা দেশ বুঝায় :—

(ক) দেশ- বা স্থান-বাচক : « ভারতবর্ষে গঙ্গানদী প্রবাহিত; বই-খানি ঘরেই ছিল; মাছ জলে থাকে; জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ; হিমালয়ে কস্তুরী-মৃগ দেখিতে পাওয়া যায়; পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত »।

(খ) ব্যাপ্ত্যধিকরণ : « সমুদ্রে লবণ আছে; দুগ্ধে মাখন আছে; আখের মধ্যে গুড়, সরিষার মধ্যে তেল; সারাদেহে, সর্বাঙ্গে ব্যথা »।

(গ) অবস্থা ও বিষয়াধিকরণ : « ধর্মে মতি; সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন; এক টাকায় পাঁচটা; গণিতে বিদ্বান্; পাঠে বা লেখায় নিবিষ্ট-চিত্ত »।

(ঘ) সামীপ্যাধিকরণ : « কাশীতে গঙ্গা; খিড়কীতে পুখুর; দরজায় হাতী-বাঁধা; গঙ্গাসাগরে মেলা বসে »।

[২] কালাধিকরণ—

(ক) মুহূর্তাধিকরণ—« ভোরে সূর্য উঠে; গত রাত্রিতে গোরুর বাছুর হইয়াছে; তিনটা বাজিয়া নয় মিনিটে ট্রেন ছাড়িবে »।

(খ) ব্যাপ্ত্যধিকরণ—« গ্রীষ্মকালে সূর্য অত্যন্ত প্রখর হয়; তিন রাত্রি ঘুম হয় নাই; এই বৎসরে প্রজাদের বড়ই অন্নাভাব যাইতেছে »।

[৩] ভাবাধিকরণ—« সে বড়ই দুঃখে পড়িয়াছে; সূর্যোদয়ে

অন্ধকার গেল ; আনন্দে নিমগ্ন ; শোক-সাগরে নিমজ্জমান ; কোলাহলে পর্যবসিত ; আনন্দ-সাগরে সন্তরণ » ইত্যাদি।

সপ্তমী-বিভক্তির লোপ :

কাল-বাচক শব্দে, এবং সাধারণতঃ গমনার্থক ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত স্থান-বাচক শব্দে, সপ্তমী বিভক্তি (« এ, তে ») বহুস্থলে ব্যবহৃত হয় না—কেবল অবিভক্তিক শব্দটী সপ্তমী-বা অধিকরণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« এ বৎসর বড়ই বিপদ্ ; এ সময় তার দেখা মেলা ভার ; আজ হবে না, কাল এসো ; শনিবার ইস্কুল বন্ধ থাকে না ; বাড়ী যাও ; কলিকাতা পহুঁছিল ; কাশী, ঢাকা, বৃন্দাবন গেল ; 'বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী (=নদীতে) এল' বান' »।

পার্থক্য লক্ষণীয়—« এক দিন যাবো—এক দিনে যাবো (তৃতীয়া) ; সময়ে এসো —কোন্ সময় আস্‌বো ? ; বাড়ী যাও—বাড়ীতে (=বাড়ীর লোকেদের কাছে) খবর দাও »।

সপ্তমীতে « কে » প্রত্যয়।—সাধারণতঃ চলিত-ভাষায় কতকগুলি বাক্যে চতুর্থীর « কে » -প্রত্যয় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (সম্প্রদান-কারক—পৃষ্ঠা ২১০)।

বীপ্সায় সপ্তমী।—বীপ্সা অর্থাৎ 'প্রত্যেক' অর্থে সপ্তমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বিরুক্তি হয়। এই প্রকার দ্বিরুক্তিতে, প্রথম পদটী অপাদানের ও দ্বিতীয় পদটী অধিকরণের কাজ করে ; যথা—« হাতে হাতে (=প্রত্যেক হাতে, এক হাত হইতে অন্য হাতে) ঘুরিতে লাগিল ; কোণে কোণে=প্রত্যেক কোণে ; ঘরে ঘরে, ঘর ঘর (ঘর ঘর পাতি পাতি খুঁজিয়া বেড়াইল) ; বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে, গাছে গাছে, লতায় লতায়, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় ; দোরে দোরে, দোর দোর, দ্বারে দ্বারে »। কখনও-কখনও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গ ভাব জানাইবার জন্য এইরূপ দ্বিরুক্তির প্রয়োগ হয় ; যথা—« মনে মনে= আপন মনে ; কানে কানে=কানে মুখ লইয়া গিয়া ; প্রাণে প্রাণে ; তাকে চোখে চোখে রাখ্‌বে ; নয়নে নয়নে ; হাতে হাতে শোধ দিলে

(=সঙ্গে সঙ্গে); সাথে সাথে, সঙ্গে সঙ্গে; কানায় কানায় কলসীটা ভরিয়া গিয়াছে » ইত্যাদি।

[৮] সম্বোধন-পদ

বাক্যের গতি ভঙ্গ করিয়া, যাহাকে বিশেষ-ভাবে আহ্বান করা হয়, তাহাকে **সম্বোধন-পদ** বলে।

খাটী বাঙ্গালা শব্দে সম্বোধনে মূল শব্দের কোনও পরিবর্তন হয় না, কতকগুলি বিশেষ অব্যয়-পদের দ্বারা সম্বোধন-পদকে স্ফুট করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। « রা » বা « গুলো » -প্রত্যয়-যুক্ত বহুবচনের পদ সম্বোধনে কচিৎ প্রযুক্ত হয়; যেমন—« ওগো মায়েরা, কোথায় সব গেলে গো?; কি বাবুরা, ব'সে ব'সে কি হ'চ্ছে?; ওরে ছোঁড়াগুলো (বা ছোঁড়ারা), অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন? »। যেমন প্রথমা বিভক্তি বা কর্তায়, তেমন সম্বোধনেও বহুবচনের « -দিগ »- প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। « গণ, সমূহ, সকল » প্রভৃতি বহুবচন-বাচক শব্দ সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়।

সাধু-ভাষায় ও কবিতায় সংস্কৃত শব্দ সম্বোধন-পদে অনেক স্থলে সংস্কৃত শব্দ-রূপের নিয়ম-অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে দ্রষ্টব্য (§ ৩.৩৭, পৃষ্ঠা ২১২-২১৪)।

নিম্নলিখিত অব্যয়-পদগুলি সম্বোধন-পদের সহিত ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ এই সকল অব্যয় পূর্বেই বসে; কতকগুলি কিন্তু পূর্বে ও পরে উভয়ত্রই বসে।

« অ; অয়ি; অরে; আমার (পরেও বসে); আরে; আলো; এই; এই যে; ও; ও আমার; ওগো; ওরে; ওরে আমার; ওলো; ওহে; গা, গো (স্বতন্ত্র—তুমি কি ক'রছ গা বা গো); গো (পরে); রে (পূর্বে ও পরে); লো (পূর্বে ও পরে); হে (পূর্বে ও পরে); হাঁ, হ্যাঁ; হাঁগো, হাঁগা, হ্যাঁগা, হ্যাঁগো; হাঁরে, হাঁরা, হ্যাঁরে, হ্যাঁরা; হাঁলা, হ্যাঁলা; হাঁহে, হ্যাঁহে; হে; হেদে, হেদে গো » ইত্যাদি।

এগুলি মানুষকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন নানা পশু ও পক্ষীকে আহ্বানের জন্য বিশেষ অব্যয় আছে, সেগুলি স্বতন্ত্র-ভাবে (অর্থাৎ কোনও বিশেষ্য না থাকিলেও) ব্যবহৃত হয়। (পরে দ্রষ্টব্য— অব্যয়-পর্যায়)।

[৩.০৭] বিশেষণ

যে পদ-দ্বারা কোনও বিশেষ্য বা অন্য পদের বিশেষ গুণ, ধর্ম, অবস্থা বা সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে **বিশেষণ-পদ** বলে ; যথা—« ভাল ছেলে » ; এখানে « ছেলে » এই বিশেষ্য-পদটীর একটী বিশেষ গুণ, « ভাল » এই পদটীর দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে ; « ছেলে » এই বিশেষ্য-পদের বিশেষণ হইতেছে, « ভাল » এই পদটী।

« বড় ভাল ছেলে »—এখানে « বড় » এই পদটী, বিশেষণ-পদ « ভাল »-র একটী বিশেষ অবস্থা প্রকাশ করিতেছে, অতএব « বড় » এই বিশেষণ-পদ, « ভাল » এই বিশেষণ-পদের বিশেষণ। এ ক্ষেত্রে ইহাকে **বিশেষণের-বিশেষণ** বা **বিশেষণীয় বিশেষণ** বলা হয়।

« ভালয়-ভালয় ঘরে পৌঁছাও »—এখানে « ভালয়-ভালয় » এই পদদ্বয় « পৌঁছাও » ক্রিয়া-পদের বিশেষ অবস্থার পরিচায়ক ; অতএব « ভালয়-ভালয় », **ক্রিয়ার বিশেষণ-** অথবা **ক্রিয়া-বিশেষণ**-রূপে বর্ণিতব্য।

« তোমা-হেন পণ্ডিতের পাশে মূর্খ আমি কি দাঁড়াইতে পারি ? »—এখানে « মূর্খ » পদটী « আমি » এই সর্বনামের বিশেষণ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুণাদি-বাচক বিশেষণ-পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া, এই সকল প্রকারের পদের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। যে প্রকারের পদের সহিত প্রযুক্ত হয় তাহার বিচার করিয়া দুই

শ্রেণীর বিশেষণ ধরা যায় : (ক) **নাম-বিশেষণ**—যাহা নাম-পদ, সর্বনাম-পদ ও বিশেষণ-পদের সহিত যুক্ত হয় (Adjective Proper) ; এবং (খ) **ক্রিয়ার বিশেষণ**—যাহা ক্রিয়া-পদের সহিত ব্যবহৃত হয় (Adverb)।

[৩.০৭১] উদ্দেশ্য ও বিধেয়
(Subject and Predicate)

যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা **উদ্দেশ্য** বা **কর্তা** (Subject) ; এবং প্রথমে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া, পরে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যে কথা বলা যায়, তাহা **বিধেয়** (Predicate) ; যথা—« ঈশ্বর মঙ্গলময় »—এখানে « ঈশ্বর » উদ্দেশ্য, এবং « মঙ্গলময় » বিধেয়। তদ্রূপ « ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-স্থল »—এখানে « ঈশ্বর » উদ্দেশ্য, ও « আশ্রয়-স্থল » বিধেয়। এই বিধেয়-পদ, ক্রিয়াও হইতে পারে ; কিন্তু ইহা উদ্দেশ্য-পদের সম্পর্কিত কোনও গুণ, ধর্ম বা অবস্থা প্রকাশ করে, সেই জন্য ইহা এক প্রকারের বিশেষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবস্থা- বা গুণ-বাচক বিধেয়কে এই জন্য **বিধেয় বিশেষণ** (Predicative Adjective) বলা হয়। বিশেষ্য-পদও বিধেয়-বিশেষণ হইয়া থাকে ; যথা—« ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়-স্থল »।

« কেমন, কত, কোন্, কি, কি কি, কিরূপ, কিরূপে, কেমন করিয়া » ইত্যাদি পদের দ্বারা প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে বিশেষণ নির্ণীত হয়, যথা—« এই লাল বেনারসী সাড়ীটী অনেক কষ্টে পঞ্চাশ টাকায় কিনিয়াছি » ;—« কেমন সাড়ী », « কোন্ সাড়ী », « কত টাকা », « কি রূপে বা কেমন করিয়া কিনিয়াছ »—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ মিলিবে : « লাল », « বেনারসী », « এই », « পঞ্চাশ » ও « অনেক কষ্টে »।

[৩.০৭২] নাম-বিশেষণ

অর্থ-বিচার করিলে, নাম-বিশেষণ এই কয়টী মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে :

[১] **গুণ- বা অবস্থা-বাচক** : « লাল ফুল ; বড় গাছ ; ঠাণ্ডা জল ; উঁচু পাহাড় : গরম চা ; তিক্ত ঔষধ ; সব লোক : সমস্ত পৃথিবী ; মনোহর দৃশ্য ; মধুর বচন ; উজ্জ্বল নক্ষত্র : যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ; অলৌকিক শক্তি ; উদার প্রকৃতি ; লঘুহস্ত ভৃত্য ; ক্ষিপ্রগতি দূত ; পরাধীন জীবন ; ধার্মিক ব্যক্তি ; ঘেয়ো কুকুর ; দ'য়ে কাদা ; দেনো জিনিষ ; মেছো হাটা ; গেঁয়ো লোক ; শহুরে' লোক ; নগরিয়া জন ; কাশীতলবাহিনী গঙ্গা » ইত্যাদি।

[২] **উপাদান-বাচক** : « স্বর্ণময় পাত্র ; মৃন্ময় মূর্তি ; মাটিয়া বা মেটে কলসী »।

[৩] **সংখ্যা- বা পরিমাণ-বাচক** : « লাখ টাকা ; পাঁচ হাত ; দশ জন »। « পাঁচ জন মানুষ ; তিরিশখানা কাপড় »—এরূপ ক্ষেত্রে, « এক, দুই, তিন » প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর « টা, টী, খানা, খানি, জন » প্রভৃতি 'পদাশ্রিত নির্দেশক' প্রযুক্ত হয় (পূর্বে পৃষ্ঠা ২৫৪-৫৮ দ্রষ্টব্য)। পরিমাণ-বাচক নাম-শব্দ সংখ্যা-বাচক শব্দের সহিত মিলিত হইয়া, পরিমাণ-বাচক বিশেষণ-রূপে অন্য বিশেষ্যের পূর্বে বসে ; যথা—« এক বিঘা জমি ; তিন বাটি দুধ ; পাঁচ হাত লম্বা ; দুই শত গজ » ; এরূপ স্থলে « এক-বিঘা, তিন-বাটি, পাঁচ-হাত, দুই-শত » প্রভৃতি পদ মিলিয়া বিশেষণ হইয়াছে। (ইংরেজীতে প্রয়োগ অন্য রূপ ; যথা—three cups of milk, ইহার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হইবে—« দুধের তিন বাটি »)।

« বহু, অনেক, অল্প, কম, বড়, ছোট » ইত্যাদি বিশেষণ, পরিমাণ-দ্যোতক।

[৪] **পূরণ- বা ক্রম-বাচক** : « প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়. চতুর্থ. বিংশ, অশীতিতম ; পয়লা, সাতই, তিরিশে' » ইত্যাদি।

[৫] **সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাত বিশেষণ** : « এই ব্যক্তি ; যে জন ; সে মানুষ ; কোন্ ভাবুক » ইত্যাদি।

রূপ বা ব্যুৎপত্তি বিচার করিলে, সাধারণ বিশেষণ—(১) একপদময়, (২) যৌগিক, ও (৩) বহুপদময় বা বাক্যময়—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে।

(১) **একপদময় বিশেষণ-পদে** একটীর অধিক শব্দ থাকে না ; যথা—« বড়. ভাল, ছোট, মন্দ, সুন্দর, মুক্ত, অলৌকিক, চল্‌তি, এক, পাঁচ, এ, এই, ঐ, সে » ইত্যাদি।

একপদময় বিশেষণগুলিকে আবার তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা—

(ক) মৌলিক—যে বিশেষণগুলির বিশ্লেষণ আধুনিক বাঙ্গালায় সম্ভব হয় না—যেগুলিকে মূল ও অবিকৃত অর্থাৎ প্রত্যয়াদি-বিহীন শব্দ বলিয়া বাঙ্গালায় ধরিতে হয় ; যথা—« বড়, ছোট, নূতন, নোতুন, পুরানো, ভাল, উঁচু, নীচু, লম্বা, চওড়া » ইত্যাদি। কতকগুলি সর্বনাম-জাত বিশেষণ এই শ্রেণীতে পড়ে : « এ, ও, সে, যে » ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দকে বাঙ্গালায় এই পর্যায়েই ফেলিতে হয় ; যথা— « তুচ্ছ, মন্দ, হাজির, কম, বেশী, গায়েবী, জাহির, চালাক, চতুর »।

(খ) কৃদন্ত—খাঁটী বাঙ্গালা, যথা—« পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, বহতা নদী, পড়ন্ত রোদ্দুর, ঘুমন্ত খোকা, করা কাজ, দেখা লোক, হাঁটা পথ » ; সংস্কৃত, যথা—« যুক্ত, গৃহীত, ক্রিয়মাণ, নীয়মান, আহৃত, করণীয়, দাতব্য, ধর্তব্য »।

(গ) তদ্ধিতান্ত—খাঁটী বাঙ্গালা : « নগরিয়া > নগুরে', বুদ্ধিমন্ত, দেশী, ঢাকাই, কটকী, বর্ধমানিয়া > বদ্ধমেনে', হিন্দুস্থানী, জাপানী,

বাঙ্গালা, সাতই, চব্বিশে' » ইত্যাদি; সংস্কৃত: « শক্তিমান্, ধার্মিক, শাক্ত, পৈতৃক, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক, বঙ্গীয়, দেশীয়, ধনবান্, শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্, সাম্প্রদায়িক » ইত্যাদি। কতকগুলি বিদেশী বিশেষ্য ও বিদেশী প্রত্যয়-যুক্ত তজ্জাত বিশেষণ উভয়ই বাঙ্গালায় প্রচলিত; এইরূপ বিশেষণকে « বিদেশী তদ্ধিতান্ত » শ্রেণীর বলা যায়; যথা—« হুঁশ—হুঁশিয়ার; আক্কেল—আক্কেলমন্দ; কেতাব—কেতাবী; গ্রেপ্তার—গ্রেপ্তারী » ইত্যাদি। « কত, যত, হেন, যেন, এমত, এমন, যেমন, কেমন » প্রভৃতি কতকগুলি সর্বনাম-জাত বিশেষণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মিশ্র: « নিকাহিতা বিবি; রেজেস্‌ট্রীকৃত দলিল »।

(ঘ) বিভক্তি-যুক্ত—ষষ্ঠী-বিভক্তি যোগ করিয়া, বিশেষ্য শব্দ হইতে বিশেষণ-পদ গঠিত হয়; যেমন - « ব্রাহ্মণের বৃত্তি, পাথরের বাটি, সূতির কাপড়, ফুলের মধু, ফুলের শরীর, সোনার অঙ্গ, প্রাণের বন্ধু, তিনের পৃষ্ঠা, রক্তমাংসের শরীর, পুণ্যের শরীর » ইত্যাদি।

(ঙ) উপসর্গ-যুক্ত—খাটী বাঙ্গালা, সংস্কৃত, বিদেশী ও মিশ্র: « নি-কামাইয়ে, বিবস্ত্র, বেহায়া, বেশুমার »।

(২) যৌগিক বিশেষণ—বহুব্রীহি ও অন্য সমাস-দ্বারা সমস্ত-পদ এইরূপ যৌগিক বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক) খাটী বাঙ্গালা যৌগিক বিশেষণ-শব্দ—« মা-মরা ছেলে, মন-মরা মানুষ, বুক-ভাঙ্গা দুঃখ, বুক-জোড়া ভাল-বাসা, আধ-মরা মানুষ, হাত-কাটা জামা, হাতে-কাটা সূতা, কলম-কাটা ছুরী, ঘর-ভাঙ্গানো কথা, তিন-শ' কথা » ইত্যাদি।

(খ) সংস্কৃত শব্দ—« বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনি, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, কুসুম-কোমল করপল্লব, দেবপ্রতিম মানব, অনলসন্নিভ জ্যোতিঃ, অনলস্রাবী গিরি; কলাকুশল, গতিশীল; বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; কর্তব্যপরায়ণ পুত্র: মাংসভুক্, পতনোন্মুখ, রৌপ্যময়, পদ্মপলাশনয়ন, উত্তালতরঙ্গময়ী, অমৃত-

নিস্তব্দিনী; দিনগত পাপক্ষয়; সর্ববাদিসম্মত; শয়নোত্থিত, তরঙ্গসমাকুল » ইত্যাদি।

কতকগুলি বিশেষণ, বিশেষ-শব্দ-যুক্ত সমাসের দ্বারা গঠিত। এইরূপ বহু যৌগিক বিশেষণ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; যথা—« তৈলাক্ত (+ অক্ত), গুণান্বিত (+ অন্বিত), গন্ধাকুল (আকুল), জনাকীর্ণ (আকীর্ণ), ক্ষুধাতুর (আতুর), পণ্ডিতোচিত (উচিত), সুখকর (কর), বিপদাপন্ন (আপন্ন), দয়াপরায়ণ, ক্রোধপূর্ণ, সেবাপর, প্রীতিভাজন, বন্ধুবৎসল, গৃহশূন্য, পণ্ডিতজনসুলভ, শ্রীসম্পন্ন, শ্রীহীন, গ্রহণযোগ্য » ইত্যাদি।

(গ) বিদেশী—« কম-জোর, দিল-দরিয়া, জবর-দস্ত »।

(ঘ) মিশ্র—« পুঁথি-গত বিদ্যা, লেন-স্থ বাড়ী, রত্ন-ভরা তরী; প্রাণ-জুড়ানো, দিল-খোলা, ছায়া-ঢাকা, বিশ-গজী, সবুট পদাঘাত »।

(৩) বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণ—« যার-পর-নাই পাজী; যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম; সব-পেয়েছি-র দেশ; সাত-রাজার-ধন মাণিক; কুড়িয়ে'-পাওয়া ছেলে; জো-হুকুম; আপ-কা-ওয়াস্তে; প'ড়ে-পাওয়া; পাঁচ-ক্রোশের পথ; তিরিশ-দিনের দিন; যাচ্ছেতাই (= অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট < যাহা-ইচ্ছা-তাই); ঘর-জ্বালানে'-পর-ভালানে' ছেলে; আপন-কাজে-আপনিই-ব্যস্ত মানুষ » ইত্যাদি।

বহু শব্দ, বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয়; যথা—« পুণ্য, পাপ, শুভ, মঙ্গল, কল্যাণ, বিশেষ, পরিষ্কার, সাধু, সত্য, মিথ্যা, আশ্চর্য, লাল, নীল, শীত, অর্ধ, কম, বেশী, গরম, ভাল, মন্দ » ইত্যাদি।

[৩.০৭৩] ক্রিয়া-বিশেষণ

ক্রিয়া-বিশেষণের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি বাঙ্গালায় বিদ্যমান।

(১) কেবল বিভক্তি-হীন পদের প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়া-বিশেষণ

সূচিত হয়; যথা—« শীঘ্র (ত্বরা) যাও; নিশ্চয়ই আসিব; অবশ্য বলিব; কখন্ বলিবে? ঠিক বল, খালি বকে, ক্রমাগত চলিতেছে; ভাল আছে, আজ আসিব, পরশু বলিব, কা'ল যাইব; আজ-কাল »।

(২) তৃতীয়া বা সপ্তমীর « এ » -বিভক্তি-যোগে, ক্রিয়া-বিশেষণ হয়; যথা—« বেগে, ধীরে, স্বচ্ছন্দে, সুখে, কুশলে, সঙ্গে, সমভিব্যাহারে; উপরে, নীচে, সামনে, সমুখে, পরে, দূরে, কাছে, ওখানে, এখানে, আগে, ভিতরে, বাহিরে; 'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে'; 'গরজে গম্ভীরে হনূ স্বর্ণরথ-চূড়ে'; 'নাদিল কাতরে শিবা, কুকুর কাঁদিল কোলাহলে, শূন্যমার্গে গর্জিল ভীষণে শকুনি-গৃধিনী-পাল'; উত্তম-রূপে, যোগ্যতা-সহকারে » ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দ—« সহসা (সহস্ শব্দ, তৃতীয়া বিভক্তি), হঠাৎ (হঠ শব্দ, পঞ্চমী), অকস্মাৎ »। (« যেন তেন » প্রাচীন বাঙ্গালা « যেহেন, তেহেন » হইতে)।

(৩) « করিয়া »—এই অসমাপিকা-ক্রিয়া-পদ যোগে, অথবা « ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া-দ্বারা, ক্রিয়ার বিশেষণ হয়; যথা—« ভাল করিয়া; হা-হা বা হো-হো করিয়া বেড়ানো; জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া তারা জ্বলিতেছে; ঠক্‌ঠকিয়ে'; হন্‌হনিয়ে'; কচ্‌মচিয়ে'; জেনে-শুনে; নাচিয়া-নাচিয়া » ইত্যাদি।

(৪) « মাত্র » শব্দ-যোগে—« চলিবা-মাত্র; দিবা-মাত্র »।

(৫) « সহিত, পূর্বক, পুরঃসর » প্রভৃতি পদ-দ্বারা সমাস করিয়া—« প্রণাম-পূর্বক, সম্মান-পুরঃসর বলিলেন »।

(৬) « তঃ, থা, ধা, শঃ, বৎ, ত্র; মত, মতন »-প্রত্যয়ান্ত পদ-দ্বারা « সাধারণতঃ, সম্ভবতঃ, ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ; শতধা; সর্বথা; ক্রমশঃ; স্তম্ভবৎ; একত্র, সর্বত্র, যত্র, তত্র; ঠিক-মত, ভাল-মতন, এমত, যেমত »।

(৭) বীপ্সায় শব্দদ্বৈত করিয়া—« শনৈঃশনৈঃ, মুহুর্মুহুঃ; কখনো-কখনো; বিন্দু-বিন্দু, বারবার (বারে বারে), ধীরে ধীরে; আস্তে আস্তে;

নাচিয়া নাচিয়া, দেখিতে দেখিতে » ইত্যাদি। « যেখানে-সেখানে, যত্র-তত্র, যেথা-সেথা, যেমন-তেমন করিয়া » প্রভৃতি পরস্পর-সাপেক্ষ শব্দ-প্রয়োগে গঠিত ক্রিয়া-বিশেষণ এই পর্যায়ে পড়ে।

[৩.০৭৪] বিশেষণের লিঙ্গ-বিচার

সাধারণতঃ খাঁটী বাঙ্গালা বিশেষণ-পদ সর্বত্র অবিকৃত থাকে (পূর্বে বিশেষ্যের লিঙ্গ, পৃষ্ঠা ২৩৫-৩৮ দ্রষ্টব্য); কিন্তু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে « ঈ » -প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা—« অভাগা পুরুষ—অভাগী বা আভাগী নারী; রাক্ষসী মা; পাগলা ছেলে—পাগলী মেয়ে; এলোকেশী কালী » ইত্যাদি। সাধু-ভাষায় অনেক সময়ে সংস্কৃতের অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গে « আ » বা « ঈ »-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হয়; যথা—« অবলা জাতি, অনুরাগান্বিতা নায়িকা; ধনবতী মহিলা; বুদ্ধিমতী, রূপসী, সুন্দরী, মহীয়সী, মানিনী নারী » ইত্যাদি। « নিকাহিতা স্ত্রী, তালাকিতা ভার্যা »-ও পাওয়া যায়। সাধু-ভাষায় অপ্রাণিবাচক শব্দের বিশেষণে, সংস্কৃতের দেখাদেখি, স্ত্রী-প্রত্যয় হয়; দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (বিশেষ্যের লিঙ্গ, পৃষ্ঠা ২৩৭)। তিথি-বাচক হইলে, সংস্কৃত ক্রম-সংখ্যা-বাচক বিশেষণ-পদ « দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী…চতুর্দশী », এবং বিভক্তি-বাচক ক্রম-সংখ্যা « প্রথমা, দ্বিতীয়া……সপ্তমী », স্ত্রী-প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।

[৩.০৭৫] তারতম্য বা অতিশায়ন, অথবা বিশেষণের তুলনা (Comparison of Adjectives)

দুইটী (অথবা দুইয়ের অধিক) ব্যক্তি বা পদার্থের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর (অথবা অপরগুলির) তুলনা করিতে হইলে—একটী যে অন্যটীর অপেক্ষা (বা অপরগুলির অপেক্ষা) কোনও বিষয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ইহা জানাইতে হইলে—সংস্কৃত, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বহু ভাষায় এইরূপ

নিয়ম আছে যে, বিশেষণে বিশেষ প্রত্যয়-যুক্ত করিয়া, ইহার রূপে কিছু পরিবর্তন-সাধন-পূর্বক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু খাঁটী বাঙ্গালা শব্দে সেরূপ কিছু হয় না, বিশেষণটী অবিকৃত-রূপেই থাকে। যে পদার্থের সহিত তুলনা করা হয়, তাহাকে « উপমান » বলে, এবং যাহার তুলনা করা হয় তাহাকে « উপমেয় » বলে। বাঙ্গালা ভাষায় দুইটী ব্যক্তি, বস্তু বা পদার্থের মধ্যে তুলনা করিবার নিয়ম এই—

(১) উপমানকে অপাদান-কারকে (পঞ্চমী-বিভক্তিতে) আনা হয়, এবং বিশেষণটী উপমেয়ের বিধেয়-রূপে পরে বসে; যেমন—« মেষ অপেক্ষা (মেষ হইতে, ভেড়ার চেয়ে, ভেড়ার থেকে, ভেড়া হ'তে) গোরু বড়; রূপার চেয়ে সোনা দামী; সোনার চেয়ে রূপা কম-দামী »; কিংবা পঞ্চমী-বিভক্তির পরিবর্তে, নিম্নলিখিত ব্যাখ্যান-মূলক উপায়েও তুলনা জানাইতে পারা যায়; যথা—« মেষ ও গোরু এই দুইয়ের মধ্যে গোরু বড় (বা গোরুই বড়, বা বেশী বড়); রাম আর শ্যাম দুইজনের মধ্যে শ্যামই পরিশ্রমী (বা শ্যাম অধিক পরিশ্রমী) »।

(২) উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আধিক্য বিশেষ করিয়া জানাইতে হইলে, বা তুলনায় পার্থক্য বা অন্তর অধিক হইলে, বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত বিশেষণের পূর্বে অর্থানুসারে « অধিক, অনেক, অত্যন্ত, বেশী, খুব, অল্প, কম, একটু, একটুখানি, অনেকখানি, অনেকটা » প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ বসে; যথা—« ভেড়ার চেয়ে হাতী অনেক (খুব) বড়; অশ্ব অপেক্ষা গর্দভ অল্প ক্ষুদ্র—ঘোড়ার চেয়ে গাধা একটু ছোট; রামের চেয়ে শ্যাম বেশী বুদ্ধিমান্ »।

অনেক পদার্থের মধ্যে তুলনায় একটীর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জানাইতে হইলে, সকল- বা সমস্ত-বাচক শব্দ অপাদান-কারকে ব্যবহৃত হয় (কিংবা সাধু-ভাষায় « সর্বাপেক্ষা » এই সমস্ত-পদ ব্যবহৃত হয়), এবং উপমানের উল্লেখ থাকিলে উপমানকে অধিকরণ-কারকে (সপ্তমী-বিভক্তিতে) আনা হয়; অথবা অর্থানুসারে, উহার বহুবচনের অপাদান-কারক প্রযুক্ত হয়;

যথা—« এ কথা সব চেয়ে (সব থেকে) ভাল ; সব চেয়ে ভাল কথা এই ; স্থলচর জন্তুদের মধ্যে হাতী সব চেয়ে বড় ; পশুগণ-মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ; রাম, শ্যাম, যদু, এই তিন জনের মধ্যে যদু-ই সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ ; গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গ ; সে সকলের চেয়ে পাজী » ইত্যাদি।

তুলনা করিবার কালে, বাঙ্গালা ভাষার রীতি-অনুসারে, বিশেষণে কোনও প্রত্যয়-যোগ হয় না। কিন্তু সংস্কৃতে প্রত্যয়-যোগ করিয়া বিশেষণের পরিবর্ধন করা হয়, এবং এই পরিবর্ধিত রূপ-দ্বারা এক বা বহুর সহিত তুলনা করা হয়। দুইটী বস্তুর মধ্যে তুলনা হইলে সাধারণতঃ সংস্কৃতে বিশেষণের উত্তর « তর »-প্রত্যয় যুক্ত হয়, এবং দুইয়ের অধিক বস্তুর মধ্যে হইলে সাধারণতঃ « তম »-প্রত্যয় আইসে। (এই « তর, তম »-প্রত্যয়দ্বয় হইতে « তারতম্য » শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ—তুলনা-দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দেশ করা।) সংস্কৃত হইতে গৃহীত « তর, তম »- যুক্ত বহু বিশেষণ-পদ বাঙ্গালা ভাষায় (বিশেষ করিয়া সাধু-ভাষায়) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। « তর, তম »-প্রত্যয়দ্বয় মূল বা অবিকৃত বিশেষণের উত্তর প্রযুক্ত হয় ; যথা—« মেষ অপেক্ষা হস্তী বৃহত্তর : হিমালয় বিন্ধ্য অপেক্ষা উচ্চতর » ; « তম »-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ-দ্বারা বহুর সহিত তুলনা বুঝাইলে, « সর্বাপেক্ষা, সকলের চেয়ে » প্রভৃতি অপাদান-কারকের পদ বা বাক্য প্রযুক্ত না করিলেও চলে ; যথা—« পশুগণ-মধ্যে (বা পশুর মধ্যে) হস্তী বৃহত্তম ; (কচিৎ এইরূপ ভুল প্রয়োগও মিলে—« পশুর মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম » ;) রাম, শ্যাম ও যদু, এই তিন জনের মধ্যে যদু-ই বুদ্ধিমত্তম ; হিমালয়ের সমস্ত শৃঙ্গের মধ্যে গৌরীশঙ্কর-ই উচ্চতম »।

« তর, তম » -প্রত্যয়দ্বয়ের উদাহরণ : « গুরু—গুরুতর—গুরুতম ; প্রিয়—প্রিয়তর—প্রিয়তম ; কৃশ—কৃশতর—কৃশতম ; মিষ্ট—মিষ্টতর —মিষ্টতম ; তিক্ত—তিক্ততর—তিক্ততম »।

খাঁটী বাঙ্গালা (প্রাকৃতজ) ও বিদেশী শব্দে « তর, তম »-প্রত্যয় কদাপি প্রযুক্ত হয় না—এই প্রত্যয়দ্বয় কেবল শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেই নিবদ্ধ থাকে ; « ভাল—ভালতর—ভালতম, বড়তর—বড়তম, চালাকতর—চালাকতম » এই প্রকার রূপ বাঙ্গালায় চলে না।

কখনও-কখনও বাঙ্গালায় আগত « তর, তম »-যুক্ত সংস্কৃত বিশেষণ-পদ হইতে তুলনার ভাব অন্তর্হিত হইয়া থাকে—এই প্রত্যয়-দ্বারা অতিশায়ন বা তুলনা না বুঝাইয়া, কেবল গুণের আধিক্য বুঝায় ; যথা—« তিনি ঘোরতর (=অত্যন্ত ঘোর বা কঠিন) বিপদে পড়িয়াছেন ; গুরুতর সমস্যা (=অত্যন্ত গুরু) ; উত্তম (=খুব ভাল) » ইত্যাদি।

« তর, তম » ভিন্ন, সংস্কৃতে « ঈয়স্ » (প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে « ঈয়ান্ », স্ত্রীলিঙ্গে « ঈয়সী », ক্লীবলিঙ্গে « ঈয়ঃ ») ও « ইষ্ঠ » -প্রত্যয়-দ্বয়ও কতকগুলি বিশেষণের উত্তর মিলে। এই প্রত্যয়গুলির যোগে, কখনও-কখনও মূল বিশেষণের রূপে কিছু আভ্যন্তর পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ; যথা— « স্বাদু—স্বাদীয়ঃ—স্বাদিষ্ঠ (তুলনীয়, ইংরেজী sweet—sweeter—sweetest) ; লঘু—লঘীয়ান্—লঘিষ্ঠ ; গুরু—গরীয়ান্ (গরীয়সী)—গরিষ্ঠ ; বহু—ভূয়ান্ (ভূয়সী)—ভূয়িষ্ঠ ; বলী—বলীয়ান্ (বলীয়সী)—বলিষ্ঠ, প্রিয়—প্রেয়ান্ (প্রেয়সী)—প্রেষ্ঠ ; প্রশস্ত (বা শ্রী বা শ্রীমৎ)—শ্রেয়ঃ (শ্রেয়সী)—শ্রেষ্ঠ ; অল্প—কনীয়ান্ (কনীয়সী)—কনিষ্ঠ ; উরু—বরীয়ান্ (বরীয়সী)—বরিষ্ঠ ; মহৎ—মহীয়ান্ (মহীয়সী)—মহিষ্ঠ »। তারতম্য জানাইতে « ঈয়স্, ইষ্ঠ »-প্রত্যয়-যুক্ত পদ বাঙ্গালায় তাদৃশ ব্যবহৃত হয় না—তারতম্যের জন্য এগুলিকে অপ্রচলিত-ই বলা যায় ; এখন এগুলি প্রায়ই সাধারণ বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয় ; যথা—« স্বাদিষ্ঠ=সুন্দর স্বাদযুক্ত, ভূয়সী (=প্রভূত) প্রশংসা ; বলিষ্ঠ (=বলশালী) ব্যক্তি ; জ্যেষ্ঠ (=অগ্রজ) ; প্রেয়সী (=প্রিয়া স্ত্রী) ; মহীয়সী (=মহদ্গুণ-যুক্তা) নারী » ইত্যাদি। « জননী জন্মভূমিশ্চ

স্বর্গাদপি গরীয়সী »—'জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গুরু'—এখানে অতিশায়ন বা তারতম্যের ভাব মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালায় « গরীয়সী » শব্দ কেবল সাধারণ ভাব-ই প্রকাশ করে। « শ্রেষ্ঠ » শব্দ বাঙ্গালায় কেবল « উৎকৃষ্ট » অর্থেই সাধারণ-ভাবে ব্যবহৃত হয়; মূলে এই শব্দ যে বহুর সহিত তুলনায় উৎকর্ষ প্রকাশ করিত, সে বোধ চলিয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালায় ইহার উত্তর আবার « তর, তম »-প্রত্যয় যোগ করিয়া, « শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম » এই দুইটী নূতন পদ সৃষ্ট হইয়াছে। তদ্বৎ, « কনিষ্ঠ —কনিষ্ঠতম ; জ্যেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠতম »।

সাদৃশ্য বা সমান ভাব জানাইবার জন্যও বিশেষণের তুলনা হয়; তখন প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত উপমানের সহিত (সর্বনাম হইলে বিকল্পে প্রাতিপদিক রূপের সহিত—নিম্নে দ্রষ্টব্য) « হেন » এই শব্দ জুড়িয়া (সাধারণতঃ পদ্যে ও চলিত-ভাষায়), কিংবা ষষ্ঠ্যন্ত উপমানের সঙ্গে « মত, মতন, ন্যায় » এই শব্দগুলির কোন একটী যোগ করিয়া, এই সাম্য বা সাদৃশ্য প্রকটিত হয়; যথা—« রাবণ হেন বীর ; আমি হেন ভাল মানুষ : মহাভারত হেন বই ; তুমি হেন বীর (বা তোমা হেন বীর); সে-হেন, তার মত (মতন) সাদাসিধা মানুষ ; রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেওর ; ভীমের ন্যায় বীর ; হাতেমের মত দাতা » ইত্যাদি।

[৩.০৭৬] সংখ্যা-বাচক বিশেষণ

বাঙ্গালায় সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইলে অবিকৃত থাকে। **ক্রম-সংখ্যা** জানাইতে হইলে, চলিত বাঙ্গালায় গণনার সংখ্যাকে কোনও-কোনও স্থলে ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত করা হয়; যেমন « একের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর, তেরর পরিচ্ছেদ »; কিংবা, প্রথমতঃ সংখ্যা-বাচক শব্দ, তৎপরে ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত উদ্দেশ্য শব্দ, এবং তদনন্তর পুনরায় উদ্দেশ্য শব্দটী —এই ভাবে ক্রম প্রকাশিত হয়; যথা—« তিন বারের বার ; পাঁচ দিনের

দিন ; সাত ভাগের ভাগ ; এক শ' দিনের দিন ; প্রত্যেক আট জনের জন »। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ নিয়ম খাটে না। চলিত-বাঙ্গালায় ক্রম-বাচক সংখ্যা প্রকাশ করা কঠিন ব্যাপার। বাঙ্গালায় ক্রম-বাচক সংখ্যার অভাব, সংস্কৃতের ক্রম-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া পূরণ করা হয়। তারিখ জানাইবার জন্য « এক » হইতে « বত্রিশ » পর্যন্ত সংখ্যার বিশেষ ক্রম-বাচক রূপ আছে। নিম্নে বাঙ্গালার ও সংস্কৃতের **গণনা-সংখ্যা** ও বন্ধনীর মধ্যে **ক্রম-বাচক-সংখ্যা** দেওয়া হইতেছে ; তারিখের জন্য « পহেলা » হইতে « বত্রিশে' » পর্যন্ত ক্রম-বাচক সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
১, এক (উচ্চারণে [য়্যাক্]) (পহেলা, পয়লা)	এক (প্রথম, প্রথমা)
২, দুই, দু' (দোসরা)	দ্বি (দ্বিতীয়, দ্বিতীয়া)
৩, তিন (তেসরা)	ত্রি (তৃতীয়, তৃতীয়া)
৪, চারি, চার (চৌঠা, চৌঠো)	চতুঃ (চতুর্থ, চতুর্থী ; তুরীয়)
৫, পাঁচ (পাঁচই, পাঁচুই)	পঞ্চ (পঞ্চম, পঞ্চমী)
৬, ছয়, ছ' (ছউই)	ষট্ ষষ্ (ষষ্ঠ, ষষ্ঠী)
৭, সাত (সাতই, সাতুই)	সপ্ত (সপ্তম, সপ্তমী)
৮, আট (আটই, আটুই)	অষ্ট (অষ্টম, অষ্টমী)
৯, নয়, ন' (নঅই, নউই)	নব (নবম, নবমী)
১০, দশ (দশই)	দশ (দশম, দশমী)
১১, এগার, এগারো (এগারই)	একাদশ (একাদশ, একাদশী)
১২, বার, বারো (বারই)	দ্বাদশ (দ্বাদশ, দ্বাদশী)
১৩, তের, তেরো (তেরই)	ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশ, ত্রয়োদশী)
১৪, চৌদ্দ, চোদ্দ (চোদ্দই)	চতুর্দশ (চতুর্দশ, চতুর্দশী)

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
১৫, পনর, পনের, পনেরো (পনরই, পনেরই)	পঞ্চদশ (পঞ্চদশ, পঞ্চদশী)
১৬, ষোল, ষোলো (ষোলই)	ষোড়শ (ষোড়শ, ষোড়শী)
১৭, সতের, সতেরো (সতরই, সতেরই)	সপ্তদশ (সপ্তদশ, সপ্তদশী)
১৮, আঠার, আঠারো (আঠারই)	অষ্টাদশ (অষ্টাদশ, অষ্টাদশী)
১৯, উনিশ (উনিশিয়া, উনিশে')	*ঊনবিংশতি (ঊনবিংশ, -তিতম)
২০, কুড়ি, বিশ (বিশে')	বিংশতি (বিংশ, -তিতম)
২১, একুশ (একুশে')	একবিংশতি (একবিংশ, -তিতম)
২২, বাইশ (বাইশে')	দ্বাবিংশতি (দ্বাবিংশ, -তিতম)
২৩, তেইশ (তেইশে')	ত্রয়োবিংশতি (ত্রয়োবিংশ, -তিতম)
২৪, চব্বিশ (চব্বিশে')	চতুর্বিংশতি (চতুর্বিংশ, -তিতম)
২৫, পঁচিশ (পঁচিশে')	পঞ্চবিংশতি (পঞ্চবিংশ, -তিতম)
২৬, ছাব্বিশ (ছাব্বিশে')	ষড়্‌বিংশতি (ষড়্‌বিংশ, -তিতম)
২৭, সাতাইশ, সাতাশ (সাতাশে')	সপ্তবিংশতি (সপ্তবিংশ, -তিতম)
২৮, আঠাইশ, আটাশ (আঠাশে', আটাশে')	অষ্টাবিংশতি (অষ্টাবিংশ, -তিতম)
২৯, উনত্রিশ, উনতিরিশ (উনত্রিশে')	ঊনত্রিংশৎ (ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিংশত্তম)
৩০, তিরিশ, ত্রিশ (তিরিশে')	ত্রিংশৎ (ত্রিংশ, ত্রিংশত্তম)
৩১, একত্রিশ (একত্রিশে')	একত্রিংশৎ (একত্রিংশ, -ত্তম)
৩২, বত্রিশ (বত্রিশে')	দ্বাত্রিংশৎ (দ্বাত্রিংশ, -ত্তম)

* ১৯, ২৯, ৩৯……৯৯, ১৯৯ প্রভৃতি স্থলে «ঊন-» বা «একোন-» উভয় শব্দই সংখ্যাটীর পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যথা—«ঊনচত্বারিংশৎ (ঊনচত্বারিংশত্তম), একোনচত্বারিংশৎ (একোনচত্বারিংশত্তম)»।

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
৩৩, তেত্রিশ	ত্রয়স্ত্রিংশৎ (ত্রয়স্ত্রিংশ, -ত্তম)
৩৪, চৌত্রিশ (প্রাচীন—চৌতীশ)	চতুস্ত্রিংশৎ (চতুস্ত্রিংশ, -ত্তম)
৩৫, পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশৎ (পঞ্চত্রিংশ, -ত্তম)
৩৬, ছত্রিশ	ষট্‌ত্রিংশৎ (ষট্‌ত্রিংশ, -ত্তম)
৩৭, সাঁইত্রিশ	সপ্তত্রিংশৎ (সপ্তত্রিংশ, -ত্তম)
৩৮, আটত্রিশ	অষ্টাত্রিংশৎ (অষ্টাত্রিংশ, -ত্তম)
৩৯, উনচল্লিশ, উনচাল্লিশ	উনচত্বারিংশৎ (উনচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪০, চল্লিশ, চাল্লিশ	চত্বারিংশৎ (চত্বারিংশ, -ত্তম)
৪১, একচল্লিশ, একচাল্লিশ	একচত্বারিংশৎ (একচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪২, বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশৎ (দ্বিচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৩, তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশৎ (ত্রিচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৪, চুয়াল্লিশ	চতুশ্চত্বারিংশৎ (চতুশ্চত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৫, পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্বারিংশৎ (পঞ্চচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৬, ছেচল্লিশ	ষট্‌চত্বারিংশৎ (ষট্‌চত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৭, সাতচল্লিশ	সপ্তচত্বারিংশৎ (সপ্তচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৮, আটচল্লিশ	অষ্টচত্বারিংশৎ, অষ্টাচত্বারিংশৎ (অষ্টচত্বারিংশ, -ত্তম)
৪৯, উনপঞ্চাশ	উনপঞ্চাশৎ (উনপঞ্চাশত্তম)
৫০, পঞ্চাশ	পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশত্তম)
৫১, একান্ন	একপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫২, বাহান্ন	দ্বিপঞ্চাশৎ, দ্বাপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৩, তিপ্পান্ন	ত্রিপঞ্চাশৎ, ত্রয়পঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৪; চুয়ান্ন	চতুঃপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৫, পঞ্চান্ন (পাচপন)	পঞ্চপঞ্চাশৎ (…শত্তম)

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
৫৬, ছাপ্পান্ন	ষট্‌পঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৭, সাতান্ন	সপ্তপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৮, আটান্ন, আঠান্ন	অষ্টপঞ্চাশৎ, অষ্টাপঞ্চাশৎ (…শত্তম)
৫৯, উনষাঠ	ঊনষষ্টি (ঊনষষ্টিতম)
৬০, ষাঠি, ষাঠ, ষাট	ষষ্টি (-তম)
৬১, একষট্টি	একষষ্টি (-তম)
৬২, বাষট্টি	দ্বিষষ্টি, দ্বাষষ্টি (-তম)
৬৩, তেষট্টি	ত্রিষষ্টি, ত্রয়ঃষষ্টি (-তম)
৬৪, চৌষট্টি	চতুঃষষ্টি (-তম)
৬৫, পঁয়ষট্টি	পঞ্চষষ্টি (-তম)
৬৬, ছেষট্টি	ষট্‌ষষ্টি (-তম)
৬৭, সাতষট্টি	সপ্তষষ্টি (-তম)
৬৮, আটষট্টি	অষ্টষষ্টি, অষ্টাষষ্টি (-তম)
৬৯, উনসত্তর	ঊনসপ্ততি (-তম)
৭০, সত্তর	সপ্ততি (-তম)
৭১, একাত্তর	একসপ্ততি (-তম)
৭২, বাহাত্তর	দ্বিসপ্ততি, দ্বাসপ্ততি (-তম)
৭৩, তিহাত্তর, তিয়াত্তর	ত্রিসপ্ততি, ত্রয়ঃসপ্ততি (-তম)
৭৪, চুয়াত্তর	চতুঃসপ্ততি (-তম)
৭৫, পঁচাত্তর	পঞ্চসপ্ততি (-তম)
৭৬, ছিয়াত্তর	ষট্‌সপ্ততি (-তম)
৭৭, সাতাত্তর	সপ্তসপ্ততি (-তম)
৭৮, আটাত্তর	অষ্টসপ্ততি, অষ্টাসপ্ততি (-তম)
৭৯, উনআশী	ঊনাশীতি (-তম)

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা।
৮০, আশী	অশীতি (-তম)
৮১, একাশী	একাশীতি (-তম)
৮২, বিরাশী	দ্ব্যশীতি (-তম)
৮৩, তিরাশী	ত্র্যশীতি (-তম)
৮৪, চুরাশী	চতুরশীতি (-তম)
৮৫, পঁচাশী	পঞ্চাশীতি (-তম)
৮৬, ছিয়াশী	ষড়শীতি (-তম)
৮৭, সাতাশী	সপ্তাশীতি (-তম)
৮৮, আটাশী, আঠাশী, অষ্টআশী	অষ্টাশীতি (-তম)
৮৯, উননই, উননব্বই	ঊননবতি (-তম)
৯০, নই, নব্বই	নবতি (-তম)
৯১, একানই, একানব্বই	একনবতি (-তম)
৯২, বিরানই, বিরানব্বই	দ্বিনবতি, দ্বানবতি (-তম)
৯৩, তিরানই, তিরানব্বই	ত্রিনবতি, ত্রয়োনবতি (-তম)
৯৪, চুরানই, চুরানব্বই	চতুর্নবতি (-তম)
৯৫, পঁচানই, পঁচানব্বই	পঞ্চনবতি (-তম)
৯৬, ছিয়ানই, ছিয়ানব্বই	ষণ্ণবতি (-তম)
৯৭, সাতানই, সাতানব্বই	সপ্তনবতি (-তম)
৯৮, আটানই, আঠানই, আটানব্বই	অষ্টানবতি (-তম)
৯৯, নিরানই, নিরানব্বই	নবনবতি, ঊনশত (-তম)
১০০, শ', শো, এক শ', এক শো	শত (শততম)
১০১, এক-শ'-এক	একাধিকশত (একাধিকশততম)
২০০, দুই শ', দুশো	দুই শত, দ্বিশত (দ্বিশততম)
১,০০০, হাজার, দশ-শ'	সহস্র (সহস্রতম)

বাঙ্গালা সংখ্যা	সংস্কৃত সংখ্যা
১,০২৫, (এক) হাজার পঁচিশ, দশ-শ' পঁচিশ	পঞ্চবিংশত্যধিক-সহস্র (পঞ্চবিংশত্যধিক-সহস্রতম)
১,৯৩৬, এক হাজার নয় শ' ছত্রিশ, বা উনিশ-শ' ছত্রিশ	
১০,০০০, দশ হাজার বা অযুত	
১,০০,০০০, (এক) লাখ বা লক্ষ	
১০,০০,০০০, দশ লাখ বা নিযুত (মিলিয়ন – million)	
১,০০,০০,০০০, (এক) কোটি (দশ মিলিয়ন) ।	

ক্রম-সংখ্যা ব্যতীত, গণন-সংখ্যা হইতে সৃষ্ট অন্য প্রকারের পরিমাণ-বোধক সংখ্যার জন্য এই পদগুলি বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—

(ক) গণিত-সংখ্যা-বাচক—« একগুণ ; দ্বিগুণ, দুইগুণ, দুগুণ, দুনা, *দুনো ; চতুর্গুণ, চৌগুণা ; পাঁচগুণ » ইত্যাদি ।

(খ) ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক—« ¼—পোয়া, পাদ ; ⅓—তেহাই, তিন ভাগের এক ভাগ ; ½—আধ, অর্ধ, আর্ধেক, আদ্ধেক, আধেক ; ¼ কম = পৌনে, পাদোন ; ¼ অধিক = সওয়া, সপাদ ; ½ অধিক—সাড়ে, সার্ধ ; ১½—½ কম ২ = দেড়, দ্ব্যর্ধ ; ২½—½ কম ৩—আড়াই, অর্ধতৃতীয় ; ২¼ = সওয়া-দুই ; ৪¼ = সওয়া-চার » ইত্যাদি ।

(গ) ভগ্নাংশ-সংখ্যা—⅓, ⅔, ⅘, ⁶⁄₇ প্রভৃতি ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক পদ, « তিনের এক, তিনের দুই, পাঁচের চার, সাতের ছয় » (অর্থাৎ « তিন ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের দুই ভাগ, পাঁচ ভাগের চার ভাগ, সাত ভাগের ছয় ভাগ ») এইরূপে, অথবা « এক তৃতীয়, দুই তৃতীয়, চার পঞ্চম, ছয় সপ্তম » এইরূপে পড়া উচিত ; কিন্তু সাধারণতঃ যে ক্রমে সংখ্যাগুলি লিখিত হয় সেই ক্রম অবলম্বন করিয়া, এবং ইংরেজীর one-

third, two-thirds, four-fifths, six-sevenths প্রভৃতির অনুকরণে « একের তিন, দুইয়ের তিন, চারের পাঁচ, ছয়ের সাত » রূপে অনেকে পাঠ করেন। « তিনের এক » প্রভৃতি পাঠে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে; « এক তিনের, দুই তিনের, চার পাঁচের, ছয় সাতের » এইরূপে পাঠ করাই সমীচীন।

[৩.০৮] সর্বনাম

বাক্য-মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত, অথবা অজ্ঞাত, কোনও সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেগুলিকে **সর্বনাম** বলে। সর্ব অর্থাৎ সকলের নামের স্থলে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, « সর্বনাম » এই নাম-করণ হইয়াছে; সর্বনাম-পদের ব্যবহার-দ্বারা, একই পদের পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়; যেমন—« রামের বাড়ী গিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে দেখা হইল না, তাহার পিতা বলিলেন যে সে কলিকাতায় গিয়াছে »—এখানে « তাহার » ও « সে » প্রয়োগ করায়, « রামের » ও « রাম » পদের পুনরুল্লেখ নিবারিত হইল।

লিঙ্গানুসারে বাঙ্গালায় সর্বনামের রূপ-ভেদ হয় না; কেবল কতকগুলি সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ রূপ আছে।

সর্বনাম নানা প্রকারের হয়; যথা—

[১] **ব্যক্তি-বাচক বা পুরুষ-বাচক** (Personal);

[২] **উল্লেখ-সূচক বা নির্দেশ-সূচক** (Demonstrative)—

(ক) **প্রত্যক্ষ- বা অন্তিক-নির্দেশ-সূচক** (Near Demonstrative);

(খ) **পরোক্ষ- বা দূরস্থ-নির্দেশ-সূচক** (Far Demonstrative);

[৩] সাকল্য-বাচক (Inclusive);
[৪] সম্বন্ধ-, সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক (Relative);
[৫] প্রশ্ন-সূচক (Interrogative);
[৬] অনিশ্চয়-সূচক (Indefinite);
[৭] আত্মবাচক (Reflexive);
[৮] ব্যতিহারিক (Reciprocal)।

বাঙ্গালা সর্বনামের "শব্দ-রূপ," বিশেষ্য-পদের রূপেরই মত হইয়া থাকে—বিশেষ্যের উত্তর যে সকল প্রত্যয়, কর্মপ্রবচনীয় প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, সর্বনামেও সেই সকল আইসে; কিন্তু সর্বনাম-শব্দের রূপে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রায় তাবৎ সর্বনামের দুইটী করিয়া রূপ বিদ্যমান—(১) একটী কর্তৃকারকের বা অবিভক্তিক অথবা বিভক্তি-হীন রূপ, এবং (২) অন্যটী প্রাতিপদিক রূপ (stem-form) বা তির্যক্ রূপ (oblique form) অথবা সবিভক্তিক বা বিভক্তি-গ্রাহী রূপ। বিভক্তি যোগ করিতে হইলে, এই প্রাতিপদিক রূপেই করা হয়, অবিভক্তিক বা মৌলিক রূপের উত্তর বিভক্তি যুক্ত হয় না। নিম্নে প্রদত্ত সর্বনামের রূপ হইতে এই দুই প্রকার বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে।

[৩.০৮১] [১] ব্যক্তিবাচক বা পুরুষ-বাচক সর্বনাম (Personal Pronouns)

[ক] উত্তম-পুরুষের সর্বনাম (First Person)

রূপ	একবচন	বহুবচন
মূল বা অবিভক্তিক রূপ	আমি; মুই	আমরা, আমরা সব, আমরা সকলে; মোরা (কবিতায়)
সবিভক্তিক বা তির্যক্ অথবা প্রাতিপদিক রূপ	আমা-; মো- (কবিতায়)	আমাদিগ, আমাদের; মোদিগ, মোদের; মোসবা (কবিতায়)।

« আমি »—সাধারণ রূপ; সকলেই নিজের সম্বন্ধে এই সর্বনাম ব্যবহার করে।

« মুই »—বঙ্গদেশে বহু স্থলে অশিক্ষিত লোকে এখনও ব্যবহার করে; আধুনিক সাহিত্যে বা ভদ্র-সমাজে এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে « মুই » পদ মিলে—« মুই, মুঞি, মুহি » প্রভৃতি নানা বানান দৃষ্ট হয়।

« মো- »—এই পদটী আধুনিক কবিতার ভাষায় মিলে, এবং বঙ্গদেশের বহু স্থলে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাদেশিক ভাষায় এখনও এই রূপের প্রয়োগ করে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় « মুই » মূলতঃ একবচনের পদ, « আমি (আহ্মি=আম্‌হি, আহ্মে=আম্‌হে) » বহুবচনের; আসামীতে এখনও « মই » একবচনে ও « আমি » বহুবচনে ব্যবহৃত হয়; তদ্রূপ উড়িয়াতে « মুঁ (একবচন), আম্ভে (বহুবচন) »; হিন্দুস্থানীতে « মৈঁ (একবচন), হম (বহুবচন) »। বহুবচনের « আমি » ক্রমে একবচনেও ব্যবহৃত হইতে থাকে, এবং একবচনের « মুই » বিরল-প্রচার বা অপ্রচলিত হইয়া যায়। « আমি » তখন পুরাপুরি একবচনেরই পদ হইয়া দাঁড়ায়, এবং বহুবচনের জন্য « আমি » হইতে « আমরা-সব, আমরা » প্রভৃতি নূতন রূপের সৃষ্টি হয়। উড়িয়া ও হিন্দুস্থানীতে একবচনের পদ « মুঁ » ও « মৈঁ » প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, বহুবচনের রূপ « আম্ভে, হম » একবচনেও ব্যবহৃত হয়, ও নূতন বহুবচনের রূপ « আম্ভে-মানে » ও « হম-লোগ » সৃষ্ট হইয়াছে; এবং আসামীতেও « আমি »-র পার্শ্বে নূতন রূপ « আমা-লোকে » স্থান পাইয়াছে।

পরের পৃষ্ঠায় « মুই » ও « আমি »-র সম্পর্ক প্রদর্শিত হইল; এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম « তুই, তুমি »-র উৎপত্তি ও ইতিহাস, প্রথম পুরুষের « মুই, আমি »-র মত বলিয়া, « তুই, তুমি »-র সম্বন্ধও প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালা « আমি » শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত « অস্মদ্ » শব্দ

	সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা	উড়িয়া, আসামী	হিন্দী বা হিন্দুস্থানী
কর্তা, একবচন	অহম্	অহকং, হকং, হউং	হাঁউ, হঁউ	[লুপ্ত]	[লুপ্ত]	হোঁ (ব্রজভাষা)
করণ, একবচন	ময়া	মএ, মইঁ	মইঁ, মই	মুই	মু, মই	মৈঁ
কর্তা, বহুবচন	অস্মে (বৈদিক)	অম্হে	আহ্মি, আম্হি }	আমি	আম্ভে, আমি	হমহি, হম
করণ, বহুবচন	অস্মাভিঃ	অম্হেহি, অম্হহি	আহ্মে, আম্হে }			
সম্বন্ধ, একবচন	মম	মম, মম্ম	মো	মো	মো	মো (ব্রজভাষা)
বহুবচনে প্রাতিপদিক রূপ	অস্ম-	অম্হ-	আহ্মা, আম্হা	আমা	আম্ভ, আমা	হম।

বাঙ্গালা « তুমি » শব্দের প্রতিরূপ সংস্কৃত « যুষ্মদ্ » শব্দ

	সংস্কৃত	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙ্গালা	বাঙ্গালা	আসামী	উড়িয়া	হিন্দী
একবচন	ত্বং, ত্বয়া	তএ, তুএ	তইঁ	তুই (তু)	তই	তু	তু, তৈঁ
বহুবচন	যুষ্মে (বৈদিক), যুষ্মাভিঃ	তুম্হে, তুম্হেহি	তুহ্মি (তুম্হি), তুহ্মে (তুম্হে)	তুমি	তুমি	তুম্ভে, তুম্ভ	তুম।

বাঙ্গালা সর্বনাম « আমি » শব্দের রূপ—

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	আমি (মুই—গ্রাম্য)	আমরা, আমরা সব, আমরা সকলে; (কবিতায়—মোরা, মোরা সব)
কর্ম ও সম্প্রদান	আমাকে, আমারে, আমায় (কবিতায়— * মোরে)	আমাদিগকে, আমাদিকে, আমা-দিগে ; আমাদের, আমাদেরকে ; (কবিতায়—মোদের, মোদিগকে, মোদিকে)
করণ	আমা হইতে, আমা হ'তে ; আমাদ্বারা, আমার দ্বারা ; আমাদিয়া, আমাকে দিয়া ; * আমায় দিয়ে ; আমা-কর্তৃক ; (কবিতায়—মোদিয়া, মোকে দিয়া, মো হইতে, মো হ'তে)	আমাদিগ (আমাদিগের) দ্বারা, কর্তৃক বা দিয়া ; * আমাদের দিয়ে ; আমাদের দিয়া ; (কবিতায়—মোদের দ্বারা, মোদের দিয়া)
অপাদান	আমা হইতে, আমা-হ'তে, আমা-থেকে, আমার কাছ থেকে ; আমার নিকট (হইতে) ; (কবিতায়—মো হইতে, মো হ'তে)	আমাদিগ হইতে, আমাদিগের নিকট হইতে ; আমাদিগের কাছ থেকে ; আমাদের থেকে ; * আমাদের হ'তে ; * আমাদের কাছ থেকে ; (কবিতায়—মোদিগ হইতে, মোসবা হইতে)
সম্বন্ধ	আমার (কবিতায়—মোর, মম)	আমাদিগের, আমাদের, আমাসবার (কবিতায়—মোদের, মোসবার)

কারক	একবচন	বহুবচন
অধিকরণ	আমাতে, আমায় (কবিতায়—মোতে)	আমাদিগতে, আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে, মাঝে ; (কবিতায়—মোদিগে, মোদিগতে, মোসবার মাঝে, মধ্যে)

কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ—

ষষ্ঠীতে (সম্বন্ধে) একবচনে সংস্কৃত ষষ্ঠীর পদ « মম » (বাঙ্গালা উচ্চারণে [মমো] বা [মোমো]) বাঙ্গালায় কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়—গদ্যে বা কথ্য ভাষায় কদাচ হয় না। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতায় ষষ্ঠীর একবচনে « মঝু » এই রূপটীও পাওয়া যায় (সংস্কৃতের সপ্তমীর পদ « মহ্যম্ » > প্রাকৃত ষষ্ঠী « মুজ্ঝ » > বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের ভাষায় « মঝু »)। « হামার, হামারি » পদদ্বয়ও ষষ্ঠীতে বৈষ্ণব পদের ভাষায় মিলে।

সংস্কৃত বিশেষ্য পদের সহিত সমাসে, একবচনে সংস্কৃত প্রাতিপদিক রূপ « মৎ » বা « মদ্ » এবং বহুবচনে « অস্মৎ » বা « অস্মদ্ » ব্যবহৃত হয় ; যথা—« মদ্‌গৃহে (বা অস্মদ্‌গৃহে) পদার্পণ-পূর্ব্বক অধীনকে অনুগৃহীত করিবেন ; মদাশ্রয়ে সুখে অবস্থান কর ; মৎসদৃশ (বা অস্মৎসদৃশ) অকিঞ্চনের নিবেদন কি শুনিবেন না ? » ইত্যাদি।

« আমাদিগের, আমাদের » প্রভৃতি পদের উৎপত্তি এইরূপ হইয়াছে : « আমা+আদিক+এর, আমা+আদি+র »। « আমাদিগ-, আমাদের » কর্ত্তৃকারকে কদাচ ব্যবহৃত হয় না—কেবল কর্ত্তৃ-ব্যতীত তির্য্যক্-রূপেই এগুলির প্রয়োগ। « আমা+আদি+র »—এই মূল- বা বিশ্লেষ-অনুসারে, প্রাচীন গদ্যে একটী সাহিত্যিক রূপ কচিৎ পাওয়া যায়—« অস্মদাদির » (অস্মৎ+আদি) ; ইহা আজকাল অপ্রচলিত। « আমাদিগের » এই পদের মধ্যে, কেহ কেহ ফারসী ভাষার « দিগর » বা « দীগর » শব্দ (ইহার অর্থ—'অন্য, অপর') বিদ্যমান আছে কল্পনা করিয়া, অথবা এই ফারসী শব্দের প্রভাব « আমাদিগের » পদের মধ্যে আসিয়াছে মনে করিয়া, « আমার-দিগর, আমার-দিগর-কে, আমার-দিগর-হইতে » এই প্রকার কতকগুলি রূপ ব্যবহার করিতেন ; পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যে, চিঠিপত্র ও দলিল প্রভৃতিতে, এই প্রকার « দিগর »-যুক্ত রূপ পাওয়া যায় ; আজকাল এগুলি একেবারে অপ্রচলিত।

নিজের অতিরিক্ত বিনয়, অথবা যাঁহার সহিত কথোপকথন করা হইতেছে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা সম্মান দেখাইবার জন্য, « আমি » এই সর্বনাম-পদ ব্যবহার না করিয়া, « দাস, সেবক, অধম, দীন, গরীব, অকিঞ্চন, বান্দা, গোলাম, ফিদ্‌বী, অধীন » প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হয়; যথা—« দাস আপনার শ্রীচরণেই পড়িয়া আছে; দীনের কুটীরে প্রভুর (= আপনার) পদধূলি কি পড়িবে না? নিরুপায় হ'য়ে এসেছি, গরীবকে বাঁচান; গোলামের গোস্তাকী মাফ হয়; বান্দা হুজুরের খেদ্‌মতের জন্যই হামেশা হাজির রহিয়াছে; শ্রীচরণে অধম একটী নিবেদন করিতে চাহে » ইত্যাদি। এই সকল শব্দ প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়।

[খ] মধ্যম পুরুষের সর্বনাম (Second Person)।

বাঙ্গালা মধ্যম পুরুষের সর্বনামে তিনটী রূপ আছে—যাহার সহিত আলাপ হইতেছে, তাহার সম্মাননার তারতম্য বা পরিমাণ জানাইবার জন্য এই তিনটী বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হয়। মধ্যম পুরুষেও উত্তম পুরুষের ন্যায় সবিভক্তিক ও অবিভক্তিক রূপ আছে।

(১) « তুই » শব্দ—

« তুই » অনাদরে ও তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়। নিজের পরিবারস্থ শিশুদের সম্বন্ধে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি স্নেহের সম্পর্কের ব্যক্তি-সম্বন্ধে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম-বয়স্ক মিত্র অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে, সাধারণতঃ এই সর্বনাম প্রযুক্ত হয়; এতদ্ভিন্ন পুরাতন ভৃত্য এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক-সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিকট আত্মীয়, বহুদিনের পরিচিত মিত্র অথবা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ না হইলে, সর্ব শ্রেণীর লোক-সম্বন্ধে-ই « তুই »-য়ের প্রয়োগ ভদ্রসমাজে বিরল হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত আদরে বা নৈকট্য-কল্পনায় (সাধারণতঃ মাতৃ-মূর্তিতে দৃষ্ট)

দেব-শক্তির সম্বন্ধেও « তুই »-য়ের প্রয়োগ বাঙ্গালায় দেখা যায়—বিশেষতঃ কবিতায় ; যেমন—« তুই মা মোদের জগৎ-আলো ; পাই যেন তোর চরণ-দুটী »।

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	তুই	তোরা (তোরা-সব, -সকলে)
সবিভক্তিক	তো-	তোদিক-, তোদের।

উত্তম পুরুষের « মুই, মো »-র মত « তুই » শব্দের রূপ হয় ; যথা—« তুই, তোকে, তোরে, তোর, তোতে ; তোরা, তোদিগকে, তোদের, তোদেরকে, তোদিগ-দ্বারা, তোদিগ-দিয়া, * তোদের দিয়ে, তোদিগতে » ইত্যাদি।

(২) « তুমি » শব্দ—

যাহারা বক্তার শ্রদ্ধা ও সম্মাননার পাত্র নহে, কিংবা শ্রদ্ধা ও সম্মাননার পাত্র হইলেও যাহাদের সঙ্গে বক্তার ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাদের সম্বন্ধে, বয়ঃকনিষ্ঠদের সম্বন্ধে, ও পদ-মর্যাদায় যাহারা বক্তা অপেক্ষা বহুগুণে হীন, তাহাদের সম্বন্ধে « তুমি » ব্যবহৃত হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহের পাত্রদের সম্বন্ধে ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের সম্বন্ধেও « তুমি » প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর- ও দেবতা-সম্বন্ধেও « তুমি » ব্যবহার্য।

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	তুমি	তোমরা (তোমরা-সব, -সকলে)
সবিভক্তিক	তো-	তোমাদিগ-, তোমাদের।

« তুমি, তোমা- » শব্দের রূপ « আমি, আমা -» শব্দের মত হয়।

« মুই, আমি »-র ন্যায়, « তুই, তুমি » মূলে যথাক্রমে একবচন ও বহুবচনের রূপ ; ইহাদের সম্বন্ধ ৩২৪ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

একবচনের রূপ « তুই » তুচ্ছতা-বোধক হইয়া দাঁড়াইলে বহুবচনের « তুমি » গৌরবে বা আদরে একবচনের রূপ ধারণ করে। তদনন্তর « তুমি »-র নূতন বহুবচনের রূপ « তোমরা » প্রভৃতি সৃষ্ট হয়।

« তুই-মুই করা »—এই বাক্যে « তুই, মুই » পদদ্বয়ের দ্বারা তুচ্ছতা বা অসম্মান-জ্ঞাপক প্রয়োগের কথা সূচিত হইতেছে।

(৩৮) « আপনি » শব্দ—

মধ্যম পুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে, ভদ্রসমাজে সম্মান ও গৌরব এবং সৌজন্য-পূর্ণ সম্বোধনে « আপনি » শব্দ ব্যবহৃত হয়। অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি এবং ভদ্রবেশী মাত্রই এই সম্মাননার অধিকারী।

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	আপনি	আপনারা
সবিভক্তিক	আপনা-	আপনাদিগ-, আপনাদের।

মধ্যম পুরুষের কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ—

« আপনি, আপনা- » শব্দের রূপ « আমি, আমা- » র মত হয়।

কবিতায় সংস্কৃত ষষ্ঠীর একবচনের পদ « তব » (উচ্চারণে [তবো]) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব পদে « তুয়া » ও « তুয়া », এবং « তোহার, তোহারি, তুহার, তুহারি » পদগুলিও 'তোমার' -অর্থে ষষ্ঠীর একবচনে মিলে; « তোহে, তোয় »—চতুর্থীর একবচনে; « তুহুঁ »—প্রথমার একবচনে;—এই কয়টী রূপ পশ্চিমের ভাষা মৈথিলী ও হিন্দী হইতে গৃহীত।

সমস্ত-পদে, মধ্যম পুরুষের সংস্কৃত প্রতিরূপ, একবচনে « ত্বৎ (ত্বদ্) » ও কচিৎ বহুবচনে « যুষ্মৎ (যুষ্মদ্) » রূপদ্বয় সংস্কৃত বিশেষ্য প্রভৃতির সহিত যুক্ত হয়; যথা—« ত্বৎসদৃশ, ত্বদনুগ্রহ »। কখনও-কখনও « আপনি »-র মত সম্মান দেখাইবার জন্য « ভবৎ (ভবদ্) » শব্দ ঐরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—« ভবৎসমীপে, ভবচ্চরণে, ভবৎ-প্রসাদাৎ »।

অত্যধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবার জন্য মধ্যম পুরুষে « আপনি—আপনার—আপনাকে » প্রভৃতি-স্থলে কতকগুলি বিশিষ্ট সম্মানদ্যোতক বিশেষ্য (প্রথম পুরুষে) ব্যবহৃত হয়; যথা—« মহাশয়, « মশায় (মহাশয়ের নিবাস ? « মশায়ের জন্য কি ক'রতে পারি ?); প্রভু (ধর্মগুরু বা অন্নদাতা অথবা রাজার সম্পর্কে); মহারাজ; হুজুর; দেবতা (ব্রাহ্মণকে সম্বোধন

করিবার জন্য—নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মুখে—অল্পপ্রচলিত); জনাব (মুসলমান ভদ্রব্যক্তি-সম্বন্ধে)» ইত্যাদি। অনেক সময়ে বৃত্তি, জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম-স্থলে ব্যবহার করিয়া, তুচ্ছতা-মিশ্র অথবা ঘনিষ্ঠতা-মিশ্র ভদ্রতা বা আদর দেখানো হয়; যথা—« দারোগা-সাহেব (দারোগা-সাহেবের হুকম হ'লেই যাই); খাঁ-সাহেব; মিঞা-সাহেব; পণ্ডিত-মহাশয়; মোড়লের পো; সামন্তের পো; শেখজী; শেঠজী; দাসজী; ঠাকুর (ঠাকুরের বাড়ী কোন্ জেলায়? মাইনে কত?); * (মাষ্টার-মশায় মাষ্টার-মশায়ের হুকুম হ'লেই জরিমানা মাফ হয়); সাহেব; (ফিরাঙ্গি বা ইউরোপীয়-বেশী অপরিচিত ব্যক্তির সম্বন্ধে); মিঞা; সারেঙ্গ-মিঞা; মহারাজ; স্বামীজী; মাঝি (সাঁওতাল-জাতীয় লোকের পক্ষে)» প্রভৃতি।

« তুই, তুমি, আপনি » —এগুলির লিঙ্গ-ভেদ নাই।

[গ] প্রথম পুরুষের (Third Person) সর্বনাম।

অনুপস্থিত ব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

(১) « সে » শব্দ—সাধারণ প্রথম পুরুষের সর্বনাম—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	সে	তাহারা, তারা
সবিভক্তিক	তাহা-, তা-	তাহাদিগ-, তাদিগ-, তাহাদের, তাদের।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপে « তুমি » অথবা « তুই » শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে « সে » ব্যবহৃত হয়; ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিন্তু « সে » ব্যবহৃত হয় না। মানবেতর প্রাণীর সম্বন্ধে « সে » চলে। বৈষ্ণব পদের ভাষায় ষষ্ঠীতে « তাহার, তার » -স্থলে « তুয় » এই রূপটী মিলে। বিশেষণে « সেই সেই » অর্থে, সংস্কৃতের ক্লীবলিঙ্গ « তৎ তৎ (তত্তৎ) » শব্দদ্বয় সকল লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

(২) «তিনি» শব্দ—

ইহা গৌরব বা সম্মানের জন্য প্রযুক্ত হয়: «আপনি»-পদের অনুরূপ।

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	তিনি	তাঁহারা, তাঁরা
সবিভক্তিক	তাঁহা-, তাঁ-	তাঁহাদিগ-, তাঁদিগ-, তাঁদের, তাঁহাদের।

☞ সাধু ও চলিত বাঙ্গালায়, গৌরবে প্রথম পুরুষের সর্বনামে, অবিভক্তিক রূপের সর্বত্রই চন্দ্রবিন্দু লেখা ও সানুনাসিক উচ্চারণ করা সম্বন্ধে সচেতন থাকা কর্তব্য। ইহা না করিলে, ভাষা লিখনে বা কথনে অনিচ্ছাকৃত অশিষ্টতা বা অসৌজন্য আসিয়া যায়; এই হেতু এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। «তাঁহা» শব্দ «তাঁই» রূপেও লিখিত হয়।

«তেনা-, তান» প্রভৃতি প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার রূপ সাধু ও চলিত ভাষায় অপ্রযোজ্য; যথা—«তেনার কাছে, তান কাছে» ইত্যাদি। পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যে ও পদ্যে এবং দলিল প্রভৃতিতে «তিনি»-স্থলে «তিঁহ, তেঁহ, তিঁই, তেঁই» পদ ব্যবহৃত হইত, এখন ইহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

ইংরেজীর he, she-র মত প্রাদেশিক বাঙ্গালায় (চট্টগ্রামে) প্রথম পুরুষে পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে বিভিন্ন রূপ আছে—চট্টগ্রামের বাঙ্গালায় «হিতে, তে (হিতে=সে+তে)» পুংলিঙ্গে, এবং «তাঁই» স্ত্রীলিঙ্গে; আসামীতেও এইরূপ আছে—«সি (=সে)» পুংলিঙ্গ, «তাই, তায়ে» স্ত্রীলিঙ্গ। সাধু ও চলিত বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গের জন্য এই প্রকার বিশেষ রূপ অজ্ঞাত। বাঙ্গালায় প্রথম পুরুষের সর্বনামটী পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ কিসে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বাক্যের অর্থ ও সঙ্গতি দেখিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

[চিকিৎসা-বিষয়ে পুস্তক-লেখক ডাক্তার ৺চন্দ্রশেখর কালী, স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য জানাইবার জন্য, স্ত্রীলিঙ্গের একবচনে কতকগুলি বিশেষ রূপ সংস্কৃত হইতে আনয়ন করিয়া বাঙ্গালায় ব্যবহারের প্রয়াস করিয়াছিলেন—যথা, «সা=she (স্ত্রী), সে=he (পুং)»; স্ত্রীলিঙ্গে সবিভক্তিক রূপ «তস্যা-» (সংস্কৃত ষষ্ঠী «তস্যাঃ») হইতে—«তস্যার, তস্যাকে, তস্যাদ্বারা» ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় এই সমস্ত নূতন করিয়া সৃষ্ট রূপ গৃহীত হয় নাই।]

(৩) « তা » শব্দ—প্রথম পুরুষ, ক্লীবলিঙ্গ—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	তাহা, তা, তাই ; সেটা, সেটী, সেখানা, সেখানি ইত্যাদি	সে-সব, সে-গুলা, সে-গুলি, সে-সকল।
সবিভক্তিক	ঐ	ঐ

সবিভক্তিক রূপে কদাচিৎ ক্লীবলিঙ্গে « তাহাদিগ-, তাদিগ-, তাহাদের, তাদের » পদগুলিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে « সে-সব, সে-গুলা » ইত্যাদিই সাধারণ।

কতকগুলি বিশেষ রূপে (সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় এগুলি অপ্রয়োজ্য)—প্রাচীন বাঙ্গালায় (এবং কবিতায়) 'সেই কারণে' অর্থে « তেঁই » শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার উৎপত্তি—« তেন হি > তেং হি > তেঁই »। স্থান বুঝাইবার জন্য « তাহা »-স্থানে « তহিঁ, তহি, তথি » পদগুলি, সবিভক্তিক ও অবিভক্তিক উভয় রূপেই মিলে।

« সে, তাহা তা »—এই সর্বনামের মূল রূপ হইতেছে সংস্কৃত « তদ্ » শব্দ। সমাসে « তৎ, তদ্ » রূপ ব্যবহৃত হয় ; যথা—« তদ্দ্বারা, তদাত্মীয়, তদাশ্রয়, তৎকর্তৃক, তন্নিবন্ধন, তৎপর, তৎপুত্র, তৎকন্যা » ইত্যাদি।

[৩.০৮২] [২] উল্লেখ-সূচক বা নির্ণয়-সূচক সর্ব্বনাম (Demonstrative Pronouns)।

একাধিক পদার্থকে পৃথক্ করিয়া জানাইবার জন্য, এই শ্রেণীর সর্বনামের দ্বিত্ব হইতে পারে ; যথা— « এই এই ; ওই ওই বা ঐ ঐ »।

[ক] প্রত্যক্ষ- বা অন্তিক-নির্ণয়-সূচক— « এ, ইহা, ইনি » (Near বা Proximate Demonstrative).

(১) প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	এ, এই	ইহারা, এরা
সবিভক্তিক	ইহা, এ	ইহাদিগ-, ইহাদের, এদিগ-, এদের।

(২) প্রাণিবাচক—গৌরবে, সম্মানে, সৌজন্যে—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	ইঁনি	ইঁহারা, এঁরা (এনারা)
সবিভক্তিক	ইঁহা, এঁ, (এনা)	ইহাদিগ-, এঁদিগ-, ইঁহাদের, এঁদের (এনাদের, এনাদিগ-)।

(৩) অপ্রাণিবাচক—ক্লীবলিঙ্গ—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক	ইহা, এই, এটা, এটী, এখানা, এখানি	ইহা-সব, এ-সব, এ-সকল, এগুলা, এগুলি, এ-সমস্ত প্রভৃতি।

সংস্কৃত শব্দের সহিত সমাস-দ্বারা গ্রথিত হইলে, এই সর্বনাম « এতৎ, এতদ্ » রূপ গ্রহণ করে ; যথা— « এতৎসম্পর্কে, এতদবস্থায়, এতদ্দ্বারা, এতদ্বাক্যে » ইত্যাদি।

বিশেষ্যের মত—অথবা « আমি » শব্দের মত—বিভক্তি, প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয় পদযুক্ত করিয়া, এই সর্বনামের রূপ হয়।

[খ] পরোক্ষ- বা দূরত্ব-নির্ণয়-সূচক— « ও, উহা, উনি » (Far বা Remote Demonstrative)।

(১) প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	ও, ওই	উহারা, ওরা
সবিভক্তিক	উহা, ও	উহাদিগ-, উহাদের, ওদিগ-, ওদের।

(২) প্রাণিবাচক—গৌরবে—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	উনি	উঁহারা, ওঁরা (ওনারা)
সবিভক্তিক	উঁহা, ওঁ, (ওনা)	উঁহাদিগ, উঁহাদের, ওঁদিগ-, ওঁদের (ওনাদিগ-, ওনাদের)।

(৩) অপ্রাণিবাচক—ক্লীবলিঙ্গ—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক	উহা, ওই, অই, ঐ, ওটী, ওটা, ওখানা, ওখানি	ও বা ওই বা ঐ+সব, সকল, সমস্ত, গুলা, গুলি প্রভৃতি।

এই সর্বনাম « এ, ইহা, ইনি » -র অনুরূপ বিভিন্ন কারক ও বচনের প্রত্যয়াদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

[৩.০৮৩] [৩] সাকল্য-বাচক সর্বনাম (Inclusive Pronouns)।

« উভয়, সকল, সব » শব্দ। এগুলির মধ্যে, « উভয় » ও « সকল » শব্দদ্বয়ের রূপ বিশেষ্যের ন্যায় মাত্র একবচনেই হইয়া থাকে; কেবল « সকল » শব্দের ষষ্ঠীতে « সকলের » ও « সকলকার » হয়। « সব » শব্দের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—

প্রথমা—সব, সবাই, * সক্কাই, সবে।

দ্বিতীয়া—সবাকে, সবাইকে, * সক্কাইকে, সবগুলিকে, সবগুলাকে; সবারে, সবগুলিরে, সবগুলারে।

তৃতীয়া—সবার দ্বারা, সবাইকে দিয়া;- সবে।

চতুর্থী—দ্বিতীয়াবৎ।

পঞ্চমী—সব হইতে, সবা হ'তে, সবার থেকে, সবচেয়ে, সবার চেয়ে, সবের থেকে, চেয়ে, * সক্কাইয়ের কাছ থেকে।

ষষ্ঠী—সবের, সবার, সবাইয়ের, সবাকার, * সব্বাইয়ের, * সব্বার।
সপ্তমী—সবে, সবেতে ; সবার মাঝে, সবের মাঝে।

[৩.০৮৪] [৪] সম্বন্ধ-, সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম (Relative Pronouns)।

এই সর্বনাম, « সে, তিনি, তাহা »-র অনুরূপ। পৃথক্ করিয়া জানাইবার জন্য, এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয় : « যে-যে, যার-যার »।

(ক) « যে » শব্দ—সাধারণ প্রাণিবাচক—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	যে	যাহারা, যারা
সবিভক্তিক	যাহা, যা	যাহাদিগ-, যাহাদের, যাদের, যাদিগ-।

(খ) « যিনি » শব্দ—গৌরবে—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	যিনি	যাঁহারা, যাঁরা
সবিভক্তিক	যাঁহা- (যাহাঁ-), যাঁ-	যাঁহাদিগ-, যাঁহাদের, যাঁদিগ-, যাঁদের।

(গ) « যাহা » শব্দ—ক্লীবলিঙ্গে অপ্রাণিবাচক—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক	যাহা, যা, যেটা, যেটী, যেখানা, যেখানি	যেগুলি, যেগুলা, যে-সব, যে-সকল, যে-সমস্ত।

সমস্ত-পদে এই সর্বনামের রূপ হয় « যৎ, যদ্ » ; যথা—« যদ্দ্বারা, যজ্জন্য, যদ্ধেতু, যৎপরোনাস্তি » ইত্যাদি।

পারস্পরিক-সঙ্গতি-মূলক সর্বনাম (Correlatives)—« যে, সে » এই সর্বনাম এবং এই দুইটী হইতে উৎপন্ন বিশেষণাদি বিভিন্ন শব্দ,

বাক্যের মধ্যস্থিত দুই খণ্ড-বাক্যের পরস্পর সঙ্গতি রক্ষা করে ; যথা— « যে জ্ঞানী, সেই সুখী ; যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনই সিদ্ধি ; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ » ইত্যাদি।

[৩.০৮৩] [৩] প্রশ্ন-সূচক সর্বনাম (Interrogative Pronouns)।

পৃথক্ করিয়া জানাইবার জন্য এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয় : « কে-কে, কাঁহার-কাঁহার, কোন্-কোন্, কি-কি »।

(ক) সাধারণ রূপ—« কে »

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	কে	কাহারা, কারা
সবিভক্তিক	কাহা-, কা-	কাহাদিগ-, কাদিগ-, কাহাদের, কাদের।

(খ) গৌরবে—

অবিভক্তিক একবচনের রূপ-হিসাবে « কে » পদেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; « তিনি, ইনি, যিনি »-র মত « কিনি » রূপ মাঝে-মাঝে মৌখিক চলিত-ভাষায় প্রযুক্ত হইলেও, ইহা সাহিত্যে প্রায় অপ্রচলিত। অবিভক্তিক বহুবচনে এবং সবিভক্তিক উভয় বচনে, চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত « কাঁহারা, কাঁরা » এবং « কাঁহা- (কাহাঁ-), কাঁ-, কাঁহাদিগ (কাহাঁদিগ), কাঁদের » প্রভৃতি প্রচলিত আছে।

বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইলে, « কে » পরিবর্তিত হইয়া « কোন্ » রূপ ধরে ; যথা—« কাল একজন মস্ত পণ্ডিত আস্‌ছেন ; কে ? অথবা, কোন্ পণ্ডিত ? »। পরিদৃশ্যমান বহুর মধ্যে একটীকে বাছিয়া লইতে হইলে, « কোন্ » শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(গ) « কি » শব্দ—ক্লীবলিঙ্গে, অপ্রাণিবাচক—

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক	কি, কোন্, কোন্টা, কোন্টী, কোন্খানা, কোন্খানি প্রভৃতি	কি-সব, কি-সমস্ত ; কোন্+সব, সকল, গুলা, গুলি।
সবিভক্তিক	কাহা, কা, কিসে, কোন্টা, -টী, -খানা, -খানি।	"

সপ্তমীতে প্রশ্ন-সূচক, « কই », অর্থাৎ « কোথায় ? »। « কই » শব্দ সাধু- ও চলিত-ভাষায় কেবল জিজ্ঞাসায় একক প্রযুক্ত হয়—বাক্যের মধ্যে « কই » ব্যবহৃত হয় না ; পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় কিন্তু « কই » বাক্যের মধ্যেও চলে ; যথা—« 'ঐ তোমার হারানো বই' ; 'কই ?' » ; « আমার হারানো বইখানা কোথায় ? ('কই' নহে) »।

সংখ্যা-জিজ্ঞাসায়, বহুবচনে—« কয় (*ক') » = « কতগুলি » ; « কয় জন, কয়টা, কয়টী (*ক-জন, *ক-টা, *ক-টী) »।

[৩.০৮৬] [৬] অনিশ্চয়-সূচক সর্বনাম
(Indefinite Pronouns)

(ক) « কেহ, « কেউ »—উভয় লিঙ্গে সাধারণ ও গৌরব-সূচক :

অবিভক্তিক রূপের বহুবচনে, এবং সবিভক্তিক রূপের উভয় বচনে, গৌরবে চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত রূপ « কাঁ- »-ও প্রযুক্ত হয়। অবিভক্তিক রূপে একবচনে « কিনিও » শব্দ কচিৎ দেখা যায়, ইহা সাধারণ নহে। বস্তুতঃ এই সর্বনাম, প্রশ্ন-সূচক সর্বনামের উত্তর অব্যয়-শব্দ « ও » যোগ করিয়া গঠিত হইয়াছে।

	একবচন	বহুবচন
অবিভক্তিক (কর্তা)	কেহ, *কেউ	কাহারাও, কারাও।
ষষ্ঠী (সম্বন্ধ)	কাহারও, কাহারো, কারো, *কার, *কারুর	কাহাদিগেরও, কাদেরো।
অবিভক্তিক (অন্য কারক)	কাহা-, কা- + বিভক্তি+ও	কাহাদিগ-, কাদিগ-, কাদেরো।

বহুবচনার্থে এই সর্বনামের দ্বিত্বও হইয়া থাকে; « কেহ-কেহ, *কেউ-কেউ; কাহারো-কাহারো, কারো-কারো »। বিশেষণ-রূপ— « কোনও, কোনো »।

(খ) « কিছু » শব্দ—অপ্রাণিবাচক :

একবচনে ও বহুবচনে অবিভক্তিক ও সবিভক্তিক রূপ একই— « কিছু »। বিশেষণ-রূপে « কিছু », অল্প-সংখ্যক অর্থে, কতকগুলি বিশেষ্যের পূর্বে বসে; যথা—« কিছু দিন, কিছু সৈন্য, কিছু গুড় »; কিন্তু « কিছু লাঠি » হয় না। দ্বিত্ব « কিছু-কিছু », অর্থ—'অল্প-সংখ্যক' বা 'অল্প-পরিমাণ'।

(গ) মিশ্র বা যৌগিক অনিশ্চয়ার্থক সর্বনাম (Compound Indefinite Pronouns) :

বিভিন্ন বিশেষণ বা অব্যয়ের সহিত, অথবা অন্য কতকগুলি সর্বনামের সহিত যুক্ত হইয়া, অনিশ্চয়ার্থক সর্বনাম « কেহ, *কেউ, কিছু », অনিশ্চয়-দ্যোতক বিভিন্ন প্রকারের মিশ্র-সর্বনাম গঠিত করে; যথা—

« কেহ-কেহ; আর-কেহ, *আর-কেউ; আর-কিছু; অন্য কেহ, অন্য কিছু; অপর কেহ, অপর কিছু; কেহ-না-কেহ, *কেউ-না-কেউ; কিছু-না-কিছু; কেহ বা; কেই বা; কোনও-কিছু; কোনও এক (বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত); যে-কেহ, *যে-কেউ; যে-কোনও; যাহা-কিছু, যা-কিছু; যে-সে; যা-তা »।

[৩.০৮৭] [৭] নিজ- বা আত্ম-বাচক সর্বনাম (Reflexive Pronouns)

বাক্যের কোনও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জোর দিয়া বলিবার জন্য, অথবা 'কাহারও সহায়তায় নহে' ইহা বুঝাইবার জন্য, বিশেষ্যের অথবা সর্বনামের সহিত « নিজ, আপনি, স্বয়ং (স্বয়ম্) » প্রভৃতি কতকগুলি আত্মবাচক সর্বনাম শব্দ প্রযুক্ত হয়। এগুলি এক ও বহু উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয়। এগুলির মধ্যে « স্বয়ং (স্বয়ম্) » পদ কেবল কর্তৃ-কারকেই মিলে ; « নিজ, আপনি » শব্দদ্বয় সমস্ত কারকে প্রযুক্ত হয়।

« আপনি » শব্দ

কর্তৃকারক—(আমি, তুমি, সে) আপনি—(আমরা, তোমরা, তাহারা) আপনারা।

কর্ম ও সম্প্রদান—আপনাকে, আপনারে—আপনাদিগকে, আপনাদের, আপনাদেরকে।

করণ—আপনার দ্বারা, আপনি, আপনাকে দিয়া—আপনাদিগ-দ্বারা, আপনাদের দিয়া; (উভয় বচনে) আপনা-আপনি।

অপাদান—আপনা(র) থেকে, আপনা হইতে—আপনাদিগ হইতে, আপনাদের থেকে।

সম্বন্ধ—আপন, আপনার, আপনকার—আপন-আপন, আপনার-আপনার, আপনা-দিগের, আপনাদের।

অধিকরণ—আপনাতে, আপনার মধ্যে বা মাঝে—আপনাদিগেতে, আপনাদিগের বা আপনাদের মধ্যে বা মাঝে, আপনাদেরতে।

« নিজ » শব্দ

(চলিত-ভাষায় উচ্চারণে স্বরান্ত [নিজো])

কর্তা—নিজে—নিজেরা, নিজে-নিজে।

কর্ম ও সম্প্রদান—নিজেকে, নিজেরে, নিজকে—নিজদিগকে, নিজেদের, নিজেদেরকে।

করণ—নিজের দ্বারা, নিজেকে দিয়া, নিজ-দ্বারা—নিজেদের দিয়া, নিজদিগ-দ্বারা।

অপাদান—নিজ হইতে, নিজের থেকে—নিজদিগ হইতে, নিজেদের থেকে।

সম্বন্ধ—নিজ, নিজের—নিজ-নিজ, নিজের-নিজের, নিজদিগের, নিজদের, নিজেদের।

অধিকরণ—নিজেতে, নিজেতে, নিজের মধ্যে বা মাঝে—নিজদিগেতে, নিজেদের মধ্যে বা মাঝে, নিজেদেরতে।

[৮] ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম (Reciprocal Pronouns)

পরস্পর অর্থে, অথবা স্বেচ্ছায় ('অপরের প্ররোচনা বিনা') অর্থে, « আপনা-আপনি » এই দ্বিত্ব রূপ ব্যবহৃত হয়।

« **আপস** »—'পরস্পর'-অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ আছে। « আপস » শব্দের কর্মকারকে, 'মিলন, বিনা কলহে নিষ্পত্তি' এই অর্থ হয় : « তাহারা এই মামলায় আপস করিয়াছে। » « আপসে »—'আপনার মধ্যে, আদালতের বা অন্যের সাহায্য না লইয়া' : « তাহারা আপসে মিটমাট করিয়াছে। » « আপসের »—« আপসের মধ্যে (=পরস্পর) ঝগড়া করা উচিত নহে। » (« আপস » শব্দের « আপোস » বানানও মিলে।)

« আপন » ও « আত্ম » (উচ্চারণে [আত্ত, আঁত্ত])—এই দুই শব্দের মিলনে « আপ্ত » শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে ; যথা—« আপ্ত-সুখী জন ; আপ্তসার »। সাধু বা চলিত ভাষায়, বিশেষতঃ লিখিত রচনায়, এই শব্দ প্রযুক্ত হয় না।

[৩.০৮৮] সর্বনামের বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ

উত্তম ও মধ্যম পুরুষ ভিন্ন, অন্য সর্বনামগুলি বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত সর্বনাম, মাত্র একবচনে সাধারণ রূপে প্রযুক্ত হয়, অন্য কোনও রূপ ব্যবহারে আইসে না। বিশেষিত পদ বহুবচনের হইলে, এই অবিভক্তিক একবচনের সর্বনামের উত্তর « সকল, সব, সমস্ত » প্রভৃতি যোগ করা হয়। বিভিন্ন কারকের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন আর সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয় না, বিশেষিত পদের পরেই বসে ; যথা—« সেই মানুষ ; যে জন ; কোন্ জনা ; সে নারী ; সে-সমস্ত কথা ; সে-সব লোক ; এ ব্যক্তির ; এ-সকল কথা মিথ্যা ; এ-সমস্ত দুর্বৃত্তকে দমন করা উচিত ; সে-সমস্ত ব্যাপারের কি ফল হইল জানা যায় নাই ; যে ছেলে ; যে-সব মেয়ে কলেজে পড়ে ; কোন্ ছেলে ; কোন্-সব ছেলে, কি-সব কাগজ হারিয়েছে ? কোনও পণ্ডিত, কোনও-কোনও পণ্ডিত ; কোনও-কোনও খবরের কাগজে কথাটা প্রকাশ পাইয়াছে » ইত্যাদি।

[৩.০৮৯] সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ (Pronominal Adjectives and Adverbs)

সর্বনামের মূল অংশের সহিত কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ, বাঙ্গালা ভাষায় দেশ, কাল, পরিমাণ ও সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ; যথা—

মূল	দেশ-বাচক— « -থা, -থায় ; -খান, -খানে » (ক্রিয়া-বিশেষণ)	কাল-বাচক— « -খন, -ক্ষণ ; -বে » (ক্রিয়া-বিশেষণ)	পরিমাণ-বাচক— « -ত » উচ্চারণে [তো] (বিশেষণ)	সাদৃশ্য-বাচক— « মন, মত [মৎ], -মত [-মতো] » (বিশেষণ)
সে, ত, তে	সেথা, সেথায় ; সেখান, সেখানে	তখন, সেইক্ষণ, তবে	তত [=ততো]	তেমন, তেমত [=মৎ] ; সেই-মত [= -মতো]
এ (হে),	হেথা, হেথায় ; এখান, এখানে, এইখানে	এখন, এইক্ষণ, এক্ষণে (এবে—কবিতায়)	এত [=অ্যাতো]	এমন, এমত [=মৎ] ; এই-মত [= -মতো] (এম্‌নে=এ-দিকে)
ও (হো), ঐ	হোথা, হোথায় ; ওখান, ওখানে, ওইখানে	(তখন) ওইক্ষণ, ঐক্ষণ	অত [=অতো]	অমন ; ঐ-মত (অম্‌নে=ও-দিকে)
য, যে	যেথা, যেথায় ; যেখান, যেখানে	যখন, যেইক্ষণ যবে	যত [=জতো]	যেমন, যেমত ; যেই-মত
ক-, কে, কো-	কোথা, কোথায় ; কোন্‌খানে ; কই	কখন, কোন্‌ক্ষণ, কবে	কত [=কতো]	কেমন, কেমত ; কোন্-মত, কি-মত (কম্‌নে=কোন্-দিকে)
কে, কো +ও	কোথাও, কোনোখানে	কখনও, কখনো	(কতক)	কোন-, কোনো-মতে

এই ক্রিয়া-বিশেষণগুলিকে অংশতঃ বিশেষ্যের মতও ব্যবহার করা যায়, এবং ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভক্তিও এগুলিতে যুক্ত করা যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সাদৃশ্য-বাচক বিশেষণ সৃষ্টি করিবার জন্য আর একটী প্রত্যয় ছিল, « হেণ বা হেন » ; « তেহেণ, এহেণ, জেহেণ, কেহেণ » এই রূপগুলি প্রচলিত ছিল। এগুলি পরে পরিবর্তিত হইয়া « তেন্‌হ, তেহ্ন, তেন ; এহেন, হেন ; যেন্‌হ, যেহ্ন, যেন ; কেন্‌হ, কেহ্ন, কেন » হইয়া দাঁড়াইল। এগুলির মধ্যে, « হেন » (উচ্চারণ [হ্যানো]) শব্দটী, সাদৃশ্য বা বর্ণনা জানাইতে আধুনিক বাঙ্গালাতেও বিদ্যমান আছে—« হেন কালে, হেন রূপে » ইত্যাদি। « কেন » [= ক্যানো] এক্ষণে 'কি কারণে ?' এই অর্থে প্রযুক্ত হয়, এবং « যেন » [= জ্যানো], লক্ষ্য-নির্দেশ-সূচক ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে আধুনিক বাঙ্গালায় জীবন্ত শব্দ।

সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত « তেন, যেন, কেন » পদগুলির সহিত, খাঁটী বাঙ্গালা « যেহ্ন, কেহ্ন, তেহ্ন > যেন, কেন, তেন » পদগুলির একটু মিশ্রণ ঘটিয়াছে ; যথা, « *যেন তেন উপায়ে তাকে রাজী করাবে »।

প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের ভাষায়, সাদৃশ্য-বাচক কতকগুলি বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ দেখা যায় ; যথা—« তৈছন, ঐছন, যৈছন, কৈছন »—বিশেষণ, এবং « তৈছে, ঐছে, যৈছে, কৈছে »—ক্রিয়া-বিশেষণ।

এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি সংস্কৃত-সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদও বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে ; যথা—মদীয়, অস্মদীয় ; ত্বদীয় (যুষ্মদীয়—অপ্রচলিত) ; ভবদীয় (=আপনার) ; স্বীয়, স্বকীয় ; তত্র, অত্র, যত্র, কুত্র (স্থান-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ ; কিন্তু « অত্র বিদ্যালয়ে, অত্র ইষ্টেটে »—বিশেষণ) ; তদা, যদা, কদা (কাল-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ) »।

সংস্কৃত « যদাহি, তদাহি » এই দুই ক্রিয়া-বিশেষণের বিকারে, বাঙ্গালা কাল-বাচক ও সঙ্গতি-দ্যোতক ক্রিয়া-বিশেষণ « যাই, তাই »।

[৩.০৯] ক্রিয়া-পর্যায়

[৩.০৯।১] ক্রিয়া-পদ

সাধারণতঃ কোনও বাক্যের মধ্যে দুইটী অঙ্গ থাকে—**উদ্দেশ্যাঙ্গ** ও **বিধেয়াঙ্গ**। যাহার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাহা **উদ্দেশ্য (Subject)** এবং তাহাকে লইয়া **উদ্দেশ্যাঙ্গ**; এবং উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা **বিধেয় (Predicate)** এবং বিধেয়কে অবলম্বন করিয়া **বিধেয়াঙ্গ**। বিধেয় যখন কোনও গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, এবং বিধেয়-বাচক **শব্দটী** যখন বিশেষণ হয়, তখন তাহাকে **বিশেষণ-বিধেয়** বলা যায়, যেমন—« ঈশ্বর পরম দয়ালু »। কিন্তু বিধেয়-দ্বারা যখন ইহা জানানো হয় যে, বাক্যের উদ্দেশ্য কোনও বিশেষ অবস্থায় রহিয়াছে, বা কোনও কার্য করিতেছে, করিয়াছে বা করিবে, তখন সেই বিধেয়কে **ক্রিয়া-পদ** বলে; যেমন—« গোপাল যায়; তাহার পিতা আসিবেন; শিক্ষক-মহাশয় সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন » ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলিতে উদ্দেশ্য শব্দ—« গোপাল, পিতা, শিক্ষক-মহাশয় », বিধেয় ক্রিয়া-পদ « যায়, আসিবেন, ছিলেন »। বিশেষ্য-পদও বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত হয়; সে অবস্থায়, 'হওয়া' বা 'থাকা' অর্থে একটী ক্রিয়া-পদ, বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-বিশেষ্য—এই উভয়ের মধ্যে **সংযোজক (Copula)** রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—« রাম-বাবু হ'চ্ছেন গোপালের মামা », বা « রাম-বাবু গোপালের মামা হন »; এখানে, « রাম-বাবু » উদ্দেশ্য, « গোপালের মামা » বিধেয়-বিশেষ্য অথবা বাক্যের পূরণ-কারক (Complement), এবং « হ'চ্ছেন » বা « হন », সংযোজক ক্রিয়া। তদ্রূপ, « তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন; রাজা ছিলেন অপুত্রক; এক ছিল বামুন; সে মস্ত পণ্ডিত হবে » ইত্যাদি। কখনও-কখনও এই সংযোজক ক্রিয়া বাঙ্গালায় অনুল্লিখিত বা উহ্য থাকে; যথা—« রাম-বাবু গোপালের মামা; তিনি ভাল লোক; সে বড় দুঃখী » ইত্যাদি

ক্রিয়া-পদকে বিশ্লেষ করিলে যে অবিভাজ্য মৌলিক অংশ পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা ক্রিয়া-পদের অন্তর্নিহিত ভাবটী মাত্র দ্যোতিত হয়, তাহাকে **ক্রিয়া-প্রকৃতি** বা **ধাতু** বলে; যথা—« করে, করিয়া, করিল, করিতে, করিবে » ইত্যাদির মূল অংশ হইতেছে « কর্ » ধাতু। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া এবং উহার বিকার বা পুতি ঘটাইয়া, ক্রিয়া-পদ সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ক্রিয়া-পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে অনাদরে যে রূপ হয়, তাহাই ক্রিয়ার নগ্ন বা বিভক্তি-হীন রূপ, এবং সেই রূপকে আমরা ক্রিয়ার ধাতু বলিয়া ধরিতে পারি; যথা—« তুই কর্; তুই খা; তুই চল্; দেখ্, শো, নে, দে, চাহ্ (চা), রহ্ (র), বহ্ (ব) » ইত্যাদি।

[৩.০৯২] ধাতু

সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ সংস্কৃত ভাষার ধাতুর তালিকা করিয়া দিয়াছেন; ইঁহাদের মতে সংস্কৃতে প্রায় ২,০০০ ধাতু আছে। কিন্তু বেদ, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ৭০০-র অধিক ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় না। এগুলি হইতেছে « সিদ্ধ ধাতু » (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালা ভাষার « সিদ্ধ, সাধিত » প্রভৃতি সকল প্রকারের ধাতুর সংখ্যা ১,৫০০ বা উহার কিছু অধিক হইবে। এই ১,৫০০ ধাতুর মধ্যে অনেকগুলি আবার আজকালকার বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে বা পাইতেছে।

বাঙ্গালার ধাতুগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করিলে, সেগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা—[১] **সিদ্ধ ধাতু** (Primary Roots), [২] **সাধিত ধাতু** (Derivative or Secondary Roots), এবং [৩] **সংযোগ-মূলক ধাতু** (Compounded Roots)।

[১] সিদ্ধ ধাতু

যে সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, ভাষায় যেগুলির কোন বিশ্লেষণ হয় না, সে সকল ধাতুকে **সিদ্ধ ধাতু** বলে; যেমন—« চল্, দেখ্, শুন্, খা,

দহ্, দে, গর্জ্, কম্ * ইত্যাদি। বাঙ্গালায় সিদ্ধ ধাতুগুলিকে উহাদের উৎপত্তি ধরিয়া আবার উপশ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা—

(ক) বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ধাতু, অর্থাৎ প্রাকৃতজ ধাতু, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন তদ্ভব ধাতু, এবং অজ্ঞাতমূল দেশী ধাতু (পূর্ব পৃষ্ঠা ১৫ দ্রষ্টব্য) ; যথা—* আছ্, কর্, কহ্, কাঁদ্, কাপ্, কাট্, কিন্, খা, চু, ছা, ছাড়্, ছোঁ, ছিঁড়্, জাগ্, জি, জিন্, টান্, টুট্, ধা, ধো, নাহ্, নে, পি, পুছ্, ফাট্, ফুট্, বাঁচ্, বোল্, বহ্, ভর্, ভাজ্, মিশ্, মাখ্, বা, যুঝ্, লহ্, শো (সো), সর্, হ * ইত্যাদি। এগুলি উপসর্গ-হীন মূল সংস্কৃত ধাতুর বিকারে জাত। প্রাকৃত হইতে লব্ধ দেশী ধাতু ও অজ্ঞাত-মূল ধাতু, যথা—* এড়্, কুঁদ্, খস্, খাট্, খুঁট্, ঘির্, চাপ্, চাহ্, চট্, ঝুল্, ঠেল্, নড়্, ফেল্, পুঁত্, বাছ্, ভাস্ * ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন আবার উপসর্গ-যুক্ত সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতজ ধাতুও বাঙ্গালায় আছে ; যথা—* আ (আ+ √যা), আইস্ বা আস্ (আ+ √বিশ্—আবিশতি > আইশই > আইসে, আসে), আন্ (আ+ √নী), উপেখ্ (উপ+ √ঈক্ষ্), উজা (উদ্+ √যা), নিবা (নির্+ √বা), নিহার্ (নি+ √ভাল্), পর্ (পরি+ √ধা), পস্ বা পইস্ (প্র+ √বিশ্), বইস্ বা বস্ (উপ+ √বিশ্), সঁপ্ (সম্+ √অর্প্) * ইত্যাদি। আবার কতকগুলি প্রাকৃতজ বাঙ্গালা ধাতু, মূলে সংস্কৃত সাধিত ধাতু ছিল, বাঙ্গালায় কিন্তু সিদ্ধ ধাতুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে—কতকগুলি সংস্কৃত ণিজন্ত বা প্রয়োজক ক্রিয়া অথবা বিশেষ্য হইতে উৎপন্ন নাম-ধাতু বাঙ্গালায় সাধারণ ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; যথা—* কহ্ (কথা—কথয়তি > কহে), গাহ্ (গাথা—গাথয়তি > গাহে), পাড়্ (√পত্—পাতয়তি > পাড়ে), গাল্ (√গল্—গালয়তি), চাল্ (√চল্—চালয়তি), তার্ (√তর্—তারয়তি), টান্ (√তন্—তানয়তি), থো (√স্থা—স্থাপয়তি > থোয়), পা (প্র+ √আপ্), বাহ্ (√বহ্—বাহয়তি), মার্ (√মৃ—মারয়তি), হার্ (√হৃ—হারয়তি) * ইত্যাদি।

কতকগুলি বাঙ্গালা সিদ্ধ বা মূল ধাতু, সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ হইতে জাত ; যথা—* জুত্ (যোক্ত্র—জোত্ত—গাড়ীতে ঘোড়া বা গোরু জোতা), গাড়্ (গর্ত), ঘাম্ (ঘর্ম), মাত্ (মত্ত), জিত্ (√জি > জিত—প্রাকৃত জিত্ত) * ইত্যাদি।

(খ) প্রাকৃত হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সিদ্ধ ধাতু ভিন্ন, সংস্কৃত হইতে বহু মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে। সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া কাব্য-সাহিত্যের ভাষায়—এগুলির অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। এগুলি হইতেছে বাঙ্গালায় আগত

তৎসম বা অর্ধতৎসম ধাতু; যথা—« আহর, কীর্ত, গর্জ, চুম্ব, তিষ্ঠ, তাজ, ধা, নম, নির্মা, নির্দি, নিশ্চি, প্রণম, বন্দ, বর্জ, বর্ত, ভঞ্জ, ভৎর্স, ভিদ, মর্দ, যজ্ঞ, শোভ, সেব, স্মর, হিংস » ইত্যাদি। কতকগুলি বিদেশী শব্দও বাঙ্গালায় সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু-রূপ প্রযুক্ত হয়; যথা—ফারসীর মারফৎ প্রাপ্ত আরবী শব্দ হইতে « জম্, কম্ », এবং ফারসী শব্দ « দাগ্ » (বস্তুতঃ এগুলি সাধিত নাম-ধাতু, সকর্মক « জমা, কমা, দাগা » হইতে « -আ » -প্রত্যয় বাদ দিয়া অকর্মক সিদ্ধ রূপ « জম্, কম্, দাগ্ » গঠিত হইয়াছে)।

[২] সাধিত ধাতু

যে সকল ধাতুর বিশ্লেষ করিলে, অন্য একটী ধাতু বা নাম-শব্দ এবং এক বা একাধিক প্রত্যয় পাওয়া যায়, সেগুলিকে **সাধিত ধাতু** বলে। এতদ্ভিন্ন, যেখানে সংস্কৃত ও অন্য বিশেষ্য-পদ, কোনও প্রত্যয় গ্রহণ না করিয়াও একেবারে ধাতুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়—সেইরূপ **নাম-ধাতুকেও** সাধিত ধাতু বলা যায়; যথা—« করা (√কর্+-আ প্রত্যয়), হাতা (হাত শব্দ+-আ), হাতড়া (হাত শব্দ+-ড়-+-আ), অগ্রসর (সংস্কৃত বিশেষ্য-পদ 'অগ্রসর' ধাতু-রূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত) »। সাধিত ধাতু—প্রাকৃতজ, তৎসম বা সংস্কৃত, এবং বিদেশী—এই তিন প্রকারেরই আছে।

এগুলির অর্থ ও সাধন বিচার করিলে, সাধিত ধাতুগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায়:

(ক) **ণিজন্ত বা প্রয়োজক ধাতু**—মূল বা সিদ্ধ ধাতুতে « -আ » বা « -ওয়া » -প্রত্যয় যোগ করিয়া, এই প্রকার ধাতু সাধিত হয়; যথা—« কর্—করা; (ব-শ্রুতির আগম, পৃষ্ঠা ১৬৬) খা—খাবা > খাওয়া, দে—দেবা > দেওয়া, যা—যাবা > যাওয়া; দেখ্—দেখা » ইত্যাদি।

(খ) **কর্ম-বাচ্যের ধাতু**—« -আ » -প্রত্যয়-যোগে: « শুন্—শুনা, শোনা, (যথা—কথাটা ভাল শোনায় না); বিঁধ—বেঁধা (যথা—স্কুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়) » ইত্যাদি

(গ) নাম-ধাতু—

(৴০) সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণ « -আ » -প্রত্যয় যোগ করিয়া; যথা—« লাঠি বা লাঠা—লাঠা, পাছু—পাছুআ, *পেছো; আগু—আগুআ, *এগো; বাহির—বাহিরা, *বেরো; আকুল > আউল—আউলা, আলুয়া, আইলা, *এলো; দুখ—দুখা; বিষ—বিষা; জুতা—জুতা; রঙ্গ > রঙ্গা, রঙা » ইত্যাদি।

(৵০) « ক » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « থমক—থমকা, ধমক—ধমকা, থক্—থকা, থাক্—থাকা, মোচক—মুচকা, হড়ক—হড়কা »।

(৷৴০) « ড় » বা « ট » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « দাবড়া, আঁকড়া, আঁচড়া, দাঁদড়া, চুমড়া, ঘষটা, কচটা, ঘষড়া, মুচড়া, হাতড়া »।

(।০) « ল » বা « র » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « আগলা, চুমরা বা চোমরা, পিকলা, ডুকরা, ছোবলা, হাঁকরা »।

(।৴০) « স » বা « চ » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে: « চকসা, ঝলসা, রেঙ্গচা, থামসা, ভাপসা, ভাঙ্গচা বা ভেঙ্গচা »।

(ঘ) ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার-ধ্বনিজ ধাতু—

(৴০) ধাতু-রূপে ব্যবহৃত অনুকার-ধ্বনি—« হাঁচ্, ফুক্, থুক্ »।

(৵০) অভ্যাস বা দ্বিত্ব না করিয়া, অনুকার-ধ্বনিতে « আ » যোগ করিয়া—« চিলা, চুঁয়া, টুসা, টসা, কোঁসা, হাঁফা »।

(৷৴০) অভ্যস্ত বা দ্বিত্ব করিয়া লিখিত অনুকার-ধ্বনিতে, অথবা ধাতুকে দ্বিত্ব করিয়া অনুকার-ধ্বনিতে রূপান্তরিত করিয়া, « আ » -যোগ-পূর্বক—« চেঁচা, গোঁগা, গোঁগা > গোঙা, চড়চড়া > চচ্চড়া, মচমচা, হড়হড়া, কনকনা, পিলপিলা, জলজলা, টলটলা, গলগলা, সড়সড়া, চুলবুলা, টলবলা, দলমলা »। সাধারণতঃ এইরূপ ধাতুতে কেবল অসমাপিকা-প্রত্যয় « ইয়া » যোগ করিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে এগুলির প্রয়োগ হয়।

(ঙ) এতদ্ভিন্ন কতকগুলি « -আ » -প্রত্যয়ান্ত ধাতু আছে, সেগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত; যথা—« কাঁচা; গজা; গুটা; গুড়া; গুঁড়া; জিরা; জুড়া; বিলা; হেদা; দোলা » ইত্যাদি।

[৩] সংযোগ-মূলক ধাতু

« কর্, হ্, দে, পা » প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর সহিত নানা বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করিয়া, বাঙ্গালায় সংযোগ-মূলক ধাতু বা ক্রিয়া সৃষ্ট হয়; যেমন—সিদ্ধ ধাতু « পুছ্ » প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক কবিতায় এবং প্রাদেশিক বাঙ্গালায় মিলে, কিন্তু এখন শিক্ষিত-সমাজে কথা-বার্তায় ও গদ্য-লেখায় আর চলে না; সাধিত ধাতু « সুধা » বা « শুধা » ('শুদ্ধ' বা পরিষ্কার করা, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়া, জিজ্ঞাসা করা অর্থে) এখন কথ্য ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সাহিত্যেও প্রযুক্ত হয়; কিন্তু « পুছ্ » ও « শুধা » উভয়-স্থলে সংযোগ-মূলক « জিজ্ঞাসা করা » (চলিত-ভাষায় « জিগ্গেস বা জিগেস করা ») আজকাল সমধিক প্রচলিত, « কর্ » ধাতুর সহিত সংস্কৃত বিশেষ্য « জিজ্ঞাসা »-কে সংযুক্ত করিয়া এই ধাতু সৃষ্ট হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় এইরূপ সংযোগ-মূলক ধাতুর বহুল প্রচার আছে। বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ স্থলে অতি সাধারণ ভাবকে সিদ্ধ বা সাধিত ধাতুর পরিবর্তে গুরুগম্ভীর সংস্কৃত (কচিৎ আরবী-ফারসী) শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া, ভাষায় একটা শব্দ-ঝঙ্কার আনিবার আকাঙ্ক্ষায়, এইরূপ সংযোগ-মূলক ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহাতে কিন্তু সহজ-সহজ কথার পরিবর্তে অনাবশ্যক-ভাবে শব্দাড়ম্বর আসিয়া গিয়াছে—ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার তুলনায়, বাঙ্গালার পক্ষে এই প্রকার অর্থাত্মক সিদ্ধ ধাতুর সংখ্যাল্পতা একটা দৌর্বল্যের নিদর্শন; যথা—ইংরেজী ask = বাঙ্গালা « জিজ্ঞাসা কর্ » (« পুছ্, শুধা » ধাতুর পরিবর্তে); gain = « লাভ বা মুনফা কর্ »; leave = « স্থানত্যাগ কর্ »; hurt = « আঘাত কর্ »; hunt = « মৃগয়া বা শিকার কর্ » ইত্যাদি। বাঙ্গালার নিজস্ব সরল সিদ্ধ ধাতুর এইভাবে বিশেষ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে; যথা—« দেখ্ » স্থলে « দর্শন, অবলোকন, নজর কর্ »; « তাকা » স্থলে « দৃষ্টিপাত, নেত্রপাত কর্ »; « শুন্ » = « শ্রবণ, কর্ণপাত কর্ »; « খা » = « আহার, ভোজন কর্ »; « মর্ » = « প্রাণত্যাগ, দেহত্যাগ, জীবন-বিসর্জন কর্; পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হ »; « দে » = « দান কর্ », « নে » বা « লহ » =

« গ্রহণ কর্ »; « পড়্ »=« পাঠ বা অধ্যয়ন কর্ »; « লুকা »=« গোপন কর্ »; « শিখ্ »=« শিক্ষা কর্ »; « বাঁচ্ »=« জীবন বা প্রাণ ধারণ কর্ »; « ছোঁ »= « স্পর্শ কর্ »; « ডুব »=« মগ্ন বা নিমজ্জিত হ » ইত্যাদি।

কখনও কখনও এই রীতি ধরিয়া আবার সংস্কৃত শব্দের যোগে বাঙ্গালা বাক্য-ধারার অনুবাদ করিয়া লওয়া হয়; যথা—« কাল কাট্ »=« সময়-কর্তন, কাল-কর্তন, সময়-যাপন কর্ »; « লাফ দে »=« লম্ফ-প্রদান কর্ »। কচিৎ বা সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে ভাবের অনুবাদ করিয়া, অনুচিত-ভাবে সহজ কথাকে ঘুরাইয়া বলা হইয়া থাকে; যথা— « লুফ্ » ধাতু-স্থলে « উৎক্ষেপ-পূর্বক পুনর্গ্রহণ কর্ »।

সকল ভাষাতেই এই প্রকারের পণ্ডিতী ধরণের কথা বলিবার একটা প্রয়াস দেখা যায়। কোনও-কিছু ভদ্র-ভাবে বলিবার জন্য, অথবা নূতন ভাব প্রকাশের জন্য, এই প্রকার সংযোগ-মূলক ধাতুর আবশ্যকতা আছে, ইহাকে একেবারে বর্জন করা চলে না।

বাঙ্গালায় অকর্মক ও সকর্মক উভয় প্রকারেরই ক্রিয়া এই সকল সংযোগ-মূলক ধাতু-দ্বারা দ্যোতিত হয়—অকর্মক-স্থলে আত্মনিষ্ঠ ভাবই বিদ্যমান থাকে; যথা—« মুড়ি দেওয়া, গুঁড়ি মারা, হাবুডুবু খাওয়া » ইত্যাদি।

উদাহরণ—

(১) « হ » ধাতু-যোগে—« সমর্থ হ, একমত হ, রাজী হ, প্রত্যক্ষ হ, ঘর্মাক্ত হ (=√ঘাম্), ধাবিত, প্রবাহিত, উদয় হ » ইত্যাদি।

(২) « যা » ধাতু-যোগে—« অস্ত যা »।

(৩) « দে » ধাতু-যোগে—« উত্তর দে; জবাব, শাস্তি, দণ্ড, সাজা, ধাক্কা, তালিম, শিক্ষা, দোল, ভোট দে » প্রভৃতি।

(৪) « পা » ধাতু-যোগে—« বৃদ্ধি পা, লজ্জা পা, কষ্ট পা, দুঃখ পা, যন্ত্রণা পা »।

(৫) « খা » ধাতু-যোগে—« হাবুডুবু খা, ঘুরপাক খা »।

(৬) « বাস্ » ধাতু-যোগে—« ভাল বাস্, মন্দ বাস্ » (প্রাচীন বাঙ্গালায় « সুখ বাস্; ভয়, ঘৃণা, লজ্জা, লাজ » ইত্যাদি + « বাস্ » ধাতু)

(৭) « বাড়্ » ধাতু যোগে—« আগ বাড়া »।

(৮) « কর্ » ধাতু-যোগে—প্রচুর উদাহরণ আছে : « লাভ, যোগ, স্বীকার, আরোহণ, ঘেউ-ঘেউ, স্নান, প্রহার, শুরু, আরম্ভ, অবরোধ, ঘেরাও, সাক্ষাৎ, পরিবর্তন, বদল, আদায়, অভিযোগ, নালিশ, সৃজন, সৃষ্টি, পাক, আরাম, নিশ্চয়, দেরী, শীঘ্র, জল্‌দি, ইচ্ছা, অভিলাষ, ভাগ, সন্দেহ, সোবে, আকর্ষণ, ব্যাখ্যা, পূরা, পূর্ণ, অনুসরণ, ঘৃণা, শ্রবণ, গোপন, আঘাত, ঠাট্টা, মস্করা, তামাশা, রসিকতা, শিক্ষা, প্রাণ-ধারণ, তৈয়ারী, প্রস্তুত, অঙ্কিত, অঙ্কন, মিশ্রণ, মিশ্রিত, রক্ষা, গুলি, নিক্ষেপ, ভ্রমণ, অভ্যর্থনা, প্রণাম, নমস্কার, প্রণতি, সেলাম, সম্মান, খাতির, আশঙ্কা, হুকুম, তামিল, বরখাস্ত, বাহাল » ইত্যাদি, ইত্যাদি। বাঙ্গালায় প্রায় যে-কোনও বিশেষ্য পদকে « কর্ » ধাতুর সহিত ব্যবহার করিয়া সংযোগ-মূলক ধাতু বা ক্রিয়া গঠন করা যায়।

« দর্শন কর্, আহার কর্, বৃদ্ধি পা, দোল খা, দোল দে, জিজ্ঞাসা কর্ » প্রভৃতি সংযোগ-মূলক ধাতু বাস্তবিক পক্ষে « দেখ্, খা, বাড়্, দুল্, দোলা, পুছ্ » প্রভৃতি ধাতুর প্রতিশব্দ। ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে, « দর্শন, আহার, বৃদ্ধি, দোল » প্রভৃতি বিশেষ্য শব্দ, « কর্, পা, খা, দে » প্রভৃতি ধাতুর কর্ম; কিন্তু ব্যাবহারিক ভাবে, « দর্শন-কর্, আহার-কর্, বৃদ্ধি-পা, দোল-খা, দোল-দে » প্রভৃতি, এক-একটী সরল-ভাব-দ্যোতক ক্রিয়া—এগুলিকে মিশ্রিত বা মিলিত বা সংযোগ-মূলক ধাতু বলাই সঙ্গত। এই প্রকারের সংযোগ-মূলক ধাতুর বিশেষ্য (বা বিশেষণ) এবং ধাতু, এই উভয়ের মধ্যে লিখিবার কালে হাইফেন বা পদ-সংযোগ চিহ্ন দেওয়া উচিত; « আমরা অন্ন আহার করি »—এখানে বস্তুতঃ « আহার-করি », 'খাই'-অর্থে প্রযুক্ত সংযোগ-মূলক ধাতু, বিশেষ্য পদ « অন্ন », এই « আহার-করি » ক্রিয়ার কর্ম; কিন্তু « আমরা অন্নাহার করি »—এখানে « অন্নাহার » সমস্ত-পদ, « করি » ক্রিয়ার কর্ম। « আমরা রাজাকে দর্শন করিলাম »—এখানে « দর্শন-করিলাম » এই সংযোগ-মূলক ধাতুই ক্রিয়া, « রাজাকে » উহার কর্ম; কিন্তু « আমরা রাজদর্শন করিলাম »—এখানে সমস্ত-পদ « রাজদর্শন », সিদ্ধ-ধাতুজ ক্রিয়া « করিলাম »-এর কর্ম। এইরূপ সংযোগ-মূলক ক্রিয়ার বিশেষ্যকে

বক্তার বা লেখকের ইচ্ছা-মত ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন করিয়া, পূর্ব-স্থিত অন্য একটী বিশেষ্যের সঙ্গে সমাস-বদ্ধ করিয়া লওয়া যায়; কিন্তু সমাস না করিয়া, বিশেষ্য ও ধাতু মিলাইয়া সংযোগ-মূলক ক্রিয়া-রূপে ধরাই বাঙ্গালার পক্ষে স্বাভাবিক; যথা—« সে মিষ্টান্ন ভোজন-করিয়াছে, অথবা সে মিষ্টান্ন-ভোজন করিয়াছে; সে পাঁচটী ব্রাহ্মণকে ভোজন-করাইয়াছে, সে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়াছে; তিনি বইখানি আমায় দান-করিলেন; দরিদ্রকে অন্ন দান-করিবে, বা অন্ন-দান করিবে; রাজা গো-দান করিলেন: এ বিষয়টী তাঁহার কর্ণ-গোচর (কর্ম) করিব; তিনি টাকা খরচ-করিলেন, আদায়-করিতে পারিলেন না; কিন্তু—তিনি টাকা-খরচ করিলেন, পুত্রকে বাঁচাইতে পারিলেন না; তিনি সভায় যোগ-দান করিলেন »। অনেক সময়ে অর্থ ধরিয়া, এবং অর্থ-অনুসারে শব্দের উপরে স্বরাঘাত ধরিয়া, বাক্যটীতে সংযোগ-মূলক ধাতু আছে, অথবা সমাস-যুক্ত বিশেষ্য পদ আছে, তাহা নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে; যথা—« তিনি মিষ্টান্ন 'ভোজন-করিলেন (ছাঁদা বাঁধিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন না!), তিনি 'মিষ্টান্ন-ভোজন (অন্য কোনও খাদ্য-ভোজন নহে) করিলেন; দেবতাকে 'দর্শন-করিলেন, 'দেব-দর্শন করিলেন; তাহার চাঁদ-মুখ কবে 'দর্শন-করিব, তাহার 'মুখ-দর্শন করিব না; তিনি টাকা 'উপার্জ্জন-করিতে জানেন, 'খরচ-করিতে জানেন না—তিনি 'টাকা-উপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'আত্ম-সম্মান-জ্ঞান হারাইয়াছেন; দরিদ্রকে অন্ন ও বস্ত্র 'দান-কর, আমায় 'অভয়-দান কর; কদাচ 'মিথ্যা-নালিশ করিও না, মিথ্যা (=অনর্থক) 'নালিশ-করিও না » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—সংযোগ-মূলক ক্রিয়ার প্রথম অংশ বিশেষ্য হয়। সংযোগ-মূলক ধাতু ভিন্ন বাঙ্গালায় **যৌগিক-ক্রিয়া (Compound Verbs)** আছে, এগুলিতে দুইটী ধাতু মিলিয়া একটী ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে। যৌগিক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

[৩.০৯।৩] সমাপিকা- ও অসমাপিকা-ক্রিয়া
(Finite and Infinite Verbs)

উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহি, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে যে ক্রিয়া-পদ-দ্বারা বলা যায়, যে ক্রিয়া-পদ-দ্বারা বাক্যের অর্থ শেষ করিয়া দেওয়া যায়,

আর কিছু বলিবার থাকে না, সেইরূপ ক্রিয়া-পদকে **সমাপিকা-ক্রিয়া** বলে ; যেমন—« আমি যাই ; সে বলিল ; তাহারা গান গাহিতেছে ; তুমি আগে রোজ-রোজ আসিতে, এখন আস না » ইত্যাদি। এই সকল দৃষ্টান্তে, উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বক্তব্যটীকে ক্রিয়া-পদ-দ্বারা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে ; অতএব « যাই, বলিল, গাহিতেছে, আসিতে, আস »—এগুলি সমাপিকা-ক্রিয়া।

কিন্তু যেখানে কোনও ক্রিয়া-পদ, উদ্দেশ্যের বিধেয় হইয়াও সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বলে না, বাক্যটীর অর্থ পূরা করিয়া দেয় না,—বাক্যটী শেষ করিতে হইলে যেখানে অন্য ক্রিয়া-পদের অপেক্ষা থাকে, সেখানে তদ্রূপ ক্রিয়া-পদকে **অসমাপিকা-ক্রিয়া** বলে ; যেমন—« আমি ভাত **খাইয়া** (বা গাড়ী **করিয়া**) [যাইব] ; সে **চেঁচাইয়া** [বলিল, উঠিল, কাঁদিতেছে, ডাকিবে ইত্যাদি] ; তাহারা **নাচিতে নাচিতে** [আসিতেছে, গান গাহিবে, জয়ধ্বনি করিল ইত্যাদি] ; তুমি আমার বাড়ী **হইয়া** [যাইবে] ; তুমি **বলিলে** [তবে আমি বলিব] » ইত্যাদি।

এই প্রকারের অসমাপিকা-ক্রিয়া ভিন্ন, **ক্রিয়া-মূলক বিশেষ্য ও বিশেষণ (Verbal Nouns and Adjectives)** আছে, ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় করিয়া এগুলি গঠিত হয় ; এগুলিকে কৃদন্ত-পদ বলে ; যেমন—« √দেখ্—দেখা (=দৃষ্ট, দর্শন-কার্য) ; দেখন্ত ; দেখিতে-দেখিতে ; দেখিবার জন্য, দেখিবা-মাত্র ; দেখন » ইত্যাদি। (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় প্রকারের কৃদন্ত-পদ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে : পূর্বে পৃষ্ঠা ১৫৪-১৮২ দ্রষ্টব্য।) এই সমস্ত কৃদন্ত-পদ ঠিক ক্রিয়া-পদ নহে।

অতএব, বাক্যকে সমাপ্ত করিয়া দেয়, কিংবা দেয় না, ইহা বিচার করিয়া, ক্রিয়া-পদকে দুই মুখ্য শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—**সমাপিকা** ও **অসমাপিকা**।

[৩.০৯।৪] অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া—মুখ্য, গৌণ ও সমধাতুক কর্ম

যে ক্রিয়া কেবল কর্তৃনিষ্ঠ, অর্থাৎ মাত্র কর্তাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে,—ধাতুর দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার নিজ হইতেই সম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সম্পূর্ণ হইতে অন্য কোনও বস্তু বা পদার্থের অপেক্ষা রাখে না, তাহাকে **অকর্মক-ক্রিয়া** বলে; যেমন—« আমি আছি; রাম গেল; গোপাল আসিবে; গাছ বাড়িতেছে; আম পাকিল » ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে ক্রিয়া-পদের দ্বারা বর্ণিত ব্যাপার, উদ্দেশ্য হইতে প্রসৃত হইয়া অন্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তবে সম্পূর্ণ হয়, সেখানে উহাকে **সকর্মক-ক্রিয়া** বলে; যেমন—« আমি বই পড়ি; সে কথা শুনিবে; মা ভাত রাঁধিতেছেন »—এখানে « পড়ি, শুনিবে, রাঁধিতেছেন » এই ক্রিয়াপদ-ত্রয় কেবল কর্তাকেই অবলম্বন করিয়া নহে—কর্তা হইতে প্রসৃত হইয়া অন্য বস্তুর উপরও ক্রিয়া-বর্ণিত কার্যের প্রভাব পড়ে, কর্তার ন্যায় অন্য বস্তুকেও আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া সার্থক হয়। সকর্মক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে « কি » বা « কাহাকে » এই সর্বনাম-পদ-দ্বারা প্রশ্ন করা যাইতে পারে; অকর্মক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে সাধারণতঃ এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

সকর্মক-ক্রিয়া একাধিক কর্মকে অবলম্বন করিয়া হইতে পারে; যেমন—« আমি তোমায় বইখানি দিলাম; যোগেশ সুবোধকে রাম-বাবুর বাড়ী দেখাইতে লইয়া গিয়াছে; মাষ্টার-মহাশয়কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিও; আমি মাকে চিঠি লিখিব; শত্রুকেও মিষ্ট কথা বলিবে » ইত্যাদি। এই দুই কর্মের মধ্যে, একটীকে **মুখ্য কর্ম** ও অন্যটীকে **গৌণ কর্ম** বলে। যাহার সুবিধার বা অসুবিধার জন্য, অথবা ভালর বা মন্দর জন্য, কিংবা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া ক্রিয়া-পদের কার্য করা হয়, তাহা **গৌণ কর্ম (Indirect Object)**; এবং যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া কার্য

ঘটে, তাহা **মুখ্য কর্ম** (Direct Object)। উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে, «তোমায়, স্থবোধকে, মাষ্টার-মহাশয়কে, মাকে, শত্রুকে»—এগুলি গৌণ কর্ম; «বইখানি, বাড়ী, প্রশ্ন, চিঠি, কথা»—এগুলি মুখ্য কর্ম।

বাঙ্গালার গৌণকর্ম ও সংস্কৃতের সম্প্রদান-কারকের মধ্যে অর্থতঃ কোনও পার্থক্য নাই; দান-অর্থে, নিমিত্ত-অর্থে, এবং অন্ত কোনও-কোনও ক্ষেত্রে, সংস্কৃত শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি-যোগে, সংস্কৃতে সম্প্রদান-কারক হয়। গৌণ কর্ম ও সম্প্রদান-কারক—এই দুইটাকে পৃথক্ করিয়া ধরিবার বিশেষ সার্থকতা বাঙ্গালায় নাই।

অকর্মক-ক্রিয়াকেও সকর্মক করিয়া ব্যবহার করা যায়; ক্রিয়া-ঘটিত ব্যাপার বা কার্যকে আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়ার সম্পূর্ণতা, এইভাবে চিন্তা করিয়া, ক্রিয়ার সহিত সমধাতুক ভাব-বিশেষ্য বা ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষ্য-পদকে (Verbal Nounকে) কর্মরূপে ধরিয়া লইয়া, অকর্মক-ক্রিয়াকে সকর্মক করিয়া দেখানো যায়; যথা—«খুব ঘুম ঘুমাইয়াছ (=খুব গভীর ভাবে ঘুমাইয়াছ); কি বসাই বসিয়াছেন, মরি মরি! খুব চমৎকার নাচ নাচিল; আর মায়াকান্না কাঁদিতে হইবে না; এমন মরণ মরিতে পারা ভাগ্যের কথা; কি মিষ্ট হাসি হাসিল!» ইত্যাদি। এইরূপ কর্মকে **সমধাতুক কর্ম** (Cognate Object) বলে। সাধু-ভাষায় সমধাতুক-কর্মের প্রয়োগ বিরল, চলিত-ভাষাতেই ইহা খুব সাধারণ।

[৩.০৯।৫] ক্রিয়ার প্রকার (Mood)

যে উপায়ে ক্রিয়া-পদের বর্ণিত কার্য ঘটিবার প্রকার অথবা রীতির বোধ বা দ্যোতনা হয়, তাহাকে **ভাব-প্রদর্শক প্রকার** (Mood) বলে; যথা—«সে যায়»; এখানে «যায়» এই ক্রিয়া-পদ, কেবল যাওয়ার ঘটনা যে ঘটিয়া থাকে, মাত্র ইহা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইল, কেবল সাধারণ-ভাবে ঘটনাটী ঘটিবার অবধারণ অথবা নির্দেশ করিল; «সে যাউক»—এখানে

বক্তার আজ্ঞা, অনুমোদন, বা প্রার্থনা জানানো হইল যে, যাওয়া-ঘটনা ঘটুক ; « যদি সে যায় »—এক্ষেত্রে যাওয়া-ঘটনার অনিশ্চয়তা দ্যোতিত হইতেছে ; « আমায় বলিলে আমি যাইতাম »—এখানে যাওয়ার সম্ভাব্যতা সূচিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়ায় এইরূপ বিভিন্ন প্রকার থাকা সত্ত্বেও, ক্রিয়ার এই « প্রকার » লইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে পৃথক্ আলোচনা নাই। ইংরেজী Mood শব্দের প্রতিশব্দ-স্বরূপ রাজা রামমোহন রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে « প্রকার » শব্দ ব্যবহার করেন।

ক্রিয়ার এইরূপ বিবিধ **প্রকার** (Mood) আছে ; যথা—

[১] **অবধারক বা নির্দেশক প্রকার** (Indicative Mood) ;

[২] **আজ্ঞা-দ্যোতক বা নিয়োজক প্রকার, অথবা অনুজ্ঞা** (Imperative Mood) ;

[৩] **ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার বা সংযোজক প্রকার** (Subjunctive Mood) ; ইত্যাদি।

অনেক ভাষায়, ক্রিয়াপদ-সাধনে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্য বিভিন্ন বিভক্তি আছে ; যেমন সংস্কৃতে—« ভরতি » ('সে ভরে' [বা বহে]—নির্দেশক বা অবধারক), « ভরেৎ » ('যেন সে ভরে'—ইচ্ছা-দ্যোতক প্রকার), « ভরতু » ('সে ভরুক'—অনুজ্ঞা বা নিয়োজক প্রকার), বৈদিক সংস্কৃতে « ভরাতি, ভরাৎ » ('যদি সে ভরে'—সংযোজক প্রকার)। ইংরেজীতেও কিছু-কিছু আছে ; যথা—he bears (অবধারক, Indicative), if he bear (সংযোজক, Subjunctive)। বাঙ্গালায় এক অবধারক প্রকার এবং নিয়োজক প্রকার (বা অনুজ্ঞা) ভিন্ন, অন্য প্রকার-দ্যোতক বিশেষ রূপের প্রচলন নাই। তবে, « যদি, যেন, কি » ইত্যাদি কতকগুলি অব্যয়ের সাহায্যে, অবধারক প্রকারের ক্রিয়া অন্য-প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন—« সে বলে ;—যদি সে বলে » (Subjunctive অর্থাৎ নিয়োজক বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার ; « তাহা হইলে, তবে » প্রভৃতির যোগে অন্য ঘটনার উল্লেখ অপেক্ষিত) ; « যেন সে বলে » (ইচ্ছা-দ্যোতক প্রকার, বিধিলিঙ্, Optative Mood)। আবার কচিৎ কেবল

নির্দেশক প্রকারের দ্বারাই অন্ত প্রকার প্রকটিত হয়; যথা—« আমি যাবো ? » (='তুমি কি আমায় যাইতে বলো ?'—অনুজ্ঞা বা নিয়োজক প্রকার); « তুমি যাবে » (অনুজ্ঞা); « আমি তাহাকে দেখিয়া থাকিব » (সংযোজক, বা সম্ভাব্যতা-দ্যোতক প্রকার) ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ধাতু-রূপে বিভিন্ন প্রকারের প্রদর্শনের স্থান নাই—কেবল নির্দেশক ও নিয়োজক প্রকারেরই বিশিষ্ট বিভক্তি আছে।

[৩.০৯।৬] বাচ্য (Voice)

ক্রিয়ার যে রূপ-ভেদের দ্বারা জানা যায় যে, ক্রিয়ার অন্বয় বা সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া কর্তার সহিত বা কর্মের সহিত, অথবা কর্তা ও কর্ম ইহাদের দুইয়ের কাহারও সহিত না হইয়া, কেবল ক্রিয়ার কার্য-মাত্র সূচিত হয়, সেই রূপ-ভেদকে ক্রিয়ার **বাচ্য** বলে; যথা—« আমি বই পড়ি; বই আমাকর্তৃক পড়া হয়; এ বই আমার পড়া হয় নাই »।

বাচ্য চারি প্রকারের: [১] **কর্তৃবাচ্য**, [২] **কর্মবাচ্য**, [৩] **ভাববাচ্য**, ও [৪] **কর্ম-কর্তৃবাচ্য**।

[১] **কর্তৃবাচ্য (Active Voice)**—যেখানে ক্রিয়ার কার্য কর্তা-ই করে, কর্তা-ই বাক্যের মধ্যে প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, ক্রিয়ার ব্যাপার কর্তার-ই অনুগামী হয়, সেখানে ক্রিয়াকে কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বলে; যথা—« সে আসে; আমি গিয়াছিলাম; রামকে আমি ডাকিব; তাহাকে খাইতে বলিয়াছি (কর্তা 'আমি' উহ্য) »। কর্তৃবাচ্যে কর্তা প্রথমা-বিভক্তির হয়, এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে, কর্ম দ্বিতীয়া-বিভক্তির হয়। কর্তাকে অনুসরণ করিয়া ক্রিয়ার রূপ উত্তম, মধ্যম অথবা প্রথম পুরুষের হয়।

[২] **কর্মবাচ্য (Passive Voice)**—যেখানে কর্মই মুখ্য-রূপে প্রতীয়মান হয়, কর্তা অপেক্ষা যেন কর্মের সহিতই ক্রিয়ার ঘটনার প্রধান

যোগ কল্পিত হয়, সেখানে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বলা হয়; যথা—* আমার দ্বারা এ কার্য হইয়াছে; তুমি রামকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছ; পাহারা-ওয়ালার দ্বারা চোর ধরা পড়িয়াছে; দূর হইতে চন্দ্র ছোট দেখায়; দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায় * ইত্যাদি। কর্মবাচ্যে মূল বা সত্যকার কর্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে আনীত হয়, মূল কর্ম প্রথমা বিভক্তিতে পড়ে এবং ইহাই ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া কল্পিত হয়; ইহাতে ক্রিয়ার সাধারণ রূপেরও পরিবর্তন ঘটে। কখনও-কখনও মূল কর্তা অনুল্লিখিত বা উহ্য থাকে; এবং মূল কর্ম, ব্যক্তি-বাচক বা বিশিষ্ট-প্রাণি-বাচক হইলে, প্রথমা বিভক্তিতে নীত না হইয়া, দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) বিভক্তিতে নীত হয়; যথা—* আমাকে দেখা যায়; আমায় দেখা হয়; রামকে বলা হয়; তাহাকে ডাকা হইবে (=সে আহূত হইবে) * ইত্যাদি। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে মুখ্য কর্ম কর্তা হইয়া দাঁড়ায়, এবং গৌণ কর্ম পূর্বের মত দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তিযুক্তই থাকে; যথা—* ভিখারীকে আমি একটী পয়সা দিলাম—আমার দ্বারা ভিখারীকে একটী পয়সা দেওয়া হইল; শিক্ষক-মহাশয় বালকদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিলেন—শিক্ষক-মহাশয়-কর্তৃক (বা শিক্ষক-মহাশয়কে দিয়া) বালকদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল * ইত্যাদি।

[৩] যেখানে ক্রিয়াই বাক্যের মধ্যে প্রধান বক্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়, বক্তার নিকটে ক্রিয়ার ঘটনাই প্রধান, কর্তা বা কর্ম প্রধান নহে, সেখানে **ভাববাচ্য (Neuter, Intransitive Passive বা Impersonal Voice)** হয়; যথা—* তোমার ঘুমানো হইয়াছে? আমার আসা হইবে না; খোকার শোওয়া হয় নাই; আমাকে যাইতে হইবে * ইত্যাদি।

ভাববাচ্য অকর্মক ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া হয়, ইহা সাধারণ মত; ভাববাচ্যে মূল কর্তা দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) অথবা ষষ্ঠীতে নীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ কতকগুলি বাক্যে,

কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার যেখানে কর্তা উহ্য থাকে অথবা যেখানে কর্তাকে ষষ্ঠীতে ফেলা হয়, সেখানে ক্রিয়া-প্রধান ভাবই বিদ্যমান—সকর্মক হইলেও এইরূপ ক্রিয়া ভাববাচ্যের পর্যায়ের; যথা—« মহাশয়ের (বা তোমার) কোথা থাকা হয়? আমার বসা হইয়াছে »—বিশুদ্ধ ভাববাচ্য; « মহাশয়ের (বা তোমার) কি করা হয়? আমার ভাত খাওয়া হইয়াছে (বিশুদ্ধ কর্মবাচ্য—আমাকর্তৃক ভাত খাওয়া হইয়াছে); দূর হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায় (বিশুদ্ধ কর্মবাচ্য—দূর হইতে চন্দ্র ছোট দেখায়); আমাকে দেখা হয়, রামকে বলা হয় (বিশুদ্ধ কর্মবাচ্য—কোনও ব্যক্তি-কর্তৃক আমি দৃষ্ট হই বা দেখা পড়ি, কোনও ব্যক্তি-কর্তৃক এই বিষয় রামকে বলা হয়); ধরিয়া লওয়া যাউক » ইত্যাদি।

[৪] কর্মকর্তৃবাচ্য (Middle Voice, Quasi-Passive Voice): কতকগুলি ক্রিয়ায় কর্তা কে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন, কর্মই যেন নিজের উপরে ক্রিয়া করে: এইরূপ ক্রিয়ায় কর্মকর্তৃবাচ্য বিদ্যমান; যথা—« কলসী ভরে; ফল পাকে; বাঁশ ভাঙ্গিতেছে; শীত করিতেছে; তাঁহার বইখানি বাজারে বেশ কাটিতেছে; কাপড় ছিঁড়ে; গ্রামে আর শাঁখ বাজে না » ইত্যাদি। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক-ঘটনাত্মক ক্রিয়াতেই এই বাচ্যের প্রয়োগ হয়; এখনকার বাঙ্গালায় কর্তৃবাচ্যের রূপ হইতে এই কর্মকর্তৃবাচ্যের রূপ অভিন্ন, কেবল অর্থে ইহাদের পার্থক্যটুকু বুঝা যায়।

কর্মবাচ্য-সম্বন্ধে বক্তব্য—

কর্ম- বা ভাব-বাচ্য সংস্কৃতে দুই ভাবে গঠিত হইয়া থাকে—[১] প্রত্যয়-যোগে (Inflexional Passive); যথা—কর্তৃবাচ্যে « করোতি » (=সে করে), কর্মবাচ্যে « ক্রিয়তে » (=ইহা করা হয়); « পঠতি » (=পড়ে), « পঠ্যতে » (=ইহা পড়া হয়); « ভবতি—ভূয়তে » (ভাববাচ্য); [২] বিশ্লেষণ করিয়া (Analytical Passive): « ক্রিয়তে » স্থলে « কৃতম্ অস্তি » (=is done), « পঠ্যতে » স্থলে « পঠিতম্ অস্তি » (=is read) ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়াই সাধারণ; যেমন—« করা হয়, পড়া হয়, করা যায়, দেখা যায়, পড়া গেল, দেখানো হইবে » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় মূল ক্রিয়ার ধাতুতে কৃৎ-প্রত্যয় « -আ » যোগ করিয়া (ণিজন্ত ক্রিয়া হইলে « -আনো » -প্রত্যয় যোগ করিয়া) বিশেষণ-রূপ গঠিত হয়, এবং

সহকারী ক্রিয়া-স্বরূপ «হ» বা «যা» ধাতু এবং কচিৎ «পড়্» ধাতু বাক্যে ব্যবহৃত হয়। «হ» ধাতুতে কার্যটী উদ্দিষ্ট বা ঈপ্সিত, এইরূপ একটু ইঙ্গিত থাকে; «যা» ধাতুতে কর্তার শক্যতা অর্থাৎ কার্য করিবার শক্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়; «পড়্» ধাতুর ব্যবহারে কর্তার কর্তৃত্ব, এইরূপ দ্যোতনা থাকে; যেমন—«খাওয়া হয়; ধরা পড়ে»। «আছ্» ধাতু-যোগেও কর্মবাচ্য হয়, কিন্তু «আছ্» ধাতু থাকিলে, পুরা-ঘটিত (Perfect) কালের দ্যোতনা আইসে; যথা—«এই বই আমার পড়া আছে; এ কথা সকলেরই জানা আছে; মাছ ধরা আছে; এই বই সকলেরই পড়া ছিল।» (বস্তুতঃ, বহুস্থলে এইরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কর্মবাচ্য বলা চলে না; «আছে, ছিল» প্রভৃতি ক্রিয়াকে উহ্য রাখিলেও চলে—তবে «আছে, ছিল» প্রভৃতি প্রস্তাবটীকে একটু সুপরিস্ফুট করিয়া দেয় বটে।)

মূল কর্ম যদি অপ্রাণিবাচক, কিংবা বিশেষ-ভাবে অনুল্লিখিত সাধারণ প্রাণিবাচক হয়, তাহা হইলে এই কর্ম বাক্যের কর্তা হইয়া দাঁড়ায়, এবং «হ, যা, পড়্» প্রভৃতি ক্রিয়া উহার সহিত অন্বিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক, অথবা বিশিষ্ট প্রাণিবাচক হইলে, মূল কর্ম কর্তা হিসাবে আর প্রথমা বিভক্তিতে আইসে না, দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তিতে «কে, রে, এ (য়ে), য়» -যুক্ত হইয়া বসে (কেবল «পড়্» ধাতু-যোগে, এবং «আছ্» এই সহায়ক ধাতু-যোগে নিষ্পন্ন «যা» ধাতুর ক্রিয়ার কাল-দ্যোতক রূপগুলিতে, অপ্রাণি-বাচক, প্রাণি-বাচক, মনুষ্য-বাচক, সকল প্রকারের মূল কর্ম কর্তৃরূপে প্রযুক্ত হয়); যথা—

১। অপ্রাণি-বাচক—«ভাত খাওয়া যায়, হয়; বাড়ী দেখা যায়, পড়ে; হাত কাটা যায় (='দ্বিখণ্ডিত হয়') (কাটিয়া যায়='অল্প কর্তিত হয়')»।

২। সাধারণ অনির্দিষ্ট প্রাণি-বাচক—«মাছ মারা হয়; চোর ধরা পড়ে, হয়, যায়; একটা লোক রেলে কাটা গেল, পড়িল; গোরু বাঁধা হইয়াছে; মুটে ডাকা হইবে, তবে বাক্সটা বাহির করা যাইবে; ডাক্তার আনানো হইল না; পাঁঠা কাটা হইল» ইত্যাদি।

৩। নির্দিষ্ট ব্যক্তি (মনুষ্য বা মনুষ্যেতর জীব)-বাচক—«আমাকে দেখা হয়, আমাকে দেখা যায় (কিন্তু—আমি দেখা পড়ি); রামকে দেখা গেল; রামকে শোনানো যাইবে; তোমাকে বাঁধা হইয়াছিল (কিন্তু—তুমি মারা গিয়াছ, তুমি বাঁধা পড়িয়াছিলে); চোরটাকে ধরা হইয়াছে; গোরুটাকে বাঁধা হইয়াছে; দোকানের মুটেকেই ডাকা হউক, অন্য মুটে ডাকিবার দরকার নাই; অনেক ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু গ্রামের বদ্দ-ডাক্তারকেই ডাকা হয় নাই» ইত্যাদি।

প্রাচীন ভাষায় ও পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায়, «-আ» -প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ভাবের কৃদন্তের পরিবর্তে, «যা» ধাতুর সহিত কর্ম- বা ভাব-বাচ্যে «অন (বা অণ)» -প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষ্যময় কৃদন্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—«আর কি করন যায়; ভাত খাওন যায়; ভিক্ষা দেওন যায়; আমারে দেখন যায়» ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় ও চলিত-ভাষায় এই রূপের ব্যবহার নাই।

উপরে বর্ণিত কর্মবাচ্যের (ও ভাববাচ্যের) বিশ্লেষণাত্মক রূপ বাঙ্গালা ভাষায় স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃতের «-ত» বা «-ইত» -প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-পদের সহিত «হ» ধাতু-যোগে, বাঙ্গালায় (বিশেষতঃ সাধু-ভাষায়) কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। এই রূপ কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার মূল কর্ম কর্তৃকারকে আনীত হয়, এবং সংস্কৃত বিশেষণ-পদটী তাহারই বিশেষণ-স্বরূপ হয়। «হ»-ধাতু-জাত ক্রিয়া-পদ এই কর্তার সহিত অন্বিত হয়। কতকটা সংস্কৃতের এবং সম্ভবতঃ কতকটা ইংরেজীর অনুকরণে, বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় (গদ্যে) এই রূপ কর্মবাচ্যের ক্রিয়া প্রথম-প্রথম ব্যবহৃত হইতে থাকে; পরে সাধু-ভাষার প্রভাবে, সংস্কৃত বিশেষণগুলির বহুল প্রচলনের ফলে, বাঙ্গালা চলিত-ভাষাতেও এই রীতি আসিয়া গিয়াছে; যথা—«আমি দৃষ্ট হই (=আমাকে দেখা হয় বা যায়, বা আমি দেখা পড়ি); পুস্তক পঠিত হইয়াছে (=«বই পড়া হ'য়েছে); অনাথ বালকটী তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে লাগিল; ইহার দ্বারা কোনও কার্য সাধিত হইবে না; পাহারাওয়ালা-কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে; রাজদ্বারে চোর দণ্ডিত হইয়াছে; আমা কর্তৃক গৃহীত, নীত, বা রক্ষিত হয় নাই; পথে যাইতে-যাইতে সে গুণ্ডা-কর্তৃক প্রতারিত এবং প্রহৃত হইয়াছে» ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় বিভক্তি-মূলক কর্ম- ও ভাব-বাচ্য—

এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের রূপের আলোচনা করা হইল, তাহা বিশ্লেষণাত্মক। কিন্তু সংস্কৃতের মত বিভক্তি-মূলক

কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া বাঙ্গালাতেও বিদ্যমান আছে। চলিত ও সাধু, উভয়বিধ ভাষায়, « আ » -প্রত্যয়-নিষ্পন্ন এক-প্রকার কর্মবাচ্যের ক্রিয়া মিলে; যেমন—« বেশ মানায়; কথাটা ভাল শুনায় না; কথাটা চারাইয়াছে (=প্রচারিত হইয়াছে); সে ভাল মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নহে; প্রায় সব দেশেই দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়; ইহাতে কিন্তু দোষ খণ্ডায় না (=খণ্ডিত বা নষ্ট হয় না); 'তেজীয়ান্ না দোষায়'; যত পরখায় (=পরীক্ষিত হয়), তত দোষ বাহির হয়; এটা মন্দ দেখাইবে না » ইত্যাদি। কেহ-কেহ এই রূপ কর্মবাচ্যের ক্রিয়াকে **কর্মকর্তৃবাচ্য** বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এতদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গালায় « ইএ, ইয়ে, ঈ, ই » -বিভক্তি-নিষ্পন্ন কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য পাওয়া যায়—কেবল সামান্য বর্তমানে: যথা—« 'ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দেহ' (চণ্ডীদাসের পদ, ='দেহ কর্তিত হয়, কাটিয়া যায়'); আপনা রাখিয়ে (=রক্ষিত হয়) আপনে (=আপনার দ্বারা); পুণ্য কইলেঁ (=করিলে) স্বর্গে জাইয়ে (=যাওয়া যায়, যাওয়া হয়), নানা উপভোগ পাইয়ে (=পাওয়া যায়) » ইত্যাদি। « আবশ্যক আছে কি? » এই প্রশ্নে, বাঙ্গালায় যে « চাই » শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও এই « ইয়ে » বা « ই » -বিভক্তি-যুক্ত কর্মবাচ্যের রূপ: কর্তৃবাচ্যে « (তুমি) কি চাও, (আপনি) কি চান বা চাহেন, (তুই) কি চাহিস্ বা চা'স্ », কিন্তু কর্মবাচ্যে « কি চাহি বা চাই » (='কোন্ বস্তু প্রার্থিত হইয়া রহিয়াছে?'; তুলনীয়, অনুরূপ প্রয়োগ, হিন্দীতে—« ক্যা চাহিয়ে (=কি চাই)?, কপড়া চাহিয়ে (=কাপড় চাই) »; কিন্তু কর্তৃবাচ্যে, « আপ ক্যা চাহতে হৈঁ, তুম ক্যা চাহতে হো, তু ক্যা চাহতা হৈ »)। বাঙ্গালা ভাষায় সামান্য বর্তমান কালে উত্তম-পুরুষে যে « ই » -বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়া-পদ বিদ্যমান, তাহা মূলে এই প্রকার কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের-ই ক্রিয়া; আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার পুরাতন কর্মবাচ্যের অথবা ভাববাচ্যের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া কর্তৃবাচ্যে নীত হইয়াছে; যথা—« আমি করি », মূলে প্রাচীন-বাঙ্গালায় « আহ্মে, বা আম্হে করিয়ে, করীএ », প্রাকৃতে « অম্হহি করীঅই, অম্হেহি করীঅদি, করীঅতি, করিয়্যতি », সংস্কৃতে « অস্মাভিঃ ক্রিয়তে » (='আমাদের বা আমার দ্বারা করা হয়'); « আমি যাই »=« আহ্মে, আম্হে জাইয়ে », « অম্হহি

জাঈঅই, অম্হেহি জাইয়াতি », « অস্মাভিঃ যায়তে » (='আমাদের বা আমার দ্বারা যাওয়া হয়')।

[৩.০৯।৭] প্রয়োজক (প্রেরণার্থক, অথবা ণিজন্ত) ক্রিয়া, এবং নাম-ধাতু

(যে ক্রিয়ার দ্বারা সূচিত হয় যে, ক্রিয়ার কার্য একজনের প্রেরণা বা চালনার দ্বারা অন্যজন-কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে, একজনের দ্বারা প্রেরিত বা চালিত হইয়া অন্যজন কোনও কার্য করিতেছে, সেই ক্রিয়াকে **প্রয়োজক বা প্রেরণার্থক** ক্রিয়া বলে।) সংস্কৃত ভাষায় প্রেরণার্থক ক্রিয়ায় যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণে সেই প্রত্যয়কে « ণিচ্ » বলা হয়; এই « ণিচ্ » বা প্রেরণার্থক-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়াকে **ণিজন্ত** ক্রিয়াও বলে (ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত)।

প্রয়োজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়ায় প্রযোক্তা বা প্রেরক বা চালক এই ক্রিয়ার কর্তা হয়, এবং ক্রিয়ার কার্য সত্য-সত্য যাহার দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহার দ্বিতীয়া বা চতুর্থী অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেখানে মূল ক্রিয়া অকর্মক থাকে, সেখানে প্রয়োজক ক্রিয়া সকর্মক হয়; এবং ক্রিয়ার কার্য যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কর্ম-কারকে (ক্বচিৎ বা করণে) ফেলা হয়; মূল ক্রিয়া সকর্মক থাকিলে, অনুষ্ঠাতা করণ-কারকে নীত হয়; মূল ক্রিয়া দ্বিকর্মক হইলে মূল কর্ম-দ্বয় কর্ম-রূপেই অবিকৃত থাকে, এবং অনুষ্ঠাতা করণ-রূপে পরিবর্তিত হয়; যথা—

[১] অকর্মক মূল ক্রিয়া—« খোকা হাসে »; প্রয়োজক রূপ—« (মা) খোকাকে হাসায় »; « সে নাচিবে », প্রয়োজক—« আমি তাহাকে (বা তাহাকে দিয়া) নাচাইব »।

[২] সকর্মক মূল ক্রিয়া—« খোকা দুধ খায় », প্রয়োজক—« (মা) খোকাকে দুধ খাওয়ায় »; « চাকর ঘর ধুইতেছে », প্রয়োজক—« (মনিব) চাকরকে দিয়া ঘর ধোয়াইতেছেন »।

[৩] দ্বিকর্মক ক্রিয়া—« রাম গোপালকে গালি দিল », প্রয়োজক—« (শ্যাম বা অন্য কেহ) রামকে দিয়া (রামের দ্বারা) গোপালকে গালি দেওয়াইল »।

« রাম শ্যামকে বইখানি দিল »—প্রয়োজক (১) « রাম (যদুর দ্বারা) শ্যামকে বইখানি দেওয়াইল »। (২) « রামের দ্বারা (যদু বা আর কেহ) শ্যামকে বইখানি দেওয়াইল »। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্তা ভিন্ন, করণাত্মক অন্য কোনও ব্যক্তির যদি উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে মূল ক্রিয়ার কর্তা, অর্থানুসারে দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বিভক্তিতে (কর্ম- বা করণ-কারকে) নীত হয় ; যথা—« রাম শ্যামের নিকটে বই পড়িতেছে », প্রয়োজক রূপ—(১) « শ্যাম রামকে বই পড়াইতেছে », (২) « যদু রামকে (বা রামকে দিয়া) শ্যামের নিকটে বই পড়াইতেছে », (৩) « শ্যাম রামের দ্বারা (বা রামকে দিয়া) বই পড়াইতেছে »।

উপর্যুক্ত বাক্যগুলি হইতে দেখা যায় যে, প্রয়োজক-ক্রিয়া দুই প্রকারের হয় ; এক প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়ায় এক জন, দ্বিতীয় কোনও জনকে কোনও কার্যে চালিত করে ; এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়ায় প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির সাহায্যে বা দ্বারায়, তৃতীয় কাহাকেও কোনও কার্যে চালিত করে ; এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়াকে « পরিচালিত » বা « আরোপিত প্রয়োজক » বলা যায়। হিন্দীতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজক-ক্রিয়ায় বিভিন্ন রূপ হয় ; যথা—« পঢ়না = স্বয়ং পাঠ করা ; পঢ়ানা = অপর কাহাকেও পাঠ করানো ; পঢ়বানা = দ্বিতীয় কাহারও সাহায্যে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে পড়ানো ». তদ্রূপ, « দেনা, দিলানা, দিলবানা »।

বাঙ্গালা ভাষায় মূলধাতুতে « -আ » প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রয়োজক ধাতু গঠিত হয়। স্বরান্ত ধাতু হইলে, অন্তঃস্থ-ব-শ্রুতি মতে (পূর্বে ১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই « আ »-কে « ওয়া »-রূপে পাওয়া যায় ; যথা—« কর্—করা ; চল্—চলা ; নাচ্—নাচা ; দেখ—দেখা ; যা—যাআ > যাওয়া ; খা—খাআ > খাওয়া ; দে—দেআ > দেওয়া ; হ—হওয়া » ইত্যাদি।

কতকগুলি বাঙ্গালা মৌলিক ধাতুর উৎপত্তি, সংস্কৃতের প্রয়োজক রূপ হইতে ঘটিয়াছে। এগুলিতে বাঙ্গালা প্রয়োজকের « -আ » -প্রত্যয় পাওয়া

যায় না। বাঙ্গালায় এগুলির প্রয়োজক প্রকৃতি অনেকটা বজায় আছে; তথাপি, « -আ »-প্রত্যয়-যোগে এগুলি হইতে আবার নূতন প্রয়োজক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়; যথা—« চল্—চাল্—চালা; বহ্—বাহ্—বাহা; মর্—মার্—মারা » ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে আর প্রয়োজক-ক্রিয়া বলা চলে না।

চলিত-ভাষায়, ধাতুর স্বর-ধ্বনি « ই, উ, ও » এবং ক্বচিৎ « এ » থাকিলে, কাল-রূপে ণিজন্ত প্রত্যয় « আ », « ও » (অথবা উহার বিকার « উ »)-রূপে মিলে; যথা—« করাইতেছে—করাচ্ছে; ঘুরাইল—ঘুরালো >ঘুরোলো>ঘুরুলো; লুকাইবে—লুকাবে>লুকোবে>লুকুবে »।

নাম, অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং (প্রসারে) অব্যয় শব্দ, ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও-কোনও স্থলে, প্রত্যয়-যোগ না করিয়া নাম-শব্দটী ধাতু-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—« কম—কমে; তাত—তাতিল; জম—জমিবে; পাক—পাকিবে; ঘাম—ঘামে; পাত—পাতে; মাত—মাতে » ইত্যাদি। কবিতার ভাষায় সংস্কৃত বিশেষ্য-পদকে এই রূপে প্রত্যয়-যুক্ত না করিয়া ক্রিয়া-রূপে ব্যবহার করা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার; যথা—« দান—দানিলা; প্রকাশ—প্রকাশিয়া; প্রভাতিল, প্রলোভিয়া, বিনোদিয়া, প্রবেশিতে, রোপিল, মুকুলিল, প্রতিবিধিৎসিতে » ইত্যাদি। কখনও-কখনও বাঙ্গালার ধাতুটী, প্রত্যয়-হীন শব্দ হইতে জাত নাম-ধাতু, কিংবা মৌলিক সংস্কৃত ধাতু,—ইহা স্থির করা কঠিন হইয়া পড়ে; যথা—« দোষ » শব্দ হইতে « দোষিবে », কিন্তু চলিত ভাষায় « দুষ্‌বে »; « দোষ » শব্দ-জাত নাম-ধাতু-রূপে, অথবা সংস্কৃত « দুষ্ »-ধাতু, উভয় প্রকারেই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। তদ্রূপ—« রোষিল—রুষ্‌ল; রোধিল—রুধ্‌লে »।

কিন্তু সাধারণতঃ শব্দকে « আ »-প্রত্যয়ান্ত করিয়া নাম-ধাতু সৃষ্ট হয়; এবং « আ »-প্রত্যয়ান্ত নাম-ধাতু, প্রয়োজক ধাতুর ন্যায় রূপ

ধারণ করে ; যথা—« চাবুক—চাবুকা > চাব্‌কা ; লতা—লতা+আ=লতায় ; চড়—চড়া ; কামড়—কামড়া ; লাথ বা লাথি+আ=লাথা ; পিছল—পিছ্‌লা ; তল—তলাইল ; জড়—জড়ায় ; ছোব—ছোবানো »।

(২) অনুকার-সূচক অব্যয়-পদের উত্তর « আ » যোগ করিয়া, এইরূপ নাম-ধাতু সৃষ্ট হয় ; যথা—« মড়মড়—মড়মড়াইয়া ; ঝনঝনা, সন্‌সনা, মস্‌মসা, ঠন্‌ঠনা, তড়বড়া » ইত্যাদি। এইরূপ নাম-ধাতুজ অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

চলিত-ভাষায় প্রয়োজক-ক্রিয়ার ন্যায় নাম-ধাতুতেও « আ » -স্থানে « ও » প্রত্যয় আইসে।

বিভিন্ন কাল-অনুসারে প্রয়োজক-ক্রিয়ায় ও নাম-ধাতুতে যে সকল প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলি সাধারণ ক্রিয়ারই মতন—সাধু-ভাষায় এই « আ » -প্রত্যয়-যুক্ত প্রয়োজক-প্রক্রিয়ায় এক কারেরই ধাতুরূপ হয়। কার্যতঃ ধাতুরূপ-বিষয়ে প্রয়োজক ও নাম-ধাতু অভিন্ন, অথবা একই শ্রেণীর। চলিত-ভাষায় স্বর-সঙ্গতি- ও অভিশ্রুতি-অনুসারে, ধাতুর রূপে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে

[৩.০৯।৮] অসমাপিকা-ক্রিয়া (Conjunctives)

অসমাপিকা ক্রিয়া (পূর্বে পৃষ্ঠা ৩৫২ দ্রষ্টব্য) বাঙ্গালায় দুইটী—ধাতুর উত্তর যথাক্রমে « -ইয়া »-প্রত্যয় (চলিত-ভাষায় « -এ », ও তৎসঙ্গে অভিশ্রুতি-হেতু ধাতুর স্বরের পরিবর্তন ঘটে), এবং « -ইলে » -প্রত্যয় (চলিত-ভাষায়, অভিশ্রুতি-জাত স্বর-পরিবর্তন-সহ, « -লে »)-যোগে নিষ্পন্ন হয় ; যথা—« করিয়া, চলিয়া, রাখিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, গাহিয়া (— « ক'রে, চ'লে, রেখে, দেখে, শুনে, গেয়ে) ; করিলে, চলিলে, রাখিলে, দেখিলে, শুনিলে, গাহিলে (— « ক'র্‌লে, চ'ল্‌লে, রাখ্‌লে, দেখ্‌লে, শুন্‌লে, গাইলে) » ইত্যাদি।

এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে, « **-ইয়া** » **কর্তৃনিষ্ঠ**, এবং « **-ইলে** » **অন্যাশ্রয়ী অসমাপিকা** ক্রিয়ার প্রকাশক; অর্থাৎ « -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা, বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত অভিন্ন; এবং ইহার দ্বারা মাত্র এমন অসমাপ্ত ঘটনার উল্লেখ হয়, যাহা বাক্যের সমাপিকা-ক্রিয়া-বর্ণিত ঘটনার পূর্বে আরব্ধ হইয়াছে; যথা—« আমি দেখিয়া বলিব; তুমি আসিয়া দেখিলে » ইত্যাদি। কিন্তু « -ইলে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা, বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া হইতে পৃথক্ হইতে পারে, এবং ইহার দ্বারা সূচিত ঘটনার পূর্বত্ব সূচিত হয়; এতদ্ভিন্ন, ইহার উপর সমাপিকা ক্রিয়ার ঘটনও নির্ভর করে; যথা—« আমি ফিরিয়া আসিলে, তুমি যাইবে; আমি সময়-মত ফিরিলে পরে, যাইতে পারি; আমি আসিলে (পরে), তুমি যাইও » ইত্যাদি। তুলনীয়—« টাকা ধার করিয়া, তোমায় দিব » এবং « টাকা ধার করিলে (='যদি আমি টাকা ধার করি, তাহা হইলে'), তোমায় দিব »—« -ইলে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা সম্ভাব্যতা বুঝায়।

« -ইলে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কর্তার সহিত ভাবার্থে অর্থাৎ পৃথক্ প্রস্তাব-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ অর্থে « ইয়া » -প্রত্যয় প্রযুক্ত হয় না; যথা—« রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মরিবে; আমি তাহাকে দিলে, তবে সে বাঁচে » ইত্যাদি।

« -ইয়া » -প্রত্যয় কবিতায় সংক্ষিপ্ত হইয়া « -ই' » -রূপে অবস্থান করে; যথা—« করি', ধরি', চলি', লই', হই', মারি' » ইত্যাদি। পশ্চিম-বঙ্গের (রাঢ়ের) সানুনাসিক উচ্চারণ ধরিয়া আবার « -ইয়া » -প্রত্যয়, প্রাচীন সাহিত্যে « ইঁয়া, ইঞা » প্রভৃতি রূপেও মিলে; যথা—« দেখিঞা, দিঞা, করিঞা, খাইঁয়া, যাঞা » ইত্যাদি।

দুইটী বা দুইয়ের অধিক ঘটনা একই কর্তার দ্বারা পর পর সাধিত হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি পৃথক্ ঘটনা ততগুলি সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না—সাধারণতঃ পর

পর « -ইয়া » -প্রত্যয়-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া, মাত্র শেষের ক্রিয়াটীকে সমাপিকা-রূপে প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজীর সঙ্গে তুলনা করিলে, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার একটী বিশিষ্ট রীতি বলা যায়; যথা—ইংরেজীতে Go home, take your bath, finish your meal, and come back soon, কিন্তু বাঙ্গালায় « 'বাড়ী গিয়ে নেয়ে ভাত খেয়ে শীগ্‌গির ফিরে এসো » (« বাড়ী যাও, নাও, ভাত খাও এবং শীঘ্র ফিরিয়া আইস »—এরূপ নহে)।

« -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কখনও-কখনও কর্তার বিশেষণের মত, অথবা ক্রিয়ার বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়; যথা— « কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী আইল বাহিরে ; 'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা ; 'শিব নাচি' নাচি' যায়' » ইত্যাদি।

« -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ বাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা, « কষিয়া বাঁধা, চাপিয়া ধরা, ভাল করিয়া পড়া » ইত্যাদি। (এ সম্বন্ধে পরে « যৌগিক ক্রিয়া » দ্রষ্টব্য।)

« -ইলে » -যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত, « পরে » এই ক্রিয়ার বিশেষণ বাঙ্গালায় বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—« আমি করিলে পরে; তুমি আসিলে পরে; সে চিঠি লিখিলে পরে » ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে, « আমি করিয়াছি বা করিয়াছিলাম পরে; তুমি আসিয়াছ বা আসিয়াছিলে পরে; সে চিঠি লিখিয়াছে বা লিখিয়াছিল পরে », এইরূপ পুরাঘটিত বর্তমান বা পুরাঘটিত অতীতের প্রয়োগ বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাষা উভয়েরই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, অতএব বর্জনীয়।

[৩.০৯১৯] ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ (Verbal Adjectives—Participles)—কর্তৃবাচ্যে « -ইতে » ও কর্মবাচ্যে « -আ, -আনো »

[ক] ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় « -ইতে » (চলিত ভাষায় « -তে », সঙ্গে সঙ্গে অভিশ্রুতি-জাত ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে) যোগ করিয়া, কর্তৃবাচ্যে

ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষণের সৃষ্টি হয়। এইরূপ ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের দুই প্রকার প্রয়োগ হয়—[১] একক প্রয়োগ, [২] দ্বিরুক্ত প্রয়োগ।

(১) যখন কোনও পদার্থের কর্তৃরূপে পৃথক্ অস্তিত্ব জানানো হয়, তখন এই কর্তৃবাচ্যের বিশেষণের একক প্রয়োগ হয়। ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের সহিত কর্তৃরূপে যে পদ সংশ্লিষ্ট, তাহা প্রথমা, দ্বিতীয়া বা চতুর্থী অথবা ষষ্ঠী বিভক্তি-যুক্ত হইতে পারে; এইরূপ প্রয়োগকে « ভাবে প্রয়োগ » (Absolute Use) বলে; তদনুসারে সেই পদকে « ভাবে প্রথমা, ভাবে চতুর্থী বা ভাবে ষষ্ঠী » বলা চলে; যথা—« ঘর থাকতে বাবুই ভিজে; দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা কেহ বুঝে না; রাম না হইতে (বা রাম না জন্মিতে) রামায়ণ; সে হাসিতেই আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম; কেহ কখনও তাহাকে রাগ করিতে দেখে নাই; আমি চাহিতেই রামবাবু আমায় বইখানি দিলেন; জ্বর হইলে (কাহাকেও) ভাত খাইতে নাই; ঈশ্বর থাকিতে এ পাপের সাজা না হইয়া যায় না; আমি তাহাকে যাইতে দেখিলাম (তুলনীয়—আমি তাহাকে যাইতে-যাইতে দেখিলাম); সকলেই বলিবে, জ্বর-অবস্থায় কাহাকেও (বা কাহারও) স্নান করিতে নাই; গোপালকে আম পাড়িতে দেখিলাম; দুধে মাখন থাকিতেও কেহ তাহা পৃথক্ করিয়া দেখিতে পায় না; শেষটায় তাহাকে এই কাজ করিতে হইল (পৃষ্ঠা ২৮০-২৮১ দ্রষ্টব্য) » ইত্যাদি।

(২) যখন কর্তা অন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবার অবস্থায় কোনও কিছু করে, তখন এই কর্তৃবাচ্যের বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়া প্রয়োগ করা হয়—ইহা একক অবস্থান করে না। বাক্যস্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা যখন ব্যাপৃত, তখন সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা কার্যান্তর-সাধন করিলে, অসমাপিকা ক্রিয়ারও দ্বিত্ব হয়; যথা—« সে নাচিতে-নাচিতে আসিল; সমস্ত পথ চমৎকার দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে আমরা যাইতে লাগিলাম;

ঘুমাইতে-ঘুমাইতে কোনও কাজ করা যায় না; আমি থাকিতে-থাকিতে কাজটুকু চুকাইয়া লইও » ইত্যাদি।

এই « -ইতে » -প্রত্যয়, সংস্কৃতের শতৃ-প্রত্যয় « -অন্ত্ » হইতে উদ্ভূত, এবং উৎপত্তির দিক্ ধরিলে, ইহাকে শতৃ-পদের « ভাবে সপ্তমী » হইতে জাত বলা চলে।

অনেকগুলি মৌলিক ধাতুর উত্তর « -অন্ত » -প্রত্যয় যোগ করিয়া, 'সেই কার্যে নিযুক্ত' এইরূপ অর্থ-দ্যোতক কর্তৃবাচ্যের বিশেষণ গঠিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এই সব « অন্ত » -প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, অন্য সকল বিশেষণের মত, বিশেষ্যের পূর্বেই বসে; যথা—« চলন্ত গাড়ী, ঘুমন্ত ছেলে, জীয়ন্ত (জ্যান্ত) মানুষ, নাচন্ত খোকা, ডুবন্ত সূর্য, উঠন্ত বয়স, পড়ন্ত রোদ »। ক্বচিৎ এই বিশেষণের বিধেয়-রূপে প্রয়োগও হয়; যথা—« বাড়ীতে চা'ল বাড়ন্ত (='চাউল বৃদ্ধির অবস্থায় আছে, চাউলের প্রাচুর্য'—অভাব-জনিত অমঙ্গল উল্লেখ না করিবার ইচ্ছায়, চাউল না থাকিলে এইরূপ বলিয়া থাকে); সূর্য তখন ডুবন্ত (=একেবারে ডুবে নাই) » ইত্যাদি।

[খ] ধাতুর উত্তর « -আ » এবং « -আনো (-আন) » প্রত্যয়-যোগে, কর্মবাচ্যে বিশেষণ গঠিত হয়। মৌলিক ধাতুর উত্তর « -আ » হয়, এবং প্রয়োজক, নাম-ধাতু প্রভৃতি আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর « -আনো » হয়। ব-শ্রুতি মতে, আ-কারান্ত ধাতুর পরে « -আ, -আনো » আসিলে, « -ওয়া, -ওয়ানো » হইয়া যায়; যথা—« খা+আ=খাওয়া, খাওয়া+আনো=খাওয়ানো »। যখন কোনও ক্রিয়ার ফল বা প্রভাব কোনও পদার্থের উপর কার্যকর হইয়া থাকে, অথবা কেবল প্রভাব পড়িয়া থাকে, তখন এই কর্মবাচ্যের বিশেষণের প্রয়োগ হয়; যথা—« রাঁধা ভাত, করা কাজ, চষা জমী—ভাত রাঁধা হইয়াছে, কাজ করা হইল, জমী চষা হয়; হারানো ছেলে, জমানো দুধ, কাচা কাপড়; ধোপার বাড়ী থেকে কাচানো কাপড়; কাপড় কাচানো হয় নাই » ইত্যাদি।

[৩.০৯।১০] উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerundial Infinitive)

ধাতুর উত্তর « ইতে » (চলিত-ভাষায় « -তে ») প্রত্যয় যোগ করিয়া, উদ্দেশ্য- বা নিমিত্ত-বাচক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় ; যথা—« আমি তোমাকে দেখিতে (=দেখিবার উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত) আসিয়াছি ; সে টাকা উপায় করিতে চায় ; মশা মারিতে কামান পাতা ; শুনিতে তার বাধে না, কিন্তু কাকেও কিছু দিতেই তার সর্বনাশ ; মেয়েরা নাহিতে ও জল আনিতে নদীতে যায় » ইত্যাদি।

« ইতে » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, ইচ্ছা, বিধি, আবশ্যকতা, শক্তি, আদেশ, আরম্ভ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« আমার খাইতে ইচ্ছা নাই—খাইতে আমার ইচ্ছা নাই ; আমি খাইতে অনিচ্ছুক—খাইতে আমি অনিচ্ছুক ; এ কাজ করিতে মানা আছে ; কাহারও হানি করিতে নাই ; সর্বজীবে দয়া করিতে হয় ; আমি বলিতে পারি না ; আমি লিখিতে অসমর্থ ; ভোজন করিতে সে বিশেষ পটু ; তাহাকে যাইতে দাও ; আশা করি তাহারা তোমাকে খাইতে, ঘুমাইতে ও কথা কহিতে দিয়াছিল ; সে যাইতে লাগিল ; বলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে থামানো কঠিন হয় ; গল্প বলিতে শুরু করিয়া দিল ; আমাকে যাইতেই হইবে ; তোমাকে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই মত দিতে হইবে » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—এই উদ্দেশ্যার্থক বা নিমিত্তার্থক « ইতে » -প্রত্যয়ের উৎপত্তি কি, তাহা স্থির-নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অংশতঃ ইহা ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ হইতে (অর্থাৎ সংস্কৃতের শতৃ-প্রত্যয় হইতে) অভিন্ন ; বহু স্থলে, এই উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ, এই উভয়ের প্রয়োগ পৃথক্ করিয়া দেখাও কঠিন। উভয়ের অর্থের মধ্যেও একটু সংমিশ্রণ দেখা যায়। উদ্দেশ্যার্থক « ইতে », অর্ধমাগধী প্রাকৃতে প্রাপ্ত « ইত্তএ » (সংস্কৃতের উদ্দেশ্য-বাচক অসমাপিকা ক্রিয়ার « তুম্ » -প্রত্যয়ের সহিত

সংশ্লিষ্ট) প্রত্যয় হইতেও আসিতে পারে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা « ই » -কারান্ত ভাব-বাচক বিশেষ্যে সপ্তমীর « -তে » -প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত, ইহা অনুমান করা যায় ; যথা—« সে খাইতে বসিল (খাই=খাওয়া কর্ম+বিভক্তি -তে) » ইত্যাদি।

[৩.০৯৷১১] ভাব-বাচক, বা ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য-পদ (Verbal Nouns)

ক্রিয়ার ভাব বা কার্য জানাইবার জন্য, কতকগুলি প্রত্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হয় ; যথা—

[১] « -অন বা অণ (-ওন) », প্রসারে « -অনা (-ওনা), -অনী, উনী, -নী, -নি » : « দেখন (=দেখার কার্য), চলন, করন বা করণ, ধরন বা ধরণ, রহন, সহন, খাওন, হওন, রাঁধন ; আনা (<আগমন-), গোনা (<গমন-), কাঁদনা > কান্না, রাঁধনা > রান্না, বাটনা > বাড়না ; খানা-পিনা—হিন্দী হইতে ; কাঁদনী—কাঁদুনি ; পোড়নী » ইত্যাদি। « -অন » -প্রত্যয় পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় বিশেষ প্রচলিত ; চলিত-ভাষায় বহুশঃ ইহার স্থানে « -আ, -ওয়া » [৪] ব্যবহৃত হয়।

[২] « -অ » -প্রত্যয় : সাধারণতঃ এই « -অ » -প্রত্যয় অবলুপ্ত—উচ্চারণে ইহা শোনা যায় না ; যথা—« বোল, চাল, নড়-চড়, রহ-সহ » ইত্যাদি।

[৩] « -ঈ, -ই » -প্রত্যয় : « বুলি, হাসি, মুড়ি, ফেরী বা ফিরি » ইত্যাদি।

[৪] « -আ, -ওয়া » -প্রত্যয় : ইহা [৩.০৯৷৯, পৃষ্ঠা ৩৬৯] অন্তর্গত আ-কারান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ হইতে অভিন্ন ; যথা—« করা, খাওয়া, দেখা, যাওয়া, দেওয়া, নেওয়া » ইত্যাদি।

[৫] «-আন, -আনো» : ইহাও [৩.০৯৷৯] পর্যায়ের অন্তর্গত আনো-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ হইতে অভিন্ন ; যথা—« খাওয়ানো,

জিয়ানো, দেখানো » ইত্যাদি। প্রসারে « -আনী, -আনি, -অনি, -উনি », « ঝাঁথানি, দেখানি, শুনানী, জ্বলানী > জ্বলনি ; মেলানি = বিদায় »।

[৬] « -আই » : « বাছাই, যাচাই, লড়াই, বড়াই, ঢালাই, বাঁধাই » ইত্যাদি। (হিন্দী হইতে গৃহীত—« চড়াই, উতরাই, ধোলাই, সেলাই, চোলাই, বনাঈ > বানী [– সেকরার মজুরী] »।)

[৭] « -আও » : ইহা কতকগুলি শব্দে পাওয়া যায়, হিন্দীর প্রভাব-জাত : « পাকড়াও, ছাড়াও, বনি-বনাও, উধাও, ঢালাও ; ফলাও, ফালাও (হিন্দী ফৈলাৱ) »।

[৮] « -ইবা » -প্রত্যয় (চলিত-ভাষায় « -বা ») : আধুনিক বাঙ্গালায় ইহা « মাত্র » শব্দ-যোগে এবং ষষ্ঠী ও চতুর্থী বিভক্তিতে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« দিবা-মাত্র, করিবার জন্য, ধরিবার, খাইবার, আসিবারে »।

এই প্রত্যয়ের চলিত-ভাষার রূপ « -বা » -তে « -ই » লোপ হইলেও, ধাতুতে অভিশ্রুতি-জাত ধ্বনি-পরিবর্তন হয় না : যথা—« কর্‌বার জন্য » (উচ্চারণে « ক'রবার জন্য [কোর্‌বার্‌ জন্য] » নহে)।

[৩.০৯।১২] কাল ও পুরুষ (Tense ও Number)

প্রত্যয়- ও বিভক্তি-যোগে যে প্রসার বা রূপান্তর ঘটিলে, ক্রিয়ার ব্যাপারটী ঘটিতেছে, বা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে, এবম্প্রকার সময়ের বোধ হয়, তাহাকে ক্রিয়ার **কাল** বলে।

কাল-বাচক রূপ নানা প্রকারের হয়।

ক্রিয়ার কালকে রূপ- ও অর্থ-অনুসারে দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—[ক] **সরল** বা **মৌলিক কাল** (Simple Tenses), এবং [খ] **মিশ্র** বা **যৌগিক কাল** (Compound Tenses)।

মৌলিক কালের জন্য ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত হয় ; ইহাতে অন্য ধাতুর সহায়তা আবশ্যক করে না।

মৌলিক কাল বাঙ্গালায় চারিটী : [১] **সাধারণ** বা **নিত্য** বা **অনির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান** (Simple or Indefinite Present), [২] **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত** (Simple or Indefinite Past), [৩] **নিত্যবৃত্ত অতীত** (Habitual Past), এবং [৪] **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (Simple Future) : যথা—« করে, করিল, করিত, করিবে »।

মিশ্র বা যৌগিক কাল, ক্রিয়ার কৃদন্ত « -ইতে » (চলিত-ভাষায় স্বর-ধ্বনির পরিবর্ত্তন-সহ মূল ধাতু) অথবা অসমাপিকা « -ইয়া » (চলিত-ভাষায় « -এ ») প্রত্যয়ান্ত রূপের পরে, অবস্থান-বাচক « আছ্ » ধাতুর মৌলিক রূপ যুক্ত করিয়া গঠিত হয় ; যথা—« করিতে + আছে = করিতেছে (*ক'র্‌ছে), করিতে + আছিল = করিতেছিল (*ক'র্‌ছিল), করিয়া + আছে – করিয়াছে (*ক'রেছে), করিয়া + আছিল – করিয়াছিল (*ক'রেছিল), করিতে থাকিবে, করিয়া থাকিবে »।

মৌলিক-কাল-গঠনে, সাধারণ বর্ত্তমানে ধাতুর উত্তর বিভিন্ন কতকগুলি তিঙ্ বা ক্রিয়া-বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; অন্য মৌলিক কালে, ধাতুর পরে কাল-বাচক প্রত্যয় (« ইল, ইত, ইব ») সংযুক্ত হয়, ও তদনন্তর পুরুষ-বাচক বিভক্তি বসে। মূল বা ধাতুর পরেই পুরুষ-বাচক বিভক্তি যুক্ত হয় বলিয়া, সাধু-ভাষার নিত্য বা সাধারণ বর্ত্তমানকে **শুদ্ধ মৌলিক** বা **মূলাত্মক কাল-রূপ** (Radical Tense) বলা হয় ; এবং অন্য মৌলিক কালগুলিতে যে « ইল, ইত, ইব » প্রত্যয় যুক্ত হয়, সেগুলি সংস্কৃতের কৃদন্ত প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বলিয়া, এই কাল-রূপগুলিকে **কৃৎপ্রত্যয়াত্মক কাল-রূপ** (Participial Tenses) বলা হয় :

ক্রিয়ার যে বক্তা, অর্থাৎ যে নিজের সম্বন্ধে বলে, সে **উত্তম পুরুষ** (First Person) ; যাহার প্রতি অথবা উপস্থিত যাহাকে ডাকিয়া বলা হয়, সে **মধ্যম পুরুষ** (Second Person) ; এবং অনুপস্থিত যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহাকে **প্রথম পুরুষ** (Third Person)

বলে। « আমি, আমরা » অর্থে উত্তম পুরুষ ; « তুমি, তুই, আপনি, তোমরা, তোরা, আপনারা » অর্থে মধ্যম পুরুষ ; এবং « সে, তাহারা, তিনি, তাঁহারা, এ, ও, ইহারা, উহারা, ইনি, উনি, ইঁহারা, উঁহারা » অর্থে প্রথম পুরুষ। সাধারণ বিশেষ্যও প্রথম পুরুষের।

সংক্ষেপে আলোচনার জন্য, ইংরেজীর First Person, Second Person, Third Person এইরূপ সংখ্যা-দ্বারা তিন পুরুষকে নির্দিষ্ট করিবার নজীর ধরিয়া, « উত্তম-পুরুষ, মধ্যম-পুরুষ ও প্রথম-পুরুষ » -এর জন্য যথাক্রমে « ১, ২, ৩ » ব্যবহার করিতে পারা যায়। মধ্যম-পুরুষের সামান্য রূপ, তুচ্ছ রূপ ও সম্ভ্রম-সূচক রূপকে যথাক্রমে « ২ক, ২খ, ২গ » রূপে, এবং প্রথম পুরুষের সামান্য ও সম্ভ্রমার্থক রূপকে « ৩ক, ৩খ » রূপে জানানো যায় ; এবং এই তিনটী শব্দের আদ্য অক্ষর « উ, ম, প্র »-ও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

নিম্নে বিভিন্ন-পুরুষ-বাচক বিভক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। « আপনি, আপনারা » মধ্যম পুরুষকে উল্লেখ করিলেও, ক্রিয়ায় এগুলির জন্য যে বিভক্তি প্রযুক্ত হয়, সে বিভক্তি গৌরব-বোধক প্রথম পুরুষের বিভক্তি হইতে অভিন্ন ; যথা— « আপনি চলেন—তিনি চলেন »।

« √কর্+উত্তম-পুরুষে -ই=করি » (সাধারণ বর্তমান, মূলাত্মক কাল-রূপ) ;

« √কর্+মধ্যম-পুরুষে -অহ, -অ বা -ও=করহ, কর, করো » (সাধারণ বর্তমান) ;

« √কর্+অতীতার্থক প্রত্যয় -ইল+উত্তম-পুরুষের বিভক্তি -আম= করিলাম » (সাধারণ অতীত—কৃৎপ্রত্যয়াত্মক কাল-রূপ) ;

« √কর্+নিত্যবৃত্ত অতীতার্থক -ইত+উত্তম-পুরুষের বিভক্তি -আম =করিতাম » ;

« √কর্+ভবিষ্যদ্বাচক -ইব+উত্তম পুরুষের বিভক্তি -অ=করিব » ; ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় ক্রিয়ার পুরুষ-বাচক বিভক্তিতে একবচন ও বহুবচনের কোনও পার্থক্য নাই—একই বিভক্তি-দ্বারা বাঙ্গালায়

একবচন ও বহুবচন উভয়বিধ পুরুষ দ্যোতিত হয়; যথা—« তুই করিস্, তোরা করিস্; আপনি করিলেন, আপনারা করিলেন »।

বাঙ্গালা ক্রিয়ার কাল-বাচক রূপগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম « কর্ » ধাতুর সাধু-ভাষায় প্রযুক্ত সমগ্র রূপগুলি, পরে প্রত্যয় ও বিভক্তিগুলি পৃথক্ প্রদর্শিত হইতেছে। কতকগুলি কাল-বাচক শব্দ বা নাম যথারীতি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা কাল-বাচক রূপগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি এখন সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক্ হইয়া দাঁড়ানোর কারণে, এবং ইংরেজী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার কাল-রূপের সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক বলিয়া, বাঙ্গালার জন্য নূতন নামের আবশ্যকতা আছে।

[ক] সরল বা মৌলিক কাল (Simple Tenses)

[১] সাধারণ বা সামান্য অথবা নিত্য বর্তমান (Simple Present) :

« (১) আমি, আমরা করি; (২ক) তুমি, তোমরা করহ, কর, করো, (২খ) তুই, তোরা করিস্, (২গ) আপনি, আপনারা করেন; (৩ক) সে, তাহারা করে, (৩খ) তিনি, তাঁহারা করেন »।

এই কালকে « মূলাত্মক কাল » (Radical Tense) বলে।

[২] সাধারণ বা নিত্য অতীত (Simple Past) :

« (১) আমি, আমরা করিলাম; (২ক) তুমি, তোমরা করিলে, (২খ) তুই, তোরা করিলি, (২গ) আপনি, আপনারা করিলেন; (৩ক) সে, তাহারা করিল. (৩খ) তিনি, তাঁহারা করিলেন »।

[৩] নিত্যবৃত্ত বা পুরা-নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past) :

« (১) করিতাম; (২ক) করিতে, (২খ) করিতিস্, (২গ) করিতেন; (৩ক) করিত, (৩খ) করিতেন »।

« যদি » এই অব্যয়-যোগে, নিত্যবৃত্ত অতীত পরাশ্রয়ী খণ্ড-বাক্যে « কারণাত্মক অতীত » (Past Conditional) এবং পরাশ্রয়ী মূল বাক্যে

« সম্ভাব্য অতীত » (Past Potential) অর্থে প্রযুক্ত হয় ; যথা—« যদি সে আসিত (কারণাত্মক অতীত, Past Conditional), তাহা হইলে আমি যাইতাম (সম্ভাব্য অতীত, Past Potential) »।

[৪] **সাধারণ ভবিষ্যৎ** (Simple Future) :

« (১) করিব ; (২ক) করিবা, করিবে, (২খ) করিবি, (২গ) করিবেন ; (৩ক) করিবে, করিবেক, (৩খ) করিবেন »।

[২], [৩] ও [৪]-কে « কৃৎ-প্রত্যয়াত্মক কাল » (Participial Tenses) বলে।

[খ] মিশ্র বা যৌগিক কালসমূহ (Compound Tenses)

[খ।অ] **ঘটমান কালসমূহ** (Progressive Tenses) :—

[৫] **ঘটমান বর্তমান** (Present Progressive) :

« (১) করিতেছি ; (২ক) করিতেছ, (২খ) করিতেছিস্, (২গ) করিতেছেন ; (৩ক) করিতেছে, (৩খ) করিতেছেন »।

[৬] **ঘটমান অতীত** (Past Progressive) :

« (১) করিতেছিলাম ; (২ক) করিতেছিলে, (২খ) করিতেছিলি, (২গ) করিতেছিলেন ; (৩ক) করিতেছিল, (৩খ) করিতেছিলেন »।

[৭] **ঘটমান ভবিষ্যৎ** (Future Progressive) :

« (১) করিতে থাকিব ; (২খ) করিতে থাকিবে, (২খ) করিতে থাকিবি, (২গ) করিতে থাকিবেন ; (৩ক) করিতে থাকিবে, (৩গ) করিতে থাকিবেন »।

[খ।আ] **পুরাঘটিত কালসমূহ** (Perfect Tenses) :—

[৮] **পুরাঘটিত বর্তমান** (Present Perfect) :

« (১) করিয়াছি ; (২ক) করিয়াছ, (২খ) করিয়াছিস্, (২গ) করিয়াছেন ; (৩ক) করিয়াছে, (৩খ) করিয়াছেন »।

[৯] **পুরাঘটিত অতীত** (Past Perfect) :

* (১) করিয়াছিলাম ; (২ক) করিয়াছিলে, (২খ) করিয়াছিলি, (২গ) করিয়াছিলেন ; (৩ক) করিয়াছিল, (৩খ) করিয়াছিলেন *।

[১০] **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ,** অর্থাৎ **ভবিষ্যতে পুরাঘটিত ভাব** (Future Perfect) :

* (১) করিয়া থাকিব ; (২ক) করিয়া থাকিবে, (২খ) করিয়া থাকিবি, (২গ) করিয়া থাকিবেন ; (৩ক) করিয়া থাকিবে, (৩খ) করিয়া থাকিবেন *।

এতদ্ভিন্ন, কাল-রূপ বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত না হইলেও, সামঞ্জস্যের দিক্ ধরিয়া বিচার করিয়া আরও দুইটী কাল-রূপকে উপর্যুক্ত পর্যায়- বা ক্রম-মধ্যে ধরা যায় :—

[খ।ই] ঘটমান (Progressive) কালগুলির মধ্যে, **ঘটমান পুরা-নিত্যবৃত্ত** (Progressive Habitual), এবং পুরাঘটিত (Perfect) কালগুলির মধ্যে **পুরাঘটমান নিত্যবৃত্ত** অথবা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত** (Perfect বা Potential Habitual) ; যথা—

[১১] **ঘটমান পুরা-নিত্যবৃত্ত** (Progressive Habitual) :

* ১) করিতে থাকিতাম ; (২ক) করিতে থাকিতে, (২খ) করিতে থাকিতিস্, (২গ) করিতে থাকিতেন ; (৩ক) করিতে থাকিত, (৩খ) করিতে থাকিতেন *।

[১২] **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত** (Perfect Conditional, Potential বা Habitual) :

* (১) করিয়া থাকিতাম ; (২ক) করিয়া থাকিতে, (২খ) করিয়া থাকিতিস্, (২গ) করিয়া থাকিতেন ; (৩ক) করিয়া থাকিত, (৩খ) করিয়া থাকিতেন *।

আলোচনার সুবিধার জন্য, **অনুজ্ঞা** (Imperative Mood) ক্রিয়ার বিশেষ « প্রকার » (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৬) হইলেও, অনুজ্ঞার রূপগুলিকে ক্রিয়ার কাল-নির্দেশক রূপের মধ্যে ধরা যাইতে পারে—

[গ] অনুজ্ঞা (Imperative)

[গ।অ] সামান্য বা বর্তমান অনুজ্ঞা (Simple Imperative) :

(২ক) তুমি, তোমরা করহ, কর, করো, (২খ) তুই, তোরা কর্, (২গ) আপনি, আপনারা করুন ; (৩ক) সে, তাহারা করুক্, (৩খ) তিনি, তাহারা করুন »।

[গ।আ] ভবিষ্যৎ বা অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা (Future Imperative বা Precative) :

« (২ক) করিও (চলিত-ভাষায় «ক'রো), (২খ) করিস্ »। অন্য পুরুষে (এবং মধ্যম-পুরুষেও) সাধারণ-ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়।

[৩.০৯।১২।ক] বিভিন্ন কালের প্রয়োগ

[১] সাধারণ বা নিত্য বর্তমান—

কোনও বিশেষ সময় অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু সাধারণ-ভাবে বর্তমানে কোনও ক্রিয়ার ব্যাপার আমাদের সমক্ষে অথবা আমাদের জ্ঞানতঃ যখন ঘটিয়া থাকে, তখন নিত্য বর্তমানের প্রয়োগ হয় ; যেমন—« আমরা ভাত খাই ; রাজা প্রজাপালন করেন »।

সাধারণ বা নিত্য বর্তমানের আর একটী নাম « নিত্যপ্রবৃত্ত »।

উত্তম-পুরুষে অনুজ্ঞার ভাব—অর্থাৎ আমাদের এই কাজ করিতে দেওয়া হউক, অথবা আমাদের এই কাজ করিতে অভিলাষ হইয়াছে, এই রূপ অর্থ—প্রকাশ করিতেও, নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয় ; যেমন— « তবে আমরা বাড়ী যাই ; আইস, আমরা আহারে প্রবৃত্ত হই »।

বাঙ্গালায় বহুশঃ কোনও অতীত ঘটনা অথবা ঐতিহাসিক ঘটনা জানাইবার জন্য, অতীত কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয়; যেমন—« প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের অদর্শনে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করেন (= করিয়াছিলেন); আকবর বাদ্‌শাহ্ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ হয়েন; বুদ্ধদেব চরিত্র শুদ্ধ রাখিতে উপদেশ দেন; হূণেরা গুপ্তরাজগণ-কর্তৃক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়; তুর্কীরা দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে আইসে » ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক ঘটনা- অথবা সাধারণ কোনও ঘটনা-বিষয়ক অতীত কালে, নঞ্‌-অর্থক ক্রিয়া (অর্থাৎ 'ইহা ঘটে নাই', এই তাৎপর্যের ক্রিয়া) জানাইতে হইলে, নিত্য বর্তমান কালের পরে « নাই » পদ (চলিত-ভাষায় * « নি ») ব্যবহৃত হয়; যথা—« তিনি আসেন নাই (*আসেন নি); তিনি একথা আমায় বলেন নাই; বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মোগল সম্রাট্ নাদির শাহকে পরাজিত করিতে পারেন নাই; পোর্তুগীসদের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই; *তুমি তো আমায় আস্‌তে বলো নি » ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য—নঞর্থক অতীত ক্রিয়ার জন্য « না » এই অব্যয়ের সহিত পুরাঘটিত অতীত কাল-রূপ প্রযুক্ত হয় না—« তিনি আসেন নাই » স্থলে, « তিনি আসিয়াছিলেন না », « তিনি একথা আমায় বলিয়াছিলেন না ('বলেন নাই' স্থলে) », « পোর্তুগীসদের সাম্রাজ্য স্থায়ী হইয়াছিল না ('হয় নাই' স্থলে) » এরূপ প্রয়োগ, বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাষা উভয়েরই প্রকৃতির বিরোধী। « সে দেয় নাই »—ঘটনামাত্রের উল্লেখ; « সে দিল না »—'দিতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া দিল না' (« সে দিয়াছে না, সে দিয়াছিল না »—অব্যবহৃত); « সে আসে নাই »—ঘটনামাত্র; « সে আসিল না » (যদিও তাহার আগমন ঈপ্সিত); « সে আসে না »—'সাধারণতঃ আসা তাহার অভ্যাস নাই'।

[২] সাধারণ বা নিত্য অতীত—

যে ঘটনা কোনও অনির্দিষ্ট অতীত কালে হইয়াছে, তাহার জন্য এই « ইল » -প্রত্যয়-যুক্ত সাধারণ অতীত প্রযুক্ত হয়। এই অতীতের একটী পুরাতন নাম « অদ্যতনী »। উদাহরণ, যথা—« রাম বনগমন করিলেন;

অর্জুন তখন শরসন্ধান করিলেন; আলেক্সান্দর পারস্য-সম্রাট্ দারয়বহুষ্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন »। কোনও ঘটনার সাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার কথা এই অতীত প্রকাশ করে বলিয়া, ইহাকে ইংরেজীর Historical Past-এর অনুকরণে «ঐতিহাসিক অতীত»-ও বলা হয়। কখনও-কখনও নিত্য-অতীত ক্রিয়া, 'এইমাত্র ঘটিল' এই ভাব প্রকাশ করে।

[৩] নিত্যবৃত্ত অতীত—

ক্রিয়ার দ্বারা উল্লিখিত কার্য অতীতে কর্তার দ্বারা সাধারণতঃ করা হইত, কর্তা উক্ত কার্যে অভ্যস্ত ছিল—এই অর্থে ইহার প্রয়োগ; যথা—« তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন; আগে খুব খাইতাম, এখন আর পারি না; মোগল বাদ্‌শাহেরা প্রত্যহ প্রাতে দর্শন-ঝরোখায় প্রজাবর্গকে দর্শন দিতেন » ইত্যাদি।

« যদি » অব্যয়-যোগে, নিত্যবৃত্ত অতীতের কারণাত্মক এবং সম্ভাব্য অর্থে প্রয়োগের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬)।

[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ—

যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই, কিন্তু অচিরাৎ অথবা দূর ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা সাধারণ ভবিষ্যৎ-দ্বারা দ্যোতিত হয়; যথা,—« আমি এখনি যাইব; আমি আগামী বৎসর যাইব; তুমি কাল তাহাকে টাকা দিবে; শতজন্মেও তাহার মুক্তি হইবে না »। এই কালের একটী পুরাতন নাম « ভবিষ্যন্তী »।

[৫] ঘটমান বর্তমান—

যে ক্রিয়া চলিতেছে, এখনও যাহার সমাপ্তি হয় নাই, তাহা ঘটমান বর্তমান। ইহার একটী প্রচলিত নাম « বর্তমানা »; যথা—« আমি ভাত খাইতেছি; সে বই পড়িতেছে; বৃষ্টি এখনও থামে নাই, বেশ জোরে পড়িতেছে »।

[৬] ঘটমান অতীত—

অতীত কালে যে ক্রিয়া ঘটমান ছিল, অর্থাৎ চলিতেছিল, অথবা অসম্পূর্ণ বা অসম্পন্ন ছিল, তাহা ঘটমান অতীতের ক্রিয়া; যথা—« কাল সকালে যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি চিঠি লিখিতেছিলেন; গভীর রাত্রিতে যখন শ্রান্ত পুরবাসিগণ নিশ্চিন্ত-ভাবে ঘুমাইতেছিল, তখন শত্রুসৈন্য অকস্মাৎ পুরী আক্রমণ করিল »। এই কালের একটী পুরাতন নাম « অসম্পন্না »।

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ—

ভবিষ্যতে যে কার্য ঘটিতে থাকিবে, তাহা ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়া; যথা—« কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে করিয়া যাইতে থাকিব »।

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান—

যে কার্য সম্পন্ন হইয়াছে কিন্তু যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, অথবা যাহার জের বা প্রভাব এখনও চলিতেছে, তাহা পুরাঘটিত বর্তমান; যথা—« আমি কালই তাহাকে দেখিয়াছি; কলিকাতায় আসিয়াছি চারি বৎসর হইল; বৃষ্টির দরুন রাস্তায় কাদা হইয়াছে »। এই কালের চলিত নাম « হ্যস্তনী »—'হ্যঃ' অর্থাৎ গত-কল্য (যাহা ঘটিয়াছে); কিন্তু এই কাল-দ্বারা এই ভাবে গত-কল্যের সময়-নির্দেশ ঠিক হয় না।

[৯] পুরাঘটিত অতীত—

ইহার প্রচলিত নাম « পরোক্ষ », অর্থাৎ যে কার্য বক্তার চোখের বাহিরে ঘটিয়াছে। এই অতীত কাল-দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে, ক্রিয়ার ব্যাপার বহু পূর্বে অথবা বর্ণিত অন্য ঘটনার পূর্বে হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফল বিদ্যমান থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে; যথা—

« অতি শিশুকালে আমি একবার খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম; সেবার বারোয়ারী পূজায় যত টাকা খরচ হইয়াছিল, তাহার অর্ধেক তিনি দিয়াছিলেন » ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনা-বর্ণনায়, এই পুরাঘটিত অতীতের স্থানে, অতীতার্থে বর্তমানের প্রয়োগ বাঙ্গালায় খুবই হইয়া থাকে (পৃঃ ৩৭৯ দ্রষ্টব্য)।

[১০] **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—**

অতীত কালে কোনও ক্রিয়া হয় তো ঘটিয়াছিল, অথবা ঘটিয়া থাকিতে পারে, এই অর্থে এই কালের প্রয়োগ হয়; যথা—« তোমাকে এই কথা বলিয়াছিলাম? আমার মনে নাই, তবে বলিয়া থাকিব (=বলিয়া থাকিতে পারি); এ কথা আমার নিষেধ সত্ত্বেও রামবাবু-ই প্রচার করিয়া থাকিবেন; তুমি দিয়া থাকিবে, কিন্তু আমার অমতে » ইত্যাদি।

[১১] **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত—**

এই কাল-রূপ, ও ইহার পরেরটী—এই দুইটীকে সাধারণতঃ ক্রিয়ার কাল-রূপ বলিয়া ধরা হয় না। « থাক্ » ধাতুর সহিত গঠিত নিত্যবৃত্ত « সংযুক্ত ক্রিয়া » -রূপেও এই দুইটীকে ধরা যায়।

অতীতের কোনও কাজ বহুক্ষণ বা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে, এই ভাব, ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত-দ্বারা প্রকাশিত হয়; যথা—« সে দিতে থাকিলে, আমরাও খাইতে থাকিতাম; ঠিক অতক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিতাম »।

[১২] **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত** অথবা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত—**

অতীতে কোনও কাজ সম্পন্ন করিয়া কর্তার অবস্থান (অথবা অবস্থানের সম্ভাব্যতা) বুঝায়; যথা—« তাহার অসুখের সময় সারা রাত জাগিয়া থাকিতাম; এ কথা সে যদিই বা বলিয়া থাকিত, তাহা

হইলে কি অপরাধ হইত? ভাল মনে করিয়া সে হয় তো এই কাজ করিয়া থাকিত, কিন্তু সুখের বিষয়, করে নাই »।

[১১] ও [১২] ক্রিয়ার সূক্ষ্ম কাল-ভেদ ও প্রকার-ভেদ জানায়; এগুলি বাঙ্গালায় তেমন প্রচলিত নহে, কিন্তু এই প্রকার নানা সূক্ষ্মতা বাঙ্গালায় এখন আসিয়া পড়িতেছে।

[৩.০৯।১২।খ] বাঙ্গালা সাধু-ভাষার কাল- ও পুরুষ-বাচক বিভক্তি

বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় তাবৎ ক্রিয়ার রূপ, একই শ্রেণীর প্রত্যয়- ও বিভক্তি-যোগে গঠিত হইয়া থাকে। ধাতু-বিশেষে প্রত্যয়াদির পার্থক্য বাঙ্গালায় নাই।

বিভক্তি-যোগ হইলে, স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৯৫-১০০) বাঙ্গালা ধাতুর স্বরবর্ণের উচ্চারণ বদলাইয়া যায়। ই-কার উ-কার স্থলে এ-কার ও-কার প্রভৃতি উচ্চারণের পরিবর্তন সাধু ভাষায় অনেক সময় প্রদর্শিত হয়, অনেক সময় হয় না; যেমন— « উঠি—ওঠা; শুনে—শোনে; শুনা—শোনা; তুলে—তোলে; দেই—দিই; মিলা মিশা—মেলা মেশা; বুঝা পড়া—বোঝা পড়া » ইত্যাদি।

যৌগিক কাল-সংগঠনে « আছ্ » ধাতুর সহায়তা আবশ্যক হয়, এই জন্য প্রথমতঃ « আছ্ » ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইতেছে। « আছ্ » ধাতু বাঙ্গালায় অসম্পূর্ণ—ইহার কতকগুলি রূপ এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত কালে, আধুনিক বাঙ্গালায় এই ধাতুর আদ্যধ্বনি « আ » লোপ পায়; প্রাচীন বাঙ্গালায় « আ » কিন্তু দেখা যায়, দুই-একটী আধুনিক প্রাদেশিক ভাষায়ও মিলে (« আছিল, আছিলাম » ইত্যাদি)। ভবিষ্যতে,

নিত্যবৃত্ত অতীতে, এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায়, তথা ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যাদিতে, « আছ্ » ধাতুর প্রয়োগ নাই, তৎস্থানে « থাক্ » ধাতুর রূপ ব্যবহৃত হয়।

পুরুষ	নিত্য বর্তমান	নিত্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত	ভবিষ্যৎ
১	আছি	ছিলাম (কবিতায় আছিলাম, ছিলেম, ছিনু)	থাকিতাম	থাকিব
২ ক	আছ, আছো	ছিলে	থাকিতে	থাকিবে
২ খ	আছিস্	ছিলি	থাকিতিস্	থাকিবি
২ গ	আছেন	ছিলেন	থাকিতেন	থাকিবেন
৩ খ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩ ক	আছে	ছিল (কবিতায় আছিল)	থাকিত	থাকিবে

সাধারণ অনুজ্ঞা—« (২ক) থাক, থাকো (কবিতায়—থাকহ), (২খ) থাক্, (২গ) থাকুন ; (৩ক) থাকুক, (৩খ) থাকুন » ;

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« (২ক) থাকিও, (২খ) থাকিস্ (থাকিবি) » (অন্যান্য পুরুষে ও পুরুষের বিভিন্ন রূপে সাধারণ ভবিষ্যৎ প্রযুক্ত হয়) ;

অসমাপিকা ক্রিয়া—« থাকিয়া (কর্তৃনিষ্ঠ ; কবিতায় থাকি'), থাকিলে (অন্য-নিষ্ঠ) » ;

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ—« থাকিতে ; থাকিতে-থাকিতে (কর্তৃবাচ্য) ; থাকা (কর্মবাচ্য) » ;

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা—« থাকিতে » ;

ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য—« থাকা, থাকন, থাকিবা- » ইত্যাদি।

[ক] মৌলিক কাল—

পুরুষ	(১) নিত্য বর্তমান	(২) নিত্য অতীত	(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত	(৪) ভবিষ্যৎ
১	-ই	-ইলাম (কবিতায় -ইলেম, -ইনু)	-ইতাম (কবিতায় -ইতেম)	-ইব
২ ক	-অ (-ও) (কবিতায় -অহ)	-ইলে (কবিতায় -ইলা)	-ইতে	-ইবে (প্রাচীন -ইবা)
২ খ	-ইস্, -স্	-ইলি	-ইতিস্	-ইবি
২ গ	-এন্, -ন	-ইলেন	-ইতেন	-ইবেন
৩ ক	-এ, -য়	-ইল (ক্বচিৎ -ইলেক) (কবিতায় -ইলা)	-ইত	-ইবে (-ইবেক —অপ্রচলিত)
	-এন	-ইলেন	-ইতেন	-ইবেন

[খ] যৌগিক কাল—

(অ) ঘটমান—

পুরুষ	(৫) ঘটমান বর্তমান	(৬) ঘটমান অতীত	(৭) ঘটমান ভবিষ্যৎ
১	-ইতেছি	-ইতেছিলাম	-ইতে থাকিব
২ ক	-ইতেছ (কবিতায় -ইছ)	-ইতেছিলে	-ইতে থাকিবে
২ খ	-ইতেছিস্	-ইতেছিলি	-ইতে থাকিবি
২ গ ও ৩ খ	-ইতেছেন (কবিতায় -ইছেন)	-ইতেছিলেন	-ইতে থাকিবেন
৩ ক	-ইতেছে (কবিতায় -ইছে)	-ইতেছিল	-ইতে থাকিবে

(আ) পুরাঘটিত—

পুরুষ	(৮) পুরাঘটিত বর্তমান	(৯) পুরাঘটিত অতীত	(১০) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
১	-ইয়াছি	-ইয়াছিলাম	-ইয়া থাকিব
২ ক	-ইয়াছ	-ইয়াছিলে	-ইয়া থাকিবে
২ খ	-ইয়াছিস্	-ইয়াছিলি	-ইয়া থাকিবি
২ গ ও ৩ খ	-ইয়াছেন	-ইয়াছিলেন	-ইয়া থাকিবেন
৩ ক	-ইয়াছে	-ইয়াছিল	-ইয়া থাকিবে

« -ইতে » ও « -ইয়া »-প্রত্যয়-যুক্ত ঘটমান ও পুরাঘটিত কালগুলিতে « আছ্ » ধাতুর « আ » লোপ পায়। « আছ্ » ধাতুকে পৃথক্ রাখিলে অর্থ বদলাইয়া যায়; যথা—« বসিয়া আছি » (সাধু-ভাষায় স্বরাঘাত « 'বসিয়া 'আছি », চলিত-ভাষায় « *'ব'সে 'আছি » এবং « বসিয়াছি » (« 'বসিয়াছি », « *'ব'সেছি »); « 'কি 'খাইয়াছিলে ? » (='কোন্ বস্তু আহার করিয়াছিলে ?', চলিত-ভাষায় « *'কি 'খেয়েছিলে ?' ») এবং « 'কি খাইয়া 'ছিলে » (='কোন্ বস্তু আহার করিয়া জীবন-ধারণ করিয়াছিলে ?', চলিত-ভাষায়—« *'কি-খেয়ে 'ছিলে ? »)।

পুরাঘটিত কালগুলিতে, « ইয়া »-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এবং « আছ্ » -ধাতুজ সমাপিকা ক্রিয়া, উভয়ের মিলন কচিৎ অসম্পূর্ণ থাকে— « ই » এবং « ও » এই দুই অব্যয়-পদ দুইয়ের মধ্যে আসিয়া বসিতে পারে, ও দুইটী পদাংশকে পৃথক্ করিয়া দিতে পারে ; এই রূপ পৃথক্-করণ বা বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায় দৃষ্ট হয়; যথা—« *ক'রেছি তো ক'রেইছি (ক'রে-ই-ছি); তাহার ইচ্ছা ছিল যে সমস্ত টাকাটা

ক্রমে-ক্রমে দান করে, কিছু টাকা দান করিয়া-ও-ছিল, কিন্তু শেষে তাহার মত বদলাইয়া যায়; না হয় বলিয়া-ই-ছে, তাহাতে এত রাগ কেন?» ইত্যাদি।

[গ] অনুজ্ঞা—

পুরুষ	(অ) সাধারণ	(আ) ভবিষ্যৎ
১	-উ (বর্তমানবৎ)	-ইব
২ ক	-অ, -ও (কদাচিৎ -অহ)	-ইও, -ইয়ো; -ইবে
২ খ	কেবল ধাতু	-ইস্; -ইবি
২ গ ও ৩ গ	-উন্	-ইবেন
৩ ক	-উক্	-ইবে

দ্রষ্টব্য—পূর্ব-বঙ্গের বহু অঞ্চলের কথা ভাষায়, মধ্যম-পুরুষ ও উত্তম-পুরুষে গৌরবার্থক রূপের উত্তর সাধারণ অনুজ্ঞায় «-উন্»-প্রত্যয় স্থলে নিত্য-বর্তমানের «-এন্»-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; সাধু- ও চলিত-ভাষায় তাহা করা উচিত নহে—অনুজ্ঞার যে প্রত্যয় ভাষায় আছে, তাহা বর্জন করা অনুচিত; যথা—«আপনারা দয়া করিয়া বসুন ('বসেন' নহে)»; «দেখুন মহাশয় ('দেখেন মহাশয়' নহে)» ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ প্রভৃতির প্রত্যয়, পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৭২)।

কয়েকটী ক্রিয়ার সাধুভাষানুমোদিত রূপ—

ধাতুস্থিত স্বরধ্বনির পূর্বে, (৯৫-১০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে, পরিবর্তন হইয়া থাকে। ধাতুর অভ্যন্তরস্থ হ-কারও

বহুশঃ লোপ পাইয়া থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০৭-১০৮)। স্বরবর্ণের পরে, বিশেষতঃ আকারের পরে, « ই » এবং « এ » বহুশঃ লুপ্ত হইয়া থাকে।

	পুরুষ	চল্ ধাতু	বহ্ ধাতু	খা ধাতু	শিখ্ ধাতু	শুন্ ধাতু	করা ধাতু
[১] নিত্য বর্তমান	১	চলি	বহি (বই)	খাই	শিখি	শুনি	করাই
	২ ক	চলহ, চল, চলো	বহ, বহো, (বও)	খাও	শিখহ, শিখ, শেখো	শুনহ, শুন, শোনো	করাহ, করাও
	২ খ	চলিস্	বহিস্ (বইস্)	খাইস্, খা'স্	শিখিস্	শুনিস্	করাইস্, করা'স্
	২ গ ও ৩ খ	চলেন	বহেন (ব'ন্)	খায়েন, খান	শিখেন (শেখেন)	শুনেন্ (শোনেন)	করা'ন্
	৩ ক	চলে	বহে, বয়	খায়	শিখে (শেখে)	শুনে (শোনে)	করায়

	পুরুষ	চল্	বহ্	খা	শিখ্	শুন্	করা
[২] নিত্য অতীত	১	চলিলাম	বহিলাম, বইলাম	খাইলাম	শিখিলাম	শুনিলাম	করাইলাম
	২ ক	চলিলে	বহিলে, বইলে	খাইলে	শিখিলে	শুনিলে	করাইলে
	২ খ	চলিলি	বহিলি, বইলি	খাইলি	শিখিলি	শুনিলি	করাইলি
	২ গ ও ৩ খ	চলিলেন	বহিলেন, বইলেন	খাইলেন	শিখিলেন	শুনিলেন	করাইলেন
	৩ ক	চলিল	বহিল, বইল	খাইল	শিখিল	শুনিল	করাইল

[৩] নিত্যবৃত্ত অতীত						
১	চলিতাম	বহিতাম, বইতাম	খাইতাম	শিখিতাম	শুনিতাম	করাইতাম
২ ক	চলিতে	বহিতে, বইতে	খাইতে	শিখিতে	শুনিতে	করাইতে
২ খ	চলিতিস্	বহিতিস্, বইতিস্	খাইতিস্	শিখিতস্	শুনিতিস্	করাইতিস্
২ গ ও ৩ খ	চলিতেন	বহিতেন, বইতেন	খাইতেন	শিখিতেন	শুনিতেন	করাইতেন
৩ ক	চলিত	বহিত, বইত	খাইত	শিখিত	শুনিত	করাইত

[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ						
১	চলিব	বহিব, বইব	খাইব	শিখিব	শুনিব	করাইব
২ ক	চলিবে	বহিবে, বইবে	খাইবে	শিখিবে	শুনিবে	করাইবে
২ খ	চলিবি	বহিবি, বইবি	খাইবি	শিখিবি	শুনিবি	করাইবি
২ গ ও ৩ খ	চলিবেন	বহিবেন, বইবেন	খাইবেন	শিখিবেন	শুনিবেন	করাইবেন
৩ ক	চলিবে	বহিবে, বইবে	খাইবে	শিখিবে	শুনিবে	করাইবে

[৫] ঘটমান বর্তমান	চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে +(১) -ছি ; (২ক) -ছ, (২খ) -ছিস্, (২গ ও ৩খ) -ছেন ; (৩ক) -ছে

[৬] ঘটমান অতীত	চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে +(১) -ছিলাম ; (২ক) -ছিলে, (২খ) -ছিলি, (২গ ও ৩খ) -ছিলেন, (৩ক) -ছিল

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ	চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে + (১) থাকিব, (২ক) থাকিবে, (২খ) থাকিবি, (২গ ও ৩খ) থাকিবেন, (৩ক) থাকিবে

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান	চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া + (১)-ছি, (২ক) -ছ, (২খ) ছিস্, (২গ ও ৩খ) -ছেন, (৩ক) -ছে

[৯] পুরাঘটিত অতীত	চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া + (১) -ছিলাম, (২ক) -ছিলে, (২খ) -ছিলি, (২গ ও ৩খ) -ছিলেন, (৩ক) -ছিল

[১০] সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ	চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া + (১) থাকিবে, (২ক) থাকিবে, (২খ) থাকিবি, (২গ ও ৩খ) থাকিবেন, (৩ক) থাকিবে

সাধারণ অনুজ্ঞা	১	চলি	বহি, বই	খাই	শিখি	শুনি	করাই
	২ ক	চল (চলহ), চলো	বহ, বও	খাও	শিখ, শেখ, (শিখহ)	শুন, শোনো (শুনহ)	করাও
	২ খ	চল্, চ'	বহ্, ব'	খা	শেখ্	শোন্	করা
	২ গ ও ৩ খ	চলুন্	বহুন, ব'ন্	খান্ (খাউন)	শিখুন	শুনুন্	করান্
	৩ ক	চলুক্	বহুক, ব'ক্	খাউক, খাক্	শিখুক	শুনুক	করাক্

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	২ ক	চলিও, চলিয়ো, (চলিহ)	বহিও, বহিয়ো, ব'য়ো	খাইও	শিখিও	শুনিও	করাইও (ক'রিও)
	২ খ	চলিস্	বহিস্, বইস্, ব'স্	খাইস্, খাস্	শিখিস্	শুনিস্	করাস্

অনুজ্ঞায় স্বরবর্ণের পরে « অ »-প্রত্যয় সর্বত্রই « ও » হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া—[১] কর্তৃনিষ্ঠ—« চলিয়া, বহিয়া, খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া »।

[২] আত্মনিষ্ঠ—« চলিলে, বহিলে (বইলে), খাইলে, শিখিলে, শুনিলে, করাইলে »।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ কর্তৃবাচ্য—« চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে »; « চলন্ত, খাবন্ত »।

কর্মবাচ্য—« চলা, বহা বা বওয়া, খাওয়া, শিখা বা শেখা, শুনা বা শোনা, করানো »।

উদ্দেশ্য-মূলক অসমাপিকা—« চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে »।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য—« চলা, চলন, চলিবা- ; বহা (বওয়া), বহন, বহিবা- (বইবা-) ; খাওয়া, খাওন, খাইবা- ; শিখা (শেখা), শিখন, শিখিবা- ; শুনা (শোনা), শুনন, শুনিবা- ; করানো, করাইবা- »।

সাধুভাষায় « হ » বা « হো » ধাতু—

[ক] মৌলিক কাল—

[১] নিত্য বর্তমান—« হই ; হও, হইস্ বা হ'স্, হয়েন বা হন ; হয় »।

[২] নিত্য অতীত—« হইলাম ; হইলে, হইলি, হইলেন ; হইল »।

[৩] পুরা নিত্যবৃত্ত—« হইতাম ; হইতে, হইতিস্, হইতেন ; হইত »।

[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ—« হইব ; হইবে, হইবি, হইবেন ; হইবে »।

[খ] যৌগিক কাল—

[৫] ঘটমান বর্তমান—« হইতেছি ; হইতেছ, হইতেছিস্, হইতেছেন হইতেছে »।

[৬] ঘটমান অতীত—« হইতেছিলাম, হইতেছিলে » ইত্যাদি।

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ—« হইতে থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান—« হইয়াছি, হইয়াছ » ইত্যাদি।

[৯] পুরাঘটিত অতীত—« হইয়াছিল, হইয়াছিলে » ইত্যাদি।

[১০] সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ—« হইয়া থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] অনুজ্ঞা—

সাধারণ—« হও, হ, হউন্, হউক্ »।

ভবিষ্যৎ—« হইও বা হইয়ো, হইস্ বা হ'স্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« হইয়া, হইলে ; হইতে ; হওয়া ; হওন, হইবা- (হবা-) »।

সাধুভাষায় « লহ্ » বা « ল » ধাতু—

[ক] [১] « লই ; লহ বা লও, লইস্, লয়েন বা লন ; লয় » ; [২] « লইলাম ; লইলে, লইলি, লইলেন ; লইল » ; [৩] « লইতাম ; লইতে, লইতিস্, লইতেন ; লইত » ; [৪] লইব ; লইবে, লইবি, লইবেন ; লইবে »।

[খ] [৫] « লইতেছি, লইতেছ » ইত্যাদি ; [৬] « লইতেছিলাম, লইতেছিল » ইত্যাদি ; [৭] « লইতে থাকিব » ইত্যাদি ; [৮] « লইয়াছি » ইত্যাদি ; [৯] « লইয়াছিলাম » ইত্যাদি ; [১০] « লইয়া থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« লহ, লহো বা লও, ল', লউন্, লউক্।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« লইও, লইস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« লইয়া, লইতে, লওয়া, লওন, লইবা- (লবা-) »।

সাধুভাষায় « দে » ধাতু—

[ক] [১] « দেই বা দিই ; দেও বা দাও, দিস্, দিন্ (দিয়েন—অপ্রচলিত), দেয় »।

[২] « দিলাম ; দিলে, দিলি, দিলেন ; দিল »।

[৩] « দিতাম ; দিতে, দিতিস্, দিতেন ; দিত »।

[৪] « দিব (বা দেবো); দিবে (দেবে), দিবি, দিবেন (দেবেন); দিবে (দেবে) »।

[খ] [৫] « দিতেছি; দিতেছ, দিতেছিস্, দিতেছেন; দিতেছে »।

[৬] « দিতেছিলাম; দিতেছিলে, দিতেছিলি, দিতেছিলেন, দিতেছিল »।

[৭] « দিতে থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] « দিয়াছি; দিয়াছ, দিয়াছিস্, দিয়াছেন; দিয়াছে »।

[৯] « দিয়াছিলাম; দিয়াছিলে, দিয়াছিলি, দিয়াছিলেন; দিয়াছিল »।

[১০] « দিয়া থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« দেহ বা দাও, দে, দিউন্ বা দিন্, দিউক্ বা দিক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« দিয়ো বা দিও, দিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« দিয়া, দিলে; দিতে; দেওয়া, দেওন, দিবা- (দেবা-) »।

« নে » ধাতু, সাধু-ভাষায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না—ইহার স্থানে « লহ্ বা ল » ধাতুই প্রযুক্ত হয়। « নে » ধাতুর রূপ « দে »-রই অনুগামী।

অসম্পূর্ণ ধাতু

কতকগুলি ধাতুর সমস্ত রূপ মিলে না, এগুলিকে অন্য ধাতুর রূপ-দ্বারা নিজ অভাব মিটাইতে হয়। এই-রূপ ধাতুকে **অসম্পূর্ণ ধাতু** বলা চলে।

[১] **« আছ্ » ধাতু**—« থাক » ধাতু দ্বারায় ইহার পূরণ করা হয় (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩৮৪)।

[২] **« যা » ধাতু**—কতকগুলি কাল-রূপে অসম্পূর্ণ « গ » ধাতুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে। « যা [উচ্চারণ,—জা] » ধাতু সংস্কৃতের « যা [উচ্চারণ,—য়া] » হইতে উৎপন্ন; « গ » ধাতুর মূল সংস্কৃতের « গম্ » ধাতু; যথা—

[ক] [১] « যাই; যাও, যাইস্ বা যাস্, যায়েন বা যান; যায় »।

[২] « গেলাম যাইলাম; গেলে যাইলে, গেলি যাইলি, গেলেন যাইলেন; গেল যাইল »। (অতীতে চলিত-ভাষায় « যাইলাম » ইত্যাদি যা-ধাতু

হইতে উৎপন্ন রূপ ব্যবহৃত হয় না; সাধু-ভাষাতেও « গেলাম, গেল » ইত্যাদি রূপই অধিকতর প্রচলিত)।

[৩] « যাইতাম; যাইতে, যাইতিস্, যাইতেন; যাইত »।

[৪] « যাইব; যাইবে, যাইবি (যাবি), যাইবেন; যাইবে »।

[খ] [৫] « যাইতেছি; যাইতেছ, যাইতেছিস্, যাইতেছেন; যাইতেছে »।

[৬] « যাইতেছিলাম; যাইতেছিলে, যাইতেছিলি, যাইতেছিলেন; যাইতেছিল »।

[৭] « যাইতে+থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] « গিয়াছি; গিয়াছ, গিয়াছিস্, গিয়াছেন; গিয়াছে »। (« যাইয়াছি » ইত্যাদি রূপ একেবারেই হয় না।)

[৯] « গিয়াছিলাম; গিয়াছিলে, গিয়াছিলি, গিয়াছিলেন; গিয়াছিল »।

[১০] « গিয়া+থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« যাও, যা, যাউন্ বা যা'ন্, যাউক্ বা যা'ক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« যাইও, যাইন্ বা যা'ন্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« গিয়া, যাইয়া; গেলে, যাইলে; যাইতে; যাওয়া, যাওন, যাইবা- »।

[৩] « আ » ও « আইস্ বা আস্ » ধাতু—« আইস্ » ধাতু « আ » ধাতু অপেক্ষা পূর্ণতর; এই দুই ধাতু পরস্পরকে পূরণ করে। « আ » ধাতুর মূল সংস্কৃতের « আ+যা [—য়া] » ধাতু, ও « আইস্ » ধাতুর মূল সংস্কৃতের « আ+বিশ্ » ধাতু। নিম্নে বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত রূপগুলি আজকাল তত প্রচলিত নহে।

[ক] [১] « আইসে বা আসে; আইস, আইসিস্ বা আসিস্, আইসেন বা আসেন; আইসে বা আসে »।

[২] « আসিল বা আইল; আসিলে (কচিৎ আইলে), আসিলি (আইলি), আসিলেন (আইলেন); আসিল (আইল) »।

[৩] « আসিতাম ; আসিতে, আসিতিস্, আসিতেন ; আসিত »।

[৪] « আসিব ; আসিবে, আসিবি, আসিবেন ; আসিবে »।

[খ] [৫] « আসিতেছি ; আসিতেছ, আসিতেছিস্, আসিতেছেন ; আসিতেছে »।

[৬] « আসিতেছিল » ইত্যাদি।

[৭] « আসিতে+থাকিব » ইত্যাদি।

[৮] « আসিয়াছি ; আসিয়াছ, আসিয়াছিস্ » ইত্যাদি।

[৯] « আসিয়াছিলাম » ইত্যাদি।

[১০] » আসিয়া+থাকিব » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« (২ক) আইস (আইস্ ধাতু) ; (২খ) আয় (আ ধাতু) ; (২গ ও ৩খ) আসুন (আইস্ ধাতু) ; (৩ক) আসুক (আইস্ ধাতু) »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« আইসিও, আসিও ; আসিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« আসিয়া ; আসিলে (আইলে—অপ্রচলিত) ; আসিতে ; আসা ; (আইসন—আইসন-যাওন=আসা-যাওয়া) ; আসিবা- »।

এই ধাতুর চলিত-ভাষার রূপ পরে দ্রষ্টব্য।

[৪] « বট্ » ধাতু—

এই ধাতু (সংস্কৃত « বৃৎ—বর্ত » হইতে জাত) বিশেষ-রূপেই অসম্পূর্ণ, কেবল নিত্য বর্তমানে মিলে ;

যথা—[ক] [১] « বটি ; বট, বটিস্, বটেন ; বটে »।

অন্যান্য কাল-বাচক এবং অপর রূপে ইহার পূরক হইতেছে « হ » ধাতু। নিত্য বর্তমানেও অধুনা ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। উদাহরণ—« যদিও আমি রাজার পুত্র বটি ; 'তোমায় চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি—তুমি কে বট হে' ; তিনি ভাল মানুষ বটেন, কিন্তু দুর্বলচেতাঃ »।

পশ্চিম-বঙ্গে (রাঢ়) « বটে (বা বটেক) » শব্দ, « হয় » বা « আছে » অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« তোমার হাতে কি ?—জল বটে »। সাধু- ও চলিত-ভাষায় « বটে » অবধারণ-বাচক অব্যয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; যেমন—« 'তুমি রামের ভাই ?—বটে ?' » ; « 'সে কাল আসিবে।'—'বটে ?' »।

[৫] « কর্ » ধাতু—সাধারণ অতীতে কতকগুলি বিশেষ রূপ মিলে, সেগুলি কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয় ; যথা—« কৈলাম (কৈলুঁ), কৈনু , কৈলে, কৈলি ; কৈল, কৈলা »।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে « হইল, মারিল, পড়িল » স্থলে, বিকল্পে « ভেল বা ভৈল, মাইল বা মাইলে, পইল বা পৈল অথবা প'ল » রূপ পাওয়া যায়।

কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ—

কতকগুলি লৌকিক বা বিশেষ রীতি-সিদ্ধ কর্মবাচ্যের রূপ ভিন্ন, সাধারণ কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপে কোনও গোলমাল নাই ; « আ »-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার (অথবা « -ত, -ইত »-প্রত্যয়ান্ত ঐ বিশেষণ-ক্রিয়ার সংস্কৃত প্রতিরূপের) সহিত « হ » ধাতুর রূপ করিলে, কর্মবাচ্যের বিভিন্ন কাল-রূপ পাওয়া যাইবে ; যথা—« (বই) পড়া (পঠিত) হয় ; পড়া (পঠিত) হইল, হইত, হইবে ; পড়া (পঠিত) হইতেছে, হইতেছিল, হইতে থাকিবে ; পড়া (পঠিত) হইয়াছে, হইয়াছিল, হইবে, থাকিবে ; পড়া হউক, পড়া হইবে ; পড়া হইতে, পড়া হইয়া, পড়া হইলে, পড়া হইবা » ইত্যাদি।

[৩.০৯।১২।গ] চলিত-ভাষায় ক্রিয়ার রূপ

চলিত-ভাষার ক্রিয়ার রূপগুলিকে, সাধারণ-ভাবে, সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণ রূপের সংক্ষেপ বা বিকার বলা যাইতে পারে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয়-উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-হেতু—পূর্বে নির্দিষ্ট স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি এবং মধ্যস্থিত হ-কারের লোপ-সাধন—এই সমস্ত রীতি-অনুসারে, অনেকাংশে সাধু-ভাষায় সুরক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্ণতর রূপের পরিবর্তন ঘটিয়া, চলিত-ভাষায় ক্রিয়া পদের উদ্ভব হয়। নিম্নে চলিত-ভাষার ক্রিয়ার বিভক্তির রূপ দেওয়া যাইতেছে ; যেখানে-যেখানে ই-কার লুপ্ত হয়, সেখানে-সেখানে প্রায়শঃ পূর্বের স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে বুঝিতে হইবে।

[ক] মৌলিক কাল—

পুরুষ	নিত্য বর্তমান	নিত্য অতীত	পুরা নিত্যবৃত্ত	ভবিষ্যৎ
১	-ই	[2]-লাম, -লুম, -লেম	-ব (-বো)	-তাম, -তুম, -তেম
২ ক	-অ, -ও	-লে	-বে	-তে
২ খ	-ইস্	-লি	-বি	-তিস্
২ গ ও ৩ খ	-এন্, -ন্	-লেন	-বেন	-তেন
৩ ক	-এ, -য়[1]	-ল, -লো, -লে[3]	-বে	-ত, -তো

১—স্বরান্ত ধাতুর উত্তর এই বিভক্তি হয়। ২—উত্তম পুরুষে « -লাম » সাধারণ রূপ, « -লুম » কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার রূপ, সাহিত্যের চলিত-ভাষায় বহুল প্রচলিত, এবং « -লেম » কবিতায় ও নাটকে সমধিক প্রচলিত। ৩—সকর্মক ধাতু হইলে, প্রথম পুরুষে « -লে » বিভক্তি হয়, অকর্মকে কদাচ হয় না ; এই « -লে » বিভক্তি সাধু-ভাষায় প্রযুক্ত হয় না ; « -ল (-লো) » বিভক্তি সকর্মক ধাতুতেও হইতে পারে, তবে চলিত-ভাষায় « -লে »-ই সকর্মকে সমধিক প্রচলিত।

[খ] যৌগিক কাল—

(অ) ঘটমান

পুরুষ	ঘটমান বর্তমান	ঘটমান অতীত	ঘটমান ভবিষ্যৎ	
১	-ছি, -চ্ছি	-ছিলাম, -ছিলুম, -ছিলেম -চ্ছিলাম, -চ্ছিলুম, -চ্ছিলেম	-তে +	থাকবো
২ ক	-ছ, -ছো, -চ্ছ	-ছিলে, -চ্ছিলে		থাকবে
২ খ	-ছিস্, -চ্ছিস্	-ছিলি, -চ্ছিলি		থাকবি
২ গ ও ৩ খ	-ছেন, -চ্ছেন	-ছিলেন, -চ্ছিলেন		থাকবেন
৩ ক	-ছে, -চ্ছে	-ছিল, -চ্ছিল		থাকবে

(আ) পুরাঘটিত

পুরুষ	পুরাঘটিত বর্তমান	পুরাঘটিত অতীত	ভবিষ্যৎ=সম্ভাব্য
১	-এছি (-য়েছি)	-এছিলাম, -এছিলুম, -এছিলেম	থাক্‌বো
২ ক	-এছ, -এছো	-এছিলে	থাক্‌বে
২ খ	-এছিস্	-এছিলি	-এ+ থাক্‌বি
২ গ ও ৩ খ	-এছেন	-এছিলেন, -ইছিলেন	থাক্‌বেন
৩ ক	-এছে, -য়েছে	-এছিল	থাক্‌বে

দ্রষ্টব্য—ঘটমান বর্তমান ও অতীতে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর « -ছ » স্থানে « -চ্ছ » হয় ; যেমন—« চ'ল্‌ছে, দিচ্ছে, হ'চ্ছিল, খাচ্ছিলেন, কাহছে > কইছে > ক'চ্ছে, হইছে > হ'চ্ছে ; চ'ল্‌ছিল, দিচ্ছিল »। কলিকাতা-অঞ্চলের প্রচলিত উচ্চারণ ধরিয়া, ঘটমান ও পুরাঘটিত বর্তমানে কেহ-কেহ « ছ » স্থানে « চ » এবং « চ্ছ » স্থানে « চ্চ » লেখেন ; যথা—« দিয়েছে » স্থলে « দিয়েচে », « হ'চ্ছে » স্থলে « হ'চ্চে », « ক'র্‌ছে » বা « ক'চ্ছে » স্থলে « ক'র্‌চে » বা « ক'চ্চে » ইত্যাদি। কিন্তু চলিত-ভাষার শুদ্ধ-রূপ « ছ, চ্ছ » লেখাই উচিত।

বিভক্তির « ছ, ত, ল »-এর পূর্বে, ধাতুতে « র » থাকিলে, চলিত-ভাষার দ্রুত উচ্চারণে « র্+ছ, র্+ত, র্+ল »-এর অন্তঃসন্ধি হয়, « র » লুপ্ত হয়, এবং পরবর্তী « ছ, ত, ল »-কে দ্বিরুক্ত করিয়া দেয় ; অনেকে এই অন্তঃসন্ধি ধরিয়া বানান লেখেন ; যথা—« ক'র্‌ছে » স্থলে « ক'চ্ছে », « ক'র্‌ত » স্থলে « ক'ত্ত », « ধ'র্‌লে » স্থলে « ধ'ল্‌লে, ধ'ল্লে », « মার্‌লে » স্থলে « মাল্লে »। « ক'র্‌ছে, ক'র্‌ত, ক'র্‌লে » প্রভৃতি পূর্ণতর রূপই লেখা উচিত, কারণ তদ্দ্বারা ধাতুর মূল-রূপের ব্যঞ্জন-ধ্বনি « র » (« কর্, ধর্, মর্ » প্রভৃতি) অবলুপ্ত বা লুকায়িত হয় না—বিশেষতঃ, ভদ্র উচ্চারণে যখন « র » সকলেই বর্জন করেন না।

☞ চলিত-ভাষার ঘটমান বর্তমানের রূপ—« -ছে, -চ্ছে, -ছি, -চ্ছি » প্রভৃতিকে সাধু-ভাষার « -ইতেছে, -ইতেছি » প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; « -ছে, -চ্ছে » প্রভৃতি, বাঙ্গালার প্রাচীন বর্তমান রূপ, কবিতায় ব্যবহৃত « -ইছে » হইতে উদ্ভূত : « করিতেছে, যাইতেছে, চলিতেছে, নাচিতেছে, দেখিতেছে » প্রভৃতির বিকারে « ক'র্ছে, যাচ্ছে, চ'ল্ছে, নাচ্ছে, দেখ্ছে » প্রভৃতি উদ্ভূত হয় নাই—কবিতায় প্রাপ্ত « করিছে, যাইছে, চলিছে, নাচিছে, দেখিছে » প্রভৃতির « -ই » -লোপে এগুলির উৎপত্তি। সাধু-ভাষায় « করিতেছে, যাইতেছে, চলিতেছে, নাচিতেছে, দেখিতেছে »-র অনুকরণে কেহ-কেহ « ক'র্তেছে, যেতেছে, চ'ল্তেছে, নাচ্তেছে, দেখ্তেছে » প্রভৃতি রূপ ব্যবহার করেন ; কিন্তু এই রূপগুলি ঠিক-মত চলিত-ভাষার রূপ নহে—ভাগীরথী-তীরের ভদ্র মৌখিক ভাষায় এগুলি ব্যবহৃত হয় না ; সাহিত্যে এগুলির প্রয়োগ না করাই ভাল।

[গ] অনুজ্ঞা—

পুরুষ	সাধারণ	ভবিষ্যৎ
২ ক	-অ, -ও	-ও (পূর্বস্বরের পরিবর্তন-সহ)
২ খ	কেবল ধাতু	-ইস্
২ ক ও ৩ খ	-উন্, -ন্	[ভবিষ্যতের রূপ]
৩ ক	-উক্, -ক্	[ভবিষ্যতের রূপ]

অসমাপিকা ক্রিয়া—কর্তৃনিষ্ঠ « -এ » (স্বরের পরিবর্তন-সহ)
অন্যনিষ্ঠ « -লে » (,,)

উদ্দেশ্য বা নিমিত্তার্থক অসমাপিকা—« -তে » (,,)

ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ—কর্তৃবাচ্যে, « -অন্ত ; -তে » (,,)
কর্মবাচ্যে « -আ, -আনো »।

ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য—« -অন (-ওন), -আ, -বা » (« -ইবা » -প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ « -বা » -প্রত্যয়ে, ধাতুর স্বরের পরিবর্তন হয় না)।

চলিত-ভাষার ক্রিয়ার রূপের নিদর্শন

[১] « আছ্ » ধাতু—

নিত্য-বর্তমান ও নিত্য-অতীতে সাধু-ভাষার রূপ হইতে অভিন্ন (« আছে, ছিল » ইত্যাদি)—কেবল নিত্য-অতীত উত্তম-পুরুষে « ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম » তিনটী রূপই পাওয়া যায়, এবং প্রথম-পুরুষে « আছিল » রূপ নাই।

« থাক্ » ধাতুর রূপগুলি এইরূপ হয় : (৩) « থাক্তাম, থাক্তুম, থাক্তেম ; থাক্তে, থাক্তিস্ » ইত্যাদি ; (৪) « থাক্বো, থাক্বে, থাক্বি » ইত্যাদি। সাধারণ অনুজ্ঞায় সাধু-ভাষা হইতে অভিন্ন, কেবল « থাকহ » পদ মিলে না। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় « (২ক) থেকো, (২খ) থাকিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« থেকে, থাক্লে ; থাক্তে ; থাকা, থাক্বা- »।

« চল্ » ধাতু—

[ক] [১] সাধু-ভাষার মত, কেবল « চলহ » রূপ অজ্ঞাত।

[২] « চ'ল্লাম্, চ'লনুম্, চ'ল্লেম ; চ'ল্লে, চ'ল্লি, চ'ল্লেন ; চ'ল্ল »।

[৩] « চ'ল্তাম, চ'লতুম, চ'লতেম ; চ'ল্তে, চ'ল্তিস্, চ'ল্তেন ; চ'ল্ত »।

[৪] « চ'ল্বো ; চ'ল্বে, চ'ল্বি, চ'ল্বেন ; চ'ল্বে »।

[খ] [৫] « চ'ল্ছি ; চ'ল্ছ, চ'ল্ছিস্, চ'ল্ছেন ; চ'ল্ছে »।

[৬] « চ'ল্ছিলাম, চ'ল্ছিলুম, চ'ল্ছিলেম ; চ'ল্ছিলে, চ'ল্ছিলি, চ'ল্ছিলেন ; চ'ল্ছিল »।

[৭] « চ'ল্তে থাক্বো » ইত্যাদি।

[৮] « চ'লেছি ; চ'লেছ, চ'লেছিস্ » ইত্যাদি।

[৯] « চ'লেছিলাম, চ'লেছিলুম, চ'লেছিলেম ; চ'লেছিলে » ইত্যাদি।

[১০] « চ'লে থাক্বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« চল (চলো), চল্ (বা চ'), চলুন্, চলুক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« চ'লো [=চোলো], চলিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« চ'লে, চ'ল্লে ; চ'ল্তে ; চলন্ত ; চলা, চলন, চল্বা- »।

[৩] « বহ্ » বা « ব » ধাতু—

[ক] [১] « বই ; বও, ব'স্, ব'ন্ ; বন্, বয় »।

[২] « বইলাম, বইলুম, বইলেম ; বইলে, বইলি, বইলেন ; বইল »।

[৩] « বইতাম্ (-তুম, -তেম) ; বইতে, বইতিস্, বইতেন ; বইত »।

[৪] « বইবো ; বইবে, বইবি (বা ব'বি), বইবেন (ববেন) ; বইবে (ববে) »।

[খ] [৫] « বইছি ব'চ্ছি ; বইছ ব'চ্ছ, বইছিস্ ব'চ্ছিস্, বইছেন ব'চ্ছেন, বইছে ব'চ্ছে »।

[৬] « বইছিলাম ব'চ্ছিলাম (-লুম, -লেম) ; বইছিলে ব'চ্ছিলে, বইছিলি ব'চ্ছিলি, বইছিলেন ব'চ্ছিলেন, বইছিল ব'চ্ছিল »।

[৭] « বইতে থাকবো » ইত্যাদি।

[৮] « ব'য়েছি ; ব'য়েছ, ব'য়েছিস্, ব'য়েছেন ; ব'য়েছে »।

[৯] « ব'য়েছিলাম (-লুম, -লেম), ব'য়েছিলে, ব'য়েছিলি, ব'য়েছিলেন ; ব'য়েছিল »।

[১০] « ব'য়ে থাকবো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« বও, ব, ব'ন্ ; ব'ক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« ব'য়ো, ব'স্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« ব'য়ে, বইলে ; বইতে ; বওয়া (বওন্), ববা- »।

[৪] « খা » ধাতু—

[ক] [১] সাধু-ভাষার মত—কেবল « খাইস্, খায়েন » রূপদ্বয় অপ্রযুক্ত।

[২] « খেলাম (-লুম, -লেম) ; খেলে, খেলি, খেলেন ; খেলে (খেল') »।

[৩] « খেতাম (-তুম, -তেম) ; খেতে, খেতিস্, খেতেন ; খেত' »।

[৪] « খাবো ; খাবে, খাবি, খাবেন ; খাবে »।

[খ] [৫] « খাচ্ছি ; খাচ্ছ, খাচ্ছিস্, খাচ্ছেন ; খাচ্ছে »।

[৬] « খাচ্ছিলাম (-লুম, -লেম) ; খাচ্ছিলে, খাচ্ছিলি, খাচ্ছিলেন, খাচ্ছিলে »।

[৭] « খেতে থাকবো » ইত্যাদি।

(৮) « খেয়েছি (খেইছি); খেয়েছ, খেয়েছিস্ (খেইছিস্), খেয়েছেন; খেয়েছে »।

(৯) « খেয়েছিলাম (খেইছিলাম; -লুম, -লেম); খেয়েছিলে, খেয়েছিলি, খেয়েছিলেন, খেয়েছিল (খেইছিলে ইত্যাদি) »।

(১০) « খেয়ে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(গ) সাধারণ অনুজ্ঞা—« খাও, খা, খান্, খাক্ »;

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« খেয়ো, খাস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« খেয়ে', খেলে; খেতে; খাওন্ত; খাওয়া (খাওন), খাবা- »।

[৫] « শিখ্ » ধাতু—

[ক] (১) « শিখি; শেখো, শিখিস্, শেখেন; শেখে »।

(২) « শিখ্‌লাম (-লুম, -লেম); শিখ্‌লে, শিখ্‌লি, শিখ্‌লেন; শিখ্‌লে (শিখ্‌ল) »।

(৩) « শিখ্‌তাম (-তুম, -তেম); শিখ্‌তে, শিখ্‌তিস্, শিখ্‌তেন; শিখ্‌ত »।

(৪) « শিখ্‌বো; শিখ্‌বে » ইত্যাদি।

(খ) (৫) « শিখ্‌ছি, শিখ্‌ছে » ইত্যাদি।

(৬) « শিখ্‌ছিলাম » ইত্যাদি।

(৭) « শিখ্‌তে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(৮) « শিখেছি, শিখেছ (শিখেছো) » ইত্যাদি।

(৯) « শিখেছিলাম, শিখেছিল » ইত্যাদি।

(১০) « শিখে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« শেখো, শেখ্, শিখুন, শিখুক্ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« শিখো, শিখিস্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« শিখে, শিখ্‌লে; শিখ্‌তে; শেখা, শেখবা- »

[৬] « শুন্ » ধাতু—

[ক] (১) « শুনি; শোনো, শুনিস্, শোনেন্; শোনে »।

(২) « শুন্‌লাম (-লুম, -লেম), শুন্‌লে » ইত্যাদি; প্রথম পুরুষে « শুন্‌লে »।

(৩) « শুন্‌তাম, শুন্‌ত » ইত্যাদি।

(৪) « শুন্‌বো, শুন্‌বে » ইত্যাদি।

[খ] (৫) « শুন্‌ছি, শুন্‌ছে » ইত্যাদি।

(৬) « শুন্‌ছিলুম, শুন্‌ছিলে » ইত্যাদি।

(৭) « শুন্‌তে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(৮) « শুনেছি, শুনেছে » ইত্যাদি।

(৯) « শুনেছিলাম, শুনেছিল » ইত্যাদি।

(১০) « শুনে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« শোনো, শোন্‌, শুনুন, শুনুক্‌ »।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« শুনো, শুনিস্‌ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« শুনে, শুন্‌লে ; শুন্‌তে ; শোনা, শোন্‌বা- »।

[৭] « করা » ধাতু—

[ক] (১) « করাই ; করাও, করাস্‌, করান্‌ ; করায় »।

(২) « করালাম, করালুম, করালেম ; করালে, করালি, করালেন ; করালে »।

(৩) « করাতাম, করাতুম, করাতে, করাত' » ইত্যাদি।

(৪) « করাবো, করাবেন, করাবে » ইত্যাদি।

[খ] (৫) « করাচ্ছি ; করাচ্ছ, করাচ্ছিস্‌, করাচ্ছেন ; করাচ্ছে »।

(৬) « করাচ্ছিলাম, করাচ্ছিলুম, করাচ্ছিলে » ইত্যাদি।

(৭) « করাতে থাক্‌বো » ইত্যাদি।

(৮) « করিয়েছি, করিয়েছ, করিয়েছিস্‌ » ইত্যাদি।

(৯) « করিয়েছিলাম, করিয়েছিলে » ইত্যাদি।

(১০) « করিয়ে' থাক্‌বো » ইত্যাদি।

[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা—« করাও, করা, করান্‌, করাক্‌ » ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« করিয়ো, করাস্‌ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« করিয়ে', করালে ; করাতে ; করানো, করাবা- »।

বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ধাতু-রূপে শ্রেণী-বিভাগের অবকাশ নাই—দুই-এক জায়গায় চলিত-ভাষার প্রভাবের ফলে অল্প একটু-আধটু পরিবর্তন

দেখা যায়, এই মাত্র। কিন্তু স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদির কার্যের ফলে, চলিত বাঙ্গালার ধাতু-রূপে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, সেগুলিকে বিচার করিয়া, চলিত-ভাষার ধাতুগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। চলিত-ভাষার ধাতু-রূপ সাধু-ভাষার অপেক্ষা খুব বেশী জটিল ব্যাপার। নিম্নে চলিত-ভাষার ধাতু-রূপের **গণ** বা **শ্রেণী** প্রদর্শিত হইল। বিভিন্ন কাল ও পুরুষ বিশেষ করিয়া এখানে আর নির্দিষ্ট হইল না।

[১] **প্রথম গণ**—ধাতুর স্বর-বর্ণ « অ », ব্যঞ্জনান্ত; বিভক্তি-প্রত্যয়ের ই-কার লোপে বা ই-কার যোগে স্বর-পরিবর্তন—« অ » স্থলে « ও » (লুপ্ত ই-কারের প্রভাবে জাত « ও »-কে « অ' »- রূপে লেখা হয়)।

[১ক] শেষে « হ্ » ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন থাকিলে—

« চল্ » ধাতু—পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৪০০।

অনুরূপ ধাতু—« কর্, কষ্, খন্, গড়্, গম্, চর্, চষ্, জল্, জম্, ঝল্, ঝর্, টল্, ডর্, ঢল্, তর্, থক্, ধর্, ধ্বন্, নড়্, পড়্, পশ্, ফল্, বক্, বধ্, বন্, বল্, বস্, ভজ্, ভর্, মর্, মল্, লড়্, সঁপ্, সর্, হট্ » ইত্যাদি।

[১খ] ধাতুর স্বর « অ », অন্ত্য ব্যঞ্জন « হ্ » (এই « হ্ » লুপ্ত হয়)—« ই »-লোপে সর্বত্র « অ »-কার « ও »-কারে পরিবর্তিত হয় না।

« কহ্ বা ক' » ধাতু—« কই, কও ক'স [=কোস্], কন, কয়; কইলাম কইলুম, (২ক, ৩ক) কইলে; কইতুম, কইত; কইবো, (২ক, ৩ক) কইবে (কবে), (২খ) কইবি (ক'বি [=কোবি]), (২গ, ৩খ) কইবেন; কইছি ক'চ্ছি, কইছ ক'চ্ছ, কইছে ক'চ্ছে; কইছিলাম ক'চ্ছিলাম, কইছিল ক'চ্ছিল; ক'য়েছি; ক'য়েছিলুম; কও ক', ক'ন [=কোন্], ক'ক্ [=কোক্], ক'য়ো [=কোয়ো], ক'স্ [=কোস্]; ক'য়ে, কইলে; কইতে; কওয়া (=কথা < কহা—র-প্রভৃতিতে 'কওয়া'), কইবা- (কবা-) »।

অনুরূপ ধাতু—« বহ্ (ব'), রহ্ (র'), সহ্ (স'), দহ্ (দ'), মহ্ (ম'), হ' (প্রাচীন *অহ্, হো), নহ (ন', ন+অহ্ বা হ'—নঞর্থক ধাতু, পরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪১৭-৪১৯)।

অস্ত্যর্থক হ-ধাতুর বৈশিষ্ট্য আছে—

« হই, হও, হ'স্, হন, হয় ; হ'লাম হ'লুম হ'লেম, হ'লে, হ'লি, হ'লেন, হ'ল [=হোলো] ; হ'তাম, হ'তে, হ'তিস, হ'তেন, হ'ত ; হবো, হবে, হবি, হবেন, হবে ('হবি' ভিন্ন অন্যত্র উচ্চারণে [হো] নহে) ; হ'চ্ছি, হ'চ্ছ ইত্যাদি ; হ'চ্ছিলাম, হ'চ্ছিল ইত্যাদি ; হ'য়েছি, হ'য়েছে ইত্যাদি ; হ'য়েছিলাম, হ'য়েছিল ইত্যাদি ; হও, হ, হ'ন্ [হোন্], হ'ক্ [হোক্], হ'য়ো [হোয়ো], হ'স্ ; হ'য়ে, হ'লে ; হ'তে ; হওয়া, হওন, হবা- »।

« খ (ক্ষ) » ধাতু—'ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া'—পূর্বে ইহার অন্তে « হ » না থাকা সত্ত্বেও, ইহা এই গণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে ; « খই, খও ; খইলাম, খ'লাম, খইল ; খইত ; খইবো খ'বো, খইবে (খবে) ; খ'চ্ছে ; খ'চ্ছিল ; খ'য়েছে, খ'য়েছিল ; খও, খ'ক্ ; খ'য়ো, খ'স্ ; খ'য়ে (ক্ষ'য়ে), খইলে ; খইতে ; খওয়া (খওন), খবা- »।

[২] দ্বিতীয় গণ—ধাতুর স্বর-ধ্বনি « আ »। ভবিষ্যতের রূপে ই-কার লোপেও অভিশ্রুতি হয় না ; যেমন—« খাইবে > খাবে »।

[২ক] স্বরান্ত—

« আ » ধাতু—অসম্পূর্ণ, নিম্ন [২গ]-এর অধীন « আস্ » ধাতু ইহাকে পূরণ করে, তাহা দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪০৭)।

« যা [=জা] » ধাতু (« গ » ধাতুর দ্বারা পূরিত)—« যাই, যাও, যা'স্, যান, যায় ; গেলাম গেলুম গেলেম, গেলে, গেলি, গেল (উচ্চারণে [গ্যালো]) »—অতীতে 'যাইলাম' প্রভৃতি রূপের বিকারে, 'যেলাম, যেলি, যেল' প্রভৃতি রূপ চলিত-ভাষায় অজ্ঞাত ; যেতাম, যেতুম ; যাবো ; যাচ্ছি ; যাচ্ছিলাম ; যেতে থাকবো ; গিয়েছিলাম ('যেয়েছিলাম' প্রভৃতি অজ্ঞাত) ; গিয়ে থাকবো ; যাও, যা, যান্, যাক্ ; যেয়ো, যাস্ ; গিয়ে (কচিৎ 'যেয়ে'), গেলে ('যেলে' চলিত-ভাষায় মিলে না) ; যেতে ; যাওয়া (যাওন), যাবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« দা (খা-এর অনুকার বা প্রতিধ্বনি ধাতু—খাওয়া-দাওয়া), পা ; ধা (='দৌড়ানো'—অতীতে 'ধাইল' হইবে)—চলিত-ভাষায় সমস্ত রূপ মিলে না—[১] (৩ক) « ধায় », আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকা « ধেয়ে », ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য « ধাওয়া »—এই কয়টী রূপ মাত্র প্রচলিত।

[২খ] অন্ত্য হ্-কারের লোপে আধুনিক বাঙ্গালায় আ-কারান্ত, প্রাচীন বাঙ্গালায় হ্-কারান্ত ;

যথা—« গা (গাহ্ ধাতু), চা (চাহ্), বা (বাহ্), না (নাহ্) »। এই ধাতুগুলিতে নিত্য অতীতে ও পুরানিতাবৃত্ত অতীতে, এবং « ইলে »-প্রত্যয়-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায়, « ইতে »-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণে, তথা « ইবা »-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যে, ই-কারের লোপ হয় না—লোপ যদিও-বা করা হয়, আকারের অভিশ্রুতি হয় না ; যথা—« (১) গাই, গাও, গা'স্, গা'ন্, গায় (< গাহি, গাহো, গাহিস্, গাহে ইত্যাদি) ; (২) গাইলাম গাইলুম গাইলেম, গাইলে গাইলি গাইলেন, গাইলে (গাহিলাম ইত্যাদি ; 'গেলুম, গেলে, গেলি' ইত্যাদি রূপ হয় না) ; (৩) গাইতাম, গাইত ('গেতাম, গেত' ইত্যাদি নহে) ; (৪) গাইবো, গাইবে ('গেবো, গেবে' নহে) ; (৫) গাইছি বা গাচ্ছি, গাইছে বা গাচ্ছে ; (৬) গাইছিলাম, গাচ্ছিলাম ইত্যাদি ; (৭) গাইতে+থাকবো ইত্যাদি ; (৮) গেয়েছি, গেয়েছে ; (৯) গেয়েছিলাম, গেয়েছিল ; (১০) গেয়ে+থাকবো ইত্যাদি ; অনুজ্ঞা—গাও, গা, গা'ন্, গা'ক্ ; গেয়ো, গা'স্ ; গেয়ে, গাইলে ('গেলে' নহে) ; গাইতে ('গেতে' নহে) ; গাওয়া, গাইবা- বা গাবা- »।

« গেতে, চেতে, নেতে, গেলে ('গাইতে, বাইতে, নাইতে, গাইলে' স্থলে) » চলত-ভাষার অশুদ্ধ রূপ। অন্য কয়টী ধাতুতে এই রীতিতেই কাল প্রভৃতি রূপ হয়।

« ছা » ধাতু (আচ্ছাদন করা) মূলে হ-কারান্ত না হইলেও, এই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়াছে।

[২গ] ধাতুর স্বর « আ », শেষে কোনও ব্যঞ্জন—

কাট্ ধাতু—

« কাটি, কাটো, কাটিস্, কাটেন, কাটে ; কাট্‌লাম কাট্‌লুম কাট্‌লেম, কাট্‌লে, কাট্‌লি, কাট্‌লেন, কাট্‌লে ; কাট্‌তাম কাটতুম কাট্‌তেম, কাট্‌ত কাটতিস্, কাট্‌তেন কাট্‌ত ; কাট্‌বো, কাট্‌বে কাট্‌বি কাট্‌বেন, কাট্‌বে ; কাট্‌ছি কাট্‌ছে, ইত্যাদি ; কাট্‌ছিলুম কাট্‌ছিলে কাট্‌ছিল ইত্যাদি ; কাট্‌তে থাকবো ইত্যাদি ; কেটেছি, কেটেছে ; কেটেছিলুম, কেটেছিল ; কেটে থাকবো ইত্যাদি ; কাট বা কাটো, কাট্, কাটুন্, কাটুক্ ; কেটো, কাটিস্ ; কেটে', কাট্‌লে, কাট্‌তে ; কাটা, কাট্‌বা- »।

অনুরূপ—« আঁক্, আছ্, আস্ (অসম্পূর্ণ), কাট্, গাথ্, ঘাম্, জ্বাল্, টান্, ডাক্, ঢাক্, ঢাল্, তাক্, তাত, থাক্, দাগ্, নাচ্, নাড়্, নাম্, পাক্, ফাট্, কাঁপ্, বাছ্, বাজ্, বাট্, পাড়্, বাধ্, বাঁধ্, বাস্, ভাঙ্, ভাঁজ্, ভাস্, মাখ্, মাপ্, মার্, রাগ্, রাঁধ্, লাগ্, সাঁট্, সাধ্, সার্, হাঁট্, হাস্ » ইত্যাদি।

অসম্পূর্ণ ধাতু—« √আস্+ √আ »—

« আসি, আসো, আসিস্, আসেন, আসে » ; অতীতে আ-ধাতু-জাত « আইল » হইতে « এল' », উহার আধারে « এলাম, এলুম, এলেম ; এলে, এলি, এলেন ; এল' » (অতীতে « আসিলাম, আসিলে, আসিল » প্রভৃতির বিকারে « আস্লাম, আস্লে, আস্ল » প্রভৃতি রূপ, শুদ্ধ চলিত-ভাষায় অনুমোদিত নহে ; « আসিলাম » ও « এলুম » এই উভয়ের মিশ্রণে আবার « আস্লুম » পদ শোনা যায়—ইহাও পরিত্যাজ্য) : « আস্তাম, আস্তুম, আস্তেম ; আস্তে, আস্তিস্, আসতেন ; আস্ত » ; « আস্বো ; আসবে » ইত্যাদি ; « আস্ছি, আস্ছ, আস্ছে (='আসিতেছি' ইত্যাদি) ; আস্ছিলাম আস্ছিলুম আস্ছিলেম, আস্ছিলে » ইত্যাদি ; আস্তে থাক্বো » ইত্যাদি ; « এসেছি, এসেছে » ইত্যাদি ; « এসেছিলাম, এসেছিল » ইত্যাদি ; « এসে থাক্বো » ইত্যাদি ; সাধারণ অনুজ্ঞায়—« এস, এসো (< আইসহ, আইস ২(ক) ; 'আসো' রূপ চলিত-ভাষায় অজ্ঞাত), আয়, (< আ ধাতু), আসুন, আসুক » ; ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« এসো (< আইসিও, < আইসিহ), আসিস্ » ; « এসে, এলে (< আইলে) ; আস্তে ; আসা, আস্বা »।

[৩] তৃতীয় গণ—ধাতুর স্বরধ্বনি, « ই, ঈ »—

[৩ক] স্বরান্ত—দুইটী অসম্পূর্ণ ধাতু, « জী, পি »—কাব্যে ব্যবহৃত, সাধু-ভাষায় ও কথ্য চলিত-ভাষায় অপ্রচলিত। এই ধাতু দুইটীতে স্বর-সঙ্গতি হয় না—ধাতুর স্বর-ধ্বনি ই-কারের এ-কারে পরিবর্তন হয় না।

« জী » ধাতু—'প্রাণধারণ করা'—« জীই, জীয়ে ; জীলাম, জীল' ; জীবো (কেহ কেহ বাঁচিলে, মধ্যম পুরুষের সাধারণ রূপ 'জীবো' বলে), জীবে ; জীয়ে, জীলে ; জীতে ; জীওন, জীবা- »।

« পি » ধাতু—'পান করা'—« পিই, পিয়ে ; পিলে, পিল' ; পিবো ; পিয়ে, পিলে ; পিতে ; পিবা- »।

[৩খ] ব্যঞ্জনান্ত ই-ধ্বনি যুক্ত—

এই শ্রেণীর ধাতুর রূপ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে : « শিখ্ » ধাতু (পৃষ্ঠা ৪০২)। অনুরূপ ধাতু—« কিন্, গিল্, চিন্, চির্, ছিঁড়্, জিত্, টিঁক্, টিপ্, নিব্, পিঁষ্, পিট্, পিষ্, ফির, বিঁধ্, ভিজ্, ভিড়্, মিল্, মিশ্, লিখ্ »।

[৪] চতুর্থ গণ—ধাতুর স্বর-ধ্বনি « এ »—

স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতি-দ্বারা « এ »-কারের « ই » ও « অ্যা »-তে পরিবর্তন হয়।

[৪ক] স্বরান্ত—দুইটী ধাতু, « দে » ও « নে »।

« দে » ধাতু—« দেই দিই, (দেও > দ্যাও >) দাও, দিস্, দিন, দেয় [=দায়] ; দিলাম দিলুম দিলেম, দিলে দিলি দিলেন, দিলে ; দিতাম দিতুম দিতেম, দিতে দিতিস্, দিতেন, দিত ; দেবো, দেবে দিবি দেবেন, দেবে ; দিচ্ছি, দিচ্ছ, দিচ্ছে ; দিচ্ছিলাম দিচ্ছিলুম দিচ্ছিলেম, দিচ্ছিল ; দিতে থাকবো ; দিয়েছি, দিয়েছে ; দিয়েছিলুম, দিয়েছিল ; দিয়ে থাকবো ; দাও, দে, দিন্, দিক্ ; দিয়ো, দিস্ ; দিয়ে, দিলে ; দিতে, দেওয়া, দেবা- »।

[৪খ] ব্যঞ্জনান্ত—

« খেল্ » ধাতু—« খেলি, খেল [=খ্যালো] খেলিস্ খেলেন, খেলে [=খ্যালে] ; খেললাম, খেললে খেললি, খেললে ; খেলতুম, খেলতিস্, খেলত ; খেলবো, খেলবে ; খেলছি, খেলছ খেলছে ; খেলছিলাম, খেলছিল ; খেলতে থাকবো ; খেলেছি, খেলেছে ; খেলেছিলুম খেলেছিল ; খেলে থাকবো ; খেল [=খ্যালো], খেল্ [=খ্যাল্], খেলুন, খেলুক্ ; খেলো, খেলিস্ ; খেলে, খেললে ; খেলতে ; খেলা, খেলবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« এড়্, খেপ্ (ক্ষেপ্), গেঁথ্, ঠেল্, লেপ্, ফেল্, বেচ্, বেড়্, মেল্, সেঁক, হেল্ »।

[৫] পঞ্চম গণ—ধাতুর স্বর-ধ্বনি « উ »—

[৫ক] স্বরান্ত—

একটি মাত্র ধাতু—« উ » (= উদিত হওয়া,'—কবিতার ভাষায় মিলে), অসম্পূর্ণ ধাতু, চলিত-ভাষায় অব্যবহৃত : « উয়ে উইল » ইত্যাদি।

« চু » ধাতু ও « দু » ধাতু এই শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু এই দুইটীর রূপ [৬ক]-এর মত হয়—কার্যতঃ এ-দুইটাও ও-কার-যুক্ত ধাতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

[৫খ] ব্যঞ্জনান্ত—স্বরসঙ্গতি-হেতু উ-কারের ও-কারে পরিবর্তন হয়।

« শুন্ » ধাতুর রূপ দ্রষ্টব্য (পূর্বে, পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৩)।

অনুরূপ ধাতু—« উঠ্, উড়্, উব্, কুট্, খুঁজ্, খুল্, গুণ্, ঘুর্, চুক্, চুষ্, ছুট্, ছুঁড়্, ঝুঁক্, ডুব্, ঢুক্, তুল্, দুল্, ধুন্, পুছ্, পুড়্, পুর্, ফুল্, বুঝ্, বুন্, মুড়্, মুষ্, লুট্, শুধ্, শুঁক্ »।

[৬] ষষ্ঠ গণ—ধাতুর স্বর ও-কার; এই ও-কারের উ-কারে পরিবর্তন হয়।

[৬ক] স্বরান্ত ধাতু—

« ছোঁ, খো (চলিত-ভাষায় তাদৃশ প্রচলিত নহে), ধো, রো, শো; নো (= নম্); চো (অধিক প্রযুক্ত হয় না) »।

« ছুঁই, ছোঁও, ছুঁন্, ছোঁন্, ছোঁয়; ছুঁলাম ছুঁলুম, ছুঁলে; ছুঁতাম, ছুঁত'; ছোঁবো, ছুঁবি, ছোঁবে; ছুঁচ্ছি; ছুঁচ্ছিলাম; ছুঁয়েছে; ছুঁয়েছিল; ছোঁও, ছোঁ, ছুঁন, ছুঁক্, ছুঁয়ো, ছুঁন্; ছুঁয়ে, ছুঁলে; ছুঁতে; ছোঁয়া, ছোঁবা- »।

« রো, শো, নো, চো » এই কয়টী ধাতুতে, নিত্য অতীতে, সামান্য ভবিষ্যতে, « -ইলে » -প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণে, « -ইবা » -প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যে, প্রত্যয়ের ই-কার সাধারণতঃ লুপ্ত হয় না; যথা—« রুইলে, চুইত, নুইলে, শুইবে, রুইছে (ক্বচিৎ 'রুচ্ছে'), চুইছে (ক্বচিৎ 'চুচ্ছে') »।

[৬খ] ব্যঞ্জনান্ত—

এই শ্রেণীর ধাতু এখন [৫খ]-এর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু ও নাম-ধাতু, যেগুলিতে ও-কার পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় কার্যতঃ উ-কার-যুক্ত ধাতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যথা—« রোষ > রুষ্, বোধ > বুধ্, রোধ > রুধ্, জোখ > জুঁখ্, রোপ > রুপ্, দোষ > দুষ্, দ্যোত > দ্যুত্, ভোগ > ভুগ্, ভোল > ভুল্, তোষ > তুষ্, পোঁছ > পুঁছ্, পোষ > পুষ্ » ইত্যাদি।

[৭] **সপ্তম গণ**—« -আ »-প্রত্যয়ান্ত ণিজন্ত ধাতু ও নাম-ধাতু।

[৭ক] মূল ধাতুর স্বর « অ »: স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতি দ্বারা এই « অ », ও-কারে পরিবর্তিত হয়।

[৭ক।১] মূল ধাতুতে স্বর-বর্ণ অ+একটী ব্যঞ্জন—

পূর্ব « করা » ধাতুর রূপ দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৪০৩)।

অনুরূপ ধাতু—« চলা, খসা, কষা, ধরা, মরা, গড়া, ঘষা, ঝরা, ঝলা, বওয়া » ইত্যাদি।

[৭ক।২] মূল ধাতুতে স্বর-বর্ণ অ+দুইটী ব্যঞ্জন—

এই প্রকার ধাতুর রূপ [৭ক।১]-এর অন্তর্গত ধাতুরই মত হয়, কেবল আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকায় « -ইয়া » -প্রত্যয়ের « ই », যাহা [৭ক।১] শ্রেণীর ধাতুতে লুপ্ত হয় না তাহা, বিকল্পে এই শ্রেণীতে লুপ্ত হয়, এবং তদনুসারে পুরাঘটিত কালগুলিতেও ই-কার হয় না; যথা—[৭ক।১] শ্রেণীর « নড়া » ধাতু—« নড়িয়ে, নড়িয়েছে, নড়িয়েছিল, নড়িয়ে' থাক্‌বে »; « ফলা » ধাতু—« ফলিয়ে', ফলিয়েছে, ফলিয়েছিল, ফলিয়ে' থাক্‌বে »; কিন্তু এই [৭ক।২] শ্রেণীর « ধমকা » ধাতু—« ধমকিয়ে' বা ধ'ম্‌কে; ধমকিয়েছে বা ধ'ম্‌কেছে, ধম্‌কিয়েছিল বা ধ'ম্‌কেছিল; ধ'ম্‌কে থাক্‌বে », ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—« ধ'ম্‌কিয়ো বা ধ'ম্‌কো » ইত্যাদি।

অনুরূপ ধাতু—« অরশা, কচ্‌টা, কড়কা, কব্‌লা, গড়জা (গর্জা), গওা, ঘস্‌টা, চমকা, চল্‌কা, ছটকা, ঝল্‌কা, টপ্‌কা, তড়জা, থমকা, দংশা, দর্শা, নরমা, পস্তা (পস্‌তা), বদ্‌লা, ভড়কা, মচ্‌কা, রগ্‌ড়া, সমঝা, হড়কা' »

[৭খ] মূল ধাতুর স্বর « আ »। ধাতুতে « -ওয়া [—wā] » থাকিলে, প্রত্যয়ের ই-কারের পূর্বে « -ওয় [w] » ধ্বনির লোপ হয়। সর্বত্র ইহাই সাধারণ নিয়ম।

[৭খ।১] মূল ধাতুর আ-কারের পরে একটীমাত্র ব্যঞ্জন—

« ঝাঁকা » ধাতু—« ঝাঁকায়; ঝাঁকালে; ঝাঁকাবে; ঝাঁকাত'; ঝাঁকাচ্ছে; ঝাঁকাচ্ছিল; ঝাঁকাতে থাক্‌বে; ঝাঁকিয়েছে; ঝাঁকিয়েছিল; ঝাঁকিয়ে' থাক্‌বে; ঝাঁকাও, ঝাঁকা, ঝাঁকান্‌, ঝাঁকাক্‌; ঝাঁকিও, ঝাঁকান্‌; ঝাঁকিয়ে', ঝাঁকালে; ঝাঁকাতে, ঝাঁকানো, ঝাঁকাবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« আঁচা, আনা, কাচা, কাটা, কাড়া, কাঁদা, কাপা, কামা, খাটা, খাটা, ঘামা, চাপা, ছাড়া, ছাপা, জাগা, জানা, ঝাড়া, টাঙা, ডাকা, তাকা, তাতা, থামা, দাবা, নাচা, নামা, পাওয়া, পাঠা, পারা, ফাটা, বাজা, বাঁধা, ভাঙা, মাতা, মাখা, মাগা, রাগা, লাগা, লাফা, শানা, সাজা, হাঁফা »।

[৭খ।২] মূল ধাতুর স্বর আ-কারের পরে একাধিক ব্যঞ্জন—

« আট্‌কা » ধাতু—([৭ক।২]-এর মত) : « আট্‌কায় ; আট্‌কালে ; আট্‌কাত' ; আট্‌কাবে ; আট্‌কাচ্ছে ; আট্‌কাচ্ছিল ; আট্‌কাতে থাকবে ; আট্‌কিয়েছিল (আট্‌কেছিল) ; আট্‌কিয়ে' (আট্‌কে') থাকবে ; আট্‌কাও, আট্‌কা, আট্‌কান, আট্‌কাক্‌ ; আট্‌কিয়া (আট্‌কা) আট্‌কান্‌ ; আট্‌কিয়ে' (আট্‌কে'), আট্‌কাল ; আট্‌কাতে, আট্‌কানো ; আট্‌কাবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« আওটা, আওড়া, আঁচড়া, আগ্‌লা, আছড়া, কামড়া খাব্‌লা, খামচা, চান্‌কা, চাপ্‌ড়া, চাব্‌কা, সামরা, ঠাওরা, পাবড়া ধামসা, পাকড়া, পাল্‌টা, সামলা, সাঁতরা, সাঁত্‌লা, হাঁট্‌কা, হাত্‌ড়া »।

[৭গ] মূল ধাতুর স্বর « ই, ঈ »।

সাধারণতঃ স্বর-সঙ্গতির ফলে, পরে অবস্থিত « আ » -প্রত্যয়ের প্রভাবে, « ই ঈ » এ-কার হইয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ণিজন্ত ক্রিয়াগুলির আর এক প্রকার রূপ আছে—তাহাতে স্বর-সঙ্গতির ফলে ই-কারের এ-কারে পরিবর্তন ঘটে না, « -আ » প্রত্যয় নিজেই « ও »-রূপ দৃষ্ট হয়, মূল ধাতুর ই-স্বর বজায় থাকে, এবং এই এ-কার আবার কোনও-কোনও ক্ষেত্রে স্বর-সঙ্গতি হেতু উ-কারে প্রাপ্ত হয়। কখনও-কখনও এই এ-কার অ-কার-রূপেই লিখিত হয় ; যথা—« শিখায় » স্থলে « শিখয় » « শিখাচ্ছে » স্থলে « শিখচ্ছে »।

[৭গ।১] মূল ধাতুর « ই, ঈ »-কারের পরে একটীমাত্র ব্যঞ্জন—

প্রথম রূপ—ণিজন্ত « আ »-প্রত্যয় অবিকৃত—« শেখাই, শেখাও, শেখাস্‌, শেখান্‌, শেখায় ; শেখালাম শেখালুম, শেখালে শেখালি শেখালেন, শেখালে ; শেখাতাম শেখাতুম শেখাতেম, শেখাতে, শেখাত' ; শেখাবো শেখাবে ; শেখাচ্ছি, শেখাচ্ছে ; শেখাচ্ছিলাম, শেখাচ্ছিল ; শেখাতে থাকবো, থাকবে ; শিখিয়েছি, শিখিয়েছে ; শিখিয়েছিলুম, শিখিয়েছিল ;

শিখিয়ে থাক্‌বো; শেখাও, শেখা, শেখান্‌ শেখাক্‌; শিখিয়ো শেখাস্‌; শিখিয়ে', শেখালে; শেখাতে; শেখানো, শেখাবা- »।

দ্বিতীয় রূপ—ণিজন্ত প্রত্যয় « আ »-স্থানে « ও (উ) »; « শিখোই (শিখুই), শিখাও শিখোস্‌ শিখোন্‌, শিখোয়; শিখোলুম (শিখুলুম), শিখোলে (শিখুলে), শিখোলি (শিখুলি), শিখোলেন, শিখোলে (শিখুলে); শিখোতুম (শিখুতুম), শিখোতে (শিখুতে) শিখোতিস্‌ (শিখুতিস্‌) শিখোতেন (শিখুতেন), শিখোত' (শিখুত'); শিখোতে (শিখুতে) থাক্‌বো; শিখিয়েছি; শিখিয়েছিলুম; শিখিয়ে' থাক্‌বো » ইত্যাদি। অনুজ্ঞা—[৭গ।১] শ্রেণীর মত (মধ্যম ও প্রথম পুরুষে গৌরবে « শিখোন্‌ » এবং প্রথম পুরুষে « শিখোক্‌ » অতিরিক্ত); শিখিয়ে', শিখোলে (শিখুলে); শিখোতে (শিখুতে); শিখোনো (শিখুনো), শিখোবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« কিলা, গিলা, চিতা, ছিটা, জিরা, ঝিমা, টিপা, খিঁচা, নিকা, নিড়া, নিতা, পিছা, পিটা, ফিরা, বিকা, বিঁধা, বিলা, বিনা, ভিজা, ভিড়া, মিটা, মিরা, মিলা, মিশা, সিধা »।

[৭গ।২] মূল ধাতুর « ই, ঈ »-র পরে দুইটী ব্যঞ্জন—

« নিংড়া (নিঙ্‌ড়া, নিঙ্গ্‌ড়া) » ধাতু—প্রথম রূপ—« আ »-প্রত্যয় : « নেংড়াই, নেংড়ায়; নেংড়ালুম, নেংড়ালে; নেংড়াত'; নেংড়াবো; নেংড়াচ্ছি; নেংড়াচ্ছিলুম; নেংড়াতে থাক্‌বো; নিংড়িয়েছি নিংড়েছি; নিংড়িয়েছিলুম নিংড়েছিলুম; নিংড়ে' থাক্‌বো; নেংড়াও, নেংড়া, নেংড়ান্‌, নেংড়াক্‌; নিংড়িয়ো নিংড়ো, নেংড়ান্‌; নিংড়িয়ে' নিংড়ে', নেংড়ালে নেংড়াতে; নেংড়ানো, নেংড়াবা- »।

দ্বিতীয় রূপ—ণিজন্ত « ও (উ) » প্রত্যয় : « নিংড়োই (নিংড়ুই), নিংড়োয়; (নিংড়োলুম (নিংড়ুলুম); নিংড়োতিস্‌ (নিংড়ুতিস্‌), নিংড়োত (নিংড়ুত'); নিংড়োবে (নিংড়ুবে); নিংড়োচ্ছি (নিংড়ুচ্ছি), নিংড়োচ্ছে (নিংড়ুচ্ছে); নিংড়োচ্ছিলুম (নিংড়ুচ্ছিলুম); নিংড়োতে (নিংড়ুতে) থাক্‌বো; নিংড়িয়েছি নিংড়েছি, নিংড়িয়েছিল নিংড়েছিল; নিংড়োতে (নিংড়ুতে), নিংড়োনো (নিংড়ুনো), নিংড়োবা- (নিংড়ুবা-) »।

অনুরূপ ক্রিয়া—« চিপ্‌টা, চিম্‌টা, ছিট্‌কা, ঠিক্‌রা, পিছ্‌লা, ভিঠা, খিচ্‌ড়া, শিউরা, সিঁটুকা »।

[৭ঘ] মূল ধাতুর স্বর « উ, ঊ »—

ই-কার যুক্ত ধাতুর অনুরূপ—স্বর-সঙ্গতি « ই, এ » স্থলে « উ, ও » হয়।

[৭ঘ।১] মূল ধাতুতে স্বরবর্ণের পরে একটী ব্যঞ্জন—

প্রথম রূপ—« আ » -প্রত্যয় :—« উঠা » ধাতু—« ওঠাই, ওঠায় ; ওঠালুম, ওঠালে ; ওঠাত' ; ওঠাবো ; ওঠাচ্ছ ; ওঠাচ্ছিল ; ওঠাতে থাক্‌বে ; উঠিয়েছি ; উঠিয়েছিলেন ; উঠিয়ে' থাক্‌বে ; ওঠাও, ওঠা, ওঠান্, ওঠাক্ ; উঠিয়ো, ওঠান্ ; উঠিয়ে', ওঠালে ; ওঠাতে ; ওঠানো, ওঠাবা- »।

সাধারণতঃ এই ধাতুকে « উঠায়, উঠান্, উঠাল' » ইত্যাদি উ-কারাদি রূপে লিখিত হয় —আদ্য « উ »-র স্বর-সঙ্গতি-জাত « ও »-কারে পরিবর্তন, সাধারণতঃ নির্দিষ্ট করা হয় না।

দ্বিতীয় রূপ—« ও (উ) » -প্রত্যয়-যুক্ত : « উঠোই (উঠুই), উঠোয় ; উঠোলে (উঠুলে) ; উঠোতিস্ (উঠুতিস্), উঠোত' (উঠুত') ; উঠোবো (উঠুবো) ; উঠোচ্ছি (উঠুচ্ছি) ; উঠোচ্ছিলেন, (উঠুচ্ছিলেন) ; উঠোতে (উঠুতে) থাক্‌বো ; উঠিয়েছি ইত্যাদি (পুরাঘটিত কালগুলি এই শ্রেণীর প্রথম রূপের মত) ; উঠোও, উঠো, উঠোন্, উঠোক্ ; উঠিয়ো, উঠোন্ ; উঠিয়ে', উঠোলে (উঠুলে) ; উঠোতে (উঠুতে) ; উঠোনো (উঠুনো), উঠোবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« উড়া, কুটা, কুলা, গুছা, গুড়া, গুঁড়া, গুঁতা, ঘুচা, ঘুমা, ঘুরা, চুকা, চুবা, চুমা, ছুটা, জুটা, জুড়া, জুতা, ঝুলা, ঠুকা, ঢুকা, ঢুলা, দুলা, পুড়া, পুরা, ফুটা, ফুলা, বুজা, বুঝা, বুড়া, ভুগা, মুছা, লুকা, শুধা, শুঁকা, শুষা, শুনা »।

[৭ঘ।২] মূল ধাতুর পরে একাধিক ব্যঞ্জন—

« শুধ্‌রা » ধাতু—প্রথম রূপ (« আ »)—« শোধ্‌রাই (শুধ্‌রাই), শোধ্‌রালুম, শোধ্‌রাবো, শোধ্‌রাচ্ছি, শোধ্‌রাচ্ছিলুম ; শুধ্‌রিয়েছি (শুধ্‌রেছি) ; শুধ্‌রিয়ে' (শুধ্‌রে'), শোধ্‌রালে ; শোধ্‌রাও, শোধ্‌রা, শোধ্‌রাক্, শুধ্‌রিয়ো (শুধ্‌রো), শোধ্‌রান্, শোধ্‌রাতে ; শোধ্‌রানো, শোধ্‌রাবা- »।

দ্বিতীয় রূপ (« ও (উ) »)—« শুধ্‌রোই (শুধ্‌রুই) ; শুধ্‌রোলুম (শুধ্‌রুলুম) ; শুধ্‌রোচ্ছি (শুধ্‌রুচ্ছি) ; শুধ্‌রোচ্ছিলুম (শুধ্‌রুচ্ছিলুম) ; শুধ্‌রোতে (শুধ্‌রুতে) থাক্‌বো ; শুধ্‌রিয়েছি, শুধ্‌রেছি ; শুধ্‌রেছিলাম ; শুধ্‌রিয়ে' (শুধ্‌রে') থাক্‌বো ; শুধ্‌রিয়ে' (শুধ্‌রে'), শুধ্‌রোলে (শুধ্‌রুলে), শুধ্‌রোনো (শুধ্‌রুনো), শুধ্‌রোবা- »।

অনুরূপ ধাতু—« উত্‌রা, উগ্‌রা, উথ্‌লা, উপ্‌চা, উপ্‌ড়া, উল্‌টা, উস্‌কা, গুজ্‌রা, গুম্‌রা, চুপ্‌সা, চুল্‌কা, জুব্‌ড়া, ডুক্‌রা, তুব্‌ড়া, দুম্‌ড়া, ফুক্‌রা, ফুস্‌লা, মুচ্‌ড়া »।

[৭৬] মূল ধাতুর স্বর « এ »—

এই শ্রেণীর ধাতুতে « আ » -প্রত্যয়ই চলে—কেবল অল্প কতকগুলি ধাতুতে সর্বদা « ও » হয়। ধাতুর « এ »-কারের উচ্চারণ, স্বর-সঙ্গতি-অনুসারে « অ্যা » হয়। এক-ব্যঞ্জনান্ত ও একাধিক-ব্যঞ্জনান্ত এই শ্রেণীর তাবৎ ধাতুরই রূপ এক প্রকার—কেবল আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়ায়, একাধিক-ব্যঞ্জনান্ত ধাতুতে, « ইয়া »-প্রত্যয়ের « ই »-ধ্বনি, বিকল্পে লুপ্ত হয়; যথা—

« এড়া » ধাতু—« এড়াই, এড়ায়; এড়ালাম এড়ালুম, এড়ালে; এড়াতাম এড়াতুম, এড়াত'; এড়াবো; এড়াচ্ছে; এড়াচ্ছিল; এড়াতে থাক্‌বো; এড়িয়েছে; এড়িয়েছিল; এড়িয়ে' থাক্‌বে; এড়াও, এড়া, এড়াক্‌, এড়িয়া, এড়ান্‌; এড়িয়ে', এড়ালে; এড়াতে; এড়ানো, এড়াবা »।

« খেঁত্‌লা » ধাতু—« খেঁত্‌লায়; খেঁত্‌লালে; খেঁত্‌লাতাম; খেঁত্‌লাবে; খেঁত্‌লাচ্ছে; খেঁত্‌লাচ্ছিল; খেঁত্‌লিয়েছে (খেঁত্‌লেছে), খেঁত্‌লিয়েছিল (খেঁত্‌লেছিল); খেঁত্‌লাও; খেঁত্‌লিয়ো; খেঁত্‌লিয়ে' খেঁত্‌লে', খেঁত্‌লালে; খেঁত্‌লানো, খেঁত্‌লাবা »।

অনুরূপ ধাতু—« এলা, খেদা, খেপা, গেলা, গেডা, চেঁচা, চেনা, চেরা, ঠেঙা, দেওয়া, নেওয়া, ফেটা, ফেনা, বেড়া, ভেঙা, ভেজা, মেলা, হেদা; খেঁচ্‌কা, নেংচা, ভেংচা, খেদ্‌ড়া, ভেস্তা, লেপ্‌টা »। এই ধাতুগুলির মধ্যে আবার কুত্রচিৎ « ও » -প্রত্যয়েরও ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাহা অনুকরণ- বা প্রভাব-জাত; যেমন—« ভেজাচ্ছে ভিজোচ্ছে ভিজুচ্ছে, এলানে এলোলে, চেতাচ্ছে চিতোচ্ছে, হেদায় হেদোয় » ইত্যাদি। কিন্তু এই ধাতুগুলি বাস্তবিক « আ »-প্রত্যয়-ই গ্রহণ করে।

« এগা (< আইগুয়া, আগুয়া), এলা (< আইলুয়া, আউলুয়া), পেরা (পার হওয়া—পারা-র বিকারে), বেরা (< বাইরা, বাহিরা)»—এই কয়টী ধাতুতে সমস্ত রূপে ণিজন্ত প্রত্যয় « ও »-ই ব্যবহৃত হয়। « ও »-প্রত্যয়ে, ধাতুর এ-কারের অ্যা-উচ্চারণ হয় না; যথা—« এগোই (এগুই), এগোয়; এগোল', এগুল' (প্রথম পুরুষ), এগোচ্ছে, এগোতে এগুতে ('এগাল, এগাল', এগাচ্ছে, এগাতে' প্রভৃতি নহে); এলোয়, এলোলে, এলোচ্ছে, এলিয়েছে ('এলালে,' 'এলায়েছে'—কবিতায়, সাহিত্যিক ও মৌখিক রূপের মিশ্রণে); বেরোয়, বেরোল'; পেরোয়, পেরিয়েছিল »; ইত্যাদি।

[৭চ] ধাতুতে স্বর-ধ্বনি «ও»—কার্যতঃ এই শ্রেণী [৭ঘ]-এর সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

ণিজন্ত «আ» এবং «ও» -প্রত্যয়-ভেদে, দুই প্রকার রূপই হয়।

[৭চ।১] ধাতুর স্বরের পরে একটী ব্যঞ্জন—

«ঘোলা» ধাতু—

প্রথম রূপ—«ঘোলায়, ঘোলালে, ঘোলাবে, ঘোলাত', ঘোলাচ্ছে, ঘোলাচ্ছিল, ঘুলিয়েছে, ঘুলিয়েছিল; ঘোলাও, ঘোলা, ঘোলাক্, ঘুলিয়ো, ঘোলান্; ঘুলিয়ে', ঘোলালে; ঘোলাতে; ঘোলানো, ঘোলাবা-»।

দ্বিতীয় রূপ—«ঘুলোই (ঘুলুই), ঘুলোয়, ঘুলোলে (ঘুলুলে), ঘুলোবো (ঘুলুবা), ঘুলোচ্ছে (ঘুলুচ্ছে), ঘুলিয়েছে; ঘুলোও, ঘুলো, ঘুলোক্ (ঘুলুক্), ঘুলিয়ো, ঘুলোন্ (ঘুলুন্); ঘুলিয়ে', ঘুলোলে (ঘুলুলে); ঘুলোতে (ঘুলুতে); ঘুলোনো (ঘুলুনো), ঘুলোবা- (ঘুলুবা-)»।

অনুরূপ ধাতু—«দোলা, ঝোলা, কোঁচা, খোঁচা, শোকা, পোঁছা, চোবা» ইত্যাদি।

[৭চ।২] বহুব্যঞ্জনান্ত—

«ঠোক্‌রা» ধাতু—

প্রথম রূপ—«ঠোক্‌রায়, ঠোক্‌রালে, ঠোক্‌রাবে, ঠোক্‌রাচ্ছে, ঠুক্‌রিয়েছে (ঠুক্‌রেছে); ঠোক্‌রাও ঠোক্‌রা, ঠুক্‌রিয়ো; ঠুক্‌রিয়ে' (ঠুক্‌রে'), ঠোক্‌রালে; ঠোক্‌রাতে; ঠোক্‌রানো, ঠোক্‌রাবা-»।

দ্বিতীয় রূপ—«ঠুক্‌রোই (ঠুক্‌রুই), ঠুক্‌রোয়; ঠুক্‌রোলে (ঠুক্‌রুলে), ঠুক্‌রোবে (ঠুক্‌রুবে); ঠুক্‌রোচ্ছে (ঠুক্‌রুচ্ছে), ঠুক্‌রিয়েছে ঠুক্‌রেছে; ঠুক্‌রিয়ে' ঠুক্‌রে', ঠুক্‌রোলে ঠুক্‌রুলে', ঠুক্‌রোতে (ঠুক্‌রুতে); ঠুক্‌রোনো, ঠুক্‌রোবা-»।

অনুরূপ ধাতু—«জোব্‌ড়া, কোদ্‌লা, মোচ্‌ড়া, কোঁক্‌ড়া, কোচ্‌কা, ছোব্‌লা»।

[৭ছ] মূল ধাতুর স্বরধ্বনি «ঔ»—«দৌড়া, পৌছা»—

এই দুই ধাতু সাধারণতঃ অণিজন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও এ-দুইটীর রূপ ণিজন্ত; «পৌছা» (সাধু-ভাষায় «পঁহুছা») ণিজন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (সাধু-ভাষায় অনুরূপ ধাতু «ভৌলা»—চলিত-ভাষায় তাদৃশ প্রচলিত নহে।)

প্রথম রূপ «আ»—«দৌড়ায়, দৌড়ালাম, দৌড়াত', দৌড়াবে; দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচ্ছিল; দৌড়েছে, দৌড়েছিল; দৌড়াও, দৌড়া, দৌড়াক্; দৌড়িয়ে' (দৌড়ে'), দৌড়ালে · দৌড়াতে, দৌড়ানো, দৌড়াবা-»। এই «আ»-যুক্ত রূপ, কথ্য চলিত-ভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিতীয় রূপ—«ও, উ»—«দৌড়োই, দৌড়ই, দৌড়ুই; দৌড়োলাম, দৌড়ুলুম; দৌড়াত দৌড়তে দৌড়ুতে; দৌড়োবো দৌড়বো দৌড়ুবো; দৌড়োচ্ছে দৌড়ুচ্ছে, দৌড়োচ্ছিল দৌড়ুচ্ছিল; দৌড়িয়েছে, দৌড়েছে; দৌড়িয়েছিল, দৌড়েছিল; দৌড়োও, দৌড়া, দৌড়োক্; দৌড়িয়ে' দৌড়ে', দৌড়োলে; দৌড়োতে, দৌড়ানো দৌড়ুনো, দৌড়োবা- দৌড়ুবা-»।

[৩.০৯।১২।ঘ] সাধু ও চলিত মিশ্র ধাতু-রূপ

চলিত-ভাষার প্রভাব সাধু-ভাষার উপরে, অর্থাৎ কথ্য ভাষার প্রভাব লিখিত ভাষার উপরে, সবদেশে সর্বকালে ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রভাবে লেখকগণ অনবধান হইয়া, অথবা সুবিধা-জনক মনে করিয়া (বিশেষতঃ কবিতায়), সাধু- ও চলিত-ভাষার মিশ্রিত ক্রিয়া-পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষাতে প্রাচীন কাল হইতেই এই মিশ্রিত রূপটী দেখা যায়। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতির ফল-স্বরূপ, বহু ক্রিয়ার ও অন্যবিধ পদের রূপ, সাধু-ভাষার উপরে চলিত-ভাষার প্রভাবেই ঘটিয়াছে। ছাত্রগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত: শুদ্ধ-ভাবে, সাধু অথবা চলিত, একটী রীতি নিয়মিত রূপে অবলম্বন করা উচিত; রচনার মধ্যে কোনও-কোনও পদ সাধু-ভাষার, আবার কোনও পদ নিছক্ চলিত-ভাষার হইলে, অসঙ্গতি-দোষ হয়। আবার গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনায় এমন কতকগুলি রূপ পাওয়া যায়, যাহা না সাধু-ভাষার না চলিত-ভাষার—কিন্তু উভয়ের মিশ্রণ-জাত; এগুলিকেও বর্জন করা উচিত। ছন্দের অনুরোধে, ভাষার ঝঙ্কারের অনুরোধে, কবিতায়

এই প্রকার মিশ্র-রূপ চলিতে পারে, কিন্তু গদ্যে কদাচ নহে। কতকগুলি উদাহরণ—

ঘটমান বর্তমান ও অতীত—« হইতেছে+হ'চ্ছে=হ'তেছে ; করিতেছিল+ক'রছিল =ক'রতেছিল ; পাইতেছে+পা'চ্ছে+পেতে (< পাইতে)=পেতেছে ; খাইতেছে+খেতে+খাচ্ছে=খেতেছে ; আসিতেছিল+আসছিল=আসতেছিল » ; পুরাঘটিত বর্তমান ও অতীত—« আউলাইয়াছে+এলিয়েছে=এলায়েছে ; গিয়াছে+যাইয়াছে+যেয়ে=যেয়েছে ; বাহিরাইয়াছিল+বেরিয়েছিল=বারাইয়াছিল »।

কতকগুলি প্রয়োগ (মিশ্রণের ফল) যথা—« নিয়া আসিবার », শুদ্ধ রূপ « লইয়া আসিবার » ; চলিত-ভাষায় « ল'য়ে এসো »—শুদ্ধ রূপ « নিয়ে এসো » ; « আসলেন », শুদ্ধ চলিত রূপ « এলেন » ; ইত্যাদি।

[৩.০৯।১৩] নঞর্থক ধাতু (Negative Verbs)

(১) অস্তি-বাচক, অর্থাৎ 'আছে' এই অর্থে, « হ » ধাতুর পূর্বে নঞর্থক অর্থাৎ 'না' বা 'নাই' এই ভাব প্রকাশক « ন » শব্দের যোগে, « নহ্ » ধাতু (চলিত-ভাষায় « ন ») হয়। এই ধাতুর রূপ—

	সাধু-ভাষা	চলিত-ভাষা
নিত্য বর্তমান—		
১।	« নহি, নই »	« নই »
২ক।	« নহও, নহো, নহ, নও »	« নও »
২খ।	« নহিস্, নইস্ »	« ন'স্ »
২গ, ৩খ।	« নহেন, নন্ »	« নন্ »
৩ক।	« নহে, নয় »	« নয় »।

অন্য কালে ইহার প্রয়োগ নাই। অসমাপিকা—« নহিলে, নইলে »।

এতদ্ভিন্ন অব্যয়-শব্দ « নাই » আছে। ইহা তিন পুরুষেই প্রযুক্ত হয়। পুরাতন সাধু-ভাষার রচনায় ও কবিতায় « নাহি » এবং « নাহিক »

রূপ পাওয়া যায়—ইহা « নাই »-এর পূর্ব রূপ। « নাই »-এর চলিত-ভাষার রূপ « *নেই », এবং ক্রিয়ার পরে আসিলে চলিত-ভাষায় এই « *নেই » আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া « *নি » আকার ধারণ করে; যেমন—« সে আইসে নাই—(চলিত-ভাষায়) সে আসে নি; আমি করি নাই—(চলিত-ভাষায়) আমি করি নি »। এই « নাই, নি » অব্যয়-পদ, বর্তমান ক্রিয়ার পরে বসিয়া তাহাকে অতীতের ক্রিয়া করিয়া দেয়; যথা—« আমি দেখি নাই (দেখি নি), তুমি দেখ নাই (দেখ নি), সে দেখে নাই (দেখে নি) »। বর্তমান কাল জানাইবার জন্য « নাই »-এর স্থানে « না » অব্যয় বসে, এবং এই « না » চলিত-ভাষায় স্বর-সঙ্গতি-হেতু « নে » রূপ গ্রহণ করে; যথা—« আমি দেখি না (>দেখি নে), তুমি দেখ না, সে দেখে না »; তুলনীয়—« আমি করি না, বা করি নে (=আমি সাধারণতঃ করিয়া থাকি না—বর্তমানের ক্রিয়া), আমি করি নাই, বা করি নি (–অতীতের ক্রিয়া) »।

এইরূপ নঞর্থক অতীত অর্থে নিত্য বর্তমানের ক্রিয়ার সঙ্গে « নাই (নি) » ব্যবহার করাই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে প্রকৃতি-সিদ্ধ; সাধারণ অতীতের সঙ্গে « নাই (নি) » যোগ হয় না, অব্যয় « না » যোগ হয়; অতীত ক্রিয়া এবং « না »—ইহার অর্থ একটু পৃথক্ হইয়া দাঁড়ায়; যেমন—« আমি দেখিলাম না »=‘দেখিতে পারিতাম, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া দেখিলাম না’, অথবা ‘দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দৃষ্টিগোচর হইল না’; কিন্তু « আমি দেখি নাই » বলিলে, মাত্র ঘটনাটীর অঘটন বুঝায়; তদ্রূপ, « সে করিল না »–‘ইচ্ছা করিয়া, উপদেশ বা অনুরোধ না মানিয়াই করিল না’ (তুলনীয়: « সে করে নাই » বা « সে করে নি »); « তুমি খাইলে না (খেলে না) », « তুমি খাও নাই (খাও নি) »।

« দেখি নাই (করে নাই, যায় নাই) » প্রভৃতির স্থলে « দেখিয়াছিলাম না »—এরূপ প্রয়োগ, সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা উভয়েরই বিরোধী।

কবিতার ভাষায় আর একটী নঞর্থক ধাতুর ব্যবহার আছে—« নার্ » ধাতু—« না (ন) » ও « √পার্ » যোগে। এই রূপগুলি সাধারণতঃ পাওয়া যায় :

« নারি	নারিলাম, নারিনু	নারিতাম	নারিব
নার	নারিলে	নারিতে	নারিবে
নারিস্	নারিলি	নারিতিস্	নারিবি
নারে	নারিল, নারিলা	নারিত	নারিবে »

প্রাদেশিক ভাষায় কচিৎ « নারে, নার্‌লে, নার্‌লাম, নারবো (নার্‌বো), নারবে » প্রভৃতি রূপ মিলে; কিন্তু সাধু গদ্যের ভাষায় ও চলিত-ভাষায় এই নঞর্থক ধাতুর চল নাই। « না+পার্ » > « নারার্ » > « নার্ »; তুলনীয়, আসামী « নোৱার » =« নার্ »।

অসমাপিকা ইত্যাদি—« নারিয়া, নারিলে, নারিতে »।

[৩.০৯।১৪] যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া (Compound Verbs)

বাঙ্গালা ভাষায় « -ইতে » এবং « -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া-পদ অন্য কতকগুলি ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয়, এবং উভয়ে মিলিয়া একটী অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ **মিলিত** বা **যৌগিক ক্রিয়াতে** প্রথম ক্রিয়া-পদের অর্থটাই বলবৎ থাকে, দ্বিতীয় ক্রিয়ার অর্থ প্রথমটীর অর্থের পূর্ণতা বা সমাপ্তি, নিত্যতা, প্রারম্ভিকতা, শক্যতা, অবধারণ বা বিশদতা, আবশ্যকতা, অনুমোদন বা অনুমতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়ায়, দ্বিতীয় ক্রিয়াকে প্রথম বা মৌলিক ক্রিয়ার **সহকারী ক্রিয়া** বলা যাইতে পারে। সংস্কৃতের « উপসর্গ » (« প্র, পরা, অভি, অনু » প্রভৃতি অব্যয়, যাহা ধাতুর পূর্বে বসে), এবং ইংরেজীর Preposition (ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়, অথবা ক্রিয়ার পরে ক্রিয়ার

বিশেষণের মত আইসে)—এগুলির যে কাজ, যৌগিক ক্রিয়ার মূল ধাতুর সম্পর্কে সহকারী ক্রিয়া সেই রকম কাজ করে, অর্থাৎ অর্থকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া দেয় ; যথা—সংস্কৃত=« সদ্ » ধাতু, ইংরেজীর sit=বাঙ্গালা « বস্, বসা », কিন্তু সংস্কৃতের « নি+সদ্ », ইংরেজীর sit down=বাঙ্গালা « বসিয়া পড়্, বসিয়া পড়া »।

যৌগিক ক্রিয়ায় সহকারী ধাতুতেই প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করা হয় ; « -ইতে, -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত মৌলিক ক্রিয়া অবিকৃত থাকে। কেবল কতকগুলি বিশেষ ক্রিয়া বা ধাতু, সহকারী ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হয়, সকল ধাতু হয় না ; যেমন—« চাহ্, থাক্, দে, নে, পার্, পড়্, ফেল্, যা, রহ্, লাগ্ » প্রভৃতি।

[১] « -ইতে » -প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ-যোগে—

(ক) প্রারম্ভিকতা-বোধক (Inceptives)—« খাইতে লাগ্, করিতে লাগ্ »।

(খ) ইচ্ছা-বোধক (Desideratives)—« দিতে চাহ্, বসিতে চাহ্ »।

(গ) অনুমতি- বা অনুমোদন-বোধক (Permissives)—« বসিতে দে, যাইতে দে »।

(ঘ) শক্যতা-বোধক (Potentials)—« চলিতে পার্ »।

(ঙ) সামর্থ্য-বোধক (Acquisitives)—« দেখিতে পা »।

(চ) নিরন্তরতা-বোধক (Continuatives)—« দিতে থাক্, হাসিতে থাক্ »।

[২] « -ইয়া » -প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-পদ-যোগে—

(ক) পূর্ণতা-বোধক (Completives)—« খাইয়া ফেল্, মুছিয়া ফেল্, মারিয়া ফেল্, দিয়া ফেল্, কাটিয়া ফেল্ ; করিয়া বস্, খাইয়া বস্, বলিয়া বস্ ; আসিয়া পড়্, বসিয়া পড়্, জাগিয়া পড়্, মরিয়া পড়্, উড়িয়া পড়্ ; ভাঙিয়া দে, দিয়া দে ; কাড়িয়া লহ্ (=কেড়ে নে) ; করিয়া তুল্, গড়িয়া তুল্, সারিয়া তুল্ »।

(খ) প্রারম্ভিকতা- বা আরম্ভ-বোধক (Inceptives)—« কাঁদিয়া উঠ্, লাগিয়া যা, বসিয়া যা, বলিয়া উঠ্ »।

(গ) স্থায়িত্ব- বা নিত্যতা-দ্যোতক (Staticals)—« বসিয়া থাক্‌, লাগিয়া থাক্‌, জাগিয়া রহ্‌, ধরিয়া রহ্‌ বা থাক্‌ »।

(ঘ) নিরন্তরতা-বোধক (Continuatives)—« বকিয়া যা, খাইয়া যা, পড়িয়া যা »।

(ঙ) অবধারণ-, বিশদতা- বা নিশ্চয়তা-বোধক (Intensives, Indicatives—« ধুইয়া লহ্‌, হইয়া দাঁড়া, বুঝিয়া লহ্‌, ঘুমাইয়া লহ্‌, দিয়া আস্‌, খাইয়া লহ্‌, পড়িয়া যা, চলিয়া যা, লাফাইয়া পড়্‌, ধরিয়া যা, চলিয়া যা, লইয়া যা »।

(চ) অভ্যাস-বোধক (Habituals)—« গিয়া থাক্‌, খাইয়া থাক্‌, দিয়া আস্‌; খাইয়া, পাইয়া, লইয়া আস্‌ »।

(ছ) পরীক্ষা- বা অনুমোদন-বোধক (Examinatives, Appreciatives)—« খাইয়া দেখ্‌, চাখিয়া দেখ্‌, চাহিয়া দেখ্‌, বসিয়া দেখ্‌ »।

এই প্রকার একটী প্রধান-ভাব-দ্যোতক মৌলিক ক্রিয়া ও অপ্রধান-ভাব-দ্যোতক সহকারী ক্রিয়া উভয়ে মিলিয়া একার্থে প্রযুক্ত হওয়া ভিন্ন, বাঙ্গালায় ভিন্নার্থক দুইটী ধাতু পাশাপাশি স্বতন্ত্র-ভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু উভয়ে মিলিয়া একটী অর্থেরই দ্যোতনা করে; যথা—« তাহাকে একটু দেখিবে শুনিবে, তাহার একটু দেখাশুনা করিবে (=তত্ত্বাবধান করিবে); বালকটী মন দিয়া পড়িত শুনিত (=পাঠাদি করিত); খাওয়া-দাওয়া (=আহার ক্রিয়া) হইল; রান্না-বান্না, রান্না-বাড়না, রাঁধলে-বাড়লে (=অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া রাখা)» ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে সংযুক্ত ক্রিয়ার মত সর্বত্র একটী ধাতুর অর্থ আর একটীর পার্শ্বে গৌণ রূপে থাকে না—বহু স্থলে উভয় ধাতুর অর্থই বলবৎ থাকে।

[৩.০৯।১৩] সংস্কৃত ধাতু

কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু বাঙ্গালা ভাষায় চলে। মুখ্যতঃ কবিতার ভাষায় এগুলি ব্যবহৃত হয়, এবং অল্প দুই-একটী কাল-রূপে ও পুরুষে, এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায়, এই সংস্কৃত ধাতুগুলি মিলে; যথা—« আহর্‌, কীর্ত,

গর্জ্, চুম্ব্, তিষ্ঠ্, ত্যজ্, ধ্যা, ধ্বন্, নম্, নির্মা, নির্ণি, নিশ্চি, প্রণম্, বদ্, বন্দ্, বর্জ্, বর্ত, ভঞ্জ্, ভর্ৎস্, ভিদ্, মর্দ্, যজ্, রাজ্, শোভ্ (শুভ্), সেব্, স্মৃ, হানয়্ (হান), হিংস্ * ইত্যাদি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এগুলিকে নাম-ধাতুই বলিতে হয়, আবার অন্যত্র এগুলি সংস্কৃত ধাতু মাত্র।

এতদ্ভিন্ন, আধুনিক কালে কবিতায় বহু সংস্কৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ, শুদ্ধ-তৎসম ও অর্ধ-তৎসম রূপে বাঙ্গালা ধাতুবৎ ব্যবহৃত হয়। এগুলি নাম-ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু রূপে ও প্রয়োগে «আ»-প্রত্যয়ান্ত নাম ধাতুর মত নহে—মৌলিক ধাতুতে যেমন, তেমনি এগুলির সহিত «আ»-প্রত্যয় যুক্ত হয় না। এগুলির প্রয়োগও খুব সীমাবদ্ধ—মৌলিক কাল-রূপে, ঘটমান বর্তমানে, এবং আত্মনিষ্ঠ অসমাপিকায়—এই কয়টী রূপেই সাধারণতঃ এগুলিকে পাওয়া যায়; যথা—« তেয়াগ (ত্যাগ), বরণ (বর্ণ), দরশ (দর্শ), পরশ (স্পর্শ), অগ্রসর, আদর, আদেশ, আকুল, আঘাত, আনন্দ, আলাপ, আশিষ, উচ্ছেদ, উত্তাপ, উদ্ধার, উন্মোচ, উন্মেষ, উলঙ্গ, চিত্র, ত্রস্ত, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, দান, দীপ, নাদ, নীরব, নিনাদ, নিশ্চয়, নিষ্ফল, নিস্তার, পরিহার, প্রদান, প্রণাম, প্রমোদ, প্রসার, প্রশম, পুরস্কর (পুরস্কার), প্রভাত, ভাব (প্রভাব), বিকাশ (বিকশ), বিদ্বেষ, বিনাশ, বিস্তার, চেষ্টা, যাগ, যোগ, লেপ, সংহর (সংহার), সন্তোষ, স্তুতি, প্রতিবিধিৎসা » ইত্যাদি।

উক্ত এবং অনুরূপ ধাতুগুলি বাঙ্গালায় তদ্ভব বা প্রাকৃতজ ধাতুর মতই প্রযুক্ত হয়। এগুলি ভিন্ন, সংস্কৃত ধাতু-জাত বহু ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সাধন ও মূল ধাতুর রূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক—অন্যথা বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট অপরিহার্য বহু শব্দের সাধন বুঝিতে পারা যাইবে না।

পরিশিষ্ট [৪]-এ কতকগুলি প্রধান-প্রধান সংস্কৃত ধাতু এবং কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে এই ধাতুগুলি হইতে সৃষ্ট ও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত

তৎসম শব্দের তালিকা দেওয়া হইল। উপসর্গ-যোগে এই সকল শব্দের প্রসারণও বহুশঃ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়।

[৩.১০] অব্যয় (Indeclinables)

অব্যয়-সম্বন্ধে—অব্যয়ের সংজ্ঞা ও প্রয়োগ-বিষয়ে—পূর্বে বলা হইয়াছে (পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৪)।

অব্যয় শব্দ মুখ্যতঃ দুই প্রকারের—[১] **সংযোগ-বাচক** বা **সম্বন্ধ-বাচক** (Conjunctions বা Post-positions), এবং [২] আহ্বান, হর্ষ, বিস্ময়াদি **মনোভাব-বাচক** অথবা (রামমোহন রায়ের সংজ্ঞানুসারে) **অন্তর্ভাবার্থক** (Interjections)। ইংরেজী Preposition-এর অনুরূপ পদ বাঙ্গালায় নাই—« বিনা » ও « বেগর » এই দুইটী শব্দ ছাড়া (« বিনা হুকুমে ; বেগর হাতা কেদারা বা জামা ») বিভক্তি ও বিভক্তি-স্থানীয় পরসর্গ বা অনুসর্গ এবং কর্মপ্রবচনীয়-দ্বারা Preposition-এর কাজ বাঙ্গালায় চলে, এবং এগুলি শব্দের পরে বসে বলিয়া এগুলির ইংরেজী নাম-করণ হইয়াছে Post-position (পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১, ২৭৭-২৭৯)।

(১) সম্বন্ধ- বা সংযোগ-বাচক অব্যয়।

« আর, ও, এবং » (« আর »—সাধারণতঃ চলিত ভাষায় প্রযুক্ত হয়, and অর্থাৎ 'এবং' অর্থে ; সাধু ও চলিত উভয় ভাষায়—again বা 'আবার' অর্থে ; « ও, এবং » সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয় ; কেহ-কেহ দুই পদের যোজনায় « ও » এবং দুই বাক্যের যোজনায় « এবং » ব্যবহার করেন, কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না)। কতক-গুলি শুদ্ধ বাঙ্গালা (বা প্রাকৃতজ) মৌলিক অব্যয় আছে ; যেমন—« না, ই, বা, কি, আর, ও, তো »—এগুলির সংযোগও মিলে, যেমন « না তো, না কি »। কতকগুলি অব্যয় সংস্কৃত হইতে গৃহীত ; যথা—« বরং, এবং, যদি, তথা » ; আবার একাধিক সংস্কৃত অব্যয়ের সমষ্টিও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত

হয়, যথা—* নতুবা, তথাপি, কিন্তু, পরন্তু, পুনশ্চ, বরঞ্চ *। প্রাকৃতজ ও সংস্কৃত অব্যয় ভিন্ন অন্য পদ, পদ-সমষ্টি, অথবা বাক্যাংশ, বাঙ্গালা ভাষায় অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা—* চাই, কারণ, আবার, অপর, যাই, তাই, হইলে পরে, না হইলে, গতিকে, যে হেতু * ইত্যাদি।

[ক] **সংযোজক** (Connectives) ও **বিযোজক** বা **বৈকল্পিক** (Alternatives)—* আর, ও, এবং, তথা (সমুচ্চয়ার্থক); ই; কি; যে; বা; কি (='বা' অর্থে); অথবা; কিংবা; না; না—না; চাই কি; চাই কি—চাই কি; এদিকে—ওদিকে; যাই—তাই; অর্থাৎ; অনন্তর *।

[খ] **প্রতিষেধক** বা **প্রাতিপক্ষিক** (Adversatives)—* কিন্তু, পরন্তু, বরঞ্চ, অপিচ, অপরন্তু, অধিকন্তু; এদিকে, ওদিকে; তো, নয় তো; তবু, তবুও; তথাপি, তথাপিও; তত্রাচ; পুনরায়, পুনশ্চ, আর, আবার; বটে (বাক্যের অন্তে) *।

[গ] **ব্যতিরেকাত্মক** (Exceptives)—* যদি না, না হইলে, নতুবা *।

[ঘ] **অবস্থাত্মক** (Conditionals)—* যদি, যদিস্যাৎ, যদি নাকি, যাই, হইলে, পরে, যদি না হয়, না হইলে *।

[ঙ] **ব্যবস্থাত্মক** (Concessives)—* তবে, তাহা হইলে (*তা-হ'লে), তাই, তবে না কি, তার জন্য, সেই জন্য, তদনন্তর, কখনও-কখনও; কাব্যের ভাষায়—তেঁই (='সে জন্য') *।

[চ] **কারণাত্মক** (Causals)—* কারণ, কারণ কি, যে হেতু, যে কারণ, যে কারণে; বলিয়া (দুই বাক্যের মধ্যে) *।

[ছ] **অনুধাবনাত্মক** (Conclusives)—* এই জন্য, এই হেতু, এই কারণ, এদিকে; তাই, তাইতে *।

[জ] **সমাপ্তি-বাচক** (Finals)—* যাহাতে (lest), শেষ *।

[ঝ] **অবধারণে, পাদপূরণে, বাক্যালঙ্কারে** (Expletives)—« তো, না (যথা—'তুমি না যাবে ?') ; সিন্, মেনে (অপ্রচলিত) ; বটি, বট, বটে, বটেন »।

[ঞ] **প্রশ্নে** (Interrogatives)—« অ্যাঁ ? না ? না কি ? কি ? বটে ? হাঁ ? হ্যাঁ ? »।

[ট] **উপমাদ্যোতক** (Comparatives)—« যেন, মতন, মত, যেমন, ন্যায়, যথা—তথা »।

(২) মনোভাব-বাচক (অন্তর্ভাবার্থক) অব্যয়।

শীৎকার-ধ্বনি দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৯০-৯২)। স্বর-বিহীন ব্যঞ্জন-ধ্বনি « ম্ » বাঙ্গালায় ভাব-বাচক শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়। উদাত্ত অনুদাত্ত আদি স্বর-অনুসারে, এই একাক্ষর অব্যয়ের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটে : যথা—

« 'ম » (উচ্চারোহী স্বরে)=প্রশ্ন ;
« ˋম » (অবরোহী স্বরে)=বটে ;
« ম্' » (হঠাৎ সমাপ্ত)=অস্বস্তি, বিরক্তি ;
« ᑌম্ » (অবরোহী এবং আরোহী)=বিতর্ক ;
« ᑎম্ » (স্তিমিত-অবরোহী)='আচ্ছা বেশ, দেখে নেবো !'

তদ্রূপ অব্যয় « হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, না » স্বরবৈচিত্র্য-অনুসারে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

[ক] **সম্মতি-জ্ঞাপক** (Assertives)—« হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, আচ্ছা, বটে, আজ্ঞে, আজ্ঞা, যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞা, যথা-আজ্ঞা, যা বলেন, তাই, তাই বটে »। বাঙ্গালী মুসলমান-মহলে, হিন্দুস্থানীর অনুকরণে—« জী, জী হাঁ »।

[খ] **অসম্মতি-জ্ঞাপক** (Negatives)—« না, একদম না, কখনই না, না তো, না বটে, মোটেই না, আদৌ না, আদোয়ে (> আদোবে, আদপে) না, কখনো না, কক্‌খনো না »।

[গ] **অনুমোদন-জ্ঞাপক** (Appreciatives)—« বাঃ, বাঃ বাঃ, বাহবা, বা রে বাঃ, বেশ, বেশ বেশ, খুব, বহুৎ খুব, বেড়ে (<বাড়িয়া, হিন্দী বঢ়িয়া), শাবাশ (সাবাস), সাধু, সাধু সাধু, বলিহারি, বলিহারি যাই, ধন্য, ধন্য ধন্য, চমৎকার, কি চমৎকার, কি সুন্দর, খাসা, কি খাসা, *বেড়ে, আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, মরি রে, মরি মরি, হায় হায় »।

[ঘ] **ঘৃণা- বা বিরক্তি-ব্যঞ্জক** (Interjections of Disgust)—« ছি, ছিঃ, ছি ছি, দূর, দূর দূর, হুঁঃ, থু, থুঃ, থুথু, রাম, রামঃ, রাম রাম, কি আপদ্, ভালো আপদ্, *ভ্যালা আপদ্, আ ম'লো, কি বিভ্রাট্, ছাই, দুর ছাই, ধেৎ, দুত্তোর, কি জ্বালা, ভালো জ্বালা, *ভ্যালা জ্বালা, কি মুস্কিল, ম্যা গেঃ (=মা গে, মা গো) »।

[ঙ] **ভয়-, যন্ত্রণা-,** বা **মনঃকষ্ট-ব্যঞ্জক** (Interjections of Fear, Pain and Suffering)— « ওঃ, ওরে, হায়, হায় হায়, আঃ, এঃ, ইঃ (ইশ্), উঃ (উফ্), ওঃ (ওফ্), এঁ্যা, আঁ, আঁ আঁ, বাপ্, বাবা গো, গেলাম রে (গেলুম রে), ম'রে গেলুম, মা, মা রে, মা গো »।

[চ] **বিস্ময়-দ্যোতক** (Interjection of Surprise)—« আঁ্যা, এঁ, ও বাবা, ওরে বাবা, ওব্বাবা, বাপ রে বাপ, ওমা, বলে কি, ওমা কোথা যাবো, করে কি, তাই তো, হরি হরি » ইত্যাদি।

[ছ] **করুণা-দ্যোতক** (Interjections of Pity)— « আহা, আহা রে, হা রে, মরি, মরি রে, মরি মরি, বাছা আমার, বাপ আমার, মা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার, আহা হা, হায় হায় »।

[জ] **আহ্বান বা সম্বোধন-দ্যোতক** (Vocatives)—« এ, এই, এরে, এই যে , ওহে, ওহো ; ওগো, ওলো, ওগো বাছা, ও মেয়ে ; ও, ওরে, অরে ; অয়ি, হে (হে ভগবন্ বা ভগবান্—সাধু-ভাষায়) ; লো ; হেদে, হেদে রে, হেদে গো (কাব্যে) ; তুতু, চৈচৈ (কুকুর, হাস

প্রভৃতিকে আহ্বান করিতে); আ আ, আয় আয়; হা গো, হাঁগা, হ্যাগা, হ্যাগো, হেঁগা » ইত্যাদি (৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

[ঝ] **অনুকার-সূচক** (Onomatopoetics বা Onomatopoeics বা Onomatopes)—এগুলি সাধারণতঃ « কর্ » বা অন্য কোনও ধাতুর সঙ্গে, অথবা « শব্দ, রব, ধ্বনি » প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া, ক্রিয়ার বিশেষণের ভাব প্রকাশ করে; যথা—« কুহু কুহু করিতেছে (কোকিল); রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; শূন্য বাড়ী খাঁ খাঁ করে; প্রদীপ টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলে; কলকল ছলছল টলটল তরঙ্গে গঙ্গা প্রবাহিত; টক্‌টক্ করিতেছে লাল; কামানের গর্জন হইল—গুড়ুম গুড়ুম; মেঘ ডাকে গুরু গুরু; কড় কড় শব্দে বাজ পড়িল; অগ্নিশিখা জ্বলে ধক্ ধক্ লক্ লক্; দুড়্-দাড়্ ইট পড়ে » ইত্যাদি।

---

[৪] বাক্য-রীতি

যে পদ- বা শব্দ-সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে বক্তার ভাব প্রকটিত হয়, সেই পদ- বা শব্দ-সমষ্টিকে **বাক্য** (Sentence) বলে।

সম্পূর্ণার্থক হইতে হইলে, বাক্যে অন্ততঃ কর্তা ও ক্রিয়া এই দুইটী পদ থাকা চাই—তাহা প্রকট-ভাবেই হউক বা উহ্য-ভাবেই হউক। কর্তা ও ক্রিয়া প্রকট, যথা—« মেঘ ডাকে, জল পড়ে, পাতা নড়ে; আমি আম খাই, হরি বাঁশী বাজায়; কাল তুমি বাড়ীতে থাকিও » ইত্যাদি। কর্তা বা ক্রিয়া, অথবা উভয়ই, উহ্য; যথা—« দেবে? দেবো (='তুমি', 'আমি'—উভয় কর্তাই উহ্য); কে ওখানে? আমি (উভয় ক্রিয়া উহ্য); তুমি খাইবে?—না (অর্থাৎ 'আমি খাইব না'—কর্তা ও ক্রিয়া উভয়ই উহ্য) »।

[৪.১] উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যে দুইটী বস্তু থাকা আবশ্যক—**উদ্দেশ্য** (Subject) এবং **বিধেয়** (Predicate)। যাহার উদ্দেশে বা সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহা « উদ্দেশ্য », এবং যাহা বলা যায়, তাহা « বিধেয় »; যেমন—« ছেলেটী পড়িতেছে »—এখানে « ছেলেটী » উদ্দেশ্য, « পড়িতেছে » বিধেয়।

বাঙ্গালা বাক্যে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য প্রথমে ও বিধেয় পরে বসে। সম্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, কৃদন্ত ইত্যাদির দ্বারা উদ্দেশ্যকে, এবং কর্ম, সম্প্রদান

বা অন্য কারকে প্রযুক্ত বিশেষ্য-, বিশেষণ-, সর্বনাম- বা অব্যয়-দ্বারা বিধেয়কে পূর্ণতর করা যাইতে পারে; যেমন—* গোপাল-বাবুর সেই বোকা ছোট ছেলেটী এখন বেশ মন দিয়া পড়াশুনা করিতেছে *।

বিশেষণ-পদ উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হইলে, তখন ইহা উদ্দেশ্যের সহিত মিলিয়া উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায়; যথা—* **কাল** ঘোড়াটী বেশ দৌড়াইতেছে; **ভাল** ছেলে নিজের কাজে অবহেলা করে না *। আবার যখন বিশেষণ বিধেয়ের পূর্বে বসিয়া বিধেয়ের সহিত প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা বিধেয়েরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়; যথা—* যে ঘোড়াটী দৌড়াইতেছে সেটী হইতেছে **কাল**; ছেলেটী **ভাল** নয় *।

[৪.২] বাক্য-রচনায় লক্ষণীয় বিষয়

বাক্য-রচনায় দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়—(১) বাক্যে প্রযুক্ত পদের ক্রম (Order or Sequence of Words), এবং (২) প্রযুক্ত পদসমূহের পারস্পরিক সঙ্গতি বা মিল (Agreement of Words)। নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের উপরে যথাক্রমে বাক্যে পদের অবস্থান, ইহাদের ক্রম, এবং ইহাদের পারস্পরিক সঙ্গতি নির্ভর করে।

[১] **আকাঙ্ক্ষা** (Expectancy)—কোনও বাক্য বা উক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে; এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত না মিটে, বা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যে অন্য নূতন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে। আকাঙ্ক্ষা-অনুসারেই বাক্যে পদের অবস্থান হয়। কোনও-কোনও স্থলে পূর্বে উক্ত বাক্যের সহিত সংযোগ বা সঙ্গতি থাকায়, একটী পদের দ্বারাই পরবর্তী বাক্য সম্পূর্ণার্থক হয়; কিন্তু সাধারণতঃ মাত্র উদ্দেশ্য অথবা বিধেয়ের দ্বারা, তাহাদের আংশিক পরিপূরণের দ্বারা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হয় না, অন্য পদেরও প্রয়োজন হয়; যথা—« সৈন্যেরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া »—কেবল এইটুকু বলিলে, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইল না—« যুদ্ধ করে » অথবা অনুরূপ অর্থের পদ বসাইলে, তবে অর্থ সম্পূর্ণ হয়। « কর্ণকে বধ করিয়া অর্জুন, বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পরে ইন্দ্র যেমন, তেমনি শোভা পাইতে লাগিলেন »—এই বাক্যে কোন একটী পদকে বর্জন করিলেই বাক্যটী সাকাঙ্ক্ষ হইয়া পড়ে। অতএব, আকাঙ্ক্ষার উপরে বাক্য-স্থিত পদের আবশ্যকতা ও অবস্থান নির্ভর করে।

[২] **যোগ্যতা** (Compatibility বা Propriety)—বাক্যের অর্থ, ভূয়োদর্শন ও সুযুক্তির অনুরূপ হওয়া চাই, অন্যথা তাহা মূর্খের বা পাগলের প্রলাপ হইয়া দাঁড়ায়। বাক্যের পদগুলির পরস্পরের সহিত অর্থ-গত বা ভাব-গত সঙ্গতি থাকা চাই। যেখানে অর্থ-গত বা ভাব-গত বাধা আছে, এরূপ পদ-রাশি ব্যাকরণানুসারে পরস্পরের সহিত সঙ্গত করিয়া বসাইলেই বাক্য হইবে না। « মাটীতে সাঁতার দিতেছে, জলের উপরে হাঁটিয়া চলিতেছে, রাত্রিতে রৌদ্র হয় »—এইরূপ পদ-সমাবেশে, ব্যাকরণ-সঙ্গত বাক্য হইলেও, অর্থানুসারে এগুলিকে বাক্য বলা যায় না। অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে বিশেষ গভীর অর্থ বা উদ্দেশ্য লইয়া, ব্যঙ্গ বা শ্লেষ করিবার জন্য, কিংবা কবিতায় অর্থালঙ্কার-স্বরূপ, এইরূপ অসম্বদ্ধ-প্রলাপ বা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে; যথা—« সুখের মত বেদনা, রৌদ্রময়ী নিশা, গেরুয়া রঙের সুরে দিবস-সঙ্গীতের অবসান হইল » ইত্যাদি। এইরূপ যোগ্যতা ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষার বাক্যে পদের ক্রম সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হয়; যথা—« গোপাল আম খায় »—এখানে অর্থগত যে যোগ্যতা, ক্রম উল্টাইয়া দিয়া, « আম গোপাল খায় » বলিলে, শ্রুত-মাত্রেই যোগ্যতার অভাব আমরা বুঝিতে পারি।

[৩] **আসত্তি** বা **নৈকট্য** (Proximity)—বাক্যের অর্থ-বোধের জন্য পদগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে পরস্পরের

সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধ-যুক্ত (অথবা অর্থ-গত সঙ্গতি-যুক্ত) পদ, ভাষার যে নিয়ম স্বাভাবিক সেই নিয়মে পর পর প্রযুক্ত হয়—তাহাদের 'আসত্তি' বা 'নৈকট্য' রক্ষিত হয়; যথা—« আমি কাল মামার বাড়ী হইতে আসিয়াছি », এই বাক্যের পদগুলি যদি এইরূপে বলা যায়—« কাল হইতে মামার আসিয়াছি বাড়ী আমি », তাহা হইলে আসত্তি রক্ষিত না হওয়ায়, বাক্যটী নিরর্থক হইল। (ছন্দের অনুরোধে, কবিতার ভাষায় এবং গদ্যে বা কথিত ভাষায়, প্রচলিত ক্রমের ব্যত্যয় অবশ্য অল্প-স্বল্প হইতে পারে—কিন্তু তদ্বিষয়েও কিছু নিয়মানুবর্তিতা আছে।) আসত্তি-রক্ষার জন্য পদ-সমূহের মধ্যে ব্যাকরণানুমোদিত সঙ্গতি থাকা চাই: « আমি আসিয়াছিস্ », « তুমি আসিলেন », « সে খাইবি », « আমি দিবেক », « গাছ হইতে ফল পড়িল » স্থলে « গাছ দিয়া ফল পড়িল », « তাহাকে খাওয়াইল » স্থলে « তাহাকে খাইল »—এইরূপ ব্যাকরণ-গত বা অর্থ-গত অপপ্রয়োগ চলিবে না।

বাক্য-রীতিতে, ব্যাকরণ অর্থাৎ শব্দ- ও ধাতু-রূপের বিশুদ্ধির পরেই, সর্বাপেক্ষা আবশ্যক বস্তু হইতেছে, পদের ক্রম ও সঙ্গতি। গদ্যের ভাষায় ক্রমের ব্যত্যয় চলে না, তবে কাব্যে কচিৎ চলে, এবং কল্পনাময় বা উচ্ছ্বাসময় গদ্য-রচনাতেও ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় মার্জনীয়। ক্রমের ব্যত্যয় হইলে, আসত্তির হানি হয়, পদের মধ্যে দুরন্বয় বা দূরান্বয় ঘটে।

[৪.৩] বাক্যের উক্তি-ভেদ (Forms of Narration)

কাহার উক্তি, অর্থাৎ কে বলিতেছে, এই বিচার করিয়া, ভাষায় দুই প্রকারের **উক্তি** (Narration) ধরা যায়—[১] **প্রত্যক্ষ, স্বকীয়, সরল** বা **অপরোক্ষ উক্তি** (Direct Narration); এবং [২] **পরোক্ষ, পরকীয়** বা **বক্র উক্তি** (Indirect Narration)।

[১] বক্তা নিজে যে কথা বলিয়াছে, তাহার যথাযথ অনুবৃত্তি হইলে, « **প্রত্যক্ষ বা স্বকীয়** » উক্তি হয়; যথা—« রাম বলিল, 'আমি

গোপালকে দেখি নাই'; তুমি বলিয়াছিলে, 'আমি তোমাকে বিপদে ফেলিব না' »। সাধারণতঃ স্বকীয় উক্তি, ' ', " ", উদ্ধার-চিহ্নের দ্বারা লেখায় ও ছাপায় নির্দিষ্ট হয়।

[২] বক্তার নিজের কথার যথাযথ অনুবৃত্তি না করিয়া, বক্তা যাহা বলিয়াছে তাহার আশয় অন্য ব্যক্তির কথায় প্রকাশিত হইলে, « পরোক্ষ বা পরকীয় উক্তি » হয়; যথা—« রাম বলিল যে সে গোপালকে দেখে নাই; তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি আমাকে বিপদে ফেলিবে না »। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, এবং « যে » এই অব্যয়-দ্বারা সাধারণতঃ পরোক্ষ উক্তিটীকে বাক্য-মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়; প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম, পুরুষ ও ক্রিয়া-পদ, পরোক্ষ উক্তিতে অর্থানুসারে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যক্ষ উক্তির সম্বোধন-পদ, পরোক্ষ উক্তিতে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নীত হয়।

পরোক্ষ উক্তি একটু ব্যাখ্যান-মূলক, অতএব বহুশঃ কৃত্রিমতাময় হয়। সাধারণতঃ পরোক্ষ উক্তি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না—বাঙ্গালা ভাষা সহজ প্রত্যক্ষ উক্তিরই অনুকূল। ইংরেজীর প্রভাবে আজকাল সাহিত্যের ভাষায় ইহার অল্প-বিস্তর প্রয়োগ দেখা যায়—এখনও ইহা ইংরেজীর মত পূর্ণ-ভাবে ভাষার উপযোগী হইয়া উঠে নাই।

[৪.৪] বাক্যের রচনার প্রকার (Kinds of Sentences)

বাক্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে—

[১] **সরল বা সাধারণ বাক্য** (Simple Sentence);

[২] **মিশ্র বা জটিল বাক্য** (Complex Sentence);

[৩] **যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য** (Compound Sentence)।

সরল বাক্য

[১] যে বাক্যে একটী মাত্র উদ্দেশ্য ও একটী মাত্র বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাহাকে **সরল বাক্য** বলে; যথা—« বৃষ্টি পড়ে; ঘোড়ায় গাড়ী টানে; সে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায় »।

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় নানা ভাবে প্রসারিত ও পূরিত হইতে পারে। সম্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক শব্দ এবং বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ, যাহাতে কোনও সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে না—এগুলি **উদ্দেশ্যের প্রসারক** (Extension of the Subject); ক্রিয়ার বিশেষণ, এবং ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ—**বিধেয়ের প্রসারক** (Extension of the Predicate); কর্ম-কারকের বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার সহিত কর্মকারকে ও সম্প্রদানে প্রযুক্ত বিশেষ্য—এগুলি **বিধেয়ের পূরক** (Complement of the Predicate).

মিশ্র বাক্য

[২] কোনও-কোনও বাক্যে, উদ্দেশ্য এবং বিধেয় (অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া)-যুক্ত মুখ্য অংশ ব্যতীত, এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড-বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে। এই অপ্রধান অংশ, প্রধান বাক্যেরই অংশ- বা অঙ্গ-স্বরূপ হয়; হয় ইহাতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, না হয় ইহাতে সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলেও, « যে, যেরূপ, যেমন » প্রভৃতি পদ বা অব্যয়ের মুখ-বন্ধে বা সহায়তায় ইহা উপস্থাপিত হয়; এবং এই হেতু সমাপিকা-ক্রিয়া সাকাঙ্ক্ষ বা অসমাপ্তার্থ হয়, প্রধান বাক্যাংশেই অর্থ-পূর্তি ঘটে;—এইরূপ বাক্যকে **মিশ্র** বা **জটিল বাক্য** (Complex Sentence) বলে; যথা—« **সে আসিলে** আমি যাইব;

হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিবে; **যাহাতে আমার নামে দোষ না পড়ে** তাহা করিবে; **বোধ হয়** (যে) সে আজ আসিতে পারিল না» ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে স্থূল অক্ষরে মুদ্রিত বাক্যাংশগুলি **অপ্রধান** বা **আশ্রিত বাক্যাংশ** (Clause বা Dependent Clause).

মিশ্র-বাক্যে অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যাংশ অথবা খণ্ডবাক্যগুলি প্রধান বাক্যের সহিত প্রযুক্ত হয় বলিয়াই, সমগ্র বাক্যে সেগুলির সার্থকতা থাকে। অপ্রধান বাক্যাংশ, প্রধান বাক্যাংশের উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূরক বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে, কার্য করে। এগুলিকে যথাক্রমে (ক) **সংজ্ঞা- বা বিশেষ্য-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ** (Noun Clause), (খ) **বিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ** (Adjectival Clause), এবং (গ) **ক্রিয়াবিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ** (Adverbial Clause) বলে।

(ক) বিশেষ্য-ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ—সমগ্র বাক্যাংশটী কর্তা, কর্ম, সমানাধিকরণ বা ক্রিয়াপূরক—এইরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; যথা—« বোধ হইতেছে (যে) **বৃষ্টি হইবে** (কর্তা); **তাহার প্রতি এতটা অবিচার করিলে** ভাল দেখাইবে না (কর্তা); **তুমি যে ওখানে ছিলে না** তাহা আমি জানি (কর্ম); **তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে** সকলেই দোষ দিবে (সমানাধিকরণ); তাহার বিশ্বাস যে **তাহার ভাই সকালেই ফিরিবে,** সত্য হইল (সমানাধিকরণ); আমার ইচ্ছা করে যে **খুব দূর দেশে যাই** (ক্রিয়াপূরক)»।

(খ) বিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ; যথা—« **যে গাড়ীখানি কাল কেনা হইয়াছিল** আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; **যে ব্যবস্থা তুমি করিয়াছ** তাহাতে ফলোদয় হইবে না; **যে লোক সমাজের মঙ্গল বুঝে না** সে নিজেরও মঙ্গল বুঝে না»।

(গ) ক্রিয়াবিশেষণ-ধর্মী বাক্যাংশ: যথা—« **শীঘ্র বাড়ী আসিবেন বলিয়া** তিনি যথাসম্ভব সত্বর হাতের কাজগুলি শেষ করিলেন; **দুই-দশ**

টাকা উপার্জন করিবে এই আশায় দোকান খুলিয়াছে »। « যখন—তখন; যথা—তথা; যেমন—তেমন; এইরূপ; এই; যদি »—এই-সকল পদ, ক্রিয়াবিশেষণাত্মক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়।

যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য

[৩] দুইটী বা দুইয়ের অধিক সরল, মিশ্র, অথবা সরল ও মিশ্র বাক্যকে সংযোজক অথবা প্রতিষেধক অব্যয়ের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া, একটা দীর্ঘ প্রস্তাব বাক্যবৎ গঠিত করিয়া লইলে, যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য হয়; যথা—« রাম বনে যাইবেন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইবেন (দুইটী সরল বাক্য); সে না আসিলে তুমি যাইবে না, কিন্তু সে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহার আসিতে দেরী হইবে (দুইটী মিশ্র বাক্য); তাহারা দুইজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি কিছু খাবার জিনিস পায় দুইজনে ভাগ করিয়া খায় (সরল ও মিশ্র); সে কাহারও দাসত্ব করিতে চায় না, এ দিকে টাকার অভাব হইলে যাহার তাহার কাছে হাত পাতে (সরল ও মিশ্র) » ইত্যাদি।

সংযুক্ত বাক্যে অনেক সময়ে অব্যয়ের দ্বারাই অর্থ-গ্রহণ হয় বলিয়া, উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের, অথবা ইহাদের প্রসারকের, পুনরুক্তির আবশ্যকতা থাকে না; কিন্তু বাক্যটী বিশ্লেষণ করিতে গেলে এইরূপ পুনরুক্তি করিতে হয়; যথা—« রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনগমন করিলেন; সে বিদ্বান্ বটে, কিন্তু তাহার ভাই মোটেই তাহা নহে; অপরের কাজ তো করিবেই না, নিজেরও না; তুমি খাইতে পার, ঘুমাইতে পার, আর এই সামান্য কাজটুকুর বেলায় না? » ইত্যাদি।

সরল, মিশ্র ও যৌগিক—এই তিন শ্রেণীর বাক্যের বিভাগ, বাক্যস্থ পদ ও বাক্যাংশের সমাবেশ, বিচার করিয়া করা হয়। এতদ্ভিন্ন, বাক্যের অর্থ-অনুসারে বাক্যকে সাতটী শ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা—

(১) **নির্দ্দেশ-সূচক বাক্য** (Indicative Sentence)—« গাই

দুধ দেয়; রাম ইস্কুলে যাইবে না »। নির্দেশ-সূচক বাক্য দুই প্রকারের—**অস্ত্যর্থক** (Affirmative) এবং **নাস্ত্যর্থক** (Negative)।

(২) **প্রশ্ন-বাচক বাক্য** (Interrogative Sentence)—« কি চাও? সে কবে যাইবে? কেন যাইতেছে না? »

(৩) **ইচ্ছা-সূচক** বা **প্রার্থনা-সূচক** (Optative, Precative)—« তুমি যেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার; তুমি এখন যাও, কাল আসিও; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন »।

(৪) **আজ্ঞা-সূচক** (Imperative)—আজ্ঞা, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ প্রভৃতি প্রকাশ করে; যথা—« আমার কথা শোনো; গুরুজনের আজ্ঞা অমান্য করিও না; আমি বলি কি তুমি তার সঙ্গে দেখা করো »।

(৫) **কার্যকারণাত্মক** (Conditional)—এইরূপ বাক্যে কোনও নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত দ্যোতিত হয়; যথা—« টাকা পাইলে শোধ করিয়া দিব; মন দিয়া না পড়িলে কিছুই শিখা যায় না »। « যদি, যদ্যপি » ইত্যাদি অব্যয়ের প্রয়োগ এইরূপ বাক্যে হইয়া থাকে—« যদি আমি আসিতে না পারি, তুমি গাড়ী করিয়া চলিয়া যাইও »।

(৬) **সন্দেহ-দ্যোতক** (Dubitative)—নির্দেশ-সূচক বাক্যে « হয় তো, বুঝি, বোধ হয়, সম্ভবতঃ, নিশ্চয় » প্রভৃতি ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করিয়া, সন্দেহ-দ্যোতক বাক্য গঠিত হয়: « হয় তো সে আসিবে না; নিশ্চয়ই তাহার কর্তব্য সে করিয়া থাকে; বোধ হয় কাল তাহার দেখা পাইব; সে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে »।

(৭) **বিস্ময়াদি-বোধক** (Interjective)—এইরূপ বাক্যে হর্ষ, শোক, বিস্ময়, কাতরোক্তি ইত্যাদি দ্যোতিত হয়; যথা—« আঁা, কি বলিলে? উঃ, কি মারটাই মারিয়াছে! ধন্য দেশভক্তি! বেশ, খুব বলিয়াছ! কি সুন্দর দৃশ্য! মা গো, গেলাম! »।

[৪.৩] বাক্যে পদের ক্রম (Order of Words in the Sentence)

[১] বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকিতে পারে—« (তুমি) যাও; (আমি) দেবো না; চরিত্রহীন লোক পশুর সমান (হয়); ছেলেটী বড় ভাল (হয়); তোমার বাড়ী কোথায় (আছে, হইতেছে)? উনি আমার মামা (হন) »। সাধারণতঃ সর্বনাম, এবং অস্তিত্ব-বাচক ক্রিয়া, যাহা উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়-রূপে সম্পৃক্ত বিশেষ্য অথবা বিশেষণের সমতা প্রকাশ করে (অর্থাৎ **যোজক বা সমতা-বাচক** ক্রিয়া—Copula বা Equational Verb),—এই দুইটী উহ্য থাকে।

[২] উদ্দেশ্য বিধেয়ের পূর্বে বসে; যথা—« পাখী উড়ে; খোকা হাসে; সে কাল আসিবে; আমার বন্ধু আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন »।

কিন্তু পদ্যে ও গদ্য-কাব্যে এবং প্রবাদে ইহার ব্যত্যয় হয়; যথা—« ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন; তাঁর কত-মত ছিল আয়োজন; আছিল দেউল এক পর্বত-প্রমাণ »। « এক ছিল রাজা »—এই বাক্যটীর বিশ্লেষণ এইরূপ—« এক (এক জন বা এক ব্যক্তি) ছিল, (সেই ব্যক্তি) রাজা »।

[৩] উদ্দেশ্যের প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বে বসে: যথা— « ব্রাহ্মণের কালো গোরুটী আর দুধ দেয় না »। পরিপূরক পরে বসে—« ধার্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার »।

বিশেষণের মত সম্বন্ধ-পদও পূর্বে বসিয়া থাকে, কিন্তু কচিৎ ব্যতিক্রম হয়; যথা—প্রশ্নে: « ছুরী কার? »; নিশ্চয়ে: « ছুরী তোমার; দোষ আমারই »; ভাবে বা আদরে: « মা আমার! বাছা আমার »।

[৪] বিধেয়ের প্রসারক ও পূরক, বিধেয়ের পূর্বে বসে; এবং বিধেয়-ক্রিয়া, বাক্যের সর্বশেষে আসে। কেবল নঞর্থক বাক্যে « না, নাই

(«নি) » প্রভৃতি অব্যয়, বিধেয়ের পরে আসে। যদি বিধেয়ের প্রসারক থাকে, তাহা হইলে বিধেয়ের পূরক, প্রসারকের পূর্বে বা পরে বসিতে পারে; যেখানে পূরকের প্রতি বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেখানে ইহা পরে বসে। বিধেয়ের প্রসারক—ক্রিয়ার বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত নানা কারক এবং বাক্যাংশ। উদাহরণ—

« সে দ্রুত চলে; তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ? মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়; গাছ হইতে ফল পড়িল; সে ছাতের উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছে; বাড়ীর ভিতরে যাও; তাহাকে বেত দিয়া মারিল (বেত দিয়া তাহাকে মারিল); রাম দুধ দিয়া ভাত খাইতেছে; গুরু-মহাশয় ছেলেদের অঙ্ক কষাইতেছেন; মেঘে জল আছে; হিংস্র জন্তু বনে থাকে » ইত্যাদি।

কচিৎ বিশেষ শব্দের উপর ঝোঁক দিবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়: « শিক্ষকটী পড়ান ভাল, কিন্তু পরিশ্রম করিতে চাহেন না, গুরুমহাশয় দেখিতেছেন ছেলেদের হাতের লেখা »।

[৫] উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের প্রসারক এবং পূরকের অবস্থান-ক্রম:

বিধেয়ের প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বে বসিতে পারে, কিন্তু পূরক সর্বদা উদ্দেশ্যের পরেই বসে। বিধেয়ের প্রসারক-দ্বারা যদি কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, কিংবা তদ্দ্বারা কোনও অভিপ্রায় প্রকট হয়, তাহা হইলে তাহা সাধারণতঃ উদ্দেশ্য বা কর্তার পূর্বে বসে; যথা—« সত্য-সত্যই তিনি আসিতে পারিবেন না; ছেলেটীর উন্নতির জন্য তাহার শিক্ষক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহার পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে, অধিকন্তু ব্যাধিতে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া আছেন » ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বিশেষণ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পরেই বসে; কিন্তু ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত বাক্যাংশ পূর্বে বসিতে পারে; যথা—« রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত-

প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন »—এখানে « রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া » এই বাক্যাংশ উদ্দেশ্য « রাম » পদের পূর্বে বসিয়াছে।

কাল-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণ সাধারণতঃ স্থান-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণের পূর্বে বসে; « তুমি পরশু আমাদের বাড়ী আসিবে তো ? » (« তুমি আমাদের বাড়ী পরশু আসিবে তো ? » —এ ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা হইতেছে)। কাল- ও স্থান-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণ দিয়া বাক্যের আরম্ভ হইতে পারে—« পূর্বকালে অযোধ্যা-নগরীতে দশরথ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন »।

[৬] উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং বিধেয় বা ক্রিয়ার পরস্পরের মধ্যে, পুরুষ-বিষয়ক এবং গুরু-লঘু-বিষয়ক সঙ্গতি থাকা চাই; যথা—উত্তম-পুরুষের কর্তার সঙ্গে উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া, মধ্যম-পুরুষের তুচ্ছতা-বোধক রূপের সঙ্গে অনুরূপ ক্রিয়া, ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম-পুরুষের কর্তা থাকে, সেখানে উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়; উত্তম-পুরুষ না থাকিয়া মধ্যম-পুরুষ থাকিলে, মধ্যম-পুরুষেরই ক্রিয়া হয়; যথা—« তুমি আর আমি যাইব; তুমি আর আমি দুজনে যাবো; আমি, তুমি আর গোপাল তিন জনে এই কাজ করিয়া ফেলিব; হরি, সুশীল আর তুমি বলিয়াছিলে; বসিয়া বসিয়া তুই আর রাম সময় নষ্ট করিতেছিস্ কেন ? »।

ইংরেজীর অনুকরণে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ উত্তম-পুরুষ, এক-বচন উদ্দিষ্ট হইলেও, বহু-বচনের প্রয়োগ করেন; সম্পাদকগণ দল-বিশেষের মুখ-পাত্র-স্বরূপ এইরূপ লিখেন। « আমরা সরকারের অনুমোদিত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিতেছি; এ বিষয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমরা আমাদের মতামত বহুবার বিবৃত করিয়াছি »।

[৭] আশ্রিত খণ্ড-বাক্য, মূল বাক্যের অগ্রে বসে; « যদি আমি না আসি, তুমি তাহা হইলে একলা যাইও; আমি না এলে তুমি যেও না »। উদ্দেশ্য- বা কারণ-সূচক আশ্রিত খণ্ড-বাক্যের পরে, « বলিয়া »

এই অব্যয়-রূপে প্রযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, যোজকের কার্য করে : « সে তোমার সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া আজ রাত্রে আসিতেছে; রাগ হইয়াছিল বলিয়া বকিয়াছিলাম, মনে দুঃখ করিও না »। « রাম বলিয়া একটী ছেলে »—এস্থলে « বলিয়া » পদ, 'নামে' এই অর্থে প্রযুক্ত।

[৮] অনেকগুলি পদ উদ্দেশ্য-রূপে অথবা উদ্দেশ্যের প্রসারক-রূপে প্রযুক্ত হইলে, শেষ পদটীর পূর্বে সমুচ্চয়ার্থক বা বৈকল্পিক অব্যয়-পদ (যথা—« ও, এবং, বা, অথবা ») বসিবে. যথা—« রাম, শ্যাম, গোপাল ও সুবোধ বাড়ী আসিবে; সাধুচেতা, দয়াশীল ও পরহিতব্রত ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ »। এইরূপ অনেকগুলি পদ একই বাক্যে আসিলে, কখনও-কখনও সেগুলিকে কতকগুলি অর্থানুগত ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বিভক্ত করিয়া, একাধিক সংযোজকের দ্বারা যুক্ত করা যাইতে পারে; যথা—« তাঁহার উচ্চ বংশ ও পদ-মর্যাদা, বিদ্যা ও বুদ্ধি, চারিত্র্য ও কর্তব্য-নিষ্ঠা, সকলের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি ও অমায়িক ব্যবহার, সমস্ত মিলিয়া তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল »।

[৯] সংযোজক অব্যয়-দ্বারা সংযুক্ত এইরূপ কতকগুলি পদের মধ্যে, অন্ত্য পদটীতেই বহুবচন বা ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন সংযুক্ত হয়—সাধারণতঃ প্রত্যেক পদটীতে হয় না; যথা—« গুরু ও শিষ্যের একই গতি; আনন্দ (আনন্দে) ও কৃতজ্ঞতায় তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল; বন্ধু ও হিতৈষিগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভারত-বহির্ভূত অন্য জাতির তুলনায়, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর মধ্যে বৈষম্য অপেক্ষা সাম্যই অধিক; হিন্দু ও মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত; চাটুজ্যে আর মুখুজ্যেদের কর্তাক্স »। যদি বিশেষ করিয়া জানাইবার আবশ্যকতা থাকে যে আলোচ্য প্রস্তাবে পদ দুইটীর মধ্যে পার্থক্য বা বৈষম্য আছে, তাহা হইলে পৃথক্ প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে; যথা—« বরপক্ষের এবং কন্যাপক্ষের পুরোহিতদ্বয়; হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের প্রতিনিধিগণ;

অন্ধদিগকে ও খঞ্জদিগকে যথাক্রমে দুই আনা ও এক আনা করিয়া ভিক্ষা দেওয়া হইল *।

[১০] সংযোজক অব্যয়-দ্বারা যুক্ত না হইলে, কিংবা যুক্ত হইয়াও বস্তু-গত পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যেক পদে আবশ্যক বিভক্তি প্রত্যয়াদি বসিবে; যথা—* সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও; ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক; 'ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'; হাতে পায়ে খিল ধরা; চোখে মুখে কথা বলে: দেশের ও দশের সেবা; হিন্দুর ও মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচন; ধনের ও মানের কাঙ্গাল * ইত্যাদি।

সংযোজক অব্যয় না থাকিলে, বহুস্থলে সমাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এবং তদনুসারে সমস্ত-পদের শেষেই বিভক্তি হইবার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম যেন প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; যথা—* ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শাসন; হিন্দু-মুসলমানের একতা; রাজা-প্রজার সম্বন্ধ; অনাথ ছেলে-মেয়েদের কি গতি হইবে? *

[১১] একাধিক ক্রিয়া-পদের কাল-গত সঙ্গতি (Sequence of Tenses) বাঙ্গালায় নাই। পর পর কতকগুলি বাক্য আসিলে, প্রথম বাক্য বা প্রধান বাক্যের ক্রিয়া-পদের কাল অনুসরণ করিয়া, পরবর্তী অথবা অপ্রধান বাক্যের কাল নিয়ন্ত্রিত হয় না। এক্ষেত্রে ইংরেজীর এবং বাঙ্গালার বাক্য-রীতির মধ্যে একটা বড় প্রভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালায় ঘটনাবলীর বর্ণনায়, সাধারণতঃ সব ঘটনাগুলি পর পর পরিদৃশ্যমান বা ক্রিয়মাণ রূপে কল্পিত হয়—তদনুসারে, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বা বিশিষ্ট অবস্থা ধরিয়া নির্দিষ্ট হয়; যথা—* একটী কাচের পাত্রের ভিতরে একটী বাতী জ্বালিয়া রাখ; তাহার পর পাত্রটীর মুখ আর একটী কাচের পাত্র দিয়া সম্পূর্ণ-রূপে ঢাকিয়া দাও; খানিক পরে দেখিবে যে, বাতীটী নিবিয়া গেল। কাল তাহার বাড়ী গিয়াছিলাম,

তাহার দেখা পাইলাম না; তাহার ভাই বলিল যে সেদিন দেখা হইবে না, সে বলিয়া গিয়াছে যে দুই দিন পরে আসিবে »।

[১২] পরকীয় বা পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration)—অর্থাৎ যখন বক্তার উক্তি প্রত্যক্ষ-ভাবে বা যথাযথ-ভাবে স্বকীয়োক্তি (Direct Narration)-রূপে উত্তম-পুরুষে প্রতিবেদিত না হইয়া, প্রথম-পুরুষে প্রতিবেদিত হয়, তখনও বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের সঙ্গতি থাকে না; যথা—« সে বলিল যে সে আসিবে না (পরোক্ষ উক্তি); সে বলিল, 'আমি আসিব না' (প্রত্যক্ষ উক্তি) »; তুলনীয় ইংরেজী—He said, 'I shall not go', এবং He said he would not go.

[১৩] একই উদ্দেশ্যের অনেকগুলি বিধেয় বা ক্রিয়া-পদ পর পর আসিলে, বাঙ্গালায় সমুচ্চয়ার্থক অথবা সংযোজক অব্যয়-দ্বারা সংযুক্ত দুইয়ের অধিক সমাপিকা-ক্রিয়া সাধারণতঃ এক-ই বাক্যে প্রযুক্ত হয় না—মাত্র শেষ ক্রিয়া-পদটীকে, অথবা মধ্যের একটী ক্রিয়া-পদ ও শেষ ক্রিয়া-পদ এই দুইটীকে, সমাপিকা রূপে আনয়ন করিয়া, অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলিকে « -ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া-রূপে প্রয়োগ করা হয়; যথা—« সে বাড়ীর সদর দরজার কড়া নাড়িয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে একটী ঘরে ভূমিতে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া, রুগ্ণ শিশুকে কোলে লইয়া, জীর্ণবাস পরিধান করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা মাতা, অসহায় নৈরাশ্যের মূর্তিরূপে বসিয়া আছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া, চট্‌পট্ স্নানাহার সারিয়া লইয়া, একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া তাহার উপরে মাল-পত্র চড়াইয়া দিয়া, গাড়ী জোরে হাঁকাইয়া, দশটার মধ্যেই স্টেশনে পঁহুছিবে »।

[১৪] কতকগুলি পদ পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ-যুক্ত (Correlatives)—একটীর প্রয়োগ হইলে আর একটীর প্রয়োগ করা চাই, নহিলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকিবে; যথা—সর্বনাম—« যে, যিনি, যাহা—সে, তিনি,

তাহা »; সর্বনাম-জাত ক্রিয়া-বিশেষণ—« যেখানে, যেথা, যেথায়, যবে, যত, যেমন ইত্যাদি—সেখানে, সেথা, সেথায়, তবে, তত, তেমন »; অব্যয়—« যদি—তবে, তাহা হইলে; বটে—কিন্তু; যাই—তাই; না—না; এদিকে—ওদিকে » ইত্যাদি।

[১৫] সাধু- ও চলিত-ভাষায় নঞর্থক « না » অব্যয়, বাক্যের শেষে বসে; « আমি দিব না; তুমি ব'লো না; সে আসিল না »। কবিতায় ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে; « 'যেতে নাহি দিব'; 'না ভজিলাম রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে'; 'না যাইও না যাইও, বন্ধু, দূর দেশান্তর'; 'আপন কাজে না করিয়ো হেলা' »।

[১৬] দূরান্বয় যথাসম্ভব পরিহার্য; « কর্তা—কর্ম—ক্রিয়া »—এই ক্রম যতদূর সম্ভব রক্ষণীয়। ক্রিয়া হইতে বহুদূরে কর্তা ও কর্মের অবস্থান, বাঙ্গালা বাক্য-রীতির অনুমোদিত নহে। সেই হেতু, ও বক্তব্যের সংক্ষেপের জন্য, অনেকগুলি বাক্য সম্মিলিত করিবার চেষ্টা সাহিত্যের গদ্যে দেখা গেলেও, বাঙ্গালায় যতদূর সম্ভব ছোট-ছোট বাক্যই প্রশস্ত।

[৫] পরিশিষ্ট

[৫.১] বাঙ্গালা ছন্দ (Benga i Metrics বা Prosody)

[৫.১১] সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বাক্য-স্থিত (অথবা বাক্যাংশ-স্থিত) পদগুলিকে যে ভাবে সাজাইলে বাক্যটী শ্রুতি-মধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কাল-গত ও ধ্বনি-গত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে **ছন্দ** (বা **ছন্দঃ**) বলে।

পদগুলির অবস্থান এমন ভাবে হওয়া চাই, যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন না হয়, এবং রচনাটীর মধ্যে একটী সহজে লক্ষণীয় এবং সুসঙ্গত পরিপাটী বা আদর্শ (pattern) দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ছন্দের মুখ্য লক্ষণ—নির্দিষ্ট পরিপাটীতে গঠিত এবং নির্দিষ্ট কাল-মধ্যে উচ্চারিত কতকগুলি বিভিন্ন বাক্যাংশের পর পর অবস্থান।

সাধারণ বাক্যালাপে শ্বাস গ্রহণের জন্য ('দম লইবার জন্য') আমরা মাঝে-মাঝে থামিয়া থাকি। সেইরূপ থামা বা বিরামকে **ছেদ** (Pause, Breath-pause) বলে। সম্পূর্ণার্থ বাক্য বা বাক্যাংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ এই ছেদ পড়িয়া থাকে; সাধারণতঃ Sense-pause ও Breath-pause একই স্থানে আসে। বিরাম দীর্ঘকাল ধরিয়া হইলে, **পূর্ণচ্ছেদ** বলে, এবং অল্পকাল ধরিয়া হইলে, কেবল **ছেদ** বা **উপচ্ছেদ** বলে। এই প্রকার ছেদের আধারে, কবিতার বাক্যে যে বিরাম হয়, তাহাকে **যতি** (Metrical Pause) বলে। কালের দৈর্ঘ্য ধরিয়া «যতি»-কে দুই প্রকারের বলা যায়—**অর্ধ-যতি** ও **পূর্ণ-যতি**।

সাধারণতঃ বাক্যের « ছেদ » ও কবিতার « যতি » এক-ই স্থানে পড়ে, কিন্তু কথাবার্তার ভাষায় একটা সুসঙ্গত বা নির্ধারিত পরিপাটী না থাকায়, কথাবার্তার ভাষায় ও গদ্যে « ছেদ » পর পর নিয়মিত স্থানে পড়ে না ; কিন্তু সাধারণতঃ কবিতার ছন্দে এই ছেদ, যতি-রূপে, নির্ধারিত স্থানে পড়িয়া থাকে। আবার বহু স্থানে স্বাভাবিক গদ্যের « ছেদ » এবং ছন্দের « যতি », এই দুই, এক-ই স্থানে পড়ে না। যেমন,

নমি আমি * | কবিগুরু * ॥ তব পদাম্বুজে * ॥

—এখানে ছেদ ও যতি এক স্থানেই পড়িয়াছে। কিন্তু,

আর—ভ্রষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বাঁক না * রয় | পাড়া * ॥

—এই উদাহরণে, *-চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট ছেদ ও ।-চিহ্ন-দ্বারা নির্দিষ্ট যতি এক-ই স্থানে পড়ে নাই।

ছন্দে যে বিভিন্ন বাক্যাংশের মধ্যে বা অন্তরালে যতি অবস্থান করে, সেই বাক্যাংশকে **পর্ব** (Measure বা Bar) বলে। পর্ব ও যতির উপর বাঙ্গালা ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

প্রত্যেক ছন্দোগত বাক্যাংশ বা পর্বের মধ্যে দুইটী কি তিনটী শব্দ থাকে ; এই শব্দগুলি পর্ব-মধ্যে আবার **পর্বাঙ্গ** (Beat) রূপে বিভক্ত হয় ; যথা—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল | ঈশ্বরী পাটনী ॥
একা দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি ॥

—এই পয়ার শ্লোকটীতে, এক দাঁড়ি (|) ও দুই দাঁড়ি (॥) দ্বারা যথাক্রমে অর্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতি দেখানো হইয়াছে। « ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল » ও « একা দেখি কুলবধূ »—এই দুইটী পর্ব ; ইহাদের মধ্যে দুইটী করিয়া পর্বাঙ্গ—« ঈশ্বরীরে » ও « জিজ্ঞাসিল », এবং « একা দেখি » ও « কুলবধূ »।

পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম **চরণ**। চরণের পরে পূর্ণ-যতি আসে। আজকাল এক-একটী চরণ পৃথক্ এক-একটী পঙ্‌ক্তিতে লিখিত ও মুদ্রিত হয় বলিয়া, চরণকে অনেক সময়ে **ছন্দঃপঙ্‌ক্তি** (Verse Line) বলা হয়। চরণ বা ছন্দঃপঙ্‌ক্তির মধ্যে একাধিক নির্দিষ্ট সংখ্যার পর্ব থাকে। কখনও কখনও মাত্র একটী পর্বে ছন্দঃপঙ্‌ক্তি গঠিত হইয়া থাকে; যথা—

সীমন্তে গোধূলি-লগ্নে। দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর।
প্রদোষের তারা দিয়ে। লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর।
তার স্নিগ্ধ ভালে।

সাধারণতঃ দুইটী চরণের শেষের অক্ষরে (Syllable-এ) স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির **মিল** দেখা যায়। (কেবল স্বর অথবা কেবল ব্যঞ্জনের মিল, মিল নহে।) এই মিলকে **অন্ত্যানুপ্রাস** বা **মিত্রাক্ষর** (Rime) বলা হয়।

অন্ত্যানুপ্রাস-দ্বারা সংযুক্ত দুইটী চরণ মিলিয়া একটী **শ্লোক** (Distich বা Couplet), এবং দুইয়ের অধিক চরণ মিলিয়া একটী **স্তবক** (Stanza) গঠিত হয়। সাধারণতঃ শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে অর্থ সমাপ্ত হইয়া থাকে; যথা—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক। নাম-গোত্রহীন।
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল। অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে। কাননে সবাই।—
সূর্য উঠি বলে তারে।—"ভালো আছো ভাই?"।

প্রাচীন বাঙ্গালা ছন্দে প্রায় সর্বত্র এই অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। সংস্কৃতে অন্ত্যানুপ্রাস ছিল না বলিলেই হয়। ইংরেজীতে অন্ত্যানুপ্রাস-বিহীন ছন্দ আছে। তাহার অনুকরণে মহাকবি মধুসূদন দত্ত

(ও কালীপ্রসন্ন সিংহ) বাঙ্গালায় অন্ত্যানুপ্রাস-বিহীন ছন্দ রচনা করেন। এইরূপ ছন্দকে **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank Verse) বলে; যথা—

সম্মুখ-সমরে পড়ি' বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু চলি' যবে গেলা যমপুরে
অকালে—কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?

নির্দিষ্ট মাত্রা বা কাল-পরিমাণ ধরিয়া, বাঙ্গালা ছন্দ গঠিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ছন্দের এক-একটী পর্বাঙ্গ, পর্ব, এবং চরণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচ্চারিত হইবে। পর্ব ও পর্বাঙ্গের অন্তর্গত শব্দগুলির বিভিন্ন অক্ষরের উচ্চারণের উপরে এই কাল-পরিমাণ নির্ভর করে। একটী হ্রস্ব অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাহাকে এক মাত্রা (mora, instant) বলে; এবং দীর্ঘ অক্ষরে দুই মাত্রা সময় লাগে বলিয়া ধরা হয়। কখনও কখনও তিন মাত্রার অক্ষরও পাওয়া যায়।

মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহাতে ছত্রের মধ্যে পরিমিত অথবা নির্দিষ্ট অক্ষরের পরে যতি আসে না; এই জন্য এই ছন্দের একটী নূতন নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে—**অমিতাক্ষর**।

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ৪, ৬ ও ৮ মাত্রার পর্ব পাওয়া যায়। ১০ মাত্রার পর্বও কচিৎ মিলে। ৫ ও ৭ মাত্রারও পর্ব হয়। ৪ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ১০ অপেক্ষা বৃহৎ পর্ব হয় না। পর্বের মধ্যস্থ পর্বাঙ্গ ২+২, ৩+১, ১+৩, ৩+২, ২+৩, ৩+৩, ২+৪, ৪+২, ৪+৪ প্রভৃতি মাত্রা-সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ৪, ৫, ৬, ৮ প্রভৃতি মাত্রা পূর্ণ হয়।

« মনে পড়ে। সুয়ো রানী। দুয়ো রানীর। কথা। »
(২+২। ২+২। ২+২। ২।)
« পাখী সব। করে রব। রাতি পোহাইল। »
(৪+৪। ২+৪।)

সংস্কৃত, গ্রীক্, আরবী প্রভৃতি ভাষায় কোন্ অক্ষরে কি মাত্রা হইবে, সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সংস্কৃত ভাষায় « অ, ই, উ, ঋ, ৯ » এই কয়টী হ্রস্ব স্বর, একটী ব্যঞ্জনের পূর্বে এগুলি সর্বত্রই হ্রস্ব হইবে ; « আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ » এই কয়টী সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বর ; এবং তাহা ছাড়া, দুইটী বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন-বর্ণের পূর্বে থাকিলে, অথবা পরে একটী হসন্ত-যুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ থাকিলে, হ্রস্ব স্বর-বর্ণ « অ, ই, উ, ঋ, ৯ »-ও সংস্কৃতে দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হয় ; এই নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয় না। বাঙ্গালায় কিন্তু এরূপ বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। « অ, আ, ই, ঈ, এ, ও, ঐ, ঔ » এবং মিলিত দুইটী স্বর, অথবা দুইটী ব্যঞ্জন-বর্ণের পূর্বেকার হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বর (অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত স্বর—শব্দ-মধ্যে অবস্থিত হলন্ত স্বর) বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালায় হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ দুই-ই হইতে পারে। সাধারণতঃ স্বরান্ত অক্ষর বাঙ্গালায় হ্রস্ব হয়, এবং হলন্ত অক্ষর শব্দের শেষে থাকিলে দীর্ঘ হয়, অন্যত্র (বিশেষতঃ শ্বাসাঘাত-যুক্ত হইলে) হ্রস্ব হয়। কিন্তু ছন্দোবিশেষে—যেমন 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে—হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া পাঠ করা হয়।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ছন্দের প্রতি পর্বে হ্রস্ব ও দীর্ঘ মিলিয়া নির্ধারিত সংখ্যার মাত্রা হওয়া আবশ্যক। চরণের বিভিন্ন পর্বে এই হ্রস্ব ও দীর্ঘের সমাবেশ কি ভাবে হইবে, তাহাও বাঙ্গালা ছন্দে সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত থাকে।

অক্ষরের এবং তদনুসারে পর্বের মাত্রার সহিত বাঙ্গালা উচ্চারণের আর একটী বস্তু—« বল » বা « শ্বাসাঘাত » অথবা « স্বরাঘাত » (পূর্বে দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা ৮২-৮৪)—কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ছন্দের একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে ; কতকগুলি বাঙ্গালা ছন্দে বিভিন্ন পর্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়িয়া থাকে।

পর্বের পূর্ণ মাত্রা, এবং কচিৎ বিশেষ-বিশেষ অক্ষরে হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব,

ও কচিৎ পর্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত—এগুলি ছাড়া, সাধারণতঃ বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিবার সময়ে, একটা **টান** বা **সুর**-ও আসে। এই **টান** বা **সুর**-কে ইংরেজীতে Vocal Drawl বলে, এবং সংস্কৃতে ও তদনুসারে বাঙ্গালায় ইহাকে **তান** বলা যায়।

[৫.১২] ছন্দের বিভাগ

পর্বের নির্দিষ্ট মাত্রা বা দৈর্ঘ্যের আধারের উপরে, [১] সমগ্র চরণের টান বা তান, [২] পর্বস্থিত অক্ষরের সুপরিস্ফুট হ্রস্ব ও দীর্ঘ ধ্বনি, এবং [৩] পর্বের আদিতে অবস্থিত প্রবল শ্বাসাঘাত (জোর, বা বল)—এই তিনটী বিষয় বিচার করিয়া, বাঙ্গালা ছন্দকে তিনটী শ্রেণীতে ফেলা যায়—

[১] **তান-প্রধান ছন্দ** বা **পয়ারাদি ছন্দ**;

[২] **ধ্বনি-প্রধান ছন্দ** বা **বাঙ্গালা 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ**;

[৩] **বল-প্রধান ছন্দ** বা **শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ**।

উপর্যুক্ত তিন প্রকার ছন্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য হইতে কয়েকটী ছত্র, মূল-রচনায় (অমিত্রাক্ষর ছন্দে, তান-প্রধান পয়ারের আধারে গঠিত), এবং ছত্রগুলির বক্তব্য বিষয় ধ্বনি-প্রধান ও স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে নূতন করিয়া রচনা করিয়া, দেওয়া হইল।

[১] তান-প্রধান ছন্দ—

[১ক] পয়ারের আধারে অমিত্রাক্ষর—মূল—

> "কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
> নদীতটে; দেখিতাম তরল সলিলে
> নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
> নব নিশাকান্ত-কান্তি। কভু বা উঠিয়া
> পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি

নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ? »

(১।খ) পয়ার—

« কভু বা প্রভুর সনে বেড়াতাম সুখে।
চেয়ে চেয়ে (চাহি' চাহি') দেখিতাম তটিনীর বুকে॥
নূতন গগনে যেন নব-তারাবলী।
নব-শশধর-শোভা উঠিত উজলি'॥
কভু উঠিতাম দোঁহে পর্বত-শিখরে।
তুষিতেন প্রভু মোরে পরম আদরে॥
রসালের মূলে শোভে যেমন ব্রততী।
নাথের চরণ-তলে বসিতাম সতী॥
শুনিয়া বচন-সুধা জুড়াত শ্রবণ।
কেমনে তোমারে বলি সেই বিবরণ॥ »

(১।গ) লঘু ত্রিপদী—

« প্রভুরে লইয়া সুখেতে ভ্রমিয়া
দেখিতাম নদীজলে।
নূতন আকাশ নব পরকাশ,
নব তারা তাহে জ্বলে॥
নব শশধর, শোভা মনোহর,
কখনো গিরির শিরে।
হরষিত হিয়া বসিতাম গিয়া
নাথের চরণ ঘিরে॥
রসালের মূলে লতা যেন দুলে,
পরম আদরে প্রভু।
তুষিতেন মোরে— সে কাহিনী তোরে
বলিতে নারিব কভু॥ »

[২] ধ্বনি-প্রধান ছন্দ—

(২।ক) সংস্কৃতের অনুসারী—তোটক ছন্দ—

(— (বা |) চিহ্ন দ্বারা দীর্ঘ বা দুই মাত্রার এবং ˘ চিহ্ন দ্বারা হ্রস্ব বা একমাত্রার অক্ষর প্রদর্শিত হইতেছে।)

« কভু বা দুজনে ধার' হাত সুখে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তটিনীর তটে,
লখিতাম ঝলে—সলিলের বুকে,
নব-চন্দ্র-সভা গগনের পটে।
কভু বা উঠিয়া নগরাজ-শিরে
বসিতাম সুখে চরণের তলে—
পুলকে ডুবিয়া প্রণয়ে নিবিড়ে ;
স্মরিতে হরষে মন যে উথলে। »

(২।খ) সংস্কৃতের অনুকারী বাঙ্গালা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ—

« রে সখি, রে সখি, তোমায় বলিব কি [৮+৮=১৬ মাত্রা]
মধুর সেই ইতিহাস। [১২ মাত্রা]
দুজনে পাশে পাশে ভ্রমণ নদীতটে
নূতন নভ পরকাশ।
উঠিয়া গিরি শিরে প্রভুর পদতলে
নীরবে বসিতাম লাজে।
আদর করি স্বামী তুষিত অধিনীরে
বরষি বচন-সুধা কানে।
কাহিনী পুরাতন স্মরণে ঝরে আঁখি,
বিষম ব্যথা বাজে প্রাণে। »

(২গ) আধুনিক শুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্ধতির ধ্বনি-প্রধান ছন্দ (বাঙ্গালা মাত্রাবৃত্ত)—

« শোন্ সখি শোন্, আমরা দুজন—নির্জন নদীতীর ;
ছল্‌ছল্ জল ধায় অবিরল—চঞ্চল, অস্থির,—
তবু পেতে ফাঁদ বুকে ধরে চাঁদ, তারা-হার সাথে তার—
সুখে দেখিতাম ; কভু উঠিতাম পর্বত চূড়াকার—
করিয়া যতন লতার মতন ও দুটী চরণ ঘিরে
বসিতে আদরে, তুমি' প্রভু মোরে বলিতেন ধীরে ধীরে
প্রেমের বচন—লাজ মানে মন বলিতে সে-সব কথা !
সেদিন কোথায়, আজ কোথা হায়, স্মরণে বিষম ব্যথা। »

[৩] বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ—

(' চিহ্নদ্বারা পর্বের আদিতে অবস্থিত বল বা শ্বাসাঘাত নির্দিষ্ট হইতেছে।)

« 'নদীর ধারে 'প্রভুর সনে 'বেড়াই ঘুরে 'ফিরে',
'ঝিল্‌মিলিয়ে' 'উঠ্‌ত আকাশ 'তরল নদী-'নীরে।
'লক্ষ তারার 'মাঝে যেন 'ফুটত নোতুন 'চাঁদ,
'গিরির শিরে 'রইত পাতা 'নোতুনতরো 'ফাঁদ।
'ক্লান্ত হ'য়ে 'চুপ্‌টি ক'রে 'প্রভুর পায়ের 'কাছে
'পেতেম শোভা, 'লতা যেমন 'জড়িয়ে' থাকে 'গাছে।
'তুষ্ট মোরে 'ক'র্‌ত প্রভু, 'মিষ্ট বচন 'ক'য়ে ;
'কার বা বলি, 'মনের দুঃখে 'সকল আছি 'স'য়ে। »

[৩.১৩] বিভিন্ন প্রকারের ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয়

[১] তান-প্রধান ছন্দ (পয়ারাদি)

এই ছন্দই বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশী করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে syllable বা অক্ষরের হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য, সমগ্র পর্ব ও চরণের টানের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত। সমগ্র চরণের অন্তর্গত পর্বগুলি

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চারিত হয়, এবং সাধারণতঃ পর্ব-মধ্যে যতগুলি মাত্রা থাকে, ততগুলি হ্রস্ব syllable বা অক্ষর থাকে ; কেবল শব্দের শেষে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর কানে শোনা গেলে, সেই অক্ষর দীর্ঘ বা দুই মাত্রার হইয়া দাঁড়ায়, ব্যঞ্জনান্ত না করিয়া স্বরান্ত করিয়া পড়িলে, দুইটী অক্ষরে এক মাত্রা এক মাত্রা করিয়া দুই মাত্রা হয়। শব্দের মধ্যে সংযুক্ত-বর্ণের পূর্বেকার স্বর-ধ্বনিও এক মাত্রার বলিয়া ধরা হয় ; যেমন—

« সম্মুখ-সমরে পড়ি'। বীর-চূড়ামণি »—

প্রত্যেক শব্দ স্বরান্ত করিয়া পড়িলে, এই ছত্রে চৌদ্দটী syllable বা অক্ষরকে এক এক হ্রস্ব মাত্রার ধরিয়া ১৪ মাত্রা। (অর্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতিতে যে বিরাম, তাহা ধরিয়া ২ মাত্রা, এইরূপে পয়ারের একটী পংক্তিতে সাকল্যে ১৬ মাত্রা ধরা যাইতে পারে।) আবার হলন্ত করিয়া পড়িলে

« সম্মুখ্-সমরে পড়ি'। বীর্-চূড়ামণি »—

এখানে « মুখ্অ » ও « বীর্অ » স্থলে « মুখ্ » ও « বীর্ », এই প্রকার দুইটী দীর্ঘ একাক্ষরের শব্দ-রূপে পড়িলে, এই শব্দ দুইটীর প্রত্যেকটীকে দুই মাত্রার করিয়া ধরিতে হইবে ; তাহা হইলেও চরণটীর অক্ষরগুলির মাত্রা-সংখ্যা পূর্বের মতই ১৪ থাকে।

এই প্রকারের ছন্দের পাঠ-কালে যে টান বা সুর আসে, তাহাতেই বিভিন্ন অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদের একটা সামঞ্জস্য হইয়া যায় ; পরের অক্ষরের বা স্বর-বর্ণের লোপের ফলে ইচ্ছা করিয়া দীর্ঘ না করিয়া দিলে (যেমন উপরের দৃষ্টান্তে « মু-খ » এই দুই হ্রস্ব অক্ষরকে, খ-এর স্বরধ্বনি অ-কে লোপ করিয়া দিয়া দীর্ঘ একাক্ষর « মুখ্ » -তে পরিবর্তন) প্রত্যেক অক্ষরকে—স্বরান্ত, অথবা যুক্ত-স্বরের পূর্বে হইলেও—হ্রস্ব-রূপেই ধরা হয়। তান-প্রধান ছন্দের তান বা টান, অর্থাৎ সুরটুকু, যেন স্বভাবতঃ দীর্ঘ অক্ষরকে শোষণ করিয়া লইয়া, আবশ্যক-মত হ্রস্ব করিয়া দেয়।

বাঙ্গালার পয়ার নামক দ্বিপঙ্‌ক্তিময় শ্লোক বা পদ এই তান-প্রধান ছন্দের মধ্যে প্রধান। শ্বাসাঘাতের প্রাধান্য বা প্রাবল্য ইহাতে থাকে না। চারি-পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার সাধারণ বাঙ্গালা কথা-বার্তার ভাষার আধারের উপরে, পয়ার প্রভৃতি তান-প্রধান ছন্দ প্রতিষ্ঠিত ; বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় তাবৎ গম্ভীর ভাবের রচনা—কাব্য, মহাকাব্য, চিন্তাপূর্ণ কবিতা—এই ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে।

[১ক] পয়ার—

প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর ও দুইটী যতি—চৌদ্দ অক্ষর, ৮+৬ এই দুই পর্বে বিভক্ত ; চৌদ্দ হ্রস্ব (অর্থাৎ এক মাত্রার) অক্ষরে (বা একটী অক্ষর অনুচ্চারিত হইলে তাহার পূর্ব অক্ষরকে দুই মাত্রার ধরিয়া) চৌদ্দ মাত্রা। দুইটী চরণের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের দ্বারা মিল থাকে, এইরূপে দুইটী চরণ মিলিয়া একটী পয়ার হয়। প্রাচীন কবিদের রচিত, এবং তাঁহাদের ধরণে লেখা পয়ারে, পয়ারের দুই পঙ্‌ক্তির বাহিরে অর্থ যায় না, দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যেই বাক্য সম্পূর্ণ হয় ; যথা—

« এদেশে রহিল বাস। যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি কাঁদে প্রাণ। তারে পাবো কিসে। »

« মহাভারতের কথা। অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুণ্যবান। »

« পাখী সব করে রব। রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম-কলি। সকলি ফুটিল। »

« তোমারে হেরিয়া তারা। হ'তেছে ব্যাকুল।
অকালে ফুটিতে চাহে। সকল মুকুল। »

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে পয়ারের দুই ছত্রের শেষের অন্ত্যানুপ্রাস ভিন্ন, প্রতি ছত্রের মধ্যে চতুর্থ অক্ষরে ও অষ্টম-অক্ষরে অতিরিক্ত অন্ত্যানুপ্রাস

আনয়ন করিয়া, পয়ারের একটী রূপভেদ « তরল পয়ার » ছন্দ গঠিত হইত ; যথা—

« দেখ দ্বিজ। মনসিজ। জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র। যুগ্মনেত্র। পরশয়ে শ্রুতি। »

চতুর্থ ও অষ্টমের অতিরিক্ত দ্বাদশ অক্ষরে অন্ত্যানুপ্রাস থাকিলে, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত « মাল-ঝাঁপ পয়ার » হয় ; যথা—

« কোতোয়াল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল। ঝাঁকে।
ধরি বাণ। খর শাণ। হান্ হান্। হাঁকে। »

পুরাতন বাঙ্গালা কাব্যে পয়ারের কতকগুলি রূপভেদ, যথা—« হীন পদ পয়ার » ও « ভঙ্গ পয়ার » পাওয়া যায়। আজকাল এই-সব ধরণের পয়ার ততটা প্রচলিত নহে।

পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস উঠাইয়া দিয়া, নির্দিষ্ট যতি-স্থলে, ছত্র-মধ্যে যতি বা বিরামের বৈচিত্র্য আনিয়া, এবং দুইয়ের অধিক ছত্রে ভাবকে প্রসারিত করিয়া দিয়া, ইংরেজী Blank Verse-এর অনুকরণে, পয়ারের আধারে, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহাকবি মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালার **অমিত্রাক্ষর ছন্দ** (Blank Verse) সৃষ্টি করেন। অমিত্রাক্ষরের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৪৪৯, ৪৫০)। আধুনিক কালে বহু কবি নূতন ধরণের পয়ার রচনা করেন, এই নূতন পয়ারে যতির বৈচিত্র্য থাকে,—যতি ইচ্ছামত ৪, ৬, ৮, ১০ অক্ষরের পরে রাখা হয়, কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস থাকে। এইরূপ পয়ারকে « সঞ্চারিত পয়ার » বলা যায় ; যথা—

« এত কহি' ঋষিপদে করিয়া প্রণতি,
গেলা চলি' সত্যকাম। ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া, পদব্রজে হ'য়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে

সুপ্তি-মৌন গ্রাম-প্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ। ঘরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালা,
দাঁড়ায়ে' দুয়ার ধরি' জননী অবালা
পুত্র-পথ চাহি'।»

এইরূপ পয়ারে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে, একটী পয়ারের বা শ্লোকের মধ্যেই অর্থ নিবদ্ধ থাকে না; বাক্য অনেকগুলি পঙ্‌ক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

চৌদ্দ অক্ষরের দুইটী পঙ্‌ক্তিতে পয়ার হয়। এইরূপ চারিটী বা অধিক সংখ্যক পঙ্‌ক্তি লইয়া, অন্ত্য-মিলের রকম-ফের করিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে পয়ারের আধারে বিভিন্ন প্রকারের স্তবক (Stanza) গঠিত হয়। « ক খ ক খ »—চারি পঙ্‌ক্তিতে পর পর এইরূপ মিল হইলে, « পর্যায়-সম পয়ার » হয়; « ক খ খ ক »—এইরূপ মিল হইলে, « মধ্য-সম পয়ার » বলে; যথা—

« কে পারে ছাড়িতে এই প্রফুল্ল অবনী—
সুন্দর রবির করে এ মহী মণ্ডিত?
মুমূর্ষু পরাণী নরে কে আছে এমনি,
পরাণে না হয় যার বাসনা উদিত? »

« বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে,
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে;
ইচ্ছা করে—যেতে পারে নরক-ভিতরে;
স্বর্গ-নরকের দ্বার তাহাদের হাতে। »

পয়ারের মত চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটী চরণ বা পঙ্‌ক্তি লইয়া যে কবিতা রচিত হয়, তাহাকে « চতুর্দশপদী কবিতা » বলে। ইহা ইউরোপীয় Sonnet সনেট কবিতার অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদন দত্ত-কর্তৃক প্রথম প্রযুক্ত হয়। সনেট ইতালীয় কাব্যের সৃষ্টি, পরে ইহা ইংরেজীতে

গৃহীত হয়। সনেটের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের বিভিন্ন রকম-ফের থাকে। তদনুসারে বাঙ্গালাতেও সনেটের প্রকার-ভেদ আছে। অল্পের মধ্যে একটী পূর্ণ ভাব প্রকাশের পক্ষে সনেট বিশেষ উপযোগী। সনেটে যতির বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই,—ইচ্ছামত ৪, ৬, ৮, ১০ বা ১২ অক্ষরে হইতে পারে। সনেটে « কখকখ। কখকখ। গঘঘগ। ঙঙ », « কখখক। কখখক। গঘঙ। গঘঙ » প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অন্ত্যানুপ্রাস হইতে পারে।

[১।খ] ত্রিপদী—

ইহাতে প্রত্যেক চরণে তিনটী করিয়া যতি থাকে। প্রচলিত ত্রিপদী দুই প্রকারের—(১) « লঘু ত্রিপদী », ইহাতে প্রতি চরণে যে তিনটী করিয়া পর্ব থাকে, সেগুলিতে যথাক্রমে ৬+৬+৮ মাত্রা বা অক্ষর হয়; যথা—

« কৈলাস ভূধর। অতি মনোহর। কোটি শশী পরকাশ ॥
গন্ধর্ব কিন্নর। যক্ষ বিদ্যাধর। অপ্সরোগণের বাস ॥ »
« চণ্ডীদাস বলে। শুন সখাগণ। অপার যাহার লীলা ॥
রাখাল-মণ্ডলে। রাখালি করিয়া। করে নানা মত খেলা ॥ »

(২) « দীর্ঘ ত্রিপদী » বা « লাচাড়ী »—ইহার তিনটী পর্বের মাত্রা বা অক্ষর যথাক্রমে ৮+৮+১০; যথা—

« যশোর নগর ধাম। প্রতাপ-আদিত্য নাম। মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ ॥
নাহি মানে পাতশায়। কেহ নাহি আঁটে তায়। ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥ »
« বড়ু চণ্ডীদাস কহে। সদাই অন্তর দহে। পাসরিলে না যায় পাসরা ॥
দেখিতে দেখিতে হরে। তনু মন চুরি করে। না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা ॥ »
« আশ্বিনের মাঝামাঝি। উঠিল বাজনা বাজি', । পূজার সময় এল' কাছে ॥
মধু বিধু দুই ভাই। ছুটাছুটি করে তাই, । আনন্দে দু হাত তুলি' নাচে ॥ »

অন্য প্রকারের ত্রিপদীও হয়; যথা—৮+৮+৬:

« নদী তীরে বৃন্দাবনে। সনাতন একমনে। জপিছেন নাম ॥
হেন কালে দীন বেশে। ব্রাহ্মণ চরণে এসে। করিল প্রণাম ॥ »

ত্রিপদীর আধারে «ভঙ্গ ত্রিপদী» ছন্দ আছে—

«ওরে বাছা ধূমকেতু। মা-বাপের পুণ্য-হেতু।
কাটি' কেল' চোরে। ছাড়ি' দেহ মোরে। ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু।»

[১গ] চৌপদী—

প্রতি চরণে চারিটী করিয়া যতি থাকে, এইজন্য এই নাম (চতুষ্পদী বা চৌপদী)। লঘু ও দীর্ঘ দুই প্রকারের চৌপদী হয়।

(১) «লঘু চৌপদী»—৬+৬+৬+৬, বা শেষ চরণে ছয়ের কম, এইরূপ অক্ষর-সমাবেশ থাকিলে, দুই চরণ সম্পূর্ণ হয়; যথা—

«চির সুখী জন। ভ্রমে কি কখন। ব্যথিত-বেদন। বুঝিতে পারে?। (৬+৬+৬+৫)
কি যাতনা বিষে। বুঝিবে সে কিসে। কভু আশীবিষে। দংশেনি যারে?»। („)
«সাজিল সঘন। সেনা অগণন। করিবারে রণ। চলিল। (৬+৬+৬+৩)
শিরে পরি' তাজ। যত বীরসাজ। সাজ সাজ সাজ। বলিল।» („)

(২) «দীর্ঘ চৌপদী»—৮+৮+৮+৮; শেষ চরণ ৭, ৬ বা ৫ অক্ষরেরও হয়; যথা—

«নিত্য তুমি খেল যাহা। নিত্য ভাল নহে তাহা। আমি যে খেলিতে কহি। সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও। সে চাহনি কোথা পাও। ভারত যেমত চাহে। সেই মত চাও হে।»

চৌপদীর মত নানা প্রকার পর্বের সমাবেশে বিভিন্ন স্তবক (Stanza) গঠিত হইয়া থাকে।

[১ঘ] একাবলী—

শেষে মিল-যুক্ত দুইটী ছত্র, প্রতি ছত্রে এগারটী করিয়া অক্ষর থাকে; যথা—

«এই রূপ ধ্যান করি' মানসে।
সমরে সকলে যায় সাহসে।

ধন্ত রে ধরমে রতি অপার।
তা ভিন্ন এ ভবে আছে কি আর?»

[১৩] দীর্ঘ একাবলী—

প্রতি ছত্রে বারটী করিয়া অক্ষর থাকে, ও ছত্র দুইটীর শেষ অক্ষরে মিল থাকে; যথা—

« কনকে রতনে রজতে জড়িত।
আভরণ সেথা ছিল কত মত।»

[২] ধ্বনি-প্রধান ছন্দ

ধ্বনি-প্রধান ছন্দে প্রত্যেক পর্বের মাত্রার সংখ্যা সুনির্দিষ্ট, কিন্তু পাঠ-কালে কোনও টান থাকে না। একটানা সমস্ত চরণটা পড়িয়া যাইতে পারা যায়, শব্দের মাঝে-মাঝে ফাঁক থাকে না—যতির স্থানে না থামিয়াও চরণ শেষ করা যায়।

বাঙ্গালার ধ্বনি-প্রধান ছন্দ দুই প্রকারের—

(ক) সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাঙ্গালা ভাষায় অনুকরণ—ইহাতে সংস্কৃত নিয়মে « অ, ই, উ, ঋ ১ »-কে হ্রস্ব স্বর (এক মাত্রার), এবং সংযুক্ত বর্ণের পূর্বে অবস্থিত « অ, ই, উ, ঋ, ১ »-কে তথা « আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ »-কে দীর্ঘ স্বর (দুই মাত্রার) ধরিয়া, পর্বের মধ্যে মাত্রা স্থির করা হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ ধ্বনি-প্রধান ছন্দ কিছু-কিছু পাওয়া যায়; আজকাল ইহার ব্যবহার বিরল,—এই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত, বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধে। উদাহরণ, যথা—

তোটক ছন্দ (চরণে বারটী অক্ষরে ১৬ মাত্রা—তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু বা দীর্ঘ)—

« দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দ ভণে।
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে।»

ভুজঙ্গপ্রয়াত (ইহাতেও বারটী অক্ষর কিন্তু ২০ মাত্রা—প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম অক্ষর লঘু)—

« মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট-জটাজুট-সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলকল্ তরঙ্গা॥ »

(খ) বাঙ্গালা পদ্ধতির ধ্বনি-প্রধান ছন্দ (বাঙ্গালা মাত্রা-বৃত্ত)—ইহাতে কোনও বিশেষ স্বর-ধ্বনি হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহে, সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরও এই বাঙ্গালা ছন্দে হ্রস্ব-রূপে উচ্চারিত হয়।

(খ।১) প্রাচীন বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তে সংযুক্ত-বর্ণের পূর্বের স্বর-ধ্বনি এবং « ঐ, ঔ » স্বর দুইটী, দীর্ঘ বা দুই মাত্রার হয়, এবং ক্বচিৎ সংস্কৃতের নকলে « আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ও »-ও দীর্ঘ বলিয়া পঠিত হয়। পর্বের শেষের এবং অন্যত্র অবস্থিত হ্রস্ব স্বরও ক্বচিৎ দীর্ঘ হইয়া থাকে ; যথা—

« ধামার্থে চাটিল। সাঙ্কম গঢ়ই॥ (৮+৮=১৬ মাত্রা)
পারগামি লোঅ। নীভর তরই॥ » (৮+৮=১৬ মাত্রা)

(=ধর্মের-জন্য (গুরু) চাটিল-পাদ সাঁকো গড়ে, পারগামী লোক নির্ভর (করিয়া) তরে।)

« চম্পক দাম হেরি। চিত অতি কম্পিত। লোচনে বহে অনু। রাগ॥ (৮+৮+৮+৪)
তুয়া রূপ অন্তর। জাগয়ে নিরন্তর। ধনি ধনি তোহারি সো। হাগ॥ » (৮+৮+৮+৪)

(খ।২) আধুনিক বাঙ্গালা ধ্বনি-প্রধান ছন্দে, অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম তান-প্রধান ছন্দেরই মত—কেবল হলন্ত অক্ষরকে একটু টানিয়া দীর্ঘ করিয়া পড়া হয়। একটানা, যেন গা ছাড়িয়া দিয়া, এক লয়ে সমস্ত

চরণ এই ছন্দে উচ্চারিত হয়। প্রতি পর্বে syllable বা অক্ষরের সংখ্যা, পর্ব-নির্দিষ্ট মাত্রার সংখ্যা অপেক্ষা কম হইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে পর্বস্থ এক বা একাধিক অক্ষরকে (স্বরান্ত অক্ষর হইলেও) দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিয়া, মাত্রার সংখ্যা অথবা কালের পরিমাণ ঠিক রাখা হয়; যথা—

« নিত্য তোমায়—চিত্ত ভ'রিয়া—স্মরণ করি।
বিশ্ব-বিহীন—বিজনে বসিয়া—বরণ করি।
তুমি আছো মোর—জীবন মরণ—হরণ করি। »

« শুধু বিঘে দুই—আছে মোর ভুঁই—আর সব গেছে—ঋণে।
বাবু কহিলেন—বুঝেছ উপেন—ও জমি লইব—কিনে। »

« মাঝে মাঝে যেন—চেনা-চেনা মত—মনে হয় থেকে—থেকে।
নিমেষ ফেলিতে—দেখিতে না পাই—কোথা পথ যায়—বেঁকে।
মনে হ'ল মেঘ—মনে হ'ল পাখী—মনে হ'ল কিশ—লয়।
ভালো ক'রে যেই—দেখিবারে যাই—মনে হ'ল কিছু—নয়। »

« মুক্ত বেণীর—গঙ্গা যেথায়—মুক্তি বিতরে—রঙ্গে।
আমরা বাঙ্গালী—বাস করি সেই—তীর্থে বরদ—বঙ্গে।......
বাঘের সঙ্গে—যুদ্ধ করিয়া—আমরা বাঁ'চয়া—আছি।
আমরা হেলায়—নাগের খেলাই—নাগেরি মাথায়—নাচি।......
বাঙ্গালীর হিয়া—অমিয় মথিয়া—নিমাই ধ'রেছে—কায়া। »

৬+৬+৬+২—এইরূপ পর্ব-সমাবেশ এই ছন্দে খুবই সাধারণ।

« নারদ ঋষিবর। কম্পিত থরথর। বিশ্ব-বিদারণ। হুঙ্কার শ্রবণে।
মানস-বিচলিত। নেত্র বিকাশিত। সংবৃত শ্রুতিপথ। নিরখিলা গগনে। »

প্রতি পর্বে আট মাত্রা, এই আট মাত্রা পূরণ করিবার জন্য আবশ্যক মত স্বরান্ত অক্ষরকেও দীর্ঘ করা হইয়াছে।

— ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ — ◡ ◡ —
« চীন গগন হ'তে। পূর্ব পবন-স্রোতে। শ্যামল রসধর। পুঞ্জ॥
— ◡ — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡ — ◡ —
শ্রাবণ বাসরে। রস ঝর-ঝর ঝরে। ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ হে। ভুঞ্জ॥

শেষ দুইটী উদাহরণে স্থানে স্থানে স্বরান্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিবার আবশ্যকতা আসায়, এই ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের মত শুনায়।

[৩] বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ

এই-জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্বে প্রথমে একটী প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনান্ত syllable বা অক্ষর সঙ্কুচিত বা হ্রস্ব হইয়া উচ্চারিত হয়—অন্য প্রকার ছন্দে কিন্তু এইরূপ স্থলে ব্যঞ্জনান্ত স্বর প্রসারিত বা দীর্ঘ হইয়া যাইতে পারে। শ্বাসাঘাতের এই সঙ্কোচন-শক্তি, বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের বিশেষ লক্ষণ। এই ছন্দের বৈচিত্র্য অধিক নহে, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শ্বাসাঘাতের পুনরাবৃত্তি হওয়া চাই। সাধারণতঃ এই ছন্দে চরণের প্রতি পর্বে চারি মাত্রা ও দুইটী পর্বাঙ্গ থাকে; চরণে চারিটী করিয়া পর্ব থাকে, তাহার শেষ পর্বটী অপূর্ণ হয়।

« 'সাম্‌নেকে তুই। 'ভয় ক'রেছিস্? । পিছন তোরে। 'ঘির্‌বে?।
'এম্‌নি কি তুই। 'ভাগাহারা ?। 'ছিঁড়্‌বে বাঁধন। 'ছিঁড়্‌বে॥ »

« 'দিনের আলো। 'নিবে এলো,। 'সুয্যি ডোবে। 'ডোবে।
'আকাশ ঘিরে'। 'মেঘ জুটেছে। 'চাঁদের লোভে। 'লোভে॥ »

« 'মেঘের উপর। 'মেঘ ক'রেছে,। 'রঙের উপর। 'রঙ্।
'মন্দিরেতে। 'কাঁসর-ঘণ্টা। 'বাজল ঠঙ্। 'ঠঙ্॥ »

« 'আকাশ জুড়ে'। 'ঢল নেমেছে,। 'সুয্যি চ'লে। 'ছে।
'চাঁদের চুলে। 'জলের গুঁড়ি,। 'মুক্তো ফ'লে। 'ছে॥ »

« 'ভোর হ'লরে। 'ফরসা হ'ল। 'ফুটল উষার। 'ফুল-দোলা।
আন্‌কো আলোয়। 'যায় দেখা ঐ। 'পদ্মকলির। 'হাই-তোলা॥ »

একই কবিতার মধ্যে তান-প্রধান, ধ্বনি-প্রধান ও বল-প্রধান—এই তিন প্রকার ছন্দের পরস্পরের মিশ্রণ হয় না। একই প্রকার ছন্দে রচিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব লইয়া গঠিত চরণের যোগে নানা প্রকার **স্তবক** (Stanza) আজকাল বাঙ্গালা কবিতায় খুবই প্রচলিত। এইরূপ কতকগুলি স্তবকের আকার ও আখ্যা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বাঙ্গালায় ইংরেজী এবং আরবী-ফারসী ছন্দের অনুকরণে নানাপ্রকার নূতন ধরণের স্তবকের প্রয়োগ দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব স্তবকের আধার হইতেছে ধ্বনি-প্রধান ছন্দ। তবে এগুলি সাধারণ নহে।

[৫.১৪] কবিতার ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য

[১] প্রায় সব ভাষাতেই দেখা যায়, কবিতার ভাষায় অনেক প্রাচীন শব্দ এবং রূপ সংরক্ষিত থাকে; কারণ কবিতার ধারা প্রাচীন কাল হইতেই ভাষায় স্থিরীকৃত হইয়া যায়। সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় অথবা লিখিত গদ্য-ভাষায় অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ বহু প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালা কবিতার ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—

« দিঠি (দৃষ্টি), নিঠুর (নিষ্ঠুর), অমিয়া (অমৃত), হিয়া (হৃদয়), বয়ান (বদন), সায়র (সাগর), চিত (চিত্ত), পিয়াস (পিপাসা), নিদয় (নির্দয়), সরম (লজ্জা—এটী ফারসী শব্দ, 'শর্‌ম্'), রাতা রাতুল (রক্তবর্ণ), ঝি ঝিয়ারী (কন্যা), দেউটী (দীপবর্তিকা বা প্রদীপ), হেরিনু (দেখিলাম), তিতিল (ভিজিল), নারিব (পারিব না), ভণে

(বলে), বাহুড়িল নেউটিল (ফিরিয়া আসিল), ঝুরে (কাঁদে), ঝুলে (ঝুরে), জিনিয়া (জয় করিয়া), পুছিল (জিজ্ঞাসা করিল), আছিল (ছিল), 'পর (উপরে), উরিল (অবতীর্ণ হইল), উয়ে (উদিত হয়), তেঁই (সেইজন্য), হেদে (=সম্বোধনে, ওগো) » ইত্যাদি।

[২] কতকগুলি ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ কবিতায় প্রযুক্ত হয় ; যেমন—

« নাচিছে নর্তক, গাহিছে গায়কী। »

« হংকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে
দুঃখ নহে, যদি তাহে হয় উপকার। »

« সৃজন-পালন-প্রভু তুমি নির্বিকার। »

[৩] সংস্কৃতের শব্দে উচ্চারণে কঠিন অথবা শ্রবণে কটু সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, অনেক সময়ে « বিপ্রকর্ষ » অনুসারে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে নূতন স্বর-ধ্বনি আনয়ন করিয়া শব্দগুলিকে সহজে উচ্চার্য এবং শ্রুতি-মধুর করিয়া লওয়া হয় ; যথা—

« তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি। »

তদ্রূপ—« ভকতি, মুকতি, দরশন, পরশ (=স্পর্শ), গরজন, নিরদয়, ধরম, করম, পরাণ, পিরীতি (=প্রীতি), পরবাস, মরম, মুকুতা, বরণ, বেয়াকুল, জোগ, বেয়াধি, মুগধ, পদুমিনী, পরবাদ, সিনান (=স্নান), দুরুবার (=দুর্বার) » ইত্যাদি।

[৪] কবিগণ অনেক সময়ে ছন্দের খাতিরে সাধু-ভাষার সহিত চলিত-ভাষার মিশ্রণ করিয়া থাকেন—গদ্যে এরূপ মিশ্রণ দোষের হয়। যথা—

« আর কত দূরে নিয়ে' যাবে (=লইয়া যাইবে) মোরে, হে সুন্দরী ?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ? »

« গান গেয়ে' তরী বেয়ে' কে আসে পারে ?
দেখে' যেন মনে হয়—চিনি উহারে। »

[৫] শব্দ-রূপে, কর্মকারকে ও সম্প্রদান-কারকে « -কে » বিভক্তি-স্থলে « -রে » এবং « -এ » বিভক্তির প্রয়োগ, কাব্যের ভাষার একটী বৈশিষ্ট্য ; যথা—

« আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ; »

« জিজ্ঞাসিব জনে জনে ; »

« কোন্ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? »

কবিতায় বিশেষ্য ও সর্বনামের সহিত কতকগুলি বিশেষ শব্দ বিভক্তি-রূপে প্রযুক্ত হয় ; যথা—

« যাহার লাগিয়া=যাহার জন্য, বন্ধুর লাগি'=বন্ধুর জন্য ; মো-সনে=আমার সঙ্গে ; সখী-সনে ; তার সাথে=তাহার সঙ্গে » ('সাথে' পদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু « সাথে » শব্দ চলিত ভাষার ও সাধু-ভাষার গদ্যের উপযোগী নহে—চলিত-ভাষার ও সাধু-ভাষার গদ্যে « সঙ্গে » শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে) ।

[৬] সর্বনাম-মধ্যে, উত্তম-পুরুষে « মো » (বহুবচনে « মোরা »), এবং « তথি=সেথায়, তাহাতে ; হেন=এইরূপ » প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

[৭] ধাতু-রূপ—

বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দ কাব্যে অনেক সময়ে ধাতু-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—« নীরবিলা (=নীরব হইল) রক্ষো-রাজ ; বিকশি' উঠে প্রাণ ; দানিলা ; বিনোদিয়া » ।

তদ্রূপ—« বাহিরিব, স্বনিছে, ধ্বনিল, প্রতিবিম্বিসিতে » ।

ক্রিয়ার অতীত কালের উত্তম- ও প্রথম-পুরুষের রূপে কতকগুলি বিশেষ বিভক্তি আছে—« -নু (<মধ্য-যুগের বাঙ্গালা « -লুঁ »), -লেম », ও « -ইলা »; যথা—« হেরিনু=দেখিলাম ; দিনু, ছিনু=দিলাম, ছিলাম ;

করিলা, পাঠাইলা=করিল, পাঠাইল; দিলেম, কিন্‌লেম=দিলাম, কিনিলাম »; « করিল, মরিল » স্থলে « কৈল, মৈল »।

ঘটমান বর্তমানের প্রথম- ও মধ্যম-পুরুষে বিশেষ বিভক্তি হয়; যথা—« শোভিছে, করিছে=শোভিতেছে, করিতেছে; কি ভাবিছ মনে=কি ভাবিতেছ »।

« ইয়া »-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কবিতায় সংক্ষিপ্ত হইয়া « -ই' » প্রত্যয়ান্ত হয়; যথা—« ধরি', করি', অবিতরি'=ধরিয়া, করিয়া, অবতরিয়া বা অবতরণ করিয়া »।

[৩.১৪] ব্রজবুলী

উপরের বিশিষ্টতাময় বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন, বাঙ্গালা কবিতায়—বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদে ও তাহার আধুনিক অনুকরণে—আর এক প্রকারের ভাষা দেখা যায়। ইহা শুদ্ধ বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম **ব্রজবুলী**। মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এই ভাষায় রচিত কবিতার বিষয় বলিয়া, ইহার এই নাম। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতি-প্রমুখ কবিগণ কর্তৃক উত্তর-বিহারের মৈথিল ভাষায় রচিত পদের বাঙ্গালা অনুকরণের ফলে, বাঙ্গালী কবিদের হাতে এই ভাষা গঠিত হইয়াছে। ইহাকে এক প্রকারের বিকৃত, বাঙ্গালা-ভাবাপন্ন মৈথিল বলা চলে। এটা হইতেছে সাহিত্যে ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা, এবং ইহা অতি শ্রুতি-মধুর। ইহার ব্যাকরণ সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা হইতে কিছু পৃথক্, বিশেষে ষষ্ঠী বিভক্তিতে « -র, -এর » স্থলে « -ক », ক্রিয়ার অতীতে « -ইল », ভবিষ্যতে « -ইব » প্রত্যয়-দ্বয় স্থলে « -অল » ও « -অব » প্রত্যয়, ইহার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহাতে কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়। (ব্রজবুলী ভাষার বিচার দ্রষ্টব্য—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-রচিত প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৬১)।

ব্রজবুলী পদের ছন্দ, ধ্বনি-প্রধান (মাত্রাবৃত্ত) হইয়া থাকে। নিম্নে দুইটী ব্রজবুলীর পদ দেওয়া হইল—একটী প্রাচীন, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ-রচিত, অন্যটী আধুনিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত।

[১] « তুহুঁ সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব, 'কানু, কানু' করি ঝুর ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধ-সম বৈঠত, সাহসে উঠই ন পার।
সখাগণ ধেনু বেণু সব বিসরল, বিসরল নগর-বজার ॥
কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই, তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক মূক, ময়ূরী ন নাচত, কোকিলা ন করতহি গান ॥
বিরহিণী-বিরহ কি কহব, মাধব! দশদিগ বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা-জল অধিক ভেল, কহতহি গোবিন্দদাস ॥ »

[২] « মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ-বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট, রক্ত-কমল কর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব, মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুহুঁ মম শ্যাম সমান ॥
মরণ রে, শ্যাম তোঁহারই নাম।
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব, তুহুঁ ন ভইবি মোয় বাম ॥
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর, ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুহুঁ মম মাধব, তুহুঁ মম দোসর,
তুহুঁ মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আওরে আও ॥ ... ...
দূর সঙে তুহুঁ বাঁশি বজাওসি, অনুখন ডাকসি অনুখন ডাকসি—
রাধা রাধা রাধা।
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব, বিরহ-তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা ॥ » ... ...

[৫.২] শব্দার্থ-বিজ্ঞান (বাগর্থ) (Semantics)

[৫.২১] শব্দের অর্থ-দ্যোতন-শক্তি

ব্যাকরণে শব্দের সাধন লইয়া বিচার করা হয়। শব্দের অর্থ-বিচার, শব্দার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ভাষায় বিদ্যমান ধ্বনির সমাবেশে যে-সকল শব্দ হয়, সেগুলি হয় অর্থ-যুক্ত, না হয় সেই ভাষায় অর্থ-হীন। অর্থ-হীন শব্দ অনুকরণাত্মক হইতে পারে—যেমন ঢাকের বাজনার অনুকরণে « নাক্ চড়াচড় » শব্দ; এরূপ **অনুকার-শব্দ** ভাষায় বহুল-প্রচলিত। নিতান্ত অর্থহীন শব্দের ভাষা-মধ্যে কোনও স্থান নাই।

সার্থক বা অর্থ-যুক্ত শব্দ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি শব্দাঙ্গ লইয়া সৃষ্ট হয় (পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৮), এবং এই-সব সার্থক শব্দ, বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া বিভিন্ন ইত্যাদি শ্রেণীতে পড়ে (পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫৪)।

সার্থক শব্দের অর্থ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—

[১] **বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ** (Words of Direct, Literal or Explicit Meaning) ;

[২] **লক্ষ্যার্থ** ('Aimed', Figurative or Indirectly Expressed Meaning) ;

[৩] **ব্যঙ্গ্যার্থ** (Suggested Sense)।

[১] বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ শব্দ—এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলেই, সঙ্গে-সঙ্গে স্পষ্ট, সুবিদিত ও প্রচলিত অর্থ প্রতীত হয়। সরল-ভাবে শব্দের এই যথাযথ অর্থ-প্রকাশের শক্তিকে তাহার « **অভিধা-শক্তি** » (Power to express the Literal Sense) বলে ; যেমন—« মানুষ, গাছ, বই, বাড়ী, নাচ, দেখা, জোর, হঠাৎ, ইহা, উহা, অমুক » প্রভৃতি শব্দ।

তিন প্রকারে এই মুখ্যার্থের বোধ আমরা লাভ করিয়া থাকি : **(১) ব্যবহার-দ্বারা :** লোক-সমাজে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত, তাহা আমরা প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে পারি। এই প্রয়োগের জ্ঞান চারি উপায়ে হয়—**(ক) সঙ্কেত-দ্বারা**—'এটা কুকুর, এটা ছবি, এটা মিঠাই, এটা বাটি, এটা লাল, এটা সাদা, এটা নাচ'—এইরূপ শব্দার্থ, এই এই প্রকার বস্তু, গুণ বা ক্রিয়ার ধ্বনিময় প্রতীক যে তত্তৎ শব্দ; তাহা অঙ্গুলি-দ্বারা বা অন্য উপায়ে প্রদর্শন করাকে « সঙ্কেত » বলে; এইরূপে লোক-ব্যবহার-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে। **(খ) ভূয়োদর্শন-দ্বারা**—'খাও, দাঁড়াও, বই দাও, ভাত খাও' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে তত্তৎ কার্য অথবা বস্তুর দর্শনেও এই জ্ঞান জন্মে। **(গ) আপ্ত-বাক্য-দ্বারা**—যে ভাষা জানে, তাহার কাছে সার্থক শব্দ পাইয়া ('আপ্ত করিয়া') শিখা যায়; যেমন—মাতা ও পিতার নিকট হইতে শিশু অর্থ-সহিত শব্দ শিখে, শিক্ষকের নিকট হইতে ছাত্র শিখে, এবং বিদেশীর নিকট হইতে তাহার ভাষার শব্দ শিক্ষা করা যায়। **(ঘ) অভিধান-দ্বারা** ইহা আপ্ত-বাক্যের মত; অজ্ঞাত শব্দের অর্থ-বোধ অভিধান অর্থাৎ ব্যাখ্যাযুক্ত শব্দ-সংগ্রহ হইতে পাওয়া যায়।

(২) ব্যাকরণ-দ্বারা : ব্যাকরণের নিয়ম জানা থাকিলে, পরিচিত পদ হইতে প্রত্যয়াদি-যোগে সিদ্ধ নূতন পদের অর্থ-গ্রহণ হইয়া থাকে; যেমন—« ঢাকা » শব্দে « -ই » -প্রত্যয়-যোগে « ঢাকাই » শব্দ, অর্থ, 'ঢাকা-সম্বন্ধীয়'; « জাল » শব্দে « -ইয়া » -প্রত্যয়-যোগে « জালিয়া » ও পরে উচ্চারণ-বিকারে « জেলে » শব্দ, অর্থ, 'জালকে অবলম্বন করিয়া যাহার আজীবিকা'; « রাঁধ্ » ধাতুর উত্তর « -অন + -ঈ » -প্রত্যয়-যোগে « রাঁধনী », উচ্চারণ-বিকারে « রাঁধুনী », অর্থ, 'যে রাঁধে, পাচক', ইত্যাদি।

(৩) বিদিতার্থ-শব্দ-সান্নিধ্য (Context)-দ্বারা : কোনও উক্তিতে অন্য সমস্ত পদের অর্থ জানা থাকিলে, সমগ্র উক্তি বা বাক্যের অর্থ অনুমান করিয়া অজ্ঞাতার্থ পদের কি সঙ্গত অর্থ হইতে পারে তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়; যথা—« ক্ষুধার্ত সাহেব ছুরী কাটা লইয়া 'খানা'য় বসিয়াছেন; ('খানা' অর্থে, 'আহার', 'আহার-ক্রিয়া' ও 'পরিখা'; 'ক্ষুধার্ত' ও 'ছুরী কাটা' শব্দ-হেতু এখানে দ্বিতীয় অর্থ); নগাধিরাজ হিমালয় ('নগ' মানে যাহা চলে না—এখানে 'হিমালয়' শব্দের সান্নিধ্য-হেতু ইহার অর্থ 'পর্বত'); বহ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে ('বহ্নিশিখা'র সান্নিধ্যে 'পতঙ্গ' অর্থে 'উড্ডয়নশীল

কীট', 'মুড়ি' নহে); নাগদন্ত-খচিত ('নাগ' শব্দে সর্প ও হস্তী, হস্তিদন্তেই কারুকার্য হয়, সর্পদন্তে নহে, তাই 'নাগ' অর্থে 'হাতী') » ইত্যাদি।

মুখ্যার্থ শব্দ-সমূহ তিন প্রকারের হয়—[১] **যৌগিক**, [২] **রূঢ়** ও [৩] **যোগরূঢ়**। ইহাদের সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে (পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯)।

[২] **লক্ষ্যার্থ**—যেখানে বাক্যে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্য (বা বাচ্য অথবা শক্য) অর্থ না হইয়া, তৎ-সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ বক্তার অভিপ্রেত, মূল শব্দ-দ্বারা সেই অর্থ দ্যোতিত হইলে, তাহাকে « লক্ষ্যার্থ » বলে। যে শক্তির দ্বারা এইরূপে অন্য অর্থের উদ্দেশ করা হয়, তাহাকে শব্দের « লক্ষণা শক্তি » (Indirect or Figurative Sense) বলে; যথা—« অঙ্কে তাহার মাথা নাই »—'মাথা' অর্থে 'বুদ্ধি'; « সে হৃদয়হীন ব্যক্তি »—'হৃদয়' অর্থে 'দয়ামায়াদির অনুভব করার শক্তি'; « তিনি গঙ্গাবাস করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন »—'গঙ্গাবাস' অর্থে 'গঙ্গার মধ্যে বাস' নহে, 'গঙ্গার তীরে বাস'।

[৩] **ব্যঙ্গ্যার্থ**—যেখানে বাক্যের অর্থ-গ্রহণ, বাক্যস্থ শব্দের মুখ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ ধরিয়া হয় না, বরঞ্চ শব্দের প্রয়োগে অন্য কোনও অনুরূপ বা অন্য রূপ অর্থের দ্যোতনা পাওয়া যায়, সেরূপ স্থলে শব্দের এই বিরূপ অর্থকে « ব্যঙ্গ্যার্থ » বলে। এইরূপ অর্থ প্রকাশ করা, শব্দের « ব্যঞ্জনা শক্তি »-র পরিচায়ক; যথা—« তাঁহার কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়াছে (=তিনি মারা গিয়াছেন—'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি' অর্থাৎ 'ঈশ্বর-প্রাপ্তি' ঘটে মৃত্যুর পরে); তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন (=তিনি মারা গেলেন—মৃত্যুর পরে দেহস্থ পঞ্চভূত পৃথিবীর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়); তুমি তো ডুমুরের ফুল হইলে (=তোমার দেখাই পাওয়া যায় না); সমস্ত ব্যাপারটা আমার নখ-দর্পণে আছে; তাঁর একচোখো বিচার দেখ্‌লে? সীঁথির সিঁদুর অক্ষয় হ'ক » ইত্যাদি।

[৩.২২] অর্থের পরিবর্তন (Semantic Change)

যেমন ধ্বনির পরিবর্তন-দ্বারা শব্দের বাহ্য-রূপ বদলাইয়া যায়, তেমনি আভ্যন্তরীণ কারণে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন হয়। নানা কারণে ইহা ঘটে ; প্রধান কারণ এই যে, ভাষায় বহুদিন ধরিয়া প্রযুক্ত হইলে, অন্য শব্দের প্রভাবে অথবা আপনা হইতেই শব্দের অর্থের প্রসার বা সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ প্রসার বা সঙ্কোচ মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকারের—

[১] **অর্থের উন্নতি** (Elevation of Meaning)—প্রথমে শব্দের অর্থ মন্দ বা সাধারণ ছিল পরে তাহার ভাল বা উচ্চ ভাবের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে ; যথা—* সাহস (মূল অর্থ—'বল, হঠকারিতা') ; সম্ভ্রম (='মান্য' ; মূল অর্থ—'ভয় করা') ; ভয়ানক ('বিশেষ' বা 'অত্যধিক' অর্থে—মূল অর্থ, 'ভীতি-প্রদ') ; মন্দির (মূল অর্থ, 'গৃহ' ; বাঙ্গালায় মূল অর্থ প্রচলিত, অপিচ নূতন অর্থ-ই সাধারণ—'দেবমন্দির') * ইত্যাদি।

[২] **অর্থের অবনতি** (Pejoration বা Deterioration of Meaning)—প্রথমে অর্থ সাধারণ অথবা উৎকর্ষ-বোধক ছিল, অধুনা অপকর্ষ-বাচক হইয়া গিয়াছে ; যথা—* ইতর লোক, ছোট লোক (মূল অর্থ—ইতর='অন্য,' ছোট='ক্ষুদ্র') ; বিরক্ত (মূল অর্থ—'বিরাগ-যুক্ত', যাহার 'ভালবাসার বা আকর্ষণের অভাব আছে' ; প্রচলিত অর্থ—'ক্রুদ্ধ') ; মহাজন ('যে টাকা ধার দেয়'—এই অর্থে) ; রাগ (মূল অর্থ—'আকর্ষণ' —আধুনিক অর্থ—'ক্রোধ') ; বাই (মারাঠী, গুজরাটী ও হিন্দীতে 'বাঈ' অর্থে 'সম্ভ্রান্ত মহিলা,' বাঙ্গালায় 'গায়িকা ও নর্তকী') * ; ইত্যাদি।

[৩] **অর্থের সঙ্কোচ** (Restriction বা Narrowing of Meaning)—শব্দ, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি-বোধক, অথবা সমগ্র হইতে অংশ-বোধক, কিংবা কারণ হইতে কার্য-বাচক হইয়া যায়। কখনও-কখনও

আদরে অর্থের সঙ্কোচ হয় ; যথা—* অন্ন (ভাত < যাহা খাওয়া হয়) ; বৈবাহিক (জামাতা বা পুত্র-বধূর পিতা < বিবাহ-সম্বন্ধ-যুক্ত ব্যক্তি) ; সম্বন্ধী (শ্যালক) ; মহোৎসব (বৈষ্ণবদের উৎসব-বিশেষ—'মোচ্ছব') ; ব্রাহ্ম (বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি) ; বাউল (বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি < পাগল, ক্ষেপা) ; সৈন্ধব (লবণ < সিন্ধুদেশ-জাত বস্তু) ; সাধু (সন্ন্যাসী, বণিক্ < ভাল লোক) ; সাহেব (ইউরোপীয় ভদ্রলোক < ভদ্রলোক, প্রভু) ; মিছরী (শর্করা-খণ্ড < মিসর-দেশের বস্তু) ; চিনি – চীনী (শর্করা < চীন দেশীয় বস্তু) * ; ইত্যাদি ।

[৪] **অর্থের প্রসার** (Expansion বা Generalisation of Meaning)—* কালী (কৃষ্ণবর্ণ মসী > যে কোনও রঙের মসী ; যথা—'লাল কালী') ; গৌরচন্দ্রিকা (বৈষ্ণব কীর্তনের প্রারম্ভিক গৌরাঙ্গ- বা চৈতন্যলীলা-বিষয়ক গান > যে কোনও বিষয়ের প্রারম্ভিক) ; ভেড়ার গোহাল ('গোহাল' শব্দের মূল অর্থ 'গোরু থাকিবার স্থান') ; ফলাহার (কেবল ফল নহে—মিষ্টান্নাদি আহার) * ইত্যাদি ।

[৫] **সম্পূর্ণ নূতন অর্থের আগমন**—মূলে ইহা সঙ্কোচ বা প্রসারের ফল ; যথা—* পাকা ফল > পাকা কাজ, পাকা কথা, পাকা মাথা, পাকা বাড়ী (যথাক্রমে – পক্ব, সত্য, খাঁটী, বুদ্ধিমান্, ইষ্টক-নির্মিত) ; ঘাম (ঘর্ম=রৌদ্র > রৌদ্র-জাত স্বেদ) ; ব্যবসায় ; তত্ত্ব, সন্দেশ (তত্ত্ব লইবার সময়ে ও সন্দেশ বা সংবাদ পাঠাইবার কালে প্রেরিত মিষ্টান্নাদি) ; সহজ (সহজাত > বিনা আয়াসে সাধ্য) ; লৌহ (লোহিত বর্ণের ধাতু > লোহা) ; প্রসাদ (অনুগ্রহ > ভুক্ত খাদ্যাদির অবশেষ, নিবেদিত খাদ্যাদি) ; শত্রু ; শুশ্রূষা ; সংবাদ ; ব্রত ; বিস্তর ; ইঙ্গিত ; বিজ্ঞান ; বিবেক ; কৃপণ ; অবকাশ ; নিমেষ ; প্রবন্ধ [এগুলির প্রচলিত অর্থ মূল অর্থ হইতে বিভিন্ন] * ।

[৩.২৩] নিরর্থক ভাষা বা ভাষার মুদ্রাদোষ
(Unconscious Flourishes in Speech)

অনেকে কথাবার্তার সময়ে কতকগুলি অনাবশ্যক পদ বা বাক্যাংশ যেখানে সেখানে প্রয়োগ করেন। বক্তা যেন বক্তব্য খুঁজিয়া না পাইয়া, সময় লইবার জন্য, এইরূপ পদ, বাক্যাংশ অথবা অর্থহীন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লিখিবার কালে সংযত হইয়া লিখিবার চেষ্টায় এরূপ নিরর্থক শব্দ বা বাক্য প্রায় সকলেই বর্জন করিয়া থাকেন।

নিরর্থক ভাষার নিদর্শন—« কি বলে; কি বলে ভাল; ওর নাম কি; গিয়ে; তোমার গিয়ে; মানে; মানে হ'চ্ছে; মানে হ'চ্ছে গিয়ে; ইয়ে; ইসে (পূর্ব-বঙ্গের কোথাও-কোথাও); বুঝ্‌লে কিনা; বুঝেছেন; ধরুন; বিবেচনা করুন; মশায়; তোমার » ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে দুই একটী ইংরেজী বা হিন্দী শব্দও কেহ কেহ এইরূপ ব্যবহার করেন।

সংস্কৃতে « পাদ-পূরণে » কতকগুলি অব্যয় ব্যবহার হইত—« চ, বা, তু, হি, বৈ » প্রভৃতি—এগুলির বিশেষ কোনও অর্থ নাই। বাঙ্গালায় পাদ-পূরণে অব্যয় ব্যবহৃত হয়—কিন্তু সেগুলি ভাষায় বিশিষ্ট শব্দ, পাদ-পূরণ ব্যতীত উহাদের অন্য অর্থও আছে। পুরাতন বাঙ্গালায় « মেনে, সিন্ » এবং আধুনিক বাঙ্গালায় প্রাদেশিক ভাষায় « সিন্ », এইরূপ কেবল পাদ-পূরণে ব্যবহৃত, অধুনা নিরর্থক, অব্যয়। এইরূপ নিরর্থক উক্তিকে **ভাষার মুদ্রাদোষ** বলে—কথা কহিবার সময়ে অনাবশ্যক অঙ্গ-সঞ্চালনাদি মুদ্রা-দোষের ন্যায় ইহাকেও বর্জন করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

[৩.৩] অলঙ্কার (Rhetoric)

যে গুণ-দ্বারা ভাষার শক্তি-বর্ধন ও সৌন্দর্য-সম্পাদন হয়, তাহাকে **অলঙ্কার** বলে। মনুষ্য-দেহ সুন্দর অলঙ্কার-ধারণে যেমন তাহার সৌন্দর্য-বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিশেষ-বিশেষ সুন্দর ভঙ্গীময় প্রকাশে ভাষার উপযোগিতা ও অন্য গুণ আরও ফুটিয়া উঠে, তাহাতে ভাষা শ্রোতার শ্রবণ-শক্তি ও বোধ-শক্তি, ধারণা-শক্তি ও ভাবনা-শক্তির পক্ষে সুখকর ও সাহায্যকর হইয়া থাকে।

ভাষার প্রয়োগ মুখ্যতঃ তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া হইয়া থাকে—[১] **বিজ্ঞাপন** বা **প্রতিবেদন** (Intimation, Information)—সাধারণ উক্তি-প্রত্যুক্তি-স্বরূপ কোনও বিষয় জ্ঞাপন করা মাত্র; [২] **উদ্বোধন** (Conviction)—শ্রোতাকে মত-বিশেষে

আনয়ন; এবং [৩] **ভাববিনয়** (Persuasion)—শ্রোতার মনোভাবের পরিবর্তন। প্রথম উদ্দেশ্য, সাধারণ ব্যাকরণানুয়ায়ী শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের দ্বারা ঘটিয়া থাকে; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, মুখ্যতঃ যুক্তি-তর্ক ও গৌণতঃ অলঙ্কার প্রয়োগে হয়; এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য, অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং যুক্তি-তর্ক, এই উভয়ের সাহায্যে হয়।

ব্যাকরণের উদ্দেশ্য—শুদ্ধ-ভাবে ভাষার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া; অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—সাধারণ সরল ভাষা অপেক্ষা শক্তিশালী ও সুন্দর ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষা, ভাষার মধ্যে কল্পনার ক্রিয়াকে ফুটাইয়া তোলা, এবং এই দিক্ দিয়া ভাষার দোষ-গুণ বিচার করা।

ভাষার অলঙ্কার দুই প্রকারের—

[১] শব্দ-গত বা ধ্বনি-গত অলঙ্কার—শব্দালঙ্কার।

[২] অর্থ-গত বা ভাব-গত অলঙ্কার—অর্থালঙ্কার।

[৫.৩১] শব্দালঙ্কার

এই অলঙ্কারের অবস্থানে, এক বা একাধিক ধ্বনির সহায়তায় বাক্য শ্রুতিসুখকর হয়, এবং উহার দ্বারা ভাব-দ্যোতনা-বিষয়ে কোনও উক্তিকে, সাধারণ উক্তি অপেক্ষা একটু বৈশিষ্ট্য-যুক্ত করিয়া দেয়। শব্দালঙ্কারের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের অলঙ্কারগুলি প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার অনুকারাত্মক শব্দগুলিকেও শব্দালঙ্কারের মধ্যে ধরা যায় (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩৪)।

[ক] **অনুপ্রাস** (Alliteration)—এক-ই বা একাধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বা বারংবার প্রয়োগকে «অনুপ্রাস» কহে। শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এই অনুপ্রাস দেখা যায়। প্রবাদ-প্রবচনে এবং কবিতাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখা যায়; যথা—

«জোর যার, মুলুক তার;» «দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি (বা জিনি) নাহি লাজ;» «'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে। শান্তি-সদন সাধন-ধন দেব, দেব হে।'»

[খ] **শ্লেষালঙ্কার বা শব্দশ্লেষ** (Verbal Quibble, Pun, Paronomasia)—একটী শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে, «শ্লেষালঙ্কার» হয়। কোনও স্থলে শব্দটী মূলে এক, কিন্তু পৃথক্ অর্থে ইহা মিলে-বলিয়া সহজেই ইহাকে শ্লেষালঙ্কারে প্রযুক্ত

করা যায়; কোনও স্থলে আবার বিভিন্ন-ব্যুৎপত্তি-জাত দুইটী পৃথক্ শব্দ, নিজ নিজ পৃথক্ অর্থ বজায় রাখা সত্ত্বেও একই রূপ পরিগ্রহণ করায়, সেগুলির রূপ-সমতা-হেতু শ্লেষ আসিয়া যায়। শ্লেষালঙ্কার কেবল শব্দালঙ্কার নহে, ইহা অর্থালঙ্কারও বটে; যথা—

« কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর। যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥ »

(প্রথম অর্থ—'ঈশ্বর'=পরমেশ্বর, 'গুপ্ত'=লুক্কায়িত, 'প্রভাকর'=সূর্য; দ্বিতীয় অর্থ—'ঈশ্বর গুপ্ত'=লেখক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'প্রভাকর'=সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকা।)

« অর্ধেক বয়স রাজা, এক পাটরানী। পাঁচ পুত্র নৃপতির, সবে যুব-জানি॥ »

(=সকলকেই যুবক বলিয়া 'জানি'; অথবা সকলেরই যুব বা যুবতী 'জায়া' অর্থাৎ স্ত্রী আছে।)

[গ] **যমক**—বাক্য বা কবিতার শ্লোক-মধ্যে, বিভিন্নার্থে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে, অথবা বিভিন্নার্থক এক-রূপ দুইটী শব্দের অবস্থান হইলে, « যমক » অলঙ্কার হয়; যথা—« যা নাই ভারতে (=মহাভারতে), তা নাই ভারতে (=ভারতবর্ষ দেশে); মনে করি, করী করি (=মনে করি যে আমি 'করী' বা হাতী তৈয়ারী করি), কিন্তু হয় হয়, হয় না ('হয়' অর্থাৎ ঘোড়া হয়, হাতী হয় না); 'আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি॥' »

শ্লেষে শব্দটী একবার মাত্র আসে, যমকে দুইবার।

[ঘ] শব্দ-সাম্য বা শব্দ-সাদৃশ্য, অথবা কাকু (অর্থাৎ স্বর-পরিবর্তন) হেতু যেখানে বক্তার ঈপ্সিত অর্থের পরিবর্তে শ্রোতার দ্বারা অন্য অর্থ পরিগ্রহের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে **বক্রোক্তি** অলঙ্কার হয়; যথা—

« ওরে রাজহংস, জন্ম দ্বিজবংশে, এ নৃশংস হলি কি কারণ। »

« স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? »

« কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ! »

[৫.৩২] অর্থালঙ্কার

অর্থ- বা ভাব-গত অলঙ্কার বহুবিধ হয়। নিম্নলিখিত রীতি অনুসারে অর্থালঙ্কারের শ্রেণী-বিভাগ করা যায়; যথা—

[ক] সাদৃশ্যবোধ-জনিত অর্থালঙ্কার (Figures based upon

Similarity); যথা—« রূপক (Metaphor), উপমা (Simile), পরম্পরিত রূপক ('Linked' বা 'Chain' Metaphor), অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory, Parable, Fable), নিদর্শনা (Transference of Epithet) » ইত্যাদি।

[খ] **বিরোধ-মূলক অলঙ্কার** (Figures based upon Difference); যথা—« নিশ্চয় (Antithesis), বিরোধ, বিচিত্র, বিষম (Epigram), [বিরোধ (Oxymoron)], দীপক (Condensed Sentence), শ্লেষ (Pun, Paronomasia), অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্য-ধ্বনি (Identical Statement) » ইত্যাদি।

[গ] **নৈকট্য- বা সংস্পর্শ-জনিত অলঙ্কার** (Figures based on Contiguity or Association); যথা—« লক্ষণা (Metonymy Synecdoche), লক্ষণা উপচার (Transference of Epithet, Hypallage) » ইত্যাদি।

[ঘ] **ভাব- বা অনুভূতি-জনিত অলঙ্কার** (Figures based on Emotion)—« সমাসোক্তি (Personification, Pathetic Fallacy), ভাবিক (Vision), অতিশয়োক্তি (Hyperbole), কাকু (Interrogation), বিস্ময়াদি রস (Exclamation), সার (Climax) » ইত্যাদি।

[ঙ] **বক্রোক্তি** (Figures based on Humour or Indirectness of Speech)—« কাকু (Innuendo), ব্যাজ-স্তুতি (Irony), পর্য্যায়োক্ত (Sarcasm, Litotes, Meiosis), পরিবৃত্ত (Periphrasis, Circumlocution) » ইত্যাদি।

[ক] সাদৃশ্যবোধ-জনিত অলঙ্কার—

[ক।১] **উপমা** (Simile)—বিভিন্ন-জাতীয় অথচ সদৃশ বা সমান-গুণ দুইটী বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য উল্লেখ-পূর্ব্বক তুলনা-দ্বারা যে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে « উপমা » বলে। 'প্রায়, ন্যায়, যথা, যেরূপ, যেমন—তেমন, সদৃশ, সম, সমতুল্য, সমান' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করিয়া, এই উপমা স্পষ্টীকৃত হয়।

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয় তাহাকে « উপমান » বলে, এবং যাহাকে তুলনা করা হয় তাহাকে « উপমেয় » বলে; যথা—

« সূর্য্যের উদয়ে কমল যেমন বিকশিত হয়, তেমন প্রজ্ঞার উদয়ে চিত্ত বিকশিত হয়, 'রচিয়া মধুর পদ অমৃতের প্রায়'; 'ছিনু মোরা, সুলোচনে। গোদাবরী-তীরে, কপোত-কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে' (মধুসূদন) » ইত্যাদি।

[ক।১৵০] **প্রতীপ** (Reversed Simile)—প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়-রূপে নির্দেশ, অথবা প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণনাকে « প্রতীপ » অলঙ্কার বলে ; যথা—

« তোমার নয়ন সম ছিল ইন্দীবর। সলিলে নিমগ্ন হইল আমার গোচর।
তব মুখ তুল্য শশী জগতে বিদিত। কালবশে কাল-মেঘে হৈল আচ্ছাদিত। »

« দুর্জন যথায়, তথা কেন হলাহল। জ্ঞাতি যথা, তথা কেন প্রদীপ্ত অনল। »

[ক।২] **রূপক** (Metaphor)—উপমেয়কে (অর্থাৎ যে বস্তু তুলিত হয় তাহাকে) উপমানের সহিত (অর্থাৎ যাহার সহিত তুলনা হয় তাহার সহিত) অভিন্ন-রূপে নির্দেশ করাকে « রূপকালঙ্কার » বলে ; যথা—« প্রজ্ঞা-রূপ সূর্যের উদয়ে চিত্ত-রূপ কমল বিকশিত হয় ; 'উদর-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়' (ভারতচন্দ্র) »।

[ক।২৵০] **পরম্পরিত রূপক** (Linked বা Chain Metaphor)—একটী রূপকের অবতারণা করিয়া তাহাকে সার্থক করিবার জন্য, তৎসংশ্লিষ্ট অন্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আর একটী রূপকের সৃষ্টি করিলে, « পরম্পরিত রূপক » হয় ; যথা—

« সেন-কুল-কমল-ভাস্কর বল্লাল নৃপতি » ; « দেহ-বল্লরীতে কর-পল্লব শোভা পাইতেছে » ; « যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তিরূপ মেঘ-দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে (অক্ষয় দত্ত) »।

[ক।২৷০] **উৎপ্রেক্ষা** (Hypothetical Metaphor)—যেখানে উপমান-বস্তুতে উপমেয়ের সম্ভাবনা করা হয়, সেখানে « উৎপ্রেক্ষালঙ্কার » হয়। এই অলঙ্কার আসিলে, বাক্যে, 'বুঝি, বোধ হয়, যেন, যেমন' প্রভৃতি পদ আসিতে পারে ; এইরূপ শব্দ থাকিলে **বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা** বলে, আর ঐরূপ শব্দ না থাকিলে **প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা** বলে ; যথা—

(প্রতীয়মানা) « সন্ধ্যা-সমীরণে তরুগণ বিহঙ্গদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলী-সঙ্কেত-দ্বারা আহ্বান করিল ; (প্রতীয়মানা) 'কুহেলী গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'—ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি' (রবীন্দ্রনাথ) » ; (বাচ্যা) « মুনিজনেরা রক্তচন্দন সহিত যে-অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন »।

[ক।৩] **ব্যতিরেক** (Contrast in Similarity)—যেখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হয়, সেখানে « ব্যতিরেক » অলঙ্কার হয়; যথা—

« কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা। পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা ॥ »

[ক।৪] **তুল্যযোগিতা অলঙ্কার** (Combination of Similar Qualities in Dissimilar Objects)—বর্ণনীয় বস্তুর মধ্যে সমান ধর্ম উল্লিখিত হইলে, এই অলঙ্কার হয়; যথা—

« যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥ »

« মেঘ কালো, রাত্রি কালো, কালো আঁধার দেশ—
তার চেয়ে কালো, কন্তে, তোমার মাথার কেশ ॥ »

[ক।৫] **অর্থান্তর-ন্যাস** (Corroboration)—যেখানে সামান্য বস্তুর দ্বারা বিশেষের, অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্যের, সমর্থন বা যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়, সেখানে এই অলঙ্কার হয়; যথা—

« একা যা'ব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥ »

« চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে? »

« সূর্য অস্ত যায়, মানুষের ভাগ্য-লক্ষ্মীও অন্তর্হিত হয়। »

[ক।৬] **দৃষ্টান্ত** (Parallel)—'যথা, যেরূপ, যেমন' প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, এবং উভয়ের মধ্যে সাধারণ গুণের উল্লেখ না করিয়া, সমান-ধর্ম-যুক্ত দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য-প্রদর্শনের নাম « দৃষ্টান্ত » অলঙ্কার; যথা—

« দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার। হায় বিধি! চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥ »

[ক।৭] **অপ্রস্তুত-প্রশংসা** (Allegory, Parable, Fable)—বর্ণনীয় বিষয়টী গূঢ় রাখিয়া, অপ্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণন-দ্বারা উহার উপলব্ধি হইলে, « অপ্রস্তুত প্রশংসা » অলঙ্কার হয়; যথা—

« চাতক যাচিলে জল হইয়া কাতর। মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর? »

(অর্থাৎ প্রার্থীকে উচ্চমনাঃ ব্যক্তি কখনও বিমুখ করেন না।)

[ক।৮] **দীপক** (Identity, Condensed Sentences)—প্রস্তুত (অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তু) ও অপ্রস্তুত (অর্থাৎ যাহা বর্ণনীয় নহে), উভয়ের একই ধর্ম বর্ণিত হইলে, অথবা উভয়ের একই ক্রিয়া ঘটিলে, « দীপক » অলঙ্কার হয়; যথা—

« ঘটিলে খলের সঙ্গ সকলে শঙ্কিত। খলে আর বিষধরে ধরে এক রীত। »

[ক।৯] **অপহ্নুতি** (Concealment)—প্রকৃত বা বর্ণনীয় বস্তুকে নিষিদ্ধ করিয়া বা গোপন রাখিয়া, অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত বস্তুর স্থাপনকে—উপমেয়কে গোপন রাখিয়া উপমানের স্থাপন বা প্রকাশকে—« অপহ্নুতি » অলঙ্কার বলে; যথা—

« শিশির-বিন্দুর ছলে ঊষাদেবী কুতূহলে
ফুল-নলিনীর ভালে পরাইছে সাবধানে মুকুতার মালা। »
« বৃষ্টি-ছলে মেঘ কাঁদে। »

সাধারণতঃ 'ছলে,' 'ব্যাজে,' 'রূপে' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার-দ্বারা এই অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটে।

[ক।১০] **অতিশয়োক্তি** (Hyperbole)—উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়-রূপে নির্দেশ করাকে « অতিশয়োক্তি » বলে; যথা—« মুখ হইতে সুধাবর্ষণ হইতেছে » (উপমেয়—'সুমধুর বচন'—একেবারেই অনুল্লিখিত)।

[ক।১১] **নিদর্শনা** (Transference of Attributes)—সাদৃশ্য-হেতু কাহারও উপর কোনও অবাস্তবিক কিংবা অসম্ভব কার্য কল্পনা করাকে « নিদর্শনা » বলে; যথা—« শকুন্তলার অধরে নবপল্লব-শোভা; 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' (মধুসূদন) »

[খ] বিরোধ-মূলক অলঙ্কার—

[খ।১] **নিশ্চয়** (Antithesis)—কোনও বস্তুর সহিত, তাহার বিরোধী গুণ আছে এমন অন্য বস্তুর তুলনা করিয়া, প্রথম বস্তুর প্রকৃত গুণকে স্থাপন করার নাম « নিশ্চয় » অলঙ্কার। এক্ষেত্রে উপমান-বস্তুর অপহ্নব বা নিষেধ করা হয়; যথা—

« 'আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি তো মেষ।' » (দ্বিজেন্দ্রলাল)

[খ।২] **বিরোধ** (Contradiction, Oxymoron)—যেখানে বাস্তবিক বিরোধ নাই, অথচ আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ মনে হয়, এবং এই পার্থক্যাভাস-দ্বারা বক্তব্যকে আরও ঘনীভূত করিয়া দেয়, সেরূপ স্থলে « বিরোধালঙ্কার » হয়; যথা—

« সীমার মাঝে, অসীম! তুমি বাজাও আপন সুর। »

« সদা কটিতট পট-বিহীন। দীননাথ-পদে, অথচ দীন। »

« উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। »

[খ।৩] **বিষম** (Contrariety)—যেখানে কোনও আরব্ধ বিষয়ের বৈফল্য ঘটে, বা অনীপ্সিত বস্তুর সম্ভব হয়, অথবা বিরুদ্ধ বস্তুর সংঘটন হয়, সেখানে « বিষমালঙ্কার » হয়; যথা—

« জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশ। বিধির বিপাকে তাহা হ'য়ে উঠে বিষ। »

« যমুনার জলে যদি দেই গিয়া ঝাঁপ। পরাণ জুড়াবে কি, অধিক উঠে তাপ। »

[খ।৪] **বিচিত্র** (Apparent Reversion of Meaning or Interest)—যে অলঙ্কারে ইষ্ট-লাভের আশায় তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনিষ্ট অনুষ্ঠান কল্পিত হয়, তাহার নাম « বিচিত্র »; যথা—« জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন, প্রাণ পাই যেন মরণে। »

« বিরোধ, বিষম, বিচিত্র »—এই তিন অলঙ্কারেই আপাত-প্রতীয়মান বিরোধ-প্রদর্শন-দ্বারা, আমাদের বোধ-শক্তিতে আঘাত করিয়া, যেন আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং উক্তির অন্তর্নিহিত কোনও গভীর অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। সাধারণতঃ সংক্ষেপে সূত্রাকারে এই অলঙ্কারের কার্য সাধিত হয়—ইংরেজীতে এরূপ গুণযুক্ত সংক্ষিপ্ত উক্তিকে Epigram বলে। পূর্বে বর্ণিত « দীপক » অলঙ্কারেও [ক।৮] এইরূপ সংক্ষেপে বিরোধী ভাবের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হয় বলিয়া, উহাকে এই [খ] পর্যায়েও ধরা যায়। শ্লেষ অলঙ্কারের একই শব্দের পরস্পর-বিরোধী একাধিক অর্থ আসে বলিয়া, ইহাকেও এই পর্যায়ে পরিগণিত করিতে পারা যায়।

[খ।৫] **অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি** (Identical Statement)—কোনও শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি করিয়া যখন অর্থান্তরে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পৃথক অর্থে ইহা প্রযুক্ত হয়, তখন এই অলঙ্কার হয়; যথা—« বলে বলুক; দেখ্‌লে তো দেখ্‌লে; ডুবিল তো একেবারেই ডুবিল; সে কত কথা কয়—খালি কথা; পণ্ডিত—পণ্ডিত, ছবির কি বুঝেন তিনি? » ইত্যাদি।

[খ।৬] **উল্লেখ** (Manifold Predication)—অনেক প্রকারে একমাত্র বস্তুর নির্দেশ করার নাম « উল্লেখ » অলঙ্কার ; যথা—

« অন্তর-মাঝে তুমি একা একাকী,
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটী স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটী পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটী চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে—
চারিদিকে চির-যামিনী। »

[গ] নৈকট্য- বা সংস্পর্শ-জনিত অলঙ্কার

[গ।১] **লক্ষণা** (Metonymy, Synecdoche)—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র-অনুসারে « লক্ষণা » শব্দের একটী শক্তিরূপে বিবেচিত হয় (পৃষ্ঠা ৪১০), কিন্তু লক্ষণার প্রয়োগ বাক্যেও হয়। কোনও বস্তুর দ্বারা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোনও বস্তুর দ্যোতনাকে « লক্ষণা » বলে। সাধারণ-ভাবে এই দ্যোতনা হইলে, ইংরেজীতে ইহাকে Metonymy বলে, এবং কোনও বস্তুর অংশ-দ্বারা সমগ্রকে, বা বস্তু-দ্বারা সদৃশ বস্তুকে, অথবা সমগ্র-দ্বারা অংশকে প্রকাশ করিলে, তাহাকে ইংরেজীতে Synecdoche বলে। লক্ষণা বিভিন্ন প্রকারের—

(১) প্রতীক-দ্বারা মূল-বস্তু— « 'লাল-টুপী আর কালো-কোর্তা, জুজুর ভয় কি আর চলে !' ; গেরুয়ার মাহাত্ম্য ; সবুজের অভিযান ; বোতলেই তাহার সর্বনাশ করিল »।

(২) করণ- বা সাধন-দ্বারা কর্তার দ্যোতনা—« তাঁহার তুলিকা অমর হইয়া থাকিবে। »

(৩) বস্তু-স্থলে বস্তুর আধার—« জরমানিতে ফ্রান্সে লড়াই ; নগরী উৎসবে মত্ত। »

(৪) কার্য-স্থলে কারণ—« শোকে তিনি ম্রিয়মাণ »।

(৫) কারণ-স্থলে কার্য—« পক্ককেশের সম্মান করিবে »।

(৬) কর্মের পরিবর্তে কর্তা—« শেক্স্পিয়র পাঠ করিয়াছ ? »।

(৭) বস্তু-স্থলে তজ্জাত মনোভাব—« দেশের গৌরব ; মানবের আশা ; 'তুমি রাম ? আমাদের বিস্ময় আমার !' »।

(৮) সমগ্র-স্থলে অংশ—« 'চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালা'; চার হাত এক হওয়া »।

(৯) অংশ-স্থলে সমগ্র—« বৌদ্ধ জগৎ; বাঙ্গালীর ঘর »।

(১০) বস্তু-স্থলে উপাদান—« দেহে স্বর্ণ ধারণ করা; রাত্রে আটা খাওয়া ভাল »।

(১১) সামান্ত-স্থলে বিশেষ—« দু'মুঠা দা'ল-ভাত রোজ জুটে না; পান-খাবার টাকা; গলা-কাটা দাম »।

(১২) বিশেষ-স্থলে সামান্ত—« তিনি পথ্য করিলেন »।

(১৩) জাতি-স্থলে ব্যক্তি (Autonomasia)—« রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী »।

(১৪) গুণ-স্থলে বস্তু—« মানুষ হও; গণ্ডস্থলের রক্তিম গোলাপ »।

(১৫) বস্তু-স্থলে গুণ—« যৌবনের জয়-যাত্রা; চিতোরের ঘরের যত মিষ্টি হাসি চিরতরে চিতার আগুনে ছারখার হইল »।

(১৬) অনির্দিষ্ট স্থলে নির্দিষ্ট সংখ্যা—« তোমায় এক শ' বার ব'লেছি »।

লক্ষণা-অনুসারে, এক পদের বিশেষ্য সংশ্লিষ্ট অন্য পদে আরোপিত হইতে পারে (« লক্ষণামূলক বিশেষণারোপণ » Transferred Epithet, Hypallage); যথা—« বিনিদ্র রজনী, সাধু উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পুস্তক, কৌতুকময় নেত্র-পাত, কৌতূহলী প্রশ্ন, ব্যগ্র অপেক্ষা, কাষ্ঠ হাসি »।

[ঘ] ভাব- বা অনুভূতি-জনিত অলঙ্কার

[ঘ।১] সমাসোক্তি (Personification, Personal Metaphor, Pathetic Fallacy)—সমান কার্য ও সমান বিশেষণাদির অবস্থান-হেতু যেখানে প্রস্তুত অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তুতে অপ্রস্তুত বস্তুর জীবন, গতি, ভাব ইত্যাদি ব্যবহার সমারোপ করা হয় (এই অপ্রস্তুত বস্তু সাধারণতঃ মানব-ধর্ম-যুক্ত হইয়া থাকে), সেখানে « সমাসোক্তি » অলঙ্কার হয়; যথা—

« সাগর গর্জন করে »;

« কেরোসিন-শিখা বলে মাটীর প্রদীপে,—
'ভাই ব'লে ডাকো যদি, দেবো গলা টিপে!'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন-শিখা বলে,—'এসো মোর দাদা!' »।

« অয়ি ইতিহাস, ওগো মিথ্যাময়ি! »

[ঘ।২] **ভাবিক** (Vision)—অতীত, ভবিষ্যৎ অথবা অন্য পরোক্ষ ঘটনার প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনাকে « ভাবিক » বলে।

[ঘ।৩] **সার** (Climax)—বর্ণনীয় বস্তুগুলির উত্তরোত্তর অর্থাৎ ক্রমবর্ধনশীল উৎকর্ষ-কথনকে « সারালঙ্কার » বলে; যথা—

« সংসার ভিতরে সার যে বস্তু চেতন।
চেতনের মধ্যে সার মনুষ্য হওন॥
মনুষ্যের সার সেই বিদ্যা আছে যার।
পণ্ডিত-মণ্ডলী-মাঝে বিনয়ী-ই সার॥ »

[ঘ।৪] **পতৎপ্রকর্ষ** (Bathos)—ইহা সারের বিপরীত—ক্রমবর্ধনশীল অপকর্ষ বর্ণিত হইলে এই অলঙ্কার হয়; যথা—« প্রথম, মাষ-কলাইয়ের দাল; দ্বিতীয়, অত্যন্ত অপরিষ্কার-ভাবে পাক করা; এবং তৃতীয়—কুকুরের উচ্ছিষ্ট »।

অতিশয়োক্তি (Hyperbole)—ইহা ভাব- বা অনুভূতি-জনিত অলঙ্কারের শ্রেণীতে পড়ে। এতদ্ভিন্ন হর্ষ-বিস্ময়াদি-প্রকাশক স্বর-ভঙ্গী (**কাকু** Tone of Voice) -কেও এই পর্যায়ে ধরা যায়।

[ঙ] বক্রোক্তি—

এই শেষ অলঙ্কারকে কয়েকটী বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা যায়:

[ঙ।১] **পর্যায়োক্ত** (Innuendo)—বর্ণনীয় বিষয়টী পরিস্ফুট- বা স্পষ্ট-রূপে কথিত না হইয়া, যেখানে কোনও বিশেষ ভঙ্গী-দ্বারাই প্রকাশিত হয়, সেখানে « পর্যায়োক্ত » অলঙ্কার হয়; যথা—

« তিনি সাধুতা অপেক্ষা সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। »

পর্যায়োক্ত-দ্বারা যখন কাহারও নিন্দা বা অপ্রশংসা করা হয়, তখন তাহা **উপহাস** (Sarcasm)-পদবাচ্য হয়; যথা—

« ধারে কাটে না, ভারে কাটে; আপনি কুকুর পায় না খেতে, শঙ্করাকে ডাকে »।

[ঙ।২] **ব্যাজ-স্তুতি**—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, অথবা স্তুতিচ্ছলে নিন্দার নাম « ব্যাজ-স্তুতি »। স্তুতিচ্ছলে নিন্দা হইলে তাহাকে ইংরেজীতে Irony বলে। Irony-তে

অন্তের মতের অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া, সেই মতকে উপহাস করা হয়—ইহা অজ্ঞানতা-প্রকাশ-মূলক পর্যায়োক্ত; যথা—« তিনি বেশ সাধু লোক—খালি গরীবের টাকা ফাঁকি দিয়া থাকেন।»

[৬।৩] যেখানে কোনও নিন্দার্হ বিষয়কে ভদ্র ভাষার আবরণে আবৃত করা হয় তাহাকে Euphemism বা **সুভাষিত পর্যায়োক্ত** বলা চলে; যেমন—« তাহার একটু হাত-টান (বা হাত-সাফাই) রোগ আছে (=সে চুরি করিয়া থাকে) »।

[৬।৪] **গুর্বর্থ-পর্যায়োক্ত** (Litotes, Meiosis)—যেখানে স্বল্পার্থক শব্দ-দ্বারা গুরু অর্থ প্রকাশ করা হয়, কিংবা নঞর্থক শব্দ-দ্বারা অস্তিত্ব বা উৎকর্ষ প্রকাশ করা হয়, সেখানে « গুর্বর্থ পর্যায়োক্ত » অলঙ্কার হয়; যথা—

« তিনি কম নন; লোক মন্দ নয়; খুব যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহা নয়; তাহার আশা খুব ক্ষুদ্র নহে; তাহার এই দুষ্কৃতির শাস্তিতে আমি বিশেষ দুঃখিত নহি »।

[৬।৫] **পল্লবিত বা বাক্যবিস্তর** (Circumlocution, Periphrasis)—এক কথায় বক্তব্য না বলিয়া, ঘুরাইয়া অনেক কথায় বলাকে « পল্লবিত » বলে; যথা—« তোমার কথার কোনো ভিত্তি নাই (=কথা সত্য নহে) »।

[৫.৩০] দোষ-বিচার

উপরে প্রদর্শিত ভাষার বা বাক্যের অলঙ্কার যথাযথ প্রযুক্ত হইলে, রচনার গুণ বৃদ্ধি করে। আবার যে রূপ প্রয়োগে ও বর্ণনায় অর্থ-প্রকাশে এবং রস- ও ভাব-প্রকটনে অপকর্ষ ঘটে, তাহাকে « দোষ » বলে। দোষ ত্রিবিধ—শব্দ-গত, অর্থ-গত ও রস-গত (রস অর্থাৎ ভাবের অনুভূতি)। ব্যাকরণ বা শব্দ-শাস্ত্র, অভিধান বা শব্দ-কোষ, ছন্দঃশাস্ত্র, অলঙ্কার-শাস্ত্র—এইগুলির মধ্যেই এই-সমস্ত দোষ-বিচারের সূত্র নিহিত রহিয়াছে।

নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান রচনা-দোষ নির্দিষ্ট হইল।

[ক] শব্দ-গত দোষ

[১] « শ্রুতিকটুতা » (Cacophony): যেখানে শব্দ-সকল শুনিতে সুন্দর হয় না। প্রায়ই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যঞ্জন-বর্ণের বাহুল্যে এই দোষ আসে; যথা—

« বাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে »।

« দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত »।

বাঙ্গালার এই শ্রুতিকটুতার অন্তর্গত হইতেছে « সন্ধি-কষ্টতা »—সংস্কৃত ব্যাকরণানুমোদিত হইলেও, অনেক সময়ে সন্ধি বাঙ্গালার প্রকৃতির বিরোধী হয়—এরূপ স্থলে কষ্ট-সন্ধি-দ্বারা শ্রুতিকটুতা আইসে; যথা—« প্রীত্যুপহার » ('প্রীতি-উপহার' স্থলে), অত্যুত্তম ('অতি-উত্তম'), শরচ্চন্দ্র ('শরৎ চন্দ্র') » ইত্যাদি।

শ্রুতিকটুতার বিপরীত হইতেছে « শ্রুতিমাধুর্য » (Euphony): সুষ্ঠু অনুপ্রাস-প্রয়োগ দ্বারা শ্রুতি-মাধুর্য আসিতে পারে।

[২] « প্রতিকূলবর্ণতা বা বর্ণাশুদ্ধি » (Use of Wrong Sounds and Letters): সাধু বাঙ্গালা ভাষায় « চ, ছ » স্থলে ইংরেজী ch, chh-এর মত ধ্বনি না বলিয়া, ts, s বলা; « জ » স্থলে ইংরেজী j-র মত উচ্চারণ না করিয়া, dz বা z বলা; অ-কারের উচ্চারণ ঠিক-মত « অ » বা « ও » না করা; মহাপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণগুলির ঠিক উচ্চারণ না করা;—এগুলি প্রতিকূল-বর্ণতার নিদর্শন। তদ্রূপ, লেখায় « ই, ঈ », « উ, ঊ », « ঋ, ৠ, রি, », « চ, ছ » (« ক'র্‌ছে » স্থলে « ক'র্‌চে, করচে »), « ট, ঠ » (« আঠা » স্থলে « আটা », « পাঁঠা » স্থলে « পাঁটা » ইত্যাদি), « ড়, র », « ত, থ » (« মাথা » স্থলে « মাতা »), « দ, ধ » (« বাঁধা » স্থলে « বাঁদা »), « শ, ষ, স, র, চন্দ্রবিন্দু » প্রভৃতি বর্ণ-সম্বন্ধে বিহিত না হওয়া, প্রতিকূল-বর্ণতার উদাহরণ। লিখিবার কালে বিশেষ করিয়া « ক্ষ, ক্ষ », « স্ত, ষ্ট », « ঋ, ৠ », « ক্র, ক্র » প্রভৃতি বর্ণ-সম্বন্ধে অনেকে অবহিত হন না। প্রতিকূল-বর্ণতার বিপরীত « অনুকূল-বর্ণতা » (Orthoëpy, Orthography).

[৩] « চ্যুত-সংস্কৃতি বা ব্যাকরণ-দোষ » (Solecism, Wrong Grammar); যথা—« অজ্ঞানী; নির্দোষী; নিরপরাধী; চাতকিনী কুতুকিনী ঘন-দরশনে; নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'লেন পতন; নিরহঙ্কারী লোক; গুণবতী ভাই; আমায় নৈরাশ ক'রো না; আপনি এদিকে এসো » ইত্যাদি।

[৪] « অপ্রযুক্ততা » (Use of Non-current Words): অভিধানে আছে, অথচ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, এরূপ শব্দের প্রয়োগ। (অনেক সময়ে উপহাস করিবার জন্য অথবা হাস্য-রসের অবতারণার জন্য এইরূপ প্রয়োগ করা হয়;) যথা—« 'বর্করাট্টি-করজাল-চকাশিত শৈল শাল, মলখা-প্রতিম রুচি উচ্চ তরুদলে'; 'ঈশাকের উবমুখে মারা গেল মার, নাকেতে নির্ঝরগণ করে হাহাকার।' ক্রহিণবাহন প্রভু অনুগ্রহনিরা প্রদান সুপুচ্ছ মোরে!»

[৫] « নূতনতা » (Neologism)—তাহার পূর্বে কেহ ব্যবহার করে নাই, এরূপ নব-সৃষ্ট শব্দের অনাবশ্যক প্রয়োগ।

[খ] অর্থ-গত দোষ

[১] « নিরর্থকতা » (Unnecessary Words and Expletives)—কেবল শব্দ-পূরণের জন্য নিষ্প্রয়োজন শব্দের ব্যবহার; যথা—« কেবল » স্থলে « কেবলমাত্র »।

[২] « অধিকপদতা » (Verbal Redundancy)—অনাবশ্যক বা অধিক পদ ব্যবহার; যথা—« তিনি বাক্য বলিলেন; আমরা আহার খাই »।

[৩] « ন্যূনপদতা » (Verbal Deficiency)—আবশ্যক পদের অভাব।

[৪] « অনবীকৃততা, পুনরুক্তি » (Repetition)—এক শব্দ বারংবার প্রয়োগ করা।

[৫] « অবাচকতা » (False Analogy of Meanings)—ঈপ্সিত অর্থে শব্দের প্রয়োগ আছে কি না, তাহা লক্ষ্য না করিয়া, শব্দের অপব্যবহার করা; যথা—« তাহাকে গলাধঃকরণ করিয়া বিদায় করিয়া দিল; আপনি একটা প্রকাণ্ড অজ্ঞ »।

[৬] « নিহতার্থতা » (Non-current Meanings)—অনেকার্থ-যুক্ত শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ; যথা—« তোমার গোরসে গো পাইব করতলে (গো=বচন, স্বর্গ) »।

[গ] রস-গত দোষ

[১] « ক্লিষ্টতা » (Involved Construction)—যেখানে প্রযুক্ত শব্দগুলির অর্থ প্রতীতির পরেও, প্রস্তুত বিষয়-সম্বন্ধে অর্থবোধ সহজে হয় না।

[২] « প্রাদেশিকতা » (Provincialism)—সাধারণ সর্বজন-গ্রাহ্য প্রয়োগের পরিবর্তে প্রদেশ-নিবদ্ধ এবং স্বল্প-সংখ্যক জনের বোধগম্য শব্দ প্রয়োগের দ্বারা, অর্থানুভূতি ও রসোদ্রেক-বিষয়ে কঠিনতা বা অশক্যতা।

[৩] « গ্রাম্যতা » (Vulgarism)—ভদ্রসমাজে ও সৎ-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না এরূপ অপকৃষ্ট বা নীচ ভাষার বা ভাবের প্রয়োগ।

[৪] « অশ্লীলতা » (Indecency, Indelicacy)—যাহা সজ্জন-সভায় পাঠ করিতে বা বলিতে মনে সঙ্কোচ আসে, এইরূপ বিষয় বা ভাষার অবতারণা।

[৫] « প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা » (Violation of Literary Conventions)—কবি-প্রসিদ্ধি ও সাহিত্যে ব্যবহৃত সর্বজন-বিদিত ভাবরাজির বিরোধী ভাবের প্রকটন।

[৩.৪] সংস্কৃত ধাতু ও তাহা হইতে জাত বাঙ্গালা তৎসম শব্দ

[নিম্নলিখিত তালিকায় শব্দের পূর্বে «-» হাইফেন বা সংযোজক-চিহ্নের অর্থ, এই শব্দগুলির উপসর্গ-যুক্ত রূপ-ভেদ বাঙ্গালায় বহুল-প্রচলিত।]

অচ্, অঞ্চ্=বাঁকানো : অঙ্ক।

অঞ্জ্=অঞ্জন লাগানো : অঙ্গ, অঞ্জন, -অক্ত (রক্তাক্ত)।

অট্=ভ্রমণ করা : অটন (পর্যটন), আটক (পর্যাটক)।

অদ্=খাওয়া : অদন, অন্ন, আদ (মৎস্যাদ)।

অন্=শ্বাস লওয়া : অনিল, আনন।

অর্চ্=স্তুতি করা, উজ্জ্বল হওয়া : অর্ক, অর্চা, অর্চন, ঋক্, অর্চিঃ, অর্চনীয়।

অর্হ্=যোগ্য হওয়া : অর্ঘ, অর্হৎ, অর্হ (মহার্হ)।

অস্=হওয়া : সৎ, সতী, অস্তিত্ব, আস্তিক, নাস্তিক, স্বস্তি।

আপ্=পাওয়া : আপ্ত, আপনীয় (প্রাপণীয়), আপন, ঈপ্সা।

আস্=বসা : আসন।

ই (ঈ, অয়্)=যাওয়া : -অয় (ব্যয়, অব্যয়), আয়, অয়ন, আয়ুঃ, ইতি, -ইত (অতীত), -এয়, -এতব্য।

ইষ্, ইচ্ছ্=ইচ্ছা করা : ইচ্ছা, ইচ্ছুক, এষা, এষণ, -এষণা (গবেষণা), -এষ্টব্য (অন্বেষ্টব্য)।

ঈক্ষ্=দেখা : -ঈক্ষা (পরীক্ষা, সমীক্ষা), -ঈক্ষণ, -ঈক্ষক, ঈক্ষণীয়।

ঈশ্=প্রভু হওয়া : ঈশ, ঈশ্বর, ঈশান।

ঋ, ঋচ্ছ্=যাওয়া, পাঠানো : অরণি, অরিত্র, অর্ণ, আর্ত, ঋতু, ঋত, ঋণ, রথ, অর্পণ।

কম্=ভালবাসা : কম, কম্র, কাম, কাম্য, কমনীয়, কামুক, কাময়িতব্য।

কম্প্=কাঁপা : কম্প, কম্পন, কম্র।

কাশ্=দীপ্তি পাওয়া : -কাশ[ন] -কাশয়িতব্য।

কুপ্=ক্রুদ্ধ হওয়া : কোপ, কোপন।

কৃ=করা : -কর, -করণ, -করণীয়, কর্তব্য, কর্তা, কর্ত্রী, কর্তৃ-, -কর্ম, -কার, -কারক, কারণ, কারী কারিণী কারি, কারণীয়, কারু, কৃত্য, -কৃতি, কৃত্রিম, ক্রতু, -ক্রিয়া, চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, কারয়িতা।

কৃৎ=কাটা : কর্তন, কৃন্তন, কৃত্তি।

কৃষ্=টানা, লাঙ্গল টানা : -কর্ষ, কর্ষণ, কর্ষক, কর্ষণীয়, কৃষি, কৃষ্টি।

কৃপ্=উপযোগী হওয়া : কল্প, কল্পনা, কল্পনীয়, কল্পিতব্য।

ক্রম্=পদক্ষেপ করা : -ক্রমণ, -ক্রম, -ক্রান্ত, চংক্রম, চংক্রমণ।

ক্রী=কেনা : ক্রয়, ক্রয়ক, ক্রয্য, ক্রেতব্য, ক্রেতা, ক্রেত্রী, ক্রেয়।

ক্লিদ্=ক্লেদযুক্ত হওয়া : ক্লেদ, ক্লিন্ন।

ক্ষম্=সহ্য করা : ক্ষমা, ক্ষম, ক্ষন্তব্য।

ক্ষি=নষ্ট করা, নষ্ট হওয়া, রাজত্ব করা : ক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষিতি।

ক্ষিপ্=ছোঁড়া : ক্ষিপ্ত, -ক্ষেপ, ক্ষেপন, ক্ষিপ্র।

ক্ষুভ্=কম্পিত হওয়া : ক্ষুব্ধ, ক্ষোভ, -ক্ষোভন।

খন্=খোঁড়া : খন, খনন, খনি, খনিত্র, খনক।

খাদ্=চর্বণ করা : খাদ্য, খাদন, খাদনীয়, খাদিতব্য।

খিদ্=খোঁড়া : খিন্ন, খেদ, খেদন।

খ্যা=দেখা : -খ্যা (আখ্যা), খ্যাতি, খ্যাতী, খ্যাপক, খ্যাপন।

গম্>গচ্ছ=যাওয়া : গচ্ছ (স্বয়ংগচ্ছ), -গম, গমক, -গম্য, -গমন, -গমনীয়, -গতি, -গত, -গন্তব্য, গন্তা, -গামী গামিনী গামি, গময়িতব্য, জগৎ, জঙ্গম, জিগমিষু।

গৈ=গান করা : গায়ক, গাথী, গায়ত্রী, গাতব্য, গান, গীতি।

গুপ্=রক্ষা করা, গোপন করা : গোপ্য, গুপ্ত, গুপ্তি, গোপন, গোপনীয়, জুগুপ্সা।

গুহ্=গোপন করা : গুহ, গুহা, গুহ্য।

গৃ>জাগৃ=জাগা : জাগর, জাগরূক, জাগ্রৎ, জাগরিত।

গ্রহ্, গ্রভ্=ধরা : -গ্রহ, -গ্রহণ, গ্রহণীয়, -গ্রাহ, -গ্রহীতব্য, -গৃহীত, গ্রহীতা, গ্রাহী, গ্রাহক, গৃহ, গৃহ্য ; গর্ভ।

ঘট্=ঘটা, চেষ্টা করা : -ঘট, ঘটক, ঘটন, ঘটনা, -ঘাটন, ঘটয়িতব্য, -ঘটিত।

ঘুষ্=ঘোষণা করা : ঘোষ, ঘোষণ, ঘোষণা, ঘোষিত, ঘোষণীয়।

চক্ষ্=দেখা : চক্ষু, (বি)চক্ষণ।

চর্=চরা : -চর, চরক, চর্ম, চর্যা, চরণ, চরণীয়, চরিতব্য, চরিত্র, চরিষ্ণু, চর্বণ, -চার, -চারী -চারিণী -চারি, -চারণ, চারণীয়, চরাচর, চারয়িতব্য।

চল্=চলা : -চল, চলক, চলন, চলনীয়, চলিতব্য, চালী, -চালন, -চালক।

চি=সংগ্রহ করা : কায়, -চয়, -চয়ন, চয়িতব্য, -চিতি, -চেয়।

চিৎ=জানা : কেতন, কেতু, চিৎ, চিত্তি, চিত্ত, -চিত্র, চেতন, চেতঃ, চিকিৎসা, চিকিৎসক, চেতয়িতা, চেতয়িতব্য।

চিন্ত=চিন্তা করা : চিন্তা, চিন্তক, চিন্তন, চিন্তনীয়, চিন্তয়িতব্য, চিন্তিত।

চেষ্ট্=নড়া, চলা : চেষ্টা, চেষ্টন, চেষ্টিতব্য, চেষ্টয়িতা, চেষ্টিত।

চ্যু=নড়া, চলা : চ্যবন, চ্যুতি।

ছদ্=আবৃত করা : -ছদ, -ছাদ, -ছদন, -ছাদন, -ছাদ্য, -ছাদী -ছাদক, ছত্র, ছদ্ম, -ছন্ন।

ছিদ্=ছিন্ন করা : ছিদ্, -ছিত্তি, ছিদ্র, ছেদক, ছেদী, ছেদ, -ছেদন, ছেদনীয়, -ছেত্তব্য, ছেত্তা, -ছিন্ন।

জন্>জা=জন্ম দেওয়া, জাত হওয়া : -জন, জনঃ, জনক, জন্তু, জনন, জন্ত, জনিতব্য, জনয়িতা জনয়িত্রী জনয়িতৃ, জন্ম, জনিষ্যমান, জনয়িতব্য ; -জ, জাতি, -জানি, জায়া।

জপ্=জপ করা : জপ, জপী, জপ্য, জপন, জপনীয়, জাপ, জাপক, জাপ্য।

জি=জয় করা : -জয়, জয়ী, জয়িনী, -জিৎ, জিন, জিষ্ণু, জয়িষ্ণু, -জেতব্য, -জেতা, -জেয়, জিগীষা, জিগীষু।

জীব্=প্রাণধারণ করা : জীব, জীবক, জীবী, জীবিনী, -জীবা, -জীবন, জীবনীয়, জীবিতব্য, জিজীবিষা।

জৄ, জুর্=ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া : জর, জরা, জারণ, জর্জর।

জ্ঞা=জানা : -জ্ঞান, জ্ঞাতি, জ্ঞাতব্য, জ্ঞাতা, জ্ঞাতৃ, -জ্ঞেয়, জ্ঞাপন, জ্ঞপ্তি, জ্ঞাপক, জ্ঞাপয়িতব্য, জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসন, জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসু।

তন্=টানা : -তন, তনয়, তনু, তন্তু, তন্ত্র, তন্ত্র, -তান।

তপ্=তপ্ত হওয়া : তপঃ, তপা, তপন, তপ্তব্য, -তাপ, -তাপক, -তাপী, -তাপন, তাপয়িতা।

তিজ্=কঠোর হওয়া : তিগ্ম, তেজঃ, তীক্ষ্ণ, -তেজন, তেজিষ্ঠ, তেজীয়ান্, তেজস্বী, তিতিক্ষা, তিতিক্ষু।

তুষ্‌=আনন্দিত হওয়া : -তুষ্টি, তুষ্টিম্‌, -তোষ, তোষক, তোষী তোষিণী, -তোষা, -তোষণ, -তোষণীয়, -তোষ্টব্য, তোষয়িতব্য, তোষয়িতা।

তৃ=পার হওয়া: -তর, তরী, -তরণ, তরণীয়, তরণি, তরুণ, তরু, তর্তব্য, তরিতব্য, তীর, তীর্থ, -তার, তারক, তারী তারিণী, তারণ, তারণীয়, তারা, তিতীর্ষা, তিতীর্ষু।

তৃপ্‌=তৃপ্ত হওয়া : তৃপ্তি, তৃপ্ত, তর্পণ, তর্পণীয়, তর্পয়িতব্য।

ত্যজ্‌=ত্যাগ করা : ত্যজন, ত্যজনীয়, ত্যক্তব্য, -ত্যক্ত, -ত্যাগ, ত্যাগী, ত্যাজ্য।

ত্রুট্‌=ভগ্ন হওয়া, টুকরা-টুকরা হওয়া : ত্রুটি (ত্রুটী), ত্রুটিত, ত্রোটক।

দংশ্‌, দশ্‌=কামড়ানো : দংশ, দংশক, দংশুক, দংষ্ট্রা, দশা, দশন।

দম্‌=দমন করা, বশে রাখা : দম, দমন, দমনীয়, দান্ত, দময়িতা।

দহ=পোড়ানো : দহ, দগ্ধব্য, দগ্ধা, -দাহ (দাঘ), -দাহক, দাহ্য, দগ্ধ, দাহন, দাহক, দিধক্ষু।

দা (>দদ্‌)=দেওয়া : -দা, -দ, দাতব্য, দাতা দাত্রী দাতৃ, -দান, দাম, -দত্ত, দায়, দায়ক, দায়ী দায়িনী দায়ি, দেয়, দিৎসা, দিদিৎসু, দাপনীয়।

দা=উজ্জ্বলো : অবদান (=উজ্জ্বল চরিত্র)।

দিশ্‌=দেখানো : দিশ্‌ দিক্‌, দিষ্ট, দিষ্টি, -দেশ, -দেশক, -দেশী, দেশ্য, দেশন, দেশনা, দিদিক্ষু।

দুষ্‌=দোষী করা : দুষ্ট, দূষক (বিদূষক), দূষ্য, দূষণ, দোষ, দোষ্য।

দুহ্‌=দুধ দোহা : -ধুক্‌ (কামধুক্‌), দুহিতা, দোহ, দোহক, দোহন, দোগ্ধব্য, দোগ্ধা, দোগ্ধ্রী।

দৃশ্‌=দেখা : -দর্শ, -দর্শক, দর্শী দর্শিনী দর্শি, -দর্শন, দর্শনীয়, -দৃক্‌, দৃশ, দৃশ্য, দৃষ্টি, দৃষ্ট, দ্রষ্টব্য, দ্রষ্টা, দিদৃক্ষা, দিদৃক্ষু।

দ্যুৎ=দীপ্তি পাওয়া: (বি)দ্যুৎ, দ্যুতি, -দ্যোত (খদ্যোত), দ্যোতক, দ্যোতন, দ্যোতনা।

দ্রু=দৌড়ানো : -দ্রব, দ্রব্য, দ্রবণ, দ্রাব, দ্রাবণ, -দ্রুত, দ্রুতি।

দ্বিষ্‌=হিংসা করা : দ্বিষ্‌ দ্বেষ, দ্বেষক, দ্বেষী, দ্বেষণ, দ্বেষণীয়।

ধা (>দধ্‌)=রাখা : ধা, -ধান, ধানীয়, -ধাতা ধাত্রী ধাতৃ, ধাম, ধায়ক, ধায়ী ধায়িনী, -হিতি, -হিত, -ধেয়।

ধৃ=ধরা : -ধর, ধরণ, ধরণীয়, ধরণী, ধর্তা, ধরিত্রী, ধর্ম, -ধার, -ধারক, ধারী ধারিণী ধারি, ধার্য, -ধারণ, ধারণীয়, ধুর্, ধৃতি, ধ্রুব, দিধীর্ষু, ধারয়িতা।

ধৃষ্=সাহস করা : ধর্ষ, ধর্ষণ, ধৃষ্ট, ধৃষ্ণু।

নশ্=নষ্ট হওয়া : নষ্ট, নশ্বর, নাশ, নাশক, নাশ্য, নাশন, নাশয়িতা।

নহ্=বাঁধা : নদ্ধ, পিনদ্ধ।

নী=পথ দেখানো : -নী (সেনানী), -নয়, -নয়ী, -নয়ন, নায়ক, -নীতি, -নেতব্য, নয়িতব্য, নেতা নেত্রী নেতৃ, নেত্র, নেয়।

নৃৎ=নাচা : নৃত্য, নর্তক, নর্তন, নৃত্ত।

পচ্=রাঁধা : পচ, পচা, পচন, পাক, পক্ব, পাচক, পাচন, পাচিত।

পৎ=পড়া, উড়া : -পত, পতন, পত্র, পতত্র, -পাত, পাতক, পাতী, পাতনীয়।

পা=পান করা : -প, পান, পানীয়, পাতা, পাত্র, পায়ী, পিপাসা, পিপাসু।

পা=পালন করা : -প, পাতা, পাতব্য, পাল, পালন, পালনীয়, পালিত।

পূ=পবিত্র করা : পবিত্র, পাবক।

পূয্=দুর্গন্ধ হওয়া : পূয, পূতি।

পৃ, পৃণ্, পূর্=পূর্ণ হওয়া : পর্ব, পূর্তি, পুর, পূরক, -পূরণ, পূরণীয়, পূরিত, পূরয়িতব্য।

পৃ=পার হওয়া : পার, পারী, পারণ, পারণীয়, পারয়িতা।

পৃ=নিযুক্ত বা ব্যস্ত হওয়া : -পার (ব্যাপার)।

প্রচ্ছ্=জিজ্ঞাসা করা : পৃচ্ছা, পৃচ্ছক, প্রষ্টব্য, প্রষ্টা, পৃষ্ট, প্রশ্ন।

প্রথ্=বিস্তৃত হওয়া : পৃথক্, পৃথু, পৃথ্বী, পৃথিবী, প্রথা।

প্রী=প্রীত হওয়া : প্রিয়, প্রীতি, প্রেম, প্রেয়ঃ, প্রেষ্ঠ, প্রীণন, প্রীত।

প্লু=ভাসা : -প্লব, প্লুত, প্লুতি, প্লাবন, প্লাবিত।

বন্ধ্=বাঁধা : -বন্ধ, -বন্ধন, বন্ধনীয়, বন্ধু, -বদ্ধ।

বাধ্=পীড়া দেওয়া : বাধক, বাধা, বাধিতব্য, বীভৎস।

বুধ্=জানা, জাগা : বুধ, বুধা, -বোধ, বোধক, বোধী বোধিনী, বোধ্য, -বোধন, বোধনীয়, বোধি, বুদ্ধ, বুদ্ধি, বোদ্ধা, বোধিতব্য, বোদ্ধব্য, বোধয়িতা।

ভজ্=ভাগ করা, অংশ-গ্রহণ করা : ভাজী, ভজ্য, ভজন, ভজনীয়, ভক্ত, ভক্তি, ভক্তিতব্য, -ভাগ, ভাগী ভাগিনী ভাগি, -ভাগ্য, ভাজ, -ভাজক, -ভাজ্য, ভাজন।

ভঞ্জ্=ভাঙা : -ভঙ্গ, ভঙ্গি, ভঞ্জক, ভঞ্জন, ভঙ্গুর, -ভগ্ন।

ভা=দীপ্তি পাওয়া: -ভা, ভানু, ভাতি, -ভাত, -ভাস, ভাসা, ভাস্বর, ভাস্কর।

ভাষ্=কথা কহা : ভাষ, ভাষা, ভাষক, ভাষী ভাষিণী, ভাষণ, ভাষণীয়, ভাষ্য, ভাষিত, ভাষিতব্য।

ভিদ্=ভেদ করা : ভিৎ, ভিদ, ভিদ্য, -ভেদ, ভেদক, ভেদী, ভেদ্য, ভেদন, ভেদনীয়, -ভিন্ন, ভিত্তি, ভেত্তা।

ভী=ভয় পাওয়া : ভী, ভয়, ভীতি, ভেতব্য, ভীম, ভীরু, -ভীষণ, (বি)ভীষিকা, ভীষ্ম।

ভুজ্=বাঁকা : ভুজ (ভুজগ), ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ।

ভুজ্=ভোগ করা : -ভুক্, ভোজ, ভোজক, ভোজী, ভোজ্য, -ভোগ, ভোগী ভোগিনী, ভোগ্য, ভোজন, ভোজনীয়, ভুক্তি, -ভুক্ত, ভোক্তব্য, ভোক্তা ভোক্ত্রী ভোক্তৃ, বুভুক্ষা, বুভুক্ষু, ভোজয়িতব্য, ভোজয়িতা।

ভূ=হওয়া : -ভু, -ভূ, -ভব, ভবক, ভবী, ভব্য, ভবন, ভবনীয়, ভুবন, -ভূতি, -ভূত, ভবিতব্য, ভবিতা ভবিত্রী ভবিতৃ, ভূমা, ভূমি, ভূয়ঃ, ভূয়িষ্ঠ, ভূরি, ভবিষ্ণু, -ভাব, ভাবক, ভাবী ভাবিনী ভাবি, ভাব্য, -ভাবন, -ভাবনীয়, ভাবুক, ভাবয়িতব্য, ভাবয়িতা।

ভৃ=ভরণ করা: -ভর, ভরণ, ভরণীয়, ভরত, ভারত, ভর্তব্য, ভর্তা ভর্ত্রী ভর্তৃ, ভ্রাতা, ভ্রূণ, ভার, ভারী, ভার্যা, -ভৃৎ, ভৃত, ভৃতি, ভৃত্য, -ভৃথ।

ভ্রম্=ঘোরা : ভৃমি, ভৃঙ্গ, -ভ্রম, ভ্রমী, ভ্রমণ, ভ্রমণীয়, ভ্রান্তি, -ভ্রান্ত, ভ্রামক।

মদ্, মন্দ্, মাদ্=উল্লসিত হওয়া, প্রমত্ত হওয়া: -মদ, মদী, মদ্য, মদন, মদিতব্য, মদির, মদিরা, মত্ত, মৎসর, -মাদ, মাদক, -মাদী -মাদিনী -মাদি, মাদ্য, -মাদন,-মাদনা, মদয়িতা মদয়িত্রী, মাদয়িতা মাদয়িত্রী, মন্দ, মন্দার, মন্দ্র।

মন্=চিন্তা করা : মনঃ মন, মনীষা, মনু, -মনন, -মত, -মতি, মন্তব্য, মন্তা, মন্ত্র, মন্ত্রী, মন্যু, মান্তি, -মান, মানক, মানী মানিনী মানি, মান্য, মুনি, মন্ত, মীমাংসা, মীমাংস্য।

মা=পরিমাপ করা : -মান, -মিতি, -মিত, -মাতব্য, -মাতা, মাত্র, মায়া, (চন্দ্র)-মাঃ, -মেয়, মাপক, মাপ্য, মাপন।

মুচ্, মোক্ষ্=মোচন করা : মুক্, মুচ, -মোক, মোচ, মোচক, -মোচন, মোচনীয়, -মুক্ত, মুক্তি, মোক্তব্য, মোক্ষ, মোক্ষা, মোক্ষণ, মোক্ষণীয়, মুমুক্ষু।

মুহ্‌=মুগ্ধ হওয়া : -মোহ, মুগ্ধ, -মূঢ়, মোহয়িতা, মোহী মোহিনী।

মৃ=মরা : -মর, মরক, মরণ, মরু, মর্ত, মর্তা, মৃত, মর্তব্য, মৃত্যু, মর্ম, মার, মারক, মারী, মারণ, মুমূর্ষু।

যজ্‌=যজনা করা : যজ্‌, -যজ, ইজ্যা, যজন, যজনীয়, যজুঃ, যষ্টব্য, যজ্ঞ, যাগ, যাজ, যাজক, যাজী, যাজ্য, যাজন, যাজনীয়, যাজয়িতা, যাজয়িতব্য, যজমান।

যা=যাওয়া : যান, যাতব্য, যাতা, যাত্র, যাম, যায়ী, যাযাবর, যাপ্য, যাপক, যাপন।

যুজ্‌=যোগ করা : যুজ, যুগ, -যোগ, যোগ্য, যোগী যোগিনী, যোজক, যোজ্য, যোজন, যোজনীয়, -যুক্ত, যুক্তি, যোক্তব্য, যোক্তা, যুগ্ম, যোজয়িতব্য, যোজয়িতা।

যুধ্‌=যুদ্ধ করা : -যুধ্‌, যুধ, যোধ্য, যোধন, যোদ্ধা যোদ্ধী যোদ্ধৃ, যুযুৎসু।

রঞ্জ্‌, রঙ্‌জ্‌=রঞ্জিত হওয়া : রঙ্গ, রঞ্জক, রজক, রঞ্জন, রঞ্জনীয়, রজনী, রজঃ, রজত, রক্ত, রাগ, -রাগী, রাগিণী।

রম্‌=প্রীত হওয়া বা প্রীত করা : রম, রমণ, রমণীয়, রম্য, -রত, -রতি, রন্তব্য, রাম, রামা, রিরংসা।

রাজ্‌=রাজার মত হওয়া : রাজ্‌, -রাট্‌, রাজা, -রাজ, রাজ্ঞী, রাষ্ট্র।

রিচ্‌=পরিত্যাগ করা : রেচ, -রেচক, রেচ্য, -রেচন, রেচনীয়, রিক্থ।

রুচ্‌=দীপ্ত পাওয়া, ভাল লাগা : রুচি, রুচির, রুচ, রুচক, রোচ, রোচক, রোচনা, রুক্ম, রুক্মিণী, রুক্ষ।

রুহ্‌=চড়া : -রোহ, -রোহণ, রূঢ়, রূঢ়ি, -রোপ, -রোপণ, রোপ্য, রোপণ, রোপণীয়।

লভ্‌=লাভ করা : লভ, লভ্য, লাভ, লাভী, লব্ধ, -লব্ধি, লব্ধব্য, লম্ভ, লিপ্সা, লিপ্সু।

লিহ্‌=চাটা : লিহ, লেহ, লেহক, লেহ্য, লীঢ়, লেহন, লেলিহান।

বচ্‌=বলা : বাক্‌, বচঃ, উচ্য, বাক্‌, বাক্য, বাচক, বাচী, বাচ্য, বচন, বাচন, বচনীয়, বচঃ, উক্ত, উক্তি, বক্তব্য, বক্তৃ, উক্থ, বাগ্মী, বিবক্ষা, বাচয়িতা।

বদ্‌=বলা : -বদ, -বক্তৃ, উদ্য, -উদিত, -বাদ, বাদক, -বাদী বাদিনী, বাদ্য, বাদন, বাদনীয়, বাদিতব্য।

বপ্‌=বপন করা : বাপ, বপন, বপনীয়, উপ্ত, বপ্তা।

বস্‌=বাস করা : -বস, -বাস, বসন, বাসন, বাসী বাসিনী, বাসক, বাসনীয়, বসতি, বস্ত্র, বাস্ত, বস্তব্য, বাস্তব্য, উষিত, উষিতব্য।

বহ্—বহা : -বহ, -বাহ, বাহ্য, -বাহন, বহন, বহনীয়, বাহী বাহিনী বাহি, উঢ়, বোঢ়ব্য বোঢ়া, বহিত্র, বহি, বক্ষঃ।

বিচ্—বিচার করা : (বি)বেক, (বি)বেচক, (বি)বেচন(1), (বি)বিক্ত।

বিদ্—জানা : -বিৎ, বিদ, বেদ, -বেদক, বেদী, বেদ্য, -বেদন, বেদনীয়, বিত্ত, বেত্তা, বেদিতা, বেদিতব্য, বিদ্যা, বিদুর, বিদ্বান্ বিদুষী, বেদয়িতা।

বৃ—ঢাকা দেওয়া : -বর, বরক, -বরণ, বরণীয়, উরু, বৃৎ, -বৃত, -বৃতি, বৃত্র, বর্ণ, বরুণ, বর্ম, ঊর্ণা, ঊর্মি, বরিষ্ঠ, বার, বারক, বৃত, বার্য।

বৃ=বরণ করা : -বর, বর্য, বরেণ্য, বরিষ্ঠ।

বৃৎ—ফিরা : বৃৎ, -বৃত, -বর্ত, বর্তী, ব্রত, -বর্তন, -বর্তনীয়, -বৃত্তি, -বৃত্ত, বর্তব্য, বর্ত্ম।

বৃধ্—বাড়া : বৃদ্ধ, বর্ধক, বর্ধন, বর্ধনীয়, বর্ধিষ্ণু, উধ্ব´, বর্ধয়িতা, বর্ধাপন, বর্ধমান।

শংস্—প্রশংসা করা : (প্র)শস্ত, -শংসা, -শংসন, -শস্তি, -শস্ত, -শস্তব্য।

শক্—সমর্থ হওয়া : -শক, শক্য, শক্ত, শক্তি, শক্র, শচী ; শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষণ, শিক্ষণীয়, শিক্ষু।

শম্—শান্ত হওয়া : -শম, শাম্য, শমনীয়, শান্ত, শময়িতব্য।

শস্—আদেশ দেওয়া : শাসন, শাসক, শিষ্ট, শস্ত, শাস্তি, শাস্তা, শাস্ত্র।

শী—শোওয়া : -শ, -শয়, শয্যা, শায়ী শায়িনী শায়ি, শয়ন, শয়নীয়, -শায়ন, শয়িতব্য।

শুচ্—দীপ্তি পাওয়া : শুক্, শুচ, শোচ, শোচা, -শোক, শোচন, শোচনীয়, শুচি, শুক্তি, শোচিতব্য, শুক্র, শুক্ল।

শ্রি—আশ্রয় করা : -শ্রয়, -শ্রয়ী, শালা, -শ্রয়ণীয়, -শ্রিত, শ্রয়িতব্য, শরণ, শ্রেণি, শর্ম, শরীর।

শ্রু—শোনা : -শ্রব, শ্রব্য, শ্রবণ, শ্রবণীয়, শ্রাব্য, শ্রাবণ, শ্রবঃ, শ্লোক, -শ্রুতি, -শ্রুত, শ্রোতব্য, শ্রোতা শ্রোত্রী শ্রোতৃ, শ্রোত্রিয়, শুশ্রূষা, শুশ্রূষক, শ্রাবয়িতা, শ্রাবয়িতব্য।

সঞ্জ্, সজ্জ্—জোড়া : সজ্জা, সঙ্গ, -সঙ্গ, সঙ্গী সঙ্গিনী সঙ্গি, -সক্ত।

সদ্=বসা : সদ, সত্ত্ব, সদঃ, সদস্য, সদন, -সন্ন (নিষণ্ণ), সত্র, সদ্ম, সাদয়িতব্য।

সহ্=শক্ত হওয়া, সহ্য করা : -সহ, সহসা, সাহস, সহ্য, সহন, সহনীয়, সোঢ়ব্য, সহিতব্য।

সিচ্—সেচন করা, ঢালা : -সেক, -সেচন, সেচক, সেচনীয়, -সিক্ত, সেক্তব্য।

সীব্ =সেলাই করা : সীবন, সীবক, সেব, সেবিতব্য, সূত্র।

সৃ—প্রবাহিত হওয়া : -সর, -সার, সারক, সরণি, -সরণ, সরণীয়, সরঃ, সরিৎ, -সৃত, সৃতি, সর্তব্য, সলিল, সরল।

সৃজ্—পরিচালনা করা : স্রক্, -সর্গ, সর্জ, -সর্জন (বাঙ্গালায় সৃজন), সৃষ্ট, সৃষ্টি, স্রষ্টা, স্রষ্টব্য, সিসৃক্ষা।

সৃপ্—বুকে হাঁটা : সর্প, সর্পী, সর্পণ, সর্পিঃ, সরীসৃপ।

স্তম্ভ্, স্তভ্—ভার বহন করা : স্তম্ভ, -স্তব্ধ।

স্তু—স্তব করা : স্তব, স্তুতি, স্তুত, স্তোতা, স্তবনীয়, স্তাবক, স্তোতব্য, স্তোত্র।

স্থা=দাঁড়ানো, থাকা : -স্থ, -স্থান, স্থেয়, -স্থিত, -স্থিতি, স্থাতব্য, স্থাতা, স্থাণু, স্থির, স্থাবর, তিষ্ঠ, -স্থাপক, স্থাপন, স্থাপনীয়, স্থাপয়িতা, স্থাপয়িতব্য।

স্বপ্—নিদ্রা যাওয়া : স্বাপ, স্বপ্ন, সুপ্তি, স্বপ্তব্য।

হন্—আঘাত করা : -হন্, -ঘ্ন, -ঘ, -হনন, হত্যা, -হত, হন্তব্য, হন্তা হন্ত্রী, জিঘাংসা, জিঘাংসু, -ঘাত, ঘাতক, ঘাতী ঘাতিনী, ঘাতন, ঘাতুক।

হু—হোম করা : -হব, হব্য, হবন, হবনীয়, হবিঃ, -হুত, -হুতি, হোতব্য, হোতা, হোত্র, হোম।

হৃ=হরণ করা : হর, -হার, হারী হারিণী হারি, -হৃত, হর্তব্য, -হর্তা, হারয়িতব্য।

[৫.৫] সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দূ), ফারসী, ও আরবী ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনা

[৫.৫১] ঐতিহাসিক কথা

[৫.৫১১] সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী

সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের ভাষা, ভারতের নিজস্ব সভ্যতার বাহন, আধুনিক হিন্দু জাতির এবং আংশিক-ভাবে ভারতের বাহিরের বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা—এক কথায়, ভারতবর্ষের 'জাতীয়' ভাষা। ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যেরা যে ভাষা বা উপভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তাহার মার্জিত সাহিত্যিক রূপ

আমরা পাই বেদগ্রন্থগুলিতে। "বৈদিক" ভাষা, অথবা "বৈদিক সংস্কৃত," ভারতে আর্য-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

তৎপরে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের অর্ধ-সহস্রক পূর্বে, পঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ অন্তর্বেদিতে প্রচলিত আর্য-ভাষার তথা বৈদিক সাহিত্যের ভাষার আধারের উপরে "লৌকিক সংস্কৃত" প্রতিষ্ঠিত হয়। পাণিনি-কর্তৃক এই ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম স্থিরীকৃত হয়—পাণিনির সময় (খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক ?) হইতে প্রায় তাবৎ সংস্কৃত লেখক এই ব্যাকরণ মানিয়া আসিতেছেন। বৈদিক ভাষা, লৌকিক-সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতর রূপ। বৈদিক ও সংস্কৃত, এই দুইটী ভারতের « আদি আর্য » -যুগের ভাষার নিদর্শন—এ দুইটীকে « আদি-ভারতীয় আর্য » ভাষা বলা যায়। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ সূত্র-গ্রন্থ মহাভারত রামায়ণ পুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া, পরে অশ্বঘোষ, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্মা, শঙ্করাচার্য, রাজশেখর প্রভৃতি নানা কবি ও অন্য লেখকের হাতে, সংস্কৃত সাহিত্য তিন হাজারের অধিক কাল ধরিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া আসিতেছে।

লোক-মুখে প্রাচীন ভারতে আর্য-ভাষার পরিবর্তন ঘটিল, ভাষা নূতন আকার ধারণ করিল। এই নূতন আকারের ভাষার নাম « মধ্য অবস্থার আর্য-ভাষা » বা « মধ্য-আর্য », অথবা « প্রাকৃত »। প্রদেশ-ভেদে প্রাকৃতের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ দেখা যায়। কতকগুলি প্রাকৃত আবার সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে থাকে; তন্মধ্যে একটী প্রাকৃত হইতেছে « পালি »। এই পালি-ভাষা, মথুরা উজ্জয়িনী অঞ্চলের লোক-ভাষার একটী সাহিত্যিক রূপ—বুদ্ধদেব মগধের ও কাশী অঞ্চলের যে প্রাকৃত বলিতেন, তাহা হইতে ইহা পৃথক্। বুদ্ধদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া পালি-ভাষায় একটী বড় সাহিত্য দাঁড়াইয়া গেল। বাঙ্গালা দেশের চট্টলে ও সিংহলে, ব্রহ্মে, কম্বোজে ও থাই-দেশে (শ্যামরাজ্যে) বৌদ্ধগণ এই পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। অধুনা ভারতবর্ষে পালির পুনঃপ্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

অবিরত পরিবর্তনের ফলে, খ্রীষ্টীয় ৬০০-র পরে প্রাকৃতগুলি যে অবস্থায় আসিয়া পহুঁছিল, তাহাকে « অপভ্রংশ » বলে। খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে, এখন হইতে ৯০০ বা ১,০০০ বৎসর পূর্বে, বিভিন্ন প্রাদেশিক অপভ্রংশের বিকারে, আধুনিক « ভাষা »-গুলির উৎপত্তি হইল—হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দু), বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি

উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের « আধুনিক আর্য » বা « নবীন আর্য » ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটিল।

সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী—এগুলি একই ভাষা-গোষ্ঠীর বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত—ভারতের একই আর্য-ভাষার প্রাচীন বা আদি রূপ হইতেছে বৈদিক সংস্কৃত, মধ্য রূপ প্রাকৃত ও পালি, এবং আধুনিক, নবীন বা নব্য রূপ বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি। পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও, বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলিতে সংস্কৃত ও পালি যুগের আর্য-ভাষার অনেক জিনিস লোপ পাইয়াছে, অনেক নূতন রীতি আসিয়াছে, অনার্য ও বিদেশী ভাষা হইতে অনেক নূতন শব্দ ও ধারা গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপরে, ব্যাকরণে—উচ্চারণে, শব্দ- ও ধাতু-রূপে, ও বাক্য-রীতিতে—এবং শব্দ-সম্ভারে, প্রাচীন যুগের আর্য-ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের তুলনায়, বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি একেবারে নূতন বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৯০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে রচিত, « চর্যাপদ » নামে পরিচিত, কতকগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের গানে আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। তৎপূর্বে বাঙ্গালা ভাষা ছিল না; উত্তর-বিহারের মৈথিলী, দক্ষিণ-বিহারের মগহী, পশ্চিম-বিহারের ভোজপুরিয়া, উড়িষ্যার উড়িয়া ও আসামের আসামী প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ বাঙ্গালা ভাষা তখন নিজ রূপ গ্রহণ করে নাই—« মাগধী অপভ্রংশ » যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে এমন একটী প্রাকৃত-ভাষার মধ্যে, ঐ ভাষাগুলির সঙ্গে, বাঙ্গালা ভাষাও নিহিত ছিল; খ্রীষ্টীয় ৭০০।৮০০-র দিকে মাগধী অপভ্রংশ পূর্ব-ভারতে প্রচলিত ছিল, এই ভাষা ছিল বাঙ্গালা আসামী উড়িয়া, মৈথিলী মগহী এবং ভোজপুরিয়ার মাতৃস্থানীয়।

হিন্দুস্থানীর (হিন্দী-উর্দুর) উদ্ভবও ঐ সময়ে হয়—মধ্য-দেশ অর্থাৎ পশ্চিম-সংযুক্ত-প্রদেশ এবং পূর্ব-পাঞ্জাবে প্রচলিত « শৌরসেনী অপভ্রংশ » হইতে; হিন্দুস্থানীর উপরে আবার পাঞ্জাবী ভাষার প্রভাবও যথেষ্ট পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবের ও দিল্লী অঞ্চলের ভাষা লইয়া, দিল্লীর মুসলমান সম্রাটদের আমলে, দিল্লী-শহরে হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি হইতে থাকে। সমগ্র উত্তর-ভারতে এই হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার হয়; ইহার ফলে, পাঞ্জাবী (পাঞ্জাব), ব্রজভাষা (মথুরা), অবধী (অযোধ্যা), ভোজপুরিয়া (কাশী) প্রভৃতি বিবিধ প্রান্তিক কথ্য ভাষা, যেগুলি সাহিত্যেও ব্যবহৃত হইত, সেগুলির প্রতিষ্ঠাও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। উত্তর-ভারত হইতে পাঠান ও মোগল যুগে যে-সকল মুসলমান ও হিন্দু দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধাদি উপলক্ষে গিয়াছিল, তাহারা দক্ষিণেও এই হিন্দুস্থানী ভাষাকে

স্থাপিত করে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে, ভারতীয় মুসলমানদের হাতে, হিন্দুস্থানী ভাষাতে ফারসী সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য-রচনা হইতে থাকে; ঐ সময়ে আরবী বা ফারসী বর্ণমালায় মুসলমান লেখকেরা হিন্দুস্থানী ভাষা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ফারসী অক্ষরে লেখা ও ফারসী শব্দ-বহুল মুসলমানী হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, « উর্দূ » নামে দাঁড়াইয়া যায়। উত্তর-ভারতের হিন্দুরা দেবনাগরী লিপিতে ব্রজভাষা অবধী প্রভৃতি ভাষা লিখিত, তাহারাও দেবনাগরী লিপিতে হিন্দুস্থানী লিখিতে আরম্ভ করিল। ফলে, এক-ই হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটী রূপ দাঁড়াইয়া গেল—মুসলমানী রূপ «উর্দূ», এবং হিন্দু রূপ « হিন্দী »। « উর্দূ » ক্রমে-ক্রমে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে, বাঙ্গালা-প্রদেশকে, এবং আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সিন্ধু-প্রদেশকে বাদ দিয়া, সমগ্র হিন্দুস্থান বা উত্তর-ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, এবং কোনও-কোনও স্থানে হিন্দুদের মধ্যেও, সাহিত্যের ভাষা-রূপে গৃহীত হইল। উর্দূ অবিসংবাদিত-ভাবে উত্তর-ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ভাষা হইয়া গিয়াছে বলিয়া, সম্প্রতি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজেও উর্দূর কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হিন্দুস্থানী ভাষা, যাহা হিন্দী আর উর্দূর সাধারণ রূপ, উত্তর-ভারতের লোকে সর্বত্রই বুঝিতে ও কতক-কতক বলিতে পারে, এবং দক্ষিণ-ভারতেও ইহার প্রসার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে; এই জন্য অনেকে হিন্দুস্থানী ভাষাকে সমগ্র ভারতের « রাষ্ট্র-ভাষা » বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে সংখ্যায় হিন্দুরা বেশী বলিয়া, হিন্দুদের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ দেবনাগরীতে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হিন্দী-ভাষা) আজকাল বেশী প্রচার লাভ করিতেছে।

[৫.৫১২] ফারসী

প্রাচীন কালে পারস্যদেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতের সহোদরা-স্থানীয়া। প্রাচীন পারস্যের ভাষা দুই মূর্তিতে মিলে: (ক) প্রাচীন পারস্যের ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা'-তে, এবং (খ) প্রাচীন পারস্যের কতকগুলি শিলালিপিতে ও অন্য লেখে। শিলালিপিতে প্রাপ্ত প্রাচীন-পারসীক ভাষা এবং অবেস্তা ভাষা, উভয়েরই সঙ্গে সংস্কৃতের (বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃতের) খুবই মিল আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০-র দিকে ও উহার দুই শত বৎসর পরে পর্যন্ত, প্রাচীন-পারসীক শিলালেখের সময়; অবেস্তার 'গাথা' নামে প্রাচীন অংশগুলি, পারস্যের ঋষি জ.রথু.শ.ত্র (সংস্কৃতে 'জরদুষ্ট') কর্তৃক লিখিত, সেগুলির সময় আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব।

"প্রাচীন-পারসীক" পরিবর্তিত হইয়া "মধ্য-পারসীক"-এ রূপান্তরিত হইল; মধ্য-পারসীকের একটী নাম "পহ্লবী"। (যেমন ভারতে সংস্কৃতের পরে প্রাকৃত।) পহ্লবীতে অবেস্তার অনুবাদ হয়, এবং অন্য সাহিত্যও রচিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্য-ভাগে, মুসলমান-ধর্মাবলম্বী আরবেরা পারস্য-দেশ জয় করে; তখন হইতে আরবদের চেষ্টায় পারস্যের লোকেরা আস্তে-আস্তে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে, এবং পারস্যের ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাবও আসিয়া যায়। পারসীকেরা তাহাদের প্রাচীন লিপি বর্জন করিয়া, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, ভাষায় বিস্তর আরবী শব্দও গ্রহণ করিল। পারস্য-ভাষা নূতন এক পর্যায়ে পড়িল—এই "নবীন-পারসীক" বা "ইস্লামীয় পারসীক"-এর পত্তন হইল খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষের কয় শতকে। এই নবীন-পারসীক বা ইস্লামীয় পারসীকের অন্য নাম "ফারসী" ভাষা অথবা "ইরানী" ভাষা। এই ভাষাতে ধীরে-ধীরে একটা খুব বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল।

খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে আফগানিস্থানে উপনিবিষ্ট তুর্কী-জাতীয় লোকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম অর্ধেই প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত তুর্কীদের করায়ত্ত হইয়া যায়। এই তুর্কীরা ছিল ধর্মে মুসলমান, তাহারা ধর্মানুষ্ঠানে আরবী মন্ত্র পড়িত; ঘরে ইহারা বলিত তুর্কী ভাষা; কিন্তু রাজকার্যের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা-হিসাবে, ইহাদের সুসভ্য ইরানী প্রজাদের ভাষা ফারসী-ভাষাই ইহারা ব্যবহার করিত। তুর্কীদের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ফারসী-ভাষা ভারতে আনীত হয়, ও ভারতের মুসলমান তুর্কী রাজ্যের রাজকীয় ভাষা-রূপে, ফারসী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটায় হিন্দী ও অন্য দেশ-ভাষায় সরকারী হিসাব-পত্র রাখা হইত; পরে সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে, এই কার্যে কেবল ফারসী-ই ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে সকল উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা, এবং হিন্দু রাজকর্মচারীরা, ও অন্য হিন্দু লোকেদের অনেকে, রাজভাষা বলিয়া ফারসী শিখিতে লাগিলেন। হিন্দু সভ্যতা এবং পারস্য হইতে আনীত পারস্যের মুসলমান সভ্যতা, উভয়ে মিলিয়া, ভারতীয় সভ্যতার একটী অভিনব বিকাশ—"ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা"—রূপে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং সেই সভ্যতার বাহন হইল ফারসী ভাষা। ভারতের বহু মুসলমান ও হিন্দু লেখক ফারসী ভাষায় ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতি লিখিয়াছেন। পারস্যের সূফী মতবাদ, হিন্দু বেদান্ত-দর্শনের অনুরূপ চিন্তা-মার্গ; এই সূফী দর্শন-দ্বারা অনুপ্রাণিত ফারসী ভাষায় নিবদ্ধ কবিতা সমগ্র মানবজাতির একটা বড় সম্পদ্।

ফারসী, আমাদের সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রভৃতিরই মত আর্য-ভাষা; পারস্য-দেশের এখনকার নাম 'ঈরান্' শব্দের অর্থ 'আর্যদের (দেশ)'—আধুনিক ফারসী 'ঈরান্' < মধ্য-পারসীক 'এরান্' < প্রাচীন-পারসীক 'আইর্যনাম্' = সংস্কৃত 'আর্যাণাম'। কেবল আধুনিক ফারসীর বর্ণমালা আরবী হইতে লওয়া, এবং আধুনিক ফারসীতে অনেক আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ফারসীর ব্যাকরণ অতি সরল; বহু বিষয়ে এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি সংস্কৃতকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

[৫.৫১৩] ইংরেজী

এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজভাষা-, এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে একতা-বিধায়িনী ভাষা-রূপে ইংরেজী ভাষা প্রতিষ্ঠিত। ইংলাণ্ডে ইংরেজ জাতির মধ্যে এই ভাষার উদ্ভব হয়। মূলে ইহা আমাদের সংস্কৃত ও ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত, Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় অথবা আর্য-বংশের ভাষা। ইংরেজীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের কতকগুলি লেখায়। ঐ সময়ে ইংরেজীর যে অবস্থা, তাহাকে Old English বা "প্রাচীন ইংরেজী" বলা হয়। "প্রাচীন ইংরেজী"র আর একটী নাম Anglo-Saxon. তখন হইতেই ইংরেজীতে একটী উচ্চ দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স হইতে আগত ফরাসী-ভাষী নরমান-জাতি ইংলাণ্ড জয় করে। তখন হইতে ফরাসী-ভাষার প্রভাব ইংরেজীর উপরে খুব বেশী করিয়া পড়িতে থাকে। ইউরোপের প্রাচীন সুসভ্য গ্রীক ও রোমান জাতিদ্বয়ের ভাষা গ্রীক ও লাটীন আমাদের দেশের সংস্কৃতের মত ইউরোপে এখন পঠিত হয়, এবং বাঙ্গালার উপরে যেমন সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে, সেইরূপ ইংরেজীর উপরে লাটীন ও গ্রীকের প্রভাব বিশেষ-রূপে পড়িয়াছে। ব্যবসায়-, উপনিবেশ-, এবং রাজ্য-বিস্তার-উপলক্ষে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া চারি শত বৎসর ধরিয়া, ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, ইংরেজদের সঙ্গে-সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও নানা দেশে নীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে পৃথিবীর বহু অংশে এখন কেবল ইংরেজী ভাষা-ই ব্যবহৃত হইতেছে (যেমন আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিলাণ্ড)। আন্তর্জাতিক ভাষা-হিসাবে ইংরেজীর প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে প্রথম। ইংরেজীর প্রভাবে পড়িয়া নানা দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের ভাষাগুলিরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতেছে।

নিম্ন প্রদত্ত বংশলতিকা হইতে সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা ফারসী ইংরেজী প্রভৃতির পরস্পরের সম্পর্ক বুঝা যাইবে।

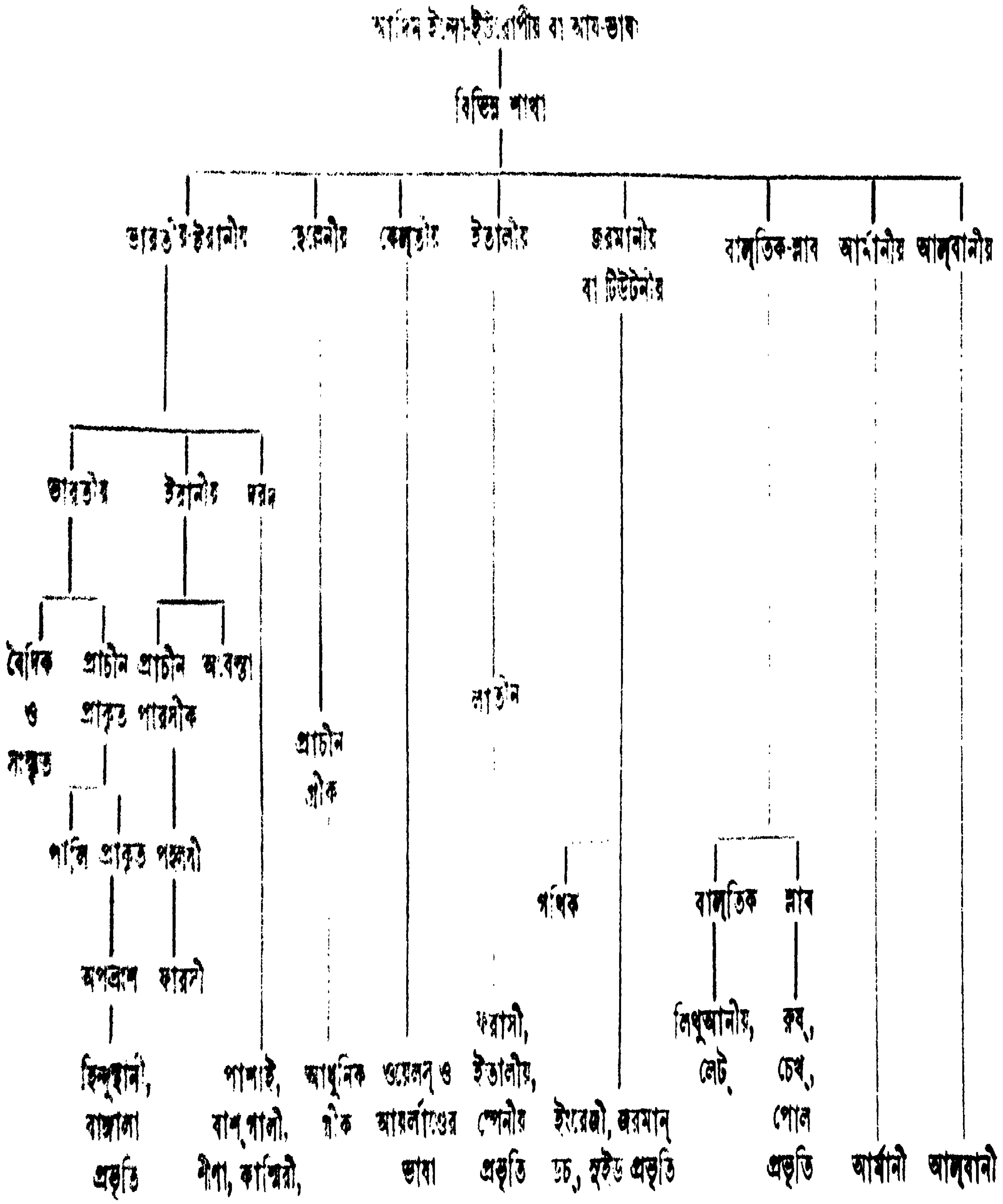

[৫.৫১৪] আরবী

এই ভাষার সহিত আমাদের সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী ফারসী ইংরেজী প্রভৃতি আর্য-ভাষার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা পৃথক্ একটা ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ইহার ব্যাকরণ-গত রীতি ও ইহার মৌলিক শব্দাবলী একেবারে আলাহিদা। আরবী ভাষা মূলতঃ উত্তর- ও মধ্য-আরবদেশের অধিবাসীদের ভাষা ছিল—দক্ষিণ-আরবের লোকেরা "হিম্‌য়ারী" বা "সাবী" নামক আরবীর-ই ভগিনী-স্থানীয় অন্য এক প্রকার ভাষা বলিত। মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নবী মোহম্মদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। মুসলমান ধর্মের প্রধান শাস্ত্র-গ্রন্থ 'কোরান' এই ভাষায় রচিত। মোহম্মদের পূর্বে আরবদের মধ্যে অতি মনোহর এক কাব্য-সাহিত্য বিদ্যমান ছিল, প্রাচীন প্রাক্-মুসলমান যুগের এই কাব্য-সাহিত্যের বহু নিদর্শন এখনও রক্ষিত আছে। এই-সব কাব্যে, এবং কোরানে, আরবী ভাষার প্রাচীন-তম নিদর্শন আমরা পাই (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক), আর পাই দুই-চারিটী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিলালেখে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক)। আরব দিগ্বিজয় ও মুসলমান-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, কোরানের ভাষা বলিয়া, আরবীর চর্চা সিরিয়া ও ইরানের নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিস্তৃত হইল। আরবী ভাষায় প্রথমটায় অল্প-স্বল্প কাব্য-সাহিত্য এবং কোরান-গ্রন্থ ভিন্ন আর কোনও সাহিত্য ছিল না, কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞানও ছিল না। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বগ্‌দাদ শহরে আব্বাসী-বংশীয় খলীফা বা সম্রাট্‌গণের রাজত্বের পত্তনের কাল হইতে, ইরানী, ইরাকী, সিরীয় ও অন্য জাতীয় মুসলমান পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহযোগিতায়, আরবী ভাষাতে ক্রমে একটা খুব বড় দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল; এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহিত্য-গঠন-কার্যে খাঁটী আরবদের হাত খুব কম ছিল। আরবী ভাষা ক্রমে এক দিকে পশ্চিমে স্পেন ও মগ্‌রেব (মরক্কো) এবং অন্য দিকে মধ্য-এশিয়া এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিরাট্ ভূখণ্ডে—সমগ্র উত্তর- ও মধ্য-আফ্রিকায়, স্পেনে, এবং পশ্চিম-এশিয়ায়—প্রাচীন- ও মধ্য-যুগের জ্ঞানের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়াইল।

মুসলমান-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, ভারতেও আরবী ভাষার আগমন হইল। সমগ্র মুসলমান জগতে আরবী বচন বা মন্ত্র পাঠ করিয়া বিধি-মত উপাসনা সম্পাদিত হয় বলিয়া, এবং আরবী কোরানের ভাষা বলিয়া, মুসলমান মাত্রেই আরবীকে পবিত্র ভাষা বলিয়া মনে করেন, ও সাধ্যমত ইহার চর্চায় প্রয়াসী হন।

আরবী যে-যে দেশের জন-সাধারণের মাতৃভাষা (যেমন আরব-দেশে হাজ্রামৌৎ, য়মন,

হেজায, নজ্‌দ্‌, ইরাক, শাম বা সিরিয়া, পালেস্তীন, মিসর, ও সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা), সেই-সেই দেশে আরবী লোক-মুখে বিশেষ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন আরবী ভাষা কোরানে ও প্রাচীন সাহিত্যেই নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে আরবীর চর্চা হয়, তাহা প্রাচীন আরবী। ধর্মের ভাষা ও মুসলমান জগতের সংস্কৃতির প্রধান বাহন বলিয়া, বঙ্গদেশের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আজকাল আরবী পড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বহু আরবী শব্দ, ফারসীর মারফৎ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

[৫.৫১৫] বিভিন্ন বর্ণমালা

এখন হইতে দুই হাজার বৎসরেরও আগে যে লিপি প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহার নাম «ব্রাহ্মী লিপি»। মহারাজ অশোকের অনুশাসনে (খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০, আনুমানিক) ঐ লিপি পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই ইহাতে লিখিত হইত। অশোক এবং মৌর্যবংশীয় রাজাদের আগেকার কালের এমন আর কোনও লেখা পাওয়া যায় না, যাহা আমরা পড়িতে সমর্থ হইয়াছি। খুব সম্ভব এই ব্রাহ্মী লিপি-ই হইতেছে ভারতের আর্য-ভাষা সংস্কৃত প্রভৃতির আদি বা প্রাচীনতম লিপি।

ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি ঠিক মত জানা যায় নাই। এতাবৎ অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করিতেন, ইহা প্রাচীন ফিনীশিয়ার লিপি হইতে উদ্ভূত। এখন কেহ-কেহ মনে করেন, সিন্ধুদেশে ও দক্ষিণ-পাঞ্জাবে মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পায় প্রাচীন ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মী লিপি উদ্ভূত হইয়াছে।

ব্রাহ্মী লিপি সরল, বর্ণের মাথায় মাত্রা-রেখা নাই; ব্যঞ্জন-বর্ণের গায়ে «া, ি, ী, ু, ূ» প্রভৃতির অনুরূপ স্বর-চিহ্ন লাগানো হইত। কতকগুলি ব্রাহ্মী বর্ণ এই প্রকারের :—

𑀅 = অ, ∴ = ই, ⊔ = উ, ◁ = এ; + = ক, 𑀔 = খ, ∧ = গ; 𑀘 = চ, 𑀙 = ছ, 𑀚 = জ, 𑀜 = ঞ; (= ট, ○ = ঠ, 𑀟 = ড, 𑀡 = ণ; 𑀢 = ত, ⊙ = থ, 𑀤 = দ, D = ধ, ⊥ = ন; 𑀧 = প, □ = ব, 𑀪 = ভ, 𑀫 = ম; 𑀬 = য, 𑀭 = র, 𑀯 = ব; 𑀲 = স; ইত্যাদি।

ব্রাহ্মী লিপির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে, পরবর্তী যুগে, ভারতের বিভিন্ন অংশে নানা প্রাদেশিক লিপির উদ্ভব হয়, এবং আধুনিক ভারতীয় লিপি—যথা, দেব-নাগরী ও তাহার বিকারে কায়থী ও গুজরাটী, নেওয়ারী, বাঙ্গালা, মৈথিলী, উড়িয়া, শারদা, গুরুমুখী, লাণ্ডা, তেলুগু-কানাড়ী, মোড়ী, গ্রন্থ, তামিল, মালয়ালম্, সিংহলী—এগুলি, এবং ভারতের

বাহিরের প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি ভাষার লিপি, ভোট বা তিব্বতী, বর্মী, শ্যামী, কম্বোজীয়, যবদ্বীপীয় প্রভৃতি কতকগুলি লিপি,—এ সমস্ত ব্রাহ্মী লিপির বিকারের ফল। প্রাচীন যুগের অক্ষর যেমন যেমন বদলাইয়া আসিতেছিল, সংস্কৃত প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষাগুলি তেমন তেমন ঐ পরিবর্তিত বা পরিবর্তনশীল অক্ষর বা লিপিতে লিখিত হইয়া আসিতেছিল।

নাগরী বা দেব-নাগরী লিপিতে আজকাল সংস্কৃত বই ছাপা হয়, সেই জন্য অনেকে মনে করেন যে, দেব-নাগরীই হইতেছে সংস্কৃতের স্বকীয় লিপি ; এবং যেমন সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব, তেমনি দেব-নাগরী লিপি হইতে বাঙ্গালা লিপিরও উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। দেব-নাগরী ও বাঙ্গালা পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়— উভয়-ই ব্রাহ্মী হইতে স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত। দেব-নাগরীর আদি স্থান হইতেছে গুজরাট, রাজপুতানা ও পশ্চিম-হিন্দুস্থান। পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তত্তৎ স্থানীয় লিপি-ই সংস্কৃত লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত—সমগ্র ভারত জুড়িয়া দেব-নাগরীর প্রচলন একেবারেই ছিল না। ইংরেজ আমলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় সংস্কৃতের পক্ষে অত্যাবশ্যক নিখিল ভারতীয় সার্বজনীন লিপি-হিসাবে দেব-নাগরীকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে— এইরূপে বিগত ৮০।৯০ বৎসরের ভিতর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে, সংস্কৃতের জন্য লিপি-গত ঐক্য আসিয়া গিয়াছে—যদিও উড়িয়া, বাঙ্গালা, তেলুগু, গ্রন্থ, মালয়ালম্ প্রভৃতি বর্ণমালায় এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত বই মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মী-লিপির অন্তর্নিহিত রীতিটী দেব-নাগরী ও বাঙ্গালায় অপরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান আছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩০-৩১)। এই বর্ণমালার বর্ণগুলি সাজাইবার কৌশল হইতেছে অপূর্ব ধ্বনি-বিচারের পরিচায়ক। সংস্কৃতের ধ্বনিগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই বর্ণমালা সৃষ্ট হইয়াছিল। সংস্কৃতের কতকগুলি ধ্বনি এখনকার প্রচলিত ভাষায় লুপ্ত ; আবার বহু স্থলে নূতন ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং, প্রাচীন ব্রাহ্মীর পরিবর্তিত রূপ বাঙ্গালা ও দেব-নাগরী বর্ণমালা দুইটীতে, এখন বাঙ্গালা ও হিন্দীর সমস্ত ধ্বনিগুলির যথাযথ প্রতীক বা পরিচায়ক অক্ষর নাই—বিভিন্ন নূতন উপায়ে এই সব অভিনব ধ্বনিকে লিখিতে হয়। যেমন বাঙ্গালায় বাঁকা « এ »—« অ্যা, ্যা, এ » প্রভৃতি-দ্বারা লিখিত হয়।

হিন্দুস্থানী দেব-নাগরীতেই লিখিত হয়—বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থানীর হিন্দী রূপ। কিন্তু উত্তর- ও দক্ষিণ-ভারতের মুসলমান লেখকেরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক হইতে উর্দূ বা মুসলমানী হিন্দুস্থানীকে ঈষৎ-পরিবর্ধিত ফারসী বর্ণমালাতেই লিখিয়া আসিতেছেন।

ইংরেজীর বর্ণমালা লাতীন হইতে ঈষৎ-পরিবর্তিত রূপে গৃহীত। প্রাচীন ইংরেজীতে বানান অনেকটা তখনকার দিনের উচ্চারণ ধরিয়াই করা হইত, কিন্তু নানা কারণে পরবর্তী কালে ইংরেজী উচ্চারণ এবং ইংরেজী বানানের মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না।

আরবী বর্ণমালা ফারসী ভাষাতে গৃহীত হইয়াছে;—আরবীতে নাই অথচ ফারসীতে আছে, কেবল এমন কতকগুলি ধ্বনির জন্য নূতন অক্ষর, ফারসীর জন্য গৃহীত আরবী বর্ণমালায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরবী বর্ণমালা, মূলে সিরীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত। এবং এই সিরীয় বর্ণমালা প্রাচীন ফিনীশীয় বর্ণমালার অর্বাচীন বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ মাত্র। আরবী লিপি ডাহিন হইতে বামে লিখিত হয়। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই—কারণ বহু প্রাচীন বর্ণমালায় ডাহিন হইতে বামে ও বাম হইতে ডাহিনে লিখিবার রীতি ছিল। আরবী বর্ণমালার বৈশিষ্ট্য—ইহাতে স্বর-বর্ণের স্থান অত্যন্ত গৌণ—বর্ণগুলি সবই ব্যঞ্জন-ধ্বনির নির্দেশক, স্বর-বর্ণের জন্য পৃথক্ অক্ষর নাই, কেবল কতকগুলি স্বরচিহ্ন আছে, এই স্বর-চিহ্নগুলি আমাদের মাত্রা বা ফলার মত ব্যঞ্জন-বর্ণের উপরে বা নীচে বসে।

[৫.৫২] সংস্কৃত ও বাঙ্গালা

বাঙ্গালা ভাষায় যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথমে সংস্কৃতের জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের কতকগুলি ধ্বনি লোপ পাইলেও, সেগুলির জন্য যে-সব বর্ণ আছে সেগুলিকে বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই: যেমন—« ঋ, ঌ, ঃ ; ণ, ণ ; ষ, স »। আবার অনেক অক্ষরের নূতন উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে—যেমন « ফ, ভ », সংস্কৃতে ছিল p + h, b + h, কিন্তু বাঙ্গালায় f, v-জাতীয় উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে। অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ ছিল « উঅ », অন্তঃস্থ য-এর « ইঅ »; এখন এই দুইটী « ব « (= b) ও « য » (= j) হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত সংযুক্ত-বর্ণ বাঙ্গালায় অন্য-রূপে উচ্চারিত হয়; যথা—« ক্ষ = সংস্কৃতে ক্‌ষ, বাঙ্গালায় খ্য; জ্ঞ = সংস্কৃতে জ্‌ঞ, বাঙ্গালায় গ্যঁ; হ্ব = সংস্কৃতে হ্‌ব, বাঙ্গালায় জ্ঝ (ঝ্ঝ); হ্ম = সংস্কৃতে হ্‌ম, বাঙ্গালায় ম্‌হ; হ্ল = সংস্কৃতে হ্‌ল, বাঙ্গালায় ল্‌হ » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় « বাঁকা এ » সংস্কৃতে নাই; বাঙ্গালায় z-এর উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে—আমরা « জ » অক্ষর দিয়াই উহাকে লিখিয়া থাকি। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় আবার চ-বর্গের এবং « ঘ ধ ঢ ধ ভ হ »-এর নূতন

উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে। সংস্কৃতে বিভিন্ন স্বরধ্বনির পরিমাণ (হ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য) নির্দিষ্ট ছিল ; বাঙ্গালায় সেরূপ নির্দিষ্ট নাই।

(৩২-৭০ পৃষ্ঠা—বাঙ্গালা বর্ণমালার উচ্চারণ-সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।)

সন্ধি—

উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য সন্ধির ব্যবস্থা। সংস্কৃতে সন্ধির খুঁটিনাটী, লেখাতে বা বানানে প্রদর্শিত হয়। বাঙ্গালাতেও সন্ধি আছে, তবে তাহার রীতি পৃথক্, এবং বাঙ্গালায় উচ্চারণে শোনা গেলেও, সন্ধি প্রায় লেখা হয় না (যেমন, « মেঘ+ক'রেছে » =উচ্চারণে [মেক্কোরেচে] ; « পাঁচ+শ' »=[পাঁশ্-শো])। মূর্ধন্য « ণ » ও « ষ »-এর উচ্চারণ বাঙ্গালায় না থাকায়, খাঁটী বাঙ্গালা শব্দে বাঙ্গালায় ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধানের পাট নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় কতকগুলি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য—স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি, হ-কারের দৌর্বল্য প্রভৃতি সংস্কৃতে অজ্ঞাত।

বাঙ্গালা বল বা শ্বাসাঘাতের রীতি-ও সংস্কৃত হইতে পৃথক্। বাঙ্গালায় শব্দের বা বাক্যাংশের আদ্য অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। বৈদিক সংস্কৃতে গানের সুরের মত স্বর ছিল ; পরবর্তী সংস্কৃতে সাধারণতঃ শব্দের মধ্যস্থিত দীর্ঘস্বরে শ্বাসাঘাত পড়ে।

শব্দ-রূপ—

সংস্কৃতে বাঙ্গালার « টা, টী (টি), টুকু, খান খানা খানি, গাছ গাছা » প্রভৃতি « পদাশ্রিত নির্দেশক » (Article) নাই।

সংস্কৃতে তিনটী লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ব্যাকরণের প্রত্যয়-অনুসারে সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ নির্ণীত হয়, অর্থ-অনুসারে—অর্থাৎ, শব্দটী প্রাণিবাচক কি অপ্রাণিবাচক, পুংবাচক কি স্ত্রীবাচক তাহা বিচার করিয়া—নহে। আ-কারান্ত বলিয়া « লজ্জা, লতা » স্ত্রীলিঙ্গ, « বৃক্ষ, ক্রোধ » অ-কারান্ত বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ নহে। বাঙ্গালাতেও তিনটী লিঙ্গ স্বীকৃত হয়—কিন্তু প্রত্যয় দেখিয়া শব্দের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। খাঁটী বাঙ্গালায় স্ত্রীত্ব-বাচক কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় আছে ; যেমন—« -ঈ, -আনী » ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষাতেও, সংস্কৃত শব্দের বেলায় কচিৎ সংস্কৃত রীতিতে অপ্রাণিবাচক শব্দকেও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়।

শব্দের প্রত্যয় ধরিয়া, বিভিন্ন কারকে, সংস্কৃত শব্দের রূপ নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে; যেমন—« লতা » শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে « লতায়াঃ », « মাতৃ » শব্দের « মাতুঃ », « চন্দ্র » শব্দের « চন্দ্রস্য », « মনস্ » শব্দের « মনসঃ »; বাঙ্গালায় কিন্তু একই প্রকারের বিভক্তি, লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব শব্দের-ই উত্তর আসে; যেমন—« লতা-র, মাতা-র (বা মা-য়ের, মা-র), চন্দ্র-র (বা চাঁদে-র), মনে-র » ইত্যাদি—সর্বত্রই একমাত্র « -র » বা « -এর » বিভক্তি।

সংস্কৃতে তিনটী বচন—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন; বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই। সংস্কৃতে শব্দের প্রত্যয় ও লিঙ্গ ধরিয়া বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়; যথা—« মানবঃ —মানবাঃ; ফলম্ —ফলানি; সাধুঃ —সাধবঃ; সখা —সখায়ঃ; সুমনাঃ —সুমনসঃ » ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এরূপ নহে; বহুবচনের প্রত্যয় « -রা, -এরা », উচ্চ-জাতির প্রাণি-বাচক সকল প্রকারের বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সমাস-দ্বারা বহুবচনকে প্রকাশ করা সংস্কৃতে থাকিলেও, ইহা বাঙ্গালার একটী বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—« গণ, কুল > গুলা, সকল, সমূহ » প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় বহুবচনের প্রত্যয়-রূপে বহুশঃ ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতে বিভক্তি-নিষ্পন্ন আটটী 'কারক' আছে। বাঙ্গালার কারকগুলি সংখ্যায় অত নহে। কতকগুলি বাঙ্গালা কারক বিভক্তি-যোগে হয়, এবং কতকগুলি কর্মপ্রবচনীয়-রূপে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র বিশেষ্য- ও ক্রিয়াপদ-যোগে নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ কর্মপ্রবচনীয় শব্দ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ (Use of Post-position) বাঙ্গালা ও আধুনিক বা নবীন ভারতীয় আর্যভাষাগুলিকে, প্রাচীন আর্যভাষা সংস্কৃত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

বিশেষণ-পদ যে বিশেষ্য-পদের সহিত সংশ্লিষ্ট, উহার (অর্থাৎ বিশেষ্যের) অনুসরণে, বিভিন্ন কারকে ও বচনে বিশেষণের রূপে পরিবর্তন করা সংস্কৃত ভাষার নিয়ম। বাঙ্গালা ভাষায় তাহা হয় না—বিশেষণ সর্বত্রই অবিকৃত থাকে; কেবল কোথাও কোথাও সংস্কৃতের অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের বিশেষণে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় বসে।

তারতম্য-প্রকাশের রীতি দুইটী ভাষায় পৃথক্।

সর্বনাম—

গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি সর্বনামের গৌরবে প্রয়োগ বাঙ্গালায় দেখা যায়, সংস্কৃতে উহা অজ্ঞাত; যথা—« এ—ইনি; সে—তিনি, তাহার—তাঁহার » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-পদ—

কাল, বাচ্য এবং প্রকার (Mood), সংস্কৃতে প্রত্যয়ের ও বিভক্তির সাহায্যে দ্যোতিত হয়, বাঙ্গালায় কিন্তু বহু স্থলে বিশ্লেষ আসিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার ক্রিয়াতে সংস্কৃতের মত পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ নাই।

সংস্কৃতের ধাতুর পরে কোনও-কোনও কাল-রূপে এবং প্রকার-ভেদে বিশেষ-বিশেষ প্রত্যয় যুক্ত হয়; এই প্রত্যয়গুলিকে « বিকরণ » বলে; যথা—« অস্-ধাতু—অস্-তি, অস্তি (=আছে); ধাতুর অভ্যাস করিয়া বা ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জনের ও আদ্য স্বরের দ্বিত্ব করিয়া হু-ধাতু > জুহু, জুহো—জুহো-তি (=হোম করে); দা-ধাতুর দ্বিত্ব করিয়া, দদ্—দদা-তি (=দেয়) » —এগুলিতে বিকরণ যুক্ত হইল না; কিন্তু « ভূ-ধাতু, বিকারে ভব্—ভব্+অ+তি=ভবতি (=হয়); কৃ ধাতু—কৃ+নো+তি=কৃণোতি (=করে); দীব্ ধাতু—দীব্+য+তি=দীব্যতি (=খেলে); চুর্ ধাতু—চোর্+অয়+তি=চোরয়তি (=চুরি করে) » ইত্যাদি (এই ক্রিয়াগুলিতে, « -অ-, -নো-, -য-, -অয়- », এই-সব বিকরণ যুক্ত হইল)। এই সমস্ত বিকরণ ধরিয়া, সংস্কৃতের ধাতুগুলিকে দশটী « গণ » বা শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। বাঙ্গালায় এরূপ রীতি নাই—বিকরণের পাট বাঙ্গালায় নাই—বাঙ্গালার ধাতুর পক্ষে একটী-মাত্র « গণ » আছে বলা যায়।

সংস্কৃতে ক্রিয়ার তিনটী বচন আছে—বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বচন-ভেদ নাই; যথা—« চলতি—চলতঃ—চলন্তি » (=সে চলে, তাহারা দুজনে চলে, তাহারা অনেকে চলে)।

সংস্কৃতে ক্রিয়ার গৌরব-বাচক বিশেষ রূপ নাই; বাঙ্গালায় মধ্যম ও প্রথম পুরুষে তাহা আছে; যেমন—« তুই চলিস্, তুমি চলো, আপনি চলেন; সে চলে, তিনি চলেন »।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ সংস্কৃতের কাল ও প্রকারকে এক সঙ্গে ধরিয়া, এগুলিকে এগারোটা পর্যায় বা বিভাগে ফেলিয়াছেন; যথা—

ধাতুর বিকরণ-যুক্ত (অর্থাৎ পরিবর্তিত) রূপে 'তিঙ্' অর্থাৎ কাল-, প্রকার-, পুরুষ- ও বচন-দ্যোতক প্রত্যয় যোগ করিয়া সৃষ্ট বিভিন্ন কাল ও প্রকার—

১। লট্—সাধারণ বর্তমান (নির্দেশক বর্তমান—Indicative Present)।

২। লোট্—অনুজ্ঞা বা বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative Present; বৈদিক ভাষায় এই অনুজ্ঞা অধিকন্তু লিট্ বা অতীতেও পাওয়া যায়)।

৩। লঙ্—নির্দেশক বা সামান্য অতীত—অদ্যতনী (আজ অর্থাৎ সম্প্রতি হইয়াছে এমন ক্রিয়ার : Imperfect)।

৪। লিঙ্ বা বিধিলিঙ্—ইচ্ছা-জ্ঞাপক বর্তমান (Optative Present)।

৫। লিট্—অভ্যাস বা ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জন ও স্বরকে দ্বিত্ব করিয়া রচিত অতীত—পরোক্ষে অর্থাৎ চোখের বাহিরে ঘটিত অতীতের ক্রিয়া-নির্দেশক (Indicative Perfect : « দদর্শ » < « দৃশ্ » ধাতু='দেখিয়াছে')।

৫ ক। লিট্—অন্য ধাতুর সহযোগে সৃষ্ট পরোক্ষ অতীত (Periphrastic Perfect : « দর্শয়ামাস, দর্শয়াম্বভূব, দর্শয়াঞ্চকার »)।

৬। লুঙ্—নির্দেশক অতীত—হ্যস্তনী অর্থাৎ গতকল্য বা বহুপূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে (Aorist)।

৭। লৃট্—নির্দেশক সামান্য ভবিষ্যৎ (Simple Future Indicative)।

৮। লৃঙ্—সম্ভাব্য (Conditional)।

৯। লুট্—ধাত্বন্তর-সাহায্যে গঠিত নির্দেশক ভবিষ্যৎ (Future by Periphrasis)।

১০। আশীর্লিঙ্—আশীর্বাদ- বা ইচ্ছা-নির্দেশক (Benedictive)।

১১। লেট্—Subjunctive—বৈদিক ভাষায় বর্তমান ও অতীতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃতে দুইটী অতীত কাল-রূপে, ক্রিয়ার পূর্বে অ-কারের আগম হয়—লঙ ও লুঙ্-এ; যথা—« গম্ ধাতু—অগচ্ছৎ (লঙ্), অগমৎ (লুঙ্); দা ধাতু—অদদৎ (লঙ্), অদাৎ (লুঙ্) »।

বাঙ্গালার কাল- ও প্রকার-প্রদর্শনের রীতি একেবারে অন্য ধরণের। বাঙ্গালার কাল-রূপের সঙ্গে, সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজীর কাল-রূপেরই অধিক মিল আছে। সরল- ও যৌগিক-ভেদে বাঙ্গালা ক্রিয়ার কাল-রূপ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৩৭২-৩৮৩)

খাটী বাঙ্গালায় নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ কতকটা সঙ্কীর্ণ; যেমন—সংস্কৃতে « কৃতঃ কম বা কার্যম্ », উড়িয়াতে « কলা কাম », কিন্তু বাঙ্গালায় « যে কাজ করা হইয়াছে » (« করা কাজ »-ও চলিতে পারে); « ধাবন্ অশ্বঃ », বাঙ্গালায় « যে ঘোড়া দৌড়াইতেছে ('দৌড়ন্ত ঘোড়া' বাঙ্গালায় চলে না; কিন্তু 'ঘুমন্ত খোকা', 'চলন্ত গাড়ী', প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর মাত্র এইরূপ প্রত্যয় পাওয়া যায়) »।

বাঙ্গালার সংযোগ-মূলক ক্রিয়া সংস্কৃতে অজ্ঞাত (পৃঃ ৪১৯-৪২১)।

সংস্কৃতে প্রত্যয়-বিভক্তি-যোগে ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য হয়, বাঙ্গালায় অন্য ক্রিয়ার

সাহায্যে বিশ্লেষ-মূলক পদ্ধতিতে ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য হয় ; যথা—« কুত্র স্থীয়তে= কোথায় থাকা হয় ; পুস্তকং পঠ্যতে=বই পড়া হয় »।

অব্যয়—

বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুরূপ কর্মপ্রবচনীয় নাই ; আছে—কর্মপ্রবচনীয় অনুসর্গ (Post-position) -রূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য- ও ক্রিয়া-পদ।

বাক্য-রীতি—

বাক্যস্থিত পদসমূহের অবস্থান-ক্রম বাঙ্গালায় অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সংস্কৃতে সুপ্ (শব্দরূপ) ও তিঙ্ (ক্রিয়ার রূপ) -গুলি বলবৎ থাকায়, পদের অবস্থান ততটা সুদৃঢ় নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট নহে। সংস্কৃতে « নরো ব্যাঘ্রং হন্তি », « হন্তি নরো ব্যাঘ্রম্ », « নরো হন্তি ব্যাঘ্রম্ », « ব্যাঘ্রং হন্তি নরঃ », « ব্যাঘ্রং নরো হন্তি », « হন্তি ব্যাঘ্রং নরঃ »—যে কোন প্রকারে ইচ্ছা, শব্দগুলি সাজানো যায় ; কিন্তু বাঙ্গালায় « মানুষ বাঘ মারে » বলিলে যাহা বুঝাইবে, « বাঘ মানুষ মারে » বলিলে তাহার উল্‌টা বুঝাইবে।

বাক্য-রীতিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগের বাহুল্য বাঙ্গালায় লক্ষণীয় (পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৬, ৪৪২) ; প্রাচীন সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়ার এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায় না, যদিও প্রাকৃতের ও আধুনিক আর্য ভাষার অনুসরণের ফলে পরবর্তী সংস্কৃতে ইহা খুবই সাধারণ।

শব্দাবলী—

প্রাচীন ভাষা বলিয়া সংস্কৃত মোটের উপরে স্বাবলম্বী ভাষা—বেশীর ভাগ শব্দই ইহার স্বকীয়, খাঁটী সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে গঠিত। তথাপি সংস্কৃতে কিয়ৎ পরিমাণ অন্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিয়াছে : [১] অনার্য-ভাষার শব্দ—যথা, « অণু, কপি, কাল, পূজা, ঘোটক, তিন্তিড়ী, হেরম্ব » প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, এবং « কদলী, কম্বল, কার্পাস, কন্দ, বাণ, পণ, তাম্বূল » প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ; [২] বিদেশী শব্দ—যথা, « পরশু (সুমেরীয়) ; মনা (আসিরীয়-বাবিলীয়) ; যবন, হোরা, দ্রম্য, সুরঙ্গ, খলীন (গ্রীক) ; পিক, দীনার (রোমক) ; কীচক='এক প্রকারের বাঁশ', চীন (প্রাচীন চীনা) ; মুদ্রা, পুস্ত, মিহির (প্রাচীন- ও মধ্য-পারসীক) »।

বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা আরও বেশী; ফারসী (আরবী ও তুর্কী ধরিয়া) প্রায় ২৫০০, পোর্তুগীস প্রায় ১১০, এবং ক্রম-বর্ধমান ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় শব্দ।

বাঙ্গালায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং বাঙ্গালার শব্দদ্বৈত, ও অনুকার বা প্রতিধ্বনি শব্দ (পৃষ্ঠা ২১০-২১১, ২২৯-২৩৪) এই ভাষার একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—সংস্কৃতে অনুকার শব্দের বাহুল্য নাই, প্রতিধ্বনি শব্দ এবং শব্দদ্বৈত অজ্ঞাত।

[৫.৫৩] ইংরেজী ও বাঙ্গালা

বর্ণমালা ও ধ্বনি—

ইংরেজীর বর্ণমালা লাতীন হইতে গৃহীত। ইহার অন্তর্নিহিত রীতি বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে একেবারে পৃথক্ (পৃষ্ঠা ৩০-৩১ দ্রষ্টব্য)। লাতীনে « চ, জ, শ » প্রভৃতি কতকগুলি ধ্বনি ছিল না—এগুলি প্রাচীনতম ইংরেজীতেও ছিল না। পরে এই-সব ধ্বনি ইংরেজীতে আসিয়া গেলে, একাধিক অক্ষর মিলিত করিয়া লাতীন ও প্রাচীন-ইংরেজীতে অজ্ঞাত সেই সকল ধ্বনির প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়। প্রাচীন-ফরাসী ভাষার প্রভাবও ইংরেজীর উপরে বিশেষ ভাবে পড়ে, সেই জন্য অনেক স্থলে আবার ফরাসীর বানান-পদ্ধতি ইংরেজীতে অনুসৃত হয়। এই-সব কারণে, ইংরেজীতে ch বা tch বা t=« চ »; dj, j, dg, ক্বচিৎ g=« জ »; sh, -ti- =« শ »; এইরূপ বিভিন্ন বর্ণ মিলাইয়া এক-একটী ধ্বনি লিখিবার রীতি ইংরেজীতে দেখা যায়। প্রাচীন- ও মধ্য-ইংরেজী, লাতীন, প্রাচীন- ও আধুনিক-ফরাসী—এই কয়টী ভাষার বানান ও উচ্চারণের ঘাত-প্রতিঘাত ইংরেজীতে দেখা যায়, এবং ইহাই হইতেছে আধুনিক ইংরেজী বানানের ও উচ্চারণের মধ্যে অসামঞ্জস্যের প্রধান কারণ।

ইংরেজী ভাষার ধ্বনি-সমষ্টি, বাঙ্গালার ধ্বনি-সমষ্টি অপেক্ষা কম সমৃদ্ধ নহে; ইংরেজী স্বর-ধ্বনির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাঙ্গালা অপেক্ষা খুবই বেশী।

একাধিক ধ্বনির জন্য এক-ই অক্ষরের ব্যবহার—যেমন a-দ্বারা ছয়টী বিভিন্ন ধ্বনির প্রকাশ, যথা—cat (ক্যাট্—'অ্যা'), pass (পাস্—'আ'), case (কেয়্স্—'এয়্'), call (কল্—'অ'), China (চায়্না—'আ'), care (কেয়ার্—'এয়া'); এবং একই ধ্বনির জন্য একাধিক প্রকারের বর্ণবিন্যাস—যেমন « এয়্ » এই সংযুক্ত স্বরের জন্য a (dame), ai (maid, train), ay (way, say), eigh (weigh), ao (gaol) প্রভৃতি;—এই দুইটী রীতি, ইংরেজী লিপির দুইটী বিশেষ অবগুণ।

ইংরেজীর ব্যঞ্জন-ধ্বনি		কণ্ঠ্য	তালব্য	দন্তমূলীয় (জিহ্বাগ্র ও দন্তমূল)	দন্ত্য	দন্তৌষ্ঠ্য	ওষ্ঠ্য
স্পৃষ্ট অল্প-প্রাণ	অঘোষ (আদিতে ঈষৎ-প্রাণযুক্ত)	k = ক (c, cc, ck, k, kk, qu, cqu, ch)		t (= t, tt, th)			p = প (p, pp)
	ঘোষ	g = গ (g, gu, gh)		d (= d, dd)			b = ব (b, bb)
ঘৃষ্ট	অঘোষ		tsh = চ (ch, tch, ci, t)				
	ঘোষ		dzh = জ (j, dj, dg, gi, ge, d)				
নাসিক্য	ঘোষ	ng = ঙ (ng, n)		n = ন (n, nn)			m = ম (m, mb, mm)
পার্শ্বিক (ঘোষ)	দন্তমূলীয়			l (= l, ll : আদ্য ল)			
	কণ্ঠীকৃত (velarised)			l (l, ll : অন্ত্য l ; যথা—well, feel, felt, wild)			
কম্পন-জাত (trilled)	ঘোষ			r = র (r, rr : স্কটল্যাণ্ডের ইংরাজীতে)			
উষ্ম	অঘোষ	h = ঃ (hand, hat, high)	sh = শ (sh, sch, ch, ti)	s = স (s, ss, sce, ce, ci)	th = থ় (thin, three)	f = ফ় (f, ff, gh)	
	ঘোষ	h = হ (per-haps, behind)	zh = ঝ় (s—measure, pleasure ; ge—rouge)	z = জ় (z, s) ; r (উষ্ম র)	dh = ধ় (then, this)	v = ভ় (v)	
অর্ধস্বর	ঘোষ		y = য় (y, i, u)				w = ব় (w)

ইংরেজীর কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই। ইংরেজীতে স্পৃষ্ট অল্প-প্রাণ ধ্বনি k, t, p শব্দের আদিতে থাকিলে, « খ, ঠ, ফ » -এর মত মহাপ্রাণবৎ উচ্চারিত হয়। ইংরেজীর দন্তমূলীয় t, d বাঙ্গালায় নাই,—বাঙ্গালার « ট, ড » মূর্ধন্য ধ্বনি। ইংরেজীর ch, j বাঙ্গালার « চ, জ » হইতে উচ্চারণে কিছু পরিমাণে পৃথক্—ইংরেজীর « চ, জ » কতকটা যেন t-sh. d-zh-এর সমাবেশে গঠিত। ইংরেজীতে দুই প্রকারের ল-ধ্বনি আছে: এক প্রকারের « ল », শব্দের আদিতে উচ্চারিত হয়, ইহা বাঙ্গালা ল-এর মত (যেমন law, lean প্রভৃতি শব্দে)—এই ল-ধ্বনির ইংরেজী নাম clear l; অন্য প্রকারের « ল », শব্দের শেষে বা শব্দ-মধ্যে ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয় (যথা—well, feel, health)—এই ল-ধ্বনিকে ইংরেজীতে dark l বলে—এই dark l যেন কতকটা u- বা w-মিশ্র, ইহাকে velarised অর্থাৎ « কণ্ঠীকৃত » ধ্বনি বলা হয়। ইংরেজীতে ঘোষবৎ sh বা শ-কার আছে;—zh—measure, pleasure শব্দের ধ্বনি (=mezhar, plezhar; এগুলি mezar, plezar নহে); ইংরেজীর উষ্ম r ধ্বনি; ইংরেজীর উষ্ম th ধ্বনি (thin, then—এই দুই শব্দের দুই প্রকার ধ্বনি, « থ্, দ্ »)—বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। ইংরেজীর w-ধ্বনি কতকটা উ-কার ঘেঁষা, বাঙ্গালাতে এই ধ্বনিও নাই।

ইংরেজীর স্বর-ধ্বনি (ধ্বনিগুলি ধ্বনি-নির্দেশক International Phonetic Association-এর বর্ণমালায় লিখিত হইতেছে):—

i (হ্রস্ব ই=i, y); i: (দীর্ঘ ঈ, বা ইয়্=e, ea, ee, eo, æ, ie); e (হ্রস্ব এ =e, eh); æ (হ্রস্ব 'অ্যা'-ধ্বনি=a); ɑ: (=কণ্ঠ্য দীর্ঘ আ=a); ɔ (হ্রস্ব অ-র ধ্বনি =o); ɔ: (দীর্ঘ অ-র ধ্বনি=au, aw, oa); o (হ্রস্ব ও-কারের ধ্বনি=o); u (হ্রস্ব উ=u, oo), u: (দীর্ঘ ঊ, বা উয়্=u, oo, ou); ʌ (বিবৃত অ-কারের ধ্বনি, অ', but, cut-এর u-এর ধ্বনি); ə (হ্রস্ব অর্ধবিবৃত অ, অ্—ago, Russia শব্দদ্বয়ের a-র ধ্বনি); ə: (দীর্ঘ অর্ধবিবৃত অ=অ'—clerk, her, bird-এর স্বর-ধ্বনি)।

এই কয়টী সরল স্বর ব্যতীত, ইংরেজীতে কতকগুলি সন্ধিস্বর (diphthong) আছে; যথা—ei (এয়্ বা এই=ai, ei, ey, ao); au (আউ বা আও=ou, ow, ough); ou (ওউ বা ওয়্=o, ough); eə (এঅ্=e, ere); iə (ইঅ্=i, ire); uə (উঅ্=u, ur, oor) ইত্যাদি। সাধু ইংরেজীর এই-সমস্ত হ্রস্ব-, দীর্ঘ- ও সন্ধি-স্বর ধরিয়া, ১৮টী স্বর-ধ্বনি ইংরেজীতে বিদ্যমান; এগুলির বানান-সম্পর্কে ইংরেজীতে বড়ই অনিয়ম দেখা যায়।

ইংরেজীর ʌ (hut), ə (her), əː (hurt)—এই ধ্বনিগুলি, এবং সন্ধি-স্বরগুলি বাঙ্গালায় নাই।

ইংরেজী দীর্ঘ-স্বর সর্বদাই দীর্ঘ থাকে, বাঙ্গালার মত বাক্যাংশের মধ্যে পড়িয়া নিজ দীর্ঘত্ব বর্জন করে না। ইংরেজীর শ্বাসাঘাত সাধারণতঃ বাঙ্গালার মত শব্দের আদ্য অক্ষরেই পড়ে, কিন্তু বাক্য-মধ্যে কোনও শব্দের শ্বাসাঘাতের বিলোপ হয় না। শ্বাসাঘাতের অভাব হইলে, ইংরেজীর স্বর-ধ্বনি, বাক্য-মধ্যে অতিহ্রস্ব অর্ধবিবৃত অ় (=ə)-তে আনীত বা পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে;—বাঙ্গালায় এরূপ হয় না, মূল স্বর-ধ্বনি শ্বাসাঘাত না পাইলে একেবারে লুপ্ত হয়, কিন্তু বিকৃত হয় না। ইংরেজীতেও বহুস্থানে শ্বাসাঘাতের অভাবে স্বর-ধ্বনি লুপ্ত হয়।

ইংরেজীতে স্বর-ধ্বনির অনুনাসিকত্ব হয় না—« ইঁ, আঁ, অঁ, ওঁ » প্রভৃতির মত স্বরের সানুনাসিক ধ্বনি ইংরেজীতে একেবারেই নাই।

ইংরেজীতেও সন্ধি আছে—তবে সেই সন্ধি লেখায় প্রদর্শিত হয় না; যথা—do+not+you=don'tyou (উচ্চারণে « ডোন্‌টিউ, ডোন্‌চু » ; nature=পুরাতন উচ্চারণে natyur=« নাটুার্ », তাহা হইতে আধুনিক « নেচর্, নেয়্চ » ইত্যাদি।

শব্দরূপ—

বাঙ্গালায় ইংরেজীর মত Definite ও Indefinite Article-এর পাট নাই, কিন্তু « টা, টি, টুক, খানা, খানি, গাছা, গাছি » প্রভৃতি নির্দেশক-দ্বারা Definite Article-এর কাজ বাঙ্গালায় চলে, এবং « এক, একটা, একটি, একজন » ইত্যাদি শব্দ-দ্বারা Indefinite Article-এর ভাব প্রকাশিত হয়।

ইংরেজীর লিঙ্গ-ভেদের রীতি বাঙ্গালার-ই মত—স্বাভাবিক নিয়ম-অনুসারে পুরুষ-জাতি, স্ত্রী-জাতি ও ক্লীব-জাতির বিশেষ্যের পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হয় (সংস্কৃতের মত প্রত্যয় ধরিয়া লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না)। ইংরেজীতে কতকগুলি শব্দে বিশেষ স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়—যথা -ess : কিন্তু মোটের উপরে, স্ত্রীলিঙ্গ-দ্যোতক প্রত্যয়ের ব্যবহার ইংরেজীতে বাঙ্গালা অপেক্ষা কম (বাঙ্গালায় « -ই বা -ঈ, -ইনী, -ইন্, -নী, -আনী, -উনি » প্রত্যয়, এবং সংস্কৃত হইতে গৃহীত « -আ, -ঈ » প্রভৃতি প্রত্যয়)।

ইংরেজীতে দুইটি-মাত্র বচন—বহুবচনে -s, -es প্রত্যয় ভিন্ন, বাঙ্গালার মত বহুবচন-দ্যোতক শব্দ জুড়িয়া দিবার রীতি ইংরেজীতে অজ্ঞাত বলিলেও হয় (যথা—farmer—farmers ; কিন্তু farming folk, farmer people বহুবচন-অর্থে প্রযুক্ত হইতে

পারে, কিন্তু এইরূপে বহুবচন সাধিত হয় না)। বাঙ্গালাতে বহুবচনের জন্য যেরূপ বহু শব্দ আছে (« গুলা, সমূহ, সকল, গণ » প্রভৃতি) ইংরেজীতে সেরূপ নাই। কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দের সাধারণ-রীতি-বহির্ভূত বহুবচনের রূপ ইংরেজীতে আছে; যেমন—men, oxen, children, kine, sheep, mice, lice প্রভৃতি; বাঙ্গালায় এই ধরণের শব্দ নাই।

ইংরেজী কারকের মধ্যে, বিভক্তি-যোগে মাত্র সম্বন্ধ-কারক বা সম্বন্ধ-পদ হয়; যথা—boy, boy's : বহুবচনে boys, boys'; সুতরাং, বিভক্তির সংখ্যা, বাঙ্গালায় সংস্কৃতের চেয়ে কম হইলেও, ইংরেজীর চেয়ে বেশী। ষষ্ঠী ব্যতীত অন্য বিভক্তির জন্য ইংরেজীতে শব্দের পূর্বে কতকগুলি কর্মপ্রবচনীয় অব্যয় বসে: to, at, in, from, সম্বন্ধ-পদে of, ইত্যাদি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজীর মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়: কর্মপ্রবচনীয় অব্যয় বা « উপ-সর্গ » (Pre-position). ইংরেজীতে শব্দের পূর্বে বসে; বাঙ্গালায় কিন্তু শব্দের পরেই (ক্বচিৎ শব্দটীতে তৃতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত করিয়া) কর্মপ্রবচনীয় বিশেষ্য বা ক্রিয়া-পদ, যেগুলিকে « অনু-সর্গ » (Post-position) বলা হইয়াছে, সেগুলি বসে; যেমন—« ঘর থেকে, হাত দিয়া, হাতে করিয়া, রামের কাছে »।

বিশেষণ—

ইংরেজী ও খাঁটী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় না: good boy, good girl, বাঙ্গালায় « ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে »। (কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাবে বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় ক্বচিৎ সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হয়; যেমন—« সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা »। বিশেষণের তারতম্য-বোধের জন্য ইংরেজীতে দুই রীতি—সংস্কৃতের « -ঈয়স্, -ইষ্ঠ » ও « -তর, -তম » প্রত্যয়ের অনুরূপ -er, -est প্রত্যয়-যোগে; আর অন্য রীতি হইতেছে, পৃথক্ বিশেষণের বিশেষণ more—most এবং less বা lesser—least যোগ করিয়া। বাঙ্গালায় এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়ম—অবিকৃত বিশেষণের সহিত « চেয়ে, অপেক্ষা » প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া তারতম্য প্রকাশিত হয় (পৃষ্ঠা ৩১০-৩১৪ দ্রষ্টব্য)।

সংখ্যা-বাচক শব্দে—« প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় » স্থানে first, second (বা other), third ভিন্ন ইংরেজীর আর সমস্ত ক্রম-বাচক শব্দ, সংখ্যা-বাচক শব্দে -th প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া গঠিত হয়: fourth, ninth, hundredth ইত্যাদি। বাঙ্গালায় অনুরূপ « -ইয়া » (বা « -এ' ») প্রত্যয় এখন লুপ্ত; ক্রম-বাচক সংখ্যার জন্য চলিত বাঙ্গালায় ষষ্ঠীর « -র, -এর » প্রত্যয় যুক্ত হয়। সাধু বাঙ্গালায় সংস্কৃত ক্রম-বাচক শব্দগুলিও ব্যবহৃত হয়।

দশের পর হইতে বিভিন্ন দশকের অন্তর্গত সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি, বাঙ্গালায় পরস্পর হইতে পৃথক্—প্রত্যেকটী আলাহিদা প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, এবং এগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত বিশেষ আকার-গত সাদৃশ্য নাই; ইংরেজীতে কিন্তু দশক-বাচক শব্দের পরে এক হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ জুড়িয়া দিয়া, বিভিন্ন দশকের অন্তর্গত সংখ্যাগুলির জন্য শব্দ গঠিত হয়; যেমন—বাঙ্গালার « পঞ্চাশ—একান্ন, বাহান্ন, তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন, ঊনষাট »—এগুলির প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র; ইংরেজী মতে হইলে « পঞ্চাশ—পঞ্চাশ-এক (fifty-one), পঞ্চাশ-দুই (fifty-two), . . . পঞ্চাশ-পাঁচ (fifty-five), . . . পঞ্চাশ-নয় (fifty-nine) », এইরূপ হইত।

সর্বনাম—

গৌরবে মধ্যম-পুরুষ ও প্রথম-পুরুষের বিভিন্ন রূপগুলি বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য—« তুই, তুমি, আপনি; সে, তিনি; ও, উনি; এ, ইনি »। এরূপ পার্থক্য ইংরেজীতে নাই (কেবল thou—you-এর পার্থক্য আগে ইংরেজীতে ছিল—এখন thou প্রায় অপ্রচল)।

সর্বনাম-জাত সম্বন্ধ-পদের দুইটী রূপ ইংরেজীতে আছে—এক, বিশেষণ (attributive), ইহা শব্দের পূর্বে বসে (যথা, my book, your hat, his pencil); আর দুই, বিধেয় রূপ (predicative), ইহা শব্দের পরে বসে (যথা, the book is mine, the hat is yours, the pencil is his)। বাঙ্গালায় ঠিক এরূপটী নাই।

ক্রিয়া—

ক্রিয়ার কাল-নির্দেশের প্রণালী-বিষয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালার মধ্যে লক্ষণীয় মিল আছে (পৃষ্ঠা ৩৭২-৩৮০)। ক্রিয়ার প্রকার (Mood), এবং কর্মবাচ্য-গঠন, উভয় ভাষায় একই প্রণালী-অনুসারে হয়—অব্যয়-পদ-যোগে প্রকার-নির্দেশ (পৃষ্ঠা ৩৫৪), এবং সংযুক্ত-পদ্ধতিতে কর্মবাচ্য-গঠন (পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৫১)। ইংরেজীতে ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য পৃথক্ ধরা হয় না—কেবল কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যই ধরা হয়।

Auxiliary Verb বা সহায়ক-ক্রিয়া—shall, will—যোগে ভবিষ্যৎ-নির্দেশ, ইংরেজীর একটী বিশেষ নিয়ম। এতদ্ভিন্ন must, ought, would, should প্রভৃতি যোগে, ক্রিয়ার কাল- ও প্রকার-গত নানা সূক্ষ্মতা ইংরেজীতে পাওয়া যায়; বাঙ্গালায় কোনও কোনও স্থলে সে সকল সূক্ষ্মতা অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট, অথবা সেগুলিকে নির্দেশ করা কঠিন।

একটী বিষয়ে ইংরেজীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—ধাতু-রূপ ধরিলে, ইংরেজী ক্রিয়াগুলি Strong Verbs ও Weak Verbs, এই দুই বিভাগে বিভক্ত। ইংরেজীতে Simple Past ও Past Participle-এ ধাতুর মূল স্বরের পরিবর্তন, Strong Verb-গুলির লক্ষণ: sing—sang—sung. এই রীতি আদিম আর্য যুগের, ইহার নাম «অপশ্রুতি» (পৃষ্ঠা ১১৮ দ্রষ্টব্য), সংস্কৃতেও ইহা বিদ্যমান—«করোতি—চকার—কৃত=কর্—কার্—কৃ»। ইংরেজীতে কতকগুলি ধাতুতে এই প্রাচীন রীতি অটুট আছে, ইহা বাঙ্গালায় এখন আর জীবিত নাই। -d, -ed, বা -t প্রত্যয় যোগ করিয়া Past ও Past Participle গঠন করা Weak Verb-এর লক্ষণ: ইংরেজী ও ইংরেজীর ভগিনী-স্থানীয় ডচ্, জরমান ও স্কান্ডিনেভীয় ভাষাগুলিতে এই রীতি দেখা যায়: love—loved (যেমন সংস্কৃতের অতীত রূপে—«করোতি—কারয়ামাস, কারয়াম্বভূব, বা কারয়াঞ্চকার»)। বাঙ্গালায় Weak Verb-এর অনুরূপ ক্রিয়া অজ্ঞাত—সর্বত্রই বাঙ্গালায় «-ইল» ও «-আ» (বা «-আনো») প্রত্যয় যুক্ত হয়। কতকগুলি ইংরেজী ক্রিয়া আবার Irregular বা অনিয়মিত—এগুলিতে -d, -ed, -t যোগ হয়, আবার ক্রিয়ার ধাতুও নানা কারণে (প্রাচীন ইংরেজীর অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি এবং অপশ্রুতির জন্য) পরিবর্তিত হইয়া যায়; যেমন—sell—sold; work—wrought; think—thought; catch—caught; ইত্যাদি।

ইংরেজীতে মধ্যম-পুরুষ ও প্রথম-পুরুষের ক্রিয়ায় বর্তমানে বচন-ভেদ আছে—thou lovest—you love; he loves—they love; বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বচন-ভেদ নাই।

বাঙ্গালার মত ইংরেজীতেও কতকগুলি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া আছে (পৃষ্ঠা ৫১০): go—went—gone; am—was—been (=সংস্কৃত «অস্—বস্—ভূ» ধাতু)।

যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verbs—পৃষ্ঠা ৪১১-৪২১) বাঙ্গালা ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাবলীর বৈশিষ্ট্য—ইংরেজীতে ইহা নাই। যেমন, ইংরেজী rub off=বাঙ্গালা «মুছিয়া-ফেলা»।

বাক্য-রীতি—

এই বিষয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় বহু পার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজী বাঙ্গালার মত প্রত্যয়-বহুল ভাষা নহে, এই জন্য বাক্যের পদ-ক্রম ইংরেজীতে বিশেষ-ভাবে নিয়মিত। নিম্ন-লিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষণীয়—

১। বাঙ্গালা ক্রম—কর্তা+সম্প্রদান+কর্ম+ক্রিয়া; ইংরেজী ক্রম—কর্তা+ক্রিয়া+

কর্ম+সম্প্রদান; যথা—« রাম গোপালকে টাকা দিল »=Ram gave money to Gopal.

২। ইংরেজীতে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার পরে বসে, বাঙ্গালায় পূর্বে; যথা—he runs fast; he ate slowly=« সে দ্রুত দৌড়ায়, সে ধীরে-ধীরে খাইল »।

৩। অনেকগুলি সমাপিকা-ক্রিয়া-যুক্ত সরল বাক্য ইংরেজীতে and যোগে পর পর বসিতে পারে, বাঙ্গালায় সেখানে সাধারণতঃ অসমাপিকা-ক্রিয়ার-ই প্রয়োগ হয়, সমাপিকা-ক্রিয়ার প্রয়োগ যথা-সম্ভব কম করা হয় (পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭, ৪৪২ দ্রষ্টব্য)।

৪। ইংরেজীতে সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম who, which, that প্রভৃতির দ্বারা সরল ও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করিবার দিকে প্রবণতা আছে। বাঙ্গালাতে কর্তৃপদের পুনরাবৃত্তি হয়; যথা—the man who had called yesterday will come again=« যে-লোকটী কাল আসিয়াছিল, সে আবার আসিবে »।

৫। ইংরেজীর Sequence of Tenses—বাঙ্গালায় এই রীতি অনুসৃত হয় না (পৃষ্ঠা ৪৪১ দ্রষ্টব্য)।

৬। ইংরেজীতে Direct এবং Indirect Narration দুই-ই বেশ চলে, বাঙ্গালায় প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct Narration)-এর প্রতি-ই পক্ষপাত দেখা যায়।

৭। অস্ত্যর্থক ক্রিয়া, যাহা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে Copula বা সংযোজকের কাজ করে, তাহা বাঙ্গালায় বহুশঃ উহ্য থাকে—ইংরেজীতে Copula স্পষ্ট উল্লিখিত হয়: he is my brother=« সে আমার ভাই »।

৮। প্রশ্ন-সূচক বাক্যে ও নঞর্থক বাক্যে ইংরেজীতে Auxiliary Verb 'to do'-র ব্যবহার আছে—বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত।

শব্দাবলী—

ইংরেজীতে নিজস্ব ধাতু- ও প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিদেশী শব্দ অজস্র ইংরেজী ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে—খাঁটী ইংরেজী শব্দের সংখ্যার চেয়ে এখন ইংরেজীতে বিদেশী ভাষার শব্দের সংখ্যা ঢের বেশী। জরমান ভাষা এ বিষয়ে ইংরেজী অপেক্ষা রক্ষণশীল। ইংরেজী আবশ্যক ও অনাবশ্যক ভাবে সহস্র সহস্র শব্দ লাতীন এবং (লাতীন হইতে জাত) ফরাসী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে: এতদ্ভিন্ন, শত শত গ্রীক শব্দ, এবং ইতালীয়, স্পেনীয়, জরমান প্রভৃতি ইউরোপের নানা ভাষার শব্দ, তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার শব্দ, ইংরেজী আত্মসাৎ করিয়াছে। ইংরেজী এখন একপ্রকার 'সর্বগ্রাসী' ভাষা।

ইংরেজ জাতি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই বিশ্বের সমস্ত ভাষা হইতে আবশ্যক-মত নূতন নূতন শব্দ ইংরেজীতে যেমন গৃহীত হইতেছে, তেমনি অন্য তাবৎ ভাষাতেও ইংরেজীর প্রভাব পড়িতেছে। কিন্তু এখন উচ্চ-ভাবের শব্দের জন্য ইংরেজীকে লাতীন ও গ্রীকের দ্বারস্থ হইতে হয়—ইংরেজী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নিজের উপর আস্থা হারাইয়াছিল, নিজে আবশ্যক-মত শব্দ সৃষ্টি করিবার শক্তি পরিহার করিয়া, লাতীন ও ফরাসীর দুয়ারে ভিক্ষা করিত, তাই এমনটী হইয়াছে। ইংরেজীর নিকট-জ্ঞাতি জরমান ভাষা কিন্তু নিজ স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়াছে, তাই জরমান ভাষায় 'স্বদেশী' শব্দ খুবই বেশী; যেমন—ইংরেজীর (লাতীন শব্দ) century-কে জরমানে বলে Jahr-hundert (খাঁটী ইংরেজী শব্দ হইলে হইত year-hundred 'শত-অব্দ'); (ফরাসী হইতে গৃহীত) hotel-কে বলে Gast-haus (ইংরেজীতে হইত guest-house); (গ্রীক) telephone-কে বলে Fern-sprecher (ইংরেজীতে হইত far-speaker); (লাতীন) expansion-কে বলে Aus-breitung (ইংরেজীতে হইত out-broadening); ইত্যাদি।

ইংরেজী ভাষায় কতকগুলি ভারতীয় শব্দ বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানীর মারফৎ (এবং কচিৎ তামিল ও অন্য ভাষা হইতে) পঁহুছিয়াছে; যথা—bungalow, pundit, loot, jungle, pucca, toddy, raja, ranee, avatar, gooroo বা guru, dacoit; khaki, lascar, sepoy, curry, cheroot, ইত্যাদি, এবং হালের blighty, cushy প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ। ভারতীয় বিদ্যা ও চিন্তার সহিত পরিচয়ের ফলে, guna, vriddhi, sandhi, ahimsa, dharma, karma প্রভৃতি শব্দও ইংরেজীতে স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজীতে সমাস হয়—যেমন, watch-man, house-wife, book-keeper, red-breast, head-strong, book-shop, blue-beard, long-shanks, ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণতঃ আজকাল বাঙ্গালার মত শব্দগুলিকে পৃথক্ করিয়াই রাখা হয়; যথা—All India Railway Workers' Conference; Smoke Nuisance Committee; Vernacular Literature Society; ইত্যাদি।

ইংরেজী ও বাঙ্গালা, এই দুই ভাষা পরস্পরের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি—উভয়ের মূল পূর্বপুরুষ হইতেছে আদি-আর্যভাষা। আধুনিক বাঙ্গালা ও ইংরেজীর মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা গেলেও, ইহাদের প্রাচীন রূপে (যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাচীন-ইংরেজীর মধ্যে) ইহাদের উভয়ের নানা লক্ষণীয় সাদৃশ্য বিদ্যমান। ধাতু- ও শব্দ-বিষয়ে সাম্য তো আছেই; অধিকন্তু দুইটী ভাষার ব্যাকরণের রীতিতে এবং প্রত্যয়-বিভক্তিতেও যথেষ্ট মিল আছে। সংস্কৃত ও

ইংরেজীর শব্দ- ও ধাতু-গত সাম্য : যথা—« ভ্রূ—brow ; দন্ত, দাঁত—tooth (প্রাচীন-ইংরেজী রূপ ছিল *tanth) ; নাসা—nose ; নখ—nail (প্রাচীন রূপ—nægel) ; পদ, পা—foot ; উধর—udder ; অদ্—eat ; গম্—come ; ভিদ্—bite ; স্মি—smi-le ; ভৃ, ভর্—bear ; পৃ, পার্—fare ; ধৃষ্—durs t ; তৃষ্—thirs t ; পূ—fou-l ; পিতর্, পিতা—father ; মাতর্, মাতা, মা—mother ; ভ্রাতর্, ভ্রাতা, ভাই—brother ; স্বসর্, স্বসা—sister ; দুহিতর্, দুহিতা—daughter ; সূনু—son ; বিধবা—widow ; শিলা—hill ; স্রু—stream ; উক্ষ=উক্ষ্—ox (=oks) ; গো—cow ; অবি—ewe ; মূষ্, মূষিক—mouse ; উদ্র>উদ (উদ্‌বিড়াল)—otter » ইত্যাদি বহু বহু শব্দ, সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে, আদি-আর্য-ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ।

ব্যাকরণের রীতি- ও প্রত্যয়-বিভক্তি-ঘটিত সাম্য : যথা—

১। সংস্কৃতে বিশেষ্যের বহুবচন—« -অস্ » প্রত্যয়-দ্বারা : « মানব + -অস্ = মানবাস্ = মানবাঃ » : ইংরেজীতে, -s, -es প্রত্যয় দ্বারা : friend—friends.

২। সংস্কৃতে « -স্য » বা « -অস্ » দ্বারা ষষ্ঠী : « মানবস্য, মনসস্ = মনসঃ, মতেস্ = মতেঃ » : ইংরেজীতে -s, বা -es দ্বারা ষষ্ঠী হয়, যথা—man's, mind's.

৩। সংস্কৃতে « -ঈয়স্, -ইষ্ঠ » -প্রত্যয়দ্বয়-যোগে তারতম্য, ইংরেজীতে -er, -est : « স্বাদু—স্বাদীয়স্—স্বাদিষ্ঠ » = sweet—sweeter—sweetest ; তুলনীয়—সংস্কৃত « নি-তর »—ইংরেজী nether ; « প্র-তর »—farther.

৪। ক্রিয়ায়—সংস্কৃত « লুভ্-য়-তি, লুভ্যতি » : প্রাচীন-ইংরেজী luf-ie-th, luvieth, মধ্য-যুগের ইংরেজী loveth, আধুনিক-ইংরেজী loves ; অস্মি—am, অস্তি—is (জরমানে ist), সন্তি—প্রাচীন-ইংরেজী sint.

৫। সংস্কৃতে শতৃ-প্রত্যয়—« অৎ », প্রাচীন-ইংরেজীতে—end, আধুনিক-ইংরেজী -ing : « ভর্ + অৎ, ভরৎ » = berend—bearing ; প্রী + অৎ = fri + end, friend.

৬। সংস্কৃতে নিষ্ঠা « ত, ইত » বা « ন » প্রত্যয় এবং ইংরেজীর Past Participle-এ -ed, -en প্রত্যয়, মূলে এক : « ভিদ্-ন » = bitt-en : « অ-দম্-ইত, *ন্-দাম্-ত = অদান্ত » = un-tam-ed, untamed.

সংস্কৃত ও ইংরেজীর মধ্যে স্বর-ধ্বনি ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায়, সেই-সব পার্থক্যের মধ্যেও একটী নিয়ম আছে : যেমন—যেখানে শব্দের আদিতে সংস্কৃতে « প »—সেখানে ইংরেজীতে f ; সংস্কৃতে « শ, ক »—ইংরেজীতে h ; সংস্কৃতে « দ »—

ইংরেজীতে th ; সংস্কৃতে « ভ »—ইংরেজীতে b ; ইত্যাদি। সংস্কৃত নঞর্থক উপসর্গ « অ, অন্ », ইংরেজীতে un- ; ইত্যাদি। তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে এই-সব বিষয় বিশেষ খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা এই দুইটী আর্য-ভাষার মৌলিক মিল প্রদর্শিত হইয়াছে।

[৫.৫৪] ফারসী ও বাঙ্গালা

ফারসী ভাষা বাঙ্গালার মত আর্য-গোষ্ঠীর ভাষ.—আধুনিক ফারসীর মূল-স্বরূপ প্রাচীন-পারসীক ও অন্য প্রাচীন ইরানীয় ভাষা, এবং বাঙ্গালার মূল বৈদিক সংস্কৃত ভাষা, এই দুইটী এত কাছাকাছি যে, ইহাদিগকে একই ভাষার দুইটী উপভাষা বলা চলে। ফারসী ও বাঙ্গালা এই দুই ভাষার মধ্যে যে মৌলিক সাদৃশ্য আছে, তাহা অনেক সময়েই এই দুই ভাষার বর্ণমালার পার্থক্য এবং শব্দ-সমষ্টির অনৈক্য সত্ত্বেও সহজেই ধরা যায়।

আরবী বর্ণমালাতে কতকগুলি নূতন বর্ণ যোগ করিয়া, ফারসী বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। সাধু বা সাহিত্যের ফারসীর ধ্বনিগুলি খুব জটিল নহে। ইহাতে মাত্র বাইশটী (অথবা « ক » ও « গ »-এর দুইটী আধুনিক বিকৃত বা তালব্যীকৃত উচ্চারণ ধরিয়া চব্বিশটী) ব্যঞ্জন-ধ্বনি আছে। ৫২২ পৃষ্ঠায় ফারসীর ব্যঞ্জন-ধ্বনি প্রদর্শিত হইল।

আরবী ভাষার কতকগুলি ধ্বনি ফারসীতে অজ্ঞাত, যদিও ঐ-সব ধ্বনির জন্য আরবীর বর্ণগুলি ফারসী বর্ণমালায় আছে; যেমন—ح (ফারসীতে ইহা ه হইতে অভিন্ন), ظ ض ذ (এই তিনটীর উচ্চারণ আরবীতে পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ফারসীতে এগুলি ز = জ বা z-এর সমান), ث ও ص (আরবীতে এই দুইটী পৃথক্, ফারসীতে কিন্তু س বা দন্ত্য স=s-এর সঙ্গে এই দুইটী অভিন্ন), ط (ফারসীতে ت র সঙ্গে অভিন্ন), ق (ফারসীতে غ=ঘ-এর মত); ع এবং ء (عمرو)—ফারসী হইতে এই ধ্বনি দুইটী পরিত্যক্ত হয়।

ফারসীর ব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলির মধ্যে উষ্ম ধ্বনির বাহুল্য লক্ষণীয়।

স্বরধ্বনি—َ, ِ, ُ = হ্রস্ব অ (বিবৃত—কতকটা আ-কারের মত), হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও (অথবা হ্রস্ব ই, হ্রস্ব উ)। ফারসীর آ অর্থাৎ দীর্ঘ « আ »-র উচ্চারণ এখন বাঙ্গালা « অ » বা « অও »-এর মত হইয়া গিয়াছে (تمام 'তমাম' শব্দ এখন পারস্য-দেশের উচ্চারণে দাঁড়াইয়াছে [ত্যামওম্]); দীর্ঘ « ঈ » ও দীর্ঘ « ঊ » আছে; এবং

ফারসী (ইরানী) ভাষার ব্যঞ্জন-ধ্বনি

	কণ্ঠনালীয় (শ্বাসনালীয়)	কণ্ঠ্য	তালব্য	* দন্ত্য ও দন্তমূলীয়	দন্তৌষ্ঠ্য	ওষ্ঠ্য
স্পৃষ্ট		k, ক (ک) g, গ (گ)		* t, ত (ت, ط) * d, দ (د)		p, প (پ) b, ব (ب)
ঘৃষ্ট			č, চ (چ) j, জ (ج)			
নাসিক্য		ŋ, ঙ (ক, গ-এর পূর্বে) (ن)		n, ন (ن)		m, ম (م, ن)
কম্পন-জাত				r, র (ر)		
পার্শ্বিক				l, ল (ل)		
উষ্ম	h, হ (ه, ح)	x, খ় (خ) ǵ, ঘ় (غ, ق)	š, শ (ش) ž, ঝ় (ژ)	s, স (س, ث, ص) z, জ় (ز, ذ, ض, ظ)	f, ফ় (ف) v, ভ়, ব (و)	

দুইটী সন্ধি-স্বর আছে—ei «এই» ও ou «ওউ»। পুরাতন ফারসীতে দীর্ঘ «এ» ও দীর্ঘ «ও» ছিল—আজকাল এই ধ্বনিগুলি যথাক্রমে দীর্ঘ «ঈ» ও দীর্ঘ «ঊ» হইয়া গিয়াছে। 'বাঘ' বা 'সিংহ' অর্থে شیر শব্দ প্রাচীন উচ্চারণে ছিল šēr «শের্», এখন হইয়াছে «শীর্» šīr ('দুগ্ধ' অর্থে شیر «শীর্» হইতে অভিন্ন); 'দিন' অর্থে, روز শব্দের আগেকার উচ্চারণ ছিল rōz; «রোয্», এখন হইয়াছে rūz «রূয্»।

ফারসীর হ্রস্ব ধ্বনিগুলি বিশেষ হ্রস্ব, দীর্ঘ ধ্বনি সচরাচর বিশেষ দীর্ঘ থাকে; বাঙ্গালার মত সমস্ত শব্দ বা বাক্যাংশের উপরে অক্ষরের হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্ব নির্ভর করে না। ফারসীর শ্বাসাঘাত সাধারণতঃ শব্দের অন্ত্য অক্ষরের উপরে পড়ে। বাঙ্গালায় ঠিক উহার উল্টা,—বাঙ্গালায় শ্বাসাঘাত শব্দের আদ্য অক্ষরে পড়ে।

আধুনিক ফারসীর «p=প, k=ক, t=ত» ধ্বনিগুলি, মহাপ্রাণ «kh=খ, ph=ফ, th=থ» রূপে উচ্চারিত হয়।

ফারসীতেও সন্ধি আছে—অনেক সময়ে তাহা লিখিয়া দেখানো হয় না—বিশেষতঃ ব্যঞ্জন-সন্ধি হইলে; যথা—بدتر «বদ্তর্»—উচ্চারণে «বৎতর্»; گنبد ,شنبه «শুন্বহ্, গুন্বদ্», উচ্চারণে «শুম্বহ্, গুম্বদ্»; ناو خدا «নাওখুদা»—ناخدا «নাখুদা»।

বিশেষ্য—শব্দ-রূপ—

ফারসীতে শব্দের লিঙ্গ-নির্ণয়-ব্যাপারে, বাঙ্গালা বা ইংরেজীরই মত কোনও ঝঞ্ঝাট নাই—অর্থ-অনুসারে শব্দের লিঙ্গ স্থিরীকৃত হয়। উভয়-লিঙ্গ শব্দের পূর্বে نر «নর্»='পুরুষ' এবং ماده «মাদহ্»='স্ত্রী', এই দুই শব্দ বসাইয়া, পুরুষ বা স্ত্রীর বিশেষ দ্যোতনা হয়। ফারসীতে স্ত্রীলিঙ্গের জন্য বিশেষ প্রত্যয় নাই—তবে আরবী শব্দে স্ত্রী-প্রত্যয় পাওয়া যায়; যথা—ملک «মলিক্» 'রাজা'—ملکه «মলিকহ্, মলিকা» 'রানী'; اسود «অস্‌বদ্» 'কালো'—سوده «সব্‌দহ্, সৌদা» 'কৃষ্ণবর্ণা'; ইত্যাদি।

প্রাচীন-পারসীকে শব্দ-রূপ সংস্কৃতের মতই ছিল। আজকালকার ফারসীতে প্রাচীন সুবন্ত রূপগুলির প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ফারসীর শব্দ-রূপ অতি সরল হইয়া গিয়াছে। বহুবচনের চিহ্ন প্রাণিবাচক শব্দে ان «আন্», ও অপ্রাণিবাচক ها «হা»—এই দুইটী ছাড়া আর কোনও প্রত্যয় নাই; আধুনিক ফারসীতে

আবার آں «আন্»-এর ব্যবহারও নাই—সর্বত্রই বহুবচনে ها «হা»-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। কর্মপ্রবচনীয় (Preposition বা উপসর্গ ও Post-position বা অনুসর্গ) দ্বারা বিভিন্ন কারক দ্যোতিত হয়; যথা—از خانه «অয্-খানহ্» 'ঘর হইতে', با مرد «বা-মর্দ্» 'মানুষের প্রতি', مرد را «মর্দ্-রা» 'মানুষকে', دست مرد «দস্‌ৎ-ই-মর্দ্» 'মানুষের হাত' (dast-i-mard—'hand-of-man'), ইত্যাদি। এইসব Preposition-এর ব্যবহারে, ফারসী ও ইংরেজীর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্বন্ধ-পদে অধিকারী ও অধিকৃতের নামের মধ্যে «ই» (বা «এ») প্রত্যয় (ফারসীতে যাহাকে اضافت বলে) ফারসীর এক বৈশিষ্ট্য: دختر بادشاه «দুখ্‌তর্-ই-বাদ্‌শাহ্» 'রাজার কন্যা'।

ফারসীর Indefinite Article বা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের অবধারণ (یای وحدت, یای تنکیر) বাঙ্গালায় অজ্ঞাত; যেমন—مرد «মর্দ্» 'মানুষ', مردے , مردي «মর্দে, মর্দী» 'কোনও একজন মানুষ'। বৃহত্ত্ব, পরিপুষ্টি অথবা সম্মান জানাইবার জন্য যে ی «এ, ঈ» অক্ষর বিশেষ্যের সঙ্গে প্রত্যয়বৎ যুক্ত হয় (یای تاکید), তাহার মত প্রত্যয়ও বাঙ্গালায় নাই; যথা—خلق «খুল্‌ক্» 'জাতি', خلقی «খুল্‌কী» 'সমগ্র জাতি'।

বিশেষণ—

বিশেষ্যকে অনুসরণ করিয়া বিশেষণের কোনও পরিবর্তন হয় না; বাঙ্গালার সহিত ফারসীর এ বিষয়ে মিল আছে। বিশেষণ ফারসীতে বিশেষ্যের পূর্বে বসে; যথা—نیک مردمان «নীক্ মর্দুমান্» 'ভাল মানুষ', هشیار وزیر «হুশ্‌য়ার্ বজীর্» 'বিচক্ষণ মন্ত্রী', ইত্যাদি; আবার বহুস্থলে বিশেষ্যের পরেই বসে, এবং উভয়ের মধ্যে ی «ই, এ» প্রত্যয় (اضافت توصیفی) আসে; যথা—بازوی سخت «বাজু-এ-সখ্‌ৎ» 'কঠিন বাহু', بندهٔ وفادار «বন্দহ্-ই-বফাদার» 'বিশ্বাসী ভৃত্য'। বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত।

তারতম্য—সংস্কৃত ও ইংরেজীর মত, تر «তর্» ও ترین «তরীন্» প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন হয়: به «বিহ্» 'ভাল', بهتر «বিহ্-তর্» 'অপেক্ষাকৃত ভাল'

بہ تریں « বিহ্‌-তরীন্ » 'সর্বাপেক্ষা ভাল'। সাধারণতঃ পঞ্চমী ও ষষ্ঠী (« -তর্ » প্রত্যয়ে পঞ্চমী বা অপাদান, « -তরীন্ » অর্থাৎ 'তম' প্রত্যয়ে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ) বিভক্তির সহযোগে তারতম্য প্রদর্শিত হয়।

সর্বনাম—

সর্বনাম-বিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সহিত ফারসীর অনেক মিল আছে।

ফারসীর 'পদাশ্রিত সর্বনাম' একটি বিশেষ বস্তু, বাঙ্গালায় তাহা নাই। সর্বনামের কতকগুলি বিশেষ রূপ আছে—ষষ্ঠী বিভক্তি'ত এই বিশেষ রূপগুলি, বিশেষ্য-পদের সহিত সংযুক্ত হয়; যথা—'আমার পিতা' অর্থে, پدر من « পিদর্-ই-মন্ », অথবা پدرم « পিদর্-অম্, পিদরম্ » (তুলনীয়, সংস্কৃত « মম পিতা—পিতা মে »); 'তোর পিতা'—پدر تو « পিদর্-ই-তু » অথবা پدرت « পিদর্-অৎ, পিদরৎ »; 'তাহার বই'—کتاب او « কিতাব্-ই-উ », অথবা کتابش « কিতাব্-অশ্, কিতাবশ্ » ইত্যাদি। ক্রিয়ার কর্ম হইলেও, এই রূপ সংক্ষিপ্ত সর্বনাম ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়; যথা—دیدم « দীদম্ » 'আমি দেখিলাম', دیدمش « দীদম্-অশ্=দীদমশ্ » 'আমি তাহাকে দেখিলাম'; زدند « জুদন্দ্ »='তাহারা মারিল', কিন্তু 'তাহারা আমাকে মারিল'= مرا زدند « ম-রা জুদন্দ্ », অথবা زدندم « জুদন্দ্-অম্, জুদন্দম্ »।

ক্রিয়াপদ-সাধন—

প্রাচীন-পারসীকের ক্রিয়ার রূপ প্রায় পুরাপুরি সংস্কৃতের-ই মত ছিল। প্রাচীন-পারসীকের ক্রিয়ার অনেক প্রত্যয় ও বিভক্তি, আধুনিক-ফারসীতেও বাঁচিয়া আছে; অধিকন্তু, কতকগুলি বিশেষ মূলক প্রকার ও কাল-রূপ, আধুনিক ফারসীতে সৃষ্ট হইয়াছে। Preposition বা অব্যয়-রূপী উপসর্গ-দ্বারা কতকগুলি ক্রিয়ার কাল-রূপ এবং প্রকার দ্যোতিত হয়।

বাঙ্গালা ও ইংরেজীর মত আধুনিক-ফারসীতে মূল ক্রিয়ার শতৃ- ও নিষ্ঠা-যুক্ত রূপের সহিত অস্তি-বাচক ও ইচ্ছা-বাচক সহায়ক-ক্রিয়া যোগ করিয়া, কতকগুলি যৌগিক কাল-রূপ সৃষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর, ক্রিয়ার রূপে সব ক্ষেত্রে পুরা মিল না থাকিলেও, বাঙ্গালা ও ইংরেজীর সঙ্গে বেশ একটা সামঞ্জস্য ফারসীতে দেখা যায়।

এক-বচনে ও বহু-বচনে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য ফারসীতে প্রদর্শিত হয়—বাঙ্গালার সঙ্গে এখানে অমিল।

ফারসী ক্রিয়ার রূপ, যথা—

১। پُرس « পুর্স্ » ধাতু—‘পুছ্, জিজ্ঞাসা কর্’ (সংস্কৃত ‘প্রচ্ছ্’=‘পৃষ্’ ধাতু)।

২। پُرسد « পুর্সদ্ » ‘সে পুছে’ (পৃচ্ছতি) [নিত্য বর্তমান]

৩। پُرسید « পুর্সীদ্ »=‘সে পুছিল’ [সাধারণ অতীত]

৪। پُرساد « পুর্সাদ্ » ‘যেন সে পুছে’ [ইচ্ছাদ্যোতক প্রকার]

৫। بپُرس « বি-পুর্স্ » ‘তুই পুছ্’ [অনুজ্ঞা]

৬। بپُرسد « বি-পুর্সদ্ » ‘সে পুছিতে পারে’ [সম্ভাব্য প্রকার, বর্তমান]

৭। می پُرسد ، همی پُرسد « মী-পুর্সদ্, হমী-পুর্সদ্ » ‘সে পুছিতেছে’ [ঘটমান বর্তমান]

৮। میپُرسید ، همی پُرسید « মী-পুর্সীদ্, হমী-পুর্সীদ্ » ‘সে পুছিতেছিল, সে পুছিত, সে পুছিতে থাকিত’ [ঘটমান অতীত]

৯। پُرسیده است « পুর্সীদহ্-অস্ত্ » বা پُرسید ست « পুর্সীদস্ত্ » ‘সে পুছিয়াছে’ [পুরাঘটিত বর্তমান]

১০। پُرسیده بود « পুর্সীদহ্-বূদ্ » ‘সে পুছিয়াছিল’ [পুরাঘটিত অতীত]

১১। خواهد پُرسید « খাহদ্-পুর্সীদ্ » ‘সে পুছিবে’ [যৌগিক ভবিষ্যৎ]

১২। پُرسیده باشد « পুর্সীদহ্-বাশদ্ » ‘সে পুছিয়া থাকিতে পারে, সে পুছিয়া থাকিবে’ [ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য]

এতদ্ভিন্ন আরও দুই-তিনটি যৌগিক কাল হয়।

অসমাপিকা, শতৃ ইত্যাদি অন্ত রূপ—پُرسا « পুর্সা » ‘পুছিয়া’ ; پُرسان « পুর্সান্ » ‘পুছিতে-পুছিতে’ ; پُرسنده « পুর্সন্দহ্ »=‘পৃচ্ছক’ ; پُرسیده « পুর্সীদহ্ » ‘পুছিলে

পরে'; پرسیدن « পুর্সীদন্ » 'পুছিতে'; پرسیدنی « পুর্সীদনী » 'পুছিবার যোগ্য, জিজ্ঞাস্য'; ইত্যাদি।

বাঙ্গালার মত ফারসীতে কতকগুলি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া আছে।

নিষ্ঠা-প্রত্যয়-যুক্ত রূপের সহিত অস্তি-বাচক ধাতু মিলাইয়া, কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়—বাঙ্গালার মত (পৃষ্ঠা ৩৫৮—৩৬১ দ্রষ্টব্য)।

ফারসীতে বিশেষ্যের সহিত « কর্ » ও « দা » ধাতু-যোগে, বহু যৌগিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় বটে (যথা—رحم كردن « রহ্‌ম্ কর্‌দন্ » 'দয়া করা', بیدار کردن « বীদার কর্‌দন্ » 'আবৃত করা', تیار کردن « তৈয়ার কর্‌দন্ » 'তৈয়ার করা,' ইত্যাদি), কিন্তু বাঙ্গালার মত দুইটা বিভিন্ন ধাতুতে মিলিয়া গঠিত যৌগিক ধাতু বা যৌগিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব ফারসীতে নাই।

বাক্য-রীতি—

বাক্য-রীতিতে ফারসীর সহিত বাঙ্গালার বহু বিষয়ে ঐক্য আছে।

১। ফারসীতে (বাঙ্গালার মত) কর্তা+সম্প্রদান+কর্ম+ক্রিয়া: ক্রিয়া শেষে বসে: پادشاه با وزیر فرمان داد « পাদ্‌শাহ্‌ বা-রজ়ীর ফ়ুর্মান্ দাদ্ » 'রাজা মন্ত্রীকে অনুমতি-পত্র (প্রমাণ) দিলেন'।

২। ক্রিয়ার বিশেষণ বাঙ্গালার মত ক্রিয়ার পূর্বে বসে।

৩। কর্তার বচন-অনুসারে ক্রিয়ার এক-বচন বা বহু-বচনের রূপ হয়; مادر گفت « মাদর্ গুফ়্‌ৎ » 'মা বলিলেন', مادران گفتند « মাদরান্ গুফ়্‌তন্দ্‌ » 'মায়েরা বলিলেন'। বাঙ্গালাতে কিন্তু বচন-অনুসারে ক্রিয়া-পদের ভেদ নাই।

৪। গৌরবে এক-বচনের কর্তার ক্রিয়া বহু-বচনের হয়; যথা—
خدا تعالی اورا دشمن دارند « খুদা-তা'আলা উ-রা দুশ্‌মন্ দারন্দ্‌ » 'পরমেশ্বর উঁহাকে শত্রু ধরেন (=ভাবেন)'।

৫। পরোক্ষ উক্তি প্রায়ই হয় না—বাঙ্গালার মত।

৬। ইংরেজীর অনুরূপ Sequences of Tenses নাই।

৭। সংযোজক-রূপে ব্যবহৃত অস্তিত্ব-বাচক ক্রিয়া বাঙ্গালার মত উহ্য থাকে না,

ব্যক্ত থাকে; যথা, বাঙ্গালা «সে আমার ভাই»=او برادرِ من است «উ বিরাদর্-ই-মন্ অস্ত্»।

শব্দাবলী—

ফারসীর নিজস্ব আর্য-ভাষার শব্দাবলীর সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান: روز «রোজ্» 'দিন' (=সংস্কৃত «রোচঃ» 'আলোক'), شب «শব্» 'রাত্রি' (=ক্ষপা, ক্ষপা); شیر «শীর্» 'দুধ' (=ক্ষীর, ক্ষীর); اسپ «অস্প্» (=অশ্ব), گاو «গাব্» (=গো), خر «খর্» 'গাধা' (=খর), شتر «শুতুর্» (প্রাচীন-পারসীক উশ্‌ত্র=উষ্ট্র); پدر «পিদর্», مادر «মাদর্», برادر «বিরাদর্», خواهر «খাহর্», دختر «দুখ্‌তর্» (=পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ, স্বসৃ, দুহিতৃ), داماد «দামাদ্» (=জামাতা); دادار «দাদার্» (=ধাতৃ), خدا «খুদা» 'ঈশ্বর' (=স্ব-ধা—'যিনি নিজে কাজ করেন'), ایزد «ঈজদ্» 'পূজ্য, ঈশ্বর' (=যজত), نماز «নমাজ্» (=নমঃ, নমস্); یک - دو - سه - چهار - پنج - شش - هفت - هشت - نه - ده - بیست - صد - هزار «য়ক্ (=এক), দো, সি (=ত্রি), চহার্, পন্‌জ্, শশ্, হফ্‌ৎ (=সপ্ত), হশ্‌ৎ (=অষ্ট), নৌ, দহ্ (=দশ), বীস্‌ৎ (=বিংশতি), সদ্ (=শত), হজার্ (অবেস্তার ভাষায় হজঙ্‌র=সহস্র)»; باد «বাদ্» (=বাত), مهر «মিহ্‌র্» (=মিত্র), پاک «পাক্» 'পবিত্র' (=পাবক; 'পাকিস্তান'='পাবকস্থান, পবিত্র দেশ'); سر «সর্» (=শিরঃ), دست «দস্ত্» (=হস্ত), پا পা (=পাদ, পদ), خود «খুদ্» (=স্বতঃ); کر «কর্» ধাতু (=√কৃ, কর্), خواب «খাব্» নিদ্রা (=স্বাপ), خوان «খান্» 'পাঠ করা' (=√স্বন্), بُر ، بر «বুর্, বর্» (=√বৃ, ভর্), بو «বূ» (=√ভূ), دا «দা» (=√দা), استا «ইস্তা» (=√স্থা: فرستا «ফিরিশ্‌তা» 'প্রেরিত পুরুষ, দেবদূত'=প্র-√স্থা), خری «খরী» (=√ক্রী), شنی «শনী» (=√শ্রু—শৃণোতি); ام «অম্» (=অস্মি), است «অস্ত্» (=অস্তি); نرم «নর্ম্» (=নম্র), شرم «শর্ম্» (=শর্ম), گرم «গর্ম্» (=ঘর্ম), چرخ «চর্খ্» (=চক্র), سرخ «সুর্খ্» 'লাল' (=রক্ত)»; ইত্যাদি।

কতকগুলি ফারসী নাম—

আধুনিক ফারসী	প্রাচীন পারসীক	সংস্কৃত
ঈরান্ < এরান্	ঐর্য়ানাম্	আর্যাণাম্
বহ্‌মন্	বহুমনো	বসুমনাঃ
খুস্‌রো	হুস্রবও	সুশ্রবাঃ
রুস্তম্	রওদস্তম	রোধস্তম
সুহ্‌রাব	সুখ্রাপ	শুভ্রাপ
জর্‌দুশ্‌ত্	জরথুশ্‌ত্	জরষ্ট্র
দারাব্	দারয়বহুশ্	ধারয়বসুঃ
অর্দ্‌শীর	অর্তখ্‌শথ্	ঋতক্ষত্র

ফারসীর নিজস্ব ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে, বহু শব্দ ফারসীতে সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, আরবী ভাষা হইতে ফারসী বহু সহস্র শব্দ গ্রহণ করিয়াছে—উচ্চ-ভাব-দ্যোতক শব্দ ফারসী ভাষায় যথেষ্ট থাকিলেও, আরবী হইতে আধুনিক ফারসী এইরূপ অনেক শব্দ ধার করিয়াছে; বর্তমানে ফারসী অভিধানের শতকরা ৬০টীর উপর শব্দ আরবী হইতে গৃহীত। কিছু গ্রীক, সিরীয়, ভারতীয় ও তুর্কী শব্দও ফারসীতে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। আজকাল ইউরোপের সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে, ফ্রেঞ্চ্ বা ফরাসী ভাষা হইতে অনেক শব্দও ফারসীতে গৃহীত হইতেছে। অধুনা কতকগুলি ফারসী লেখক, ভাষায় আগত আরবী শব্দাবলীকে বর্জন করিয়া, সেগুলির স্থানে প্রাচীন বা খাঁটী ফারসী শব্দকে পুনঃপ্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, এবং কেহ-কেহ আবার প্রচুর পরিমাণে ফরাসী ও অন্য ইউরোপীয় শব্দ আমদানী করিতে চাহিতেছেন।

ফারসীর সমাস, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের ন্যায়; যথা—شاه نامه « শাহ্-নামহ্ » 'রাজগ্রন্থ', تخت نشین « তখ্‌ৎ-নশীন্ » 'সিংহাসনারূঢ়', شاه زاده « শাহ্-জ়াদহ্ » 'রাজ-জাত, রাজপুত্র,' شیرمرد « শের-মর্‌দ্ » 'নৃসিংহ,' خوش بو « খুশ্-বো » 'সু-গন্ধ,' نیک نام « নেক্-নাম » 'সু-নাম,' دراز دست « দরাজ়্-দস্ত্ » 'দীর্ঘ-বাহু, দীর্ঘ-হস্ত,' شش پا « শশ্-পা » 'ষট্-পদ'; ইত্যাদি।

[৫·৫৫] হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু) ও বাঙ্গালা

হিন্দুস্থানী ভাষার দুইটী সাহিত্যিক রূপ—হিন্দী, উর্দু। ইহাদের ধ্বনি ও ব্যাকরণ এক, প্রভেদ—বর্ণমালা ও উচ্চ-ভাবের শব্দাবলী লইয়া। ফারসী হরফে লেখা এবং প্রচুর ফারসী-আরবী-শব্দ-যুক্ত হিন্দুস্থানী ভাষার নাম « উর্দু », এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখা ও প্রচুর সংস্কৃত-শব্দে-ভরা হিন্দুস্থানী ভাষার নাম « হিন্দী »; উর্দুকে « মুসলমানী হিন্দী » বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপে একই দেশের মানুষ একই ভাষাকে, ধর্ম-অনুসারে বিভিন্ন বর্ণমালায় লিখিয়া এবং অন্য ভাষা হইতে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতির শব্দ গ্রহণ করিয়া, দুইটী ভাষায় পরিণত করিয়াছে। সাহিত্যের ভাষা হিন্দী ও উর্দু ব্যতীত, সাধারণ লোকে যে হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহার করে, তাহার আবার একটী সমস্ত ভারতবর্ষময় প্রচলিত সরল রূপ আছে; তাহাকে « বাজারী হিন্দুস্থানী » বা « চলতী হিন্দুস্থানী » বলা চলে। কিন্তু জীবনে বিশেষ কার্যকরী হইলেও, ব্যাকরণানুসারী নহে বলিয়া, এই « চলতী হিন্দুস্থানী »-তে কেহ সাহিত্য রচনা করে নাই, এবং ইহার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই।

ধ্বনি—

সংস্কৃতের সব অক্ষরগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট ধ্বনিগুলি মোটামুটি ভাবে হিন্দুস্থানীতে পাওয়া যায়। « ঋ, ৠ, ঌ » হিন্দীতে ব্যবহৃত নাগরী বর্ণমালায় আছে, কিন্তু প্রাচীন উচ্চারণ নাই। « ঐ, ঔ »-এর উচ্চারণ বদলাইয়া গিয়াছে। « ঞ »-র উচ্চারণও নাই। « ণ »-এর উচ্চারণও লোপ পাইয়াছে—এই ধ্বনি উর্দুতে স্বীকৃত হয় নাই, হিন্দীতে « ণ » কেবল সংস্কৃত শব্দে মিলে, এবং এই ণ-র উচ্চারণ করা হয় « ড়ঁ »। হিন্দীতে পূর্বে তালব্য শ-এর উচ্চারণ ছিল দন্ত্য স-কারের মত, এবং মূর্ধন্য ষ-কারের উচ্চারণ ছিল « খ »; এখন « শ » ও « ষ » এই দুইটী অক্ষর ইংরেজীর sh-রূপ উচ্চারিত হয়। ফারসীর কতকগুলি ধ্বনি হিন্দুস্থানীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে—বিশেষতঃ উর্দুতে; যে-সব আরবী-ফারসী শব্দ উর্দুতে ঢুকিয়াছে, সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া এই-সব বিদেশী ধ্বনি ভারতে আসিয়াছে। এই ধ্বনিগুলি হইতেছে फ़ = f = ف, ख़ = kh = خ, ग़ = gh = غ এবং ज़ = z = ز (এবং ذ ض ظ)। এগুলির জন্য বিন্দুযুক্ত দেবনাগরী অক্ষর হিন্দীতে ব্যবহৃত হয়—फ़, ख़, ग़, ज़; কিন্তু সাধারণ « फ, ख, ग, ज » -ও চলে। ق-এর ধ্বনি (ক়, क़) শিক্ষিত উর্দু-ওয়ালার মুখে শোনা যায়—এই আরবী ধ্বনিটী দেবনাগরীতে क़ রূপে লিখিত

হয়। আরবীর ع « 'অয়ন্ » অক্ষর উর্দু লিপিতে আছে, উর্দুতে আগত আরবী শব্দে পাওয়া যায়, কিন্তু মুসলমান মৌলবী ও আরবী-জানা লোকেদের মুখে ছাড়া হিন্দুস্থানীতে এই ধ্বনি শোনা যায় না, সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা হয়; দেবনাগরী অক্ষরে স্বরবর্ণের তলায় ফুট্‌কি দিয়া কখনও কখনও ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা হয়; যথা—علی = अ़ली = আলী, علم = इ़ल्म = (চল্‌তী বাঙ্গালায়) এলেম, عثمان = उ़स्मान = ওসমান।

মহাপ্রাণ ধ্বনি « ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ » শুদ্ধ বা পূর্ণ-রূপে হিন্দীতে উচ্চারিত হয়। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিও হিন্দীতে বেশ স্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার তুলনায় হিন্দুস্থানীর এটী একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দীতে « জ্ঞ »-র উচ্চারণ « গ্যঁ »; এবং « ক্ষ » সাধারণতঃ « ক্‌খ »-রূপে, কচিৎ « চ্ছ »-রূপে উচ্চারিত হয়। फ = ফ = ph, এবং फ़ = ফ় = f—এই দুইটার পার্থক্য হিন্দুস্থানীতে রক্ষিত হয়। হিন্দীতে व = « ৱ » (অন্তঃস্থ ব) সর্বত্র ब = « ব » (বর্গীয় ব) হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়।

স্বরধ্বনিগুলির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ-বিষয়ে হিন্দুস্থানী ভাষা বেশ নিয়মানুসারী—বাঙ্গালার মত হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ, শব্দের দৈর্ঘ্যের বা বাক্যে ইহার অবস্থানের বশবর্তী নহে। হ্রস্ব « অ »-র উচ্চারণ বাঙ্গালা অপেক্ষা বিবৃত—ইংরেজীর *hut*-এর *u*-এর মত। « ঐ, ঔ »-এর উচ্চারণ « অ্যায়্, অও »-এর মত। অনুস্বার হিন্দীতে আছে—উচ্চারণ « ম্ »,—বাঙ্গালার মত « ঙ্ » নহে।

উর্দুতে আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ-বিষয়ে ফারসীরই অনুসরণ করা হয়। ث, ح, ذ, ص, ض, ط, ظ—এই অক্ষরগুলির আরবী ধ্বনি উর্দুতে অজ্ঞাত; ع, ق—কচিৎ এই দুই অক্ষর উচ্চারণের চেষ্টা করা হয় মাত্র।

হিন্দুস্থানীর শ্বাসাঘাত বাঙ্গালার মত আদ্য অক্ষরে নহে—শব্দের শেষের দিকে যে দীর্ঘ স্বর থাকে, তাহার উপরই সাধারণতঃ স্বরাঘাত পড়ে। হিন্দুস্থানীতেও সন্ধি আছে, তবে তাহা মৌখিক, লেখায় প্রকাশ করা হয় না।

শব্দ-রূপ—

হিন্দুস্থানীতে মাত্র পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে, ক্লীবলিঙ্গ নাই। অর্থ ধরিয়া এবং প্রত্যয় ধরিয়া হিন্দুস্থানী শব্দের লিঙ্গ নির্ণীত হয়—এবং অনেক সময়ে হিন্দুস্থানীর একটী শব্দ কেন পুংলিঙ্গ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইল তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; যেমন—

« ভাত, হাথ, চনা (=ছোলা), কাগজ » হইল পুংলিঙ্গ, কিন্তু « দাল, নাক, রোটী (=রুটি), কিতাব » হইল স্ত্রীলিঙ্গ।

বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গের হইলে, তাহার বিশেষণ স্ত্রী-বাচক « -ঈ » -প্রত্যয় গ্রহণ করে; সম্বন্ধ-পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ তাহা স্ত্রীলিঙ্গের হইলে, সম্বন্ধের বিভক্তি « কা » স্থানে « কী » হয়; যথা—« অচ্ছা কাগজ, অচ্ছী কিতাব; ঘর-কা বেটা, ঘর-কী বহূ; ছোটা কাম, বড়ী বাত »।

বহুবচন (১) বিশেষ বিভক্তি-দ্বারা, (২) সমষ্টি-বাচক শব্দ-যোগে, ও (৩) কেবল একবচনের শব্দ-দ্বারা নির্দিষ্ট হয়; যথা—« (১) ঘোড়া—ঘোড়ে; বাত—বাতেঁ; লাঠী—লাঠিয়াঁ; (২) রাজা—রাজা-লোগ; বন্দর—বন্দর-লোগ (প্রাণিবাচক শব্দে); (৩) হাথ—হাথ; কাম—কাম »। (১) রীতি—অর্থাৎ, বিভক্তি-যোগে বহুবচন—বাঙ্গালায় বিরল।

হিন্দুস্থানীতে বিশেষ্যের তির্যক্ রূপ বা প্রাতিপাদিক রূপ আছে, ইহা এখন বাঙ্গালায় অপ্রচলিত। কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকে যে-সকল অনুসর্গ সংযুক্ত হয়, সেগুলি হিন্দুস্থানীতে অবিকৃত বিশেষ্য-শব্দের পরে বসে না, সেগুলি বিশেষ্যের একটী পরিবর্তিত রূপের পরে বসে—তাহার নাম Oblique Form অর্থাৎ 'তির্যক্‌রূপ'; যথা—« ঘোড়া—ঘোড়ে-কা, ঘোড়ে-সে, ঘোড়ে-পর; বহুবচনে—ঘোড়ে—ঘোড়োঁ-কা, ঘোড়োঁ-সে, ঘোড়োঁ-পর » (তির্যক্-রূপ—একবচনে « ঘোড়ে », বহুবচনে « ঘোড়োঁ »)। বাঙ্গালায় এখন কেবল সর্বনামে এই প্রকারের তির্যক্ রূপ আছে।

হিন্দীতে একটী Agentive Case—কর্তৃকারক-স্থানীয় করণ-কারক আছে, সকর্মক ধাতুর অতীত কালের ক্রিয়ার কর্তা রূপে « -নে » অনুসর্গ-সহ তাহা ব্যবহৃত হয়; যথা—« রাম-নে শ্যাম-কো দেখা; লড়্‌কে-নে দুধ পিয়া; মৈঁ-নে ভাত খায়া; উন্-নে রোটী খাঈ। » বাঙ্গালায় এই কারকের প্রচলন নাই।

সম্বন্ধ-পদ বা কারক যে বিশেষ্যের সহিত অন্বিত, সেই বিশেষ্য পুংলিঙ্গে কর্তৃকারকে একবচনের হইলে, সম্বন্ধের প্রত্যয় বা বিভক্তি হয় « -কা »; কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য কারকে একবচনের হইলে, এই « কা »-প্রত্যয়টী হইয়া যায় « -কে », এবং বহুবচনে সর্বত্র হয় « -কে »; যথা—« সিপাহী-কা ঘোড়া বড়া হৈ, সিপাহী-কে ঘোড়ে-পর জীন লগাও; সেঠজী-কে তীন ঘোড়ে হৈঁ, সেঠজী-কে তীন ঘোড়োঁ-মেঁ এক ভী অচ্ছা নহীঁ » ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন বাঙ্গালা ষষ্ঠীর বিভক্তি « -র, -এর »-তে নাই।

বিশেষণ—

স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের সহিত অন্বিত হইলে, সম্ভব হইলে বিশেষণে স্ত্রী-বাচক « ঈ » -প্রত্যয় যুক্ত হয় : « কালা ঘোড়া, কালী ঘোড়ী ; সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা ; গোরা লড়কা, গোরী লড়কী » ; কিন্তু « খুব-সুরৎ লড়কা, খুব-সুরৎ লড়কী »।

তারতম্য—বাঙ্গালার মত।

সংখ্যা-বাচক শব্দ—বাঙ্গালার মত ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক সংখ্যার শব্দ পৃথক্ পৃথক্ প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইংরেজীর মত, নূতন করিয়া গঠিত নহে ; যথা— « পচাস, একাবন্, বাবন্, তিরপন্, চৌপন্, পচ্‌পন্ » ইত্যাদি ;—ইংরেজীর ধরণে « পচাস, পচাস-এক, পচাস-দো, পচাস-তীন » ইত্যাদি নহে। ক্রম-বাচক প্রত্যয় হিন্দীতে জীবিত, বাঙ্গালার মত মৃত নহে ; « ১=পহিলা, ২=দূসরা, ৩=তীসরা, ৪=চৌথা, ৫=পাঁচৱাঁ, ৬=ছঠা, ৭=সাতৱাঁ, ৮=আঠৱাঁ, ৯=নৱৱাঁ »—সমস্ত ঊর্ধ্ব সংখ্যাতে এই « -ৱাঁ » -প্রত্যয়-যোগ হয়, ইংরেজীর th-এর মত : 88th=« অঠাসীৱাঁ » =বাঙ্গালায় « আটাশীর, অষ্টাশীতিতম »।

সর্বনাম—

তাবৎ সর্বনামের তির্যক্ রূপ লক্ষণীয়। « মৈঁ—মুঝ ; হম—হম ; তূ—তুঝ ; তুম—তুম ; বহ—উস্ ; বে—উন্ ; য়হ্—ইস্ ; য়ে—ইন্ ; কৌন—কিস্, বহুবচনে কিন্ ; জো—জিস্, জিন » ইত্যাদি।

ক্রিয়া-পদ—

ক্রিয়া-পদের বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক কাল-রূপের গঠন-বিষয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দীর সাদৃশ্য থাকিলেও, এই দুই ভাষার ক্রিয়া-পদে নানা লক্ষণীয় পার্থক্য আছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতে ক্রিয়ার বচন-ভেদ কর্তার বচন-অনুসারে হয় : « মৈঁ জাউঙ্গা— হম্ জায়েঙ্গে ; মৈঁ জাউঁ—হম জাএঁ ; মৈঁ জাতা হূঁ—হম জাতে হৈঁ »।

সকর্মক-ক্রিয়ার অতীতে, কর্মের সহিত ক্রিয়া অন্বিত হয়—ক্রিয়া যেন কর্মের বিশেষণ ; অকর্মক-ক্রিয়ার অতীতে, কর্তার বিশেষণের মত কর্তার সহিতই ক্রিয়া অন্বিত হয় ; যথা— অকর্মক, « মৈঁ চলা—হম চলে ; তূ চলা—তুম চলে ; বহ চলা—বে চলে » ; সকর্মক— « মৈঁ-নে এক লড়কা দেখা—হম-নে এক লড়কা দেখা ; মৈঁ-নে চার লড়কে দেখে—হম্-নে চার লড়কে দেখে »। বাঙ্গালায় এই রীতি এখন অজ্ঞাত।

বাঙ্গালার তুলনায়, হিন্দুস্থানীর অতীত কালের ক্রিয়ার তিন প্রকার « প্রয়োগ » একটী লক্ষণীয় পার্থক্য—(১) কর্তরি-প্রয়োগ, (২) কর্মণি-প্রয়োগ (৩) ভাবে-প্রয়োগ। অ-কর্মক ক্রিয়ার অতীতে কর্তরি-প্রয়োগ হয়—ক্রিয়া তখন যেন কর্তার বিশেষণ; স-কর্মক ক্রিয়ার, অতীতে কর্মণি-প্রয়োগ হয়, ক্রিয়া কাযতঃ কর্মের বিশেষণ (উদাহরণ উপরের পারাগ্রাফে দ্রষ্টব্য)। ভাবে-প্রয়োগে, স-কর্মক-ক্রিয়ার কর্মকে « -কো »-বিভক্তি বা অনুসর্গ যুক্ত করিয়া, পৃথক্ ভাবে রাখা হয়, ইহাতে ক্রিয়া-পদের পরিবর্তন হয় না; যেমন—« মৈঁ-নে এক লড়কে-কো দেখা, মৈঁ-নে চার লড়কোঁ-কো দেখা; শহর-মে দৌড়তে হুএ পাঁচ ছঃ লড়কোঁ-কো দেখা » (ক্রিয়াপদ « দেখা » অপরিবর্তিত); ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এখন কেবল কর্তরি-প্রয়োগ বিদ্যমান।

ভবিষ্যৎ কালে, হিন্দুস্থানীর ক্রিয়া, কর্তার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়।

বাঙ্গালায় ক্রিয়া-পদ, পূর্ণ-ভাবে ক্রিয়ার রূপেই বিদ্যমান; ইহাতে বিশেষণের গুণ আর নাই—পুরাতন বাঙ্গালায় তাহা ছিল—হিন্দুস্থানীর সহিত প্রয়োগ-বিষয়ে পুরাতন বাঙ্গালার মিল ছিল।

হিন্দীতে পরিচালিত বা আরোপিত ণিজন্ত ক্রিয়া আছে—বাঙ্গালায় নাই।

হিন্দীতে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রীতি বাঙ্গালার মত।

যৌগিক-ক্রিয়া হিন্দীতে বাঙ্গালার মত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বাক্য-রীতি—

মোটের উপর বাঙ্গালার সঙ্গে খুবই মিল আছে।

১। কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া: « উন্-নে খানা খায়া »।

২। সংযোজক অস্ত্যর্থক ক্রিয়া স্পষ্ট থাকে: « য়হ্ মেরা ভাই হৈ »।

৩। না-অর্থক অব্যয়, ক্রিয়ার পূর্বে বসে: « মৈঁ নহীঁ দূঁগা »।

৪। প্রত্যক্ষ উক্তির সমধিক ব্যবহার।

৫। বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দুস্থানীতে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বেশী ব্যবহৃত হয়।

শব্দাবলী—

বাঙ্গালার মত হিন্দুস্থানীতেও, ভাষার শব্দগুলি প্রাকৃতজ ও দেশী, তৎসম, অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী প্রভৃতি শ্রেণীতে পড়ে। তবে উর্দুতে সংস্কৃত শব্দ অত্যন্ত কম, ফারসী ও আরবী শব্দের অনুপাত খুবই বেশী, শতকরা ৫০ কি তাহার অধিক হইবে; আবশ্যক

হউক বা অনাবশ্যক হউক, উর্দু-লেখকগণ অবাধে আরবী ও ফারসী অভিধান হইতে শব্দ আনিয়া ব্যবহার করেন,—সংস্কৃতের কথা স্বপ্নেও মনে আনেন না। হিন্দীর জন্য সংস্কৃতের ভাণ্ডার খোলা, কিন্তু উর্দুর মারফৎ এবং চলতী হিন্দুস্থানীর মারফৎ বহু আরবী-ফারসী শব্দ হিন্দীতেও আসিয়া গিয়াছে। চলতী হিন্দুস্থানীতে এই দুইয়েরসা মগুস্ত দেখা যায় —তবে চলতী হিন্দুস্থানীতে উচ্চ-ভাবের বিষয়ের আলোচনা নাই। আজকাল ইংরেজী শব্দও অনেক পরিমাণে হিন্দুস্থানীতে স্থান লাভ করিতেছে—এই-সব ইংরেজী শব্দ, উত্তর-ভারতের উচ্চারণ-রীতি ধরিয়া পরিবর্তিত হয়, বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট ইংরেজী শব্দের মত এগুলির রূপ হয় না (যেমন « কালিজ, কমেটী, য়ুনিবর্সিটী, রেলবে, শার্টিফিকেট, আনররী-মৈজিস্ট্রেট » ইত্যাদি)। দুই-পাঁচটা বাঙ্গালা শব্দও হিন্দুস্থানীতে স্থান লাভ করিয়াছে (যেমন « গমছা, রসগুল্লা, কবিরাজী, ফালো »)। আবার বহু হিন্দুস্থানী শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে।

[৫.৩৬] আরবী ও বাঙ্গালা

বাঙ্গালা ও আরবী উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই অধিক, কারণ এই দুই ভাষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন দুইটী ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, ফারসী ও ইংরেজী প্রভৃতি আর্য-গোষ্ঠীর ভাষার গঠন-প্রণালী, এবং শেমীয়-গোষ্ঠীর ভাষা আরবীর গঠন-প্রণালী, নানা দিক্ দিয়া পরস্পর হইতে খুবই পৃথক্। আর্য-ভাষার শব্দ-সৃষ্টি এইরূপে হয়: প্রথম আসে ধাতু (সরল রূপে, অথবা গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ-দ্বারা কিংবা ধাতুর অভ্যন্তরে « ন » যুক্ত অক্ষর বা « ন »-ধ্বনির আগম করিয়া পরিবর্তিত রূপে); তৎপরে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি জুড়িয়া দেওয়া হয়। কচিৎ বা উপসর্গ আসিয়া ধাতুর পূর্বে বসে। আর্য-ভাষার ধাতু সাধারণতঃ monosyllabic বা একাক্ষর —এবং এই একাক্ষর ধাতুর পরিবর্ধিত রূপ-হিসাবে, দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর ধাতুও আদি আর্য-ভাষায় পাওয়া যাইত; কিন্তু আধার ছিল—একাক্ষর ধাতু। কুত্রাপি ধাতুর অভ্যাস বা দ্বিত্ব-ভাব ঘটে; যথা—« (সংস্কৃত) √চল্—চল্-অ-তি, চাল্-অয়্-অ-তি, প্র-চল্-ইত, চ-চাল্-অ; √বৃ—বর্-অ-তি, ব-বৃর্-অ, ভ-রি-ভুম্; √পুষ্—পু-ষ্-প্+অ+তি; √বৃধ্—বৃ-ন-ধ্+তি=বৃণদ্ধি; (বাঙ্গালা) কর্-ইল্-আম; (ইংরেজী) sleep —slep-t, sleep-er, sleep-ing, sleep-ing-ly » ইত্যাদি।

আরবীর ধাতুগুলি trilite বা ত্রি-ব্যঞ্জনময় ; ধাতুর এই তিন ব্যঞ্জন-ধ্বনির পূর্বে ও পরে প্রত্যয় বসিতে পারে ; কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের স্বর-ধ্বনি, এবং কতকগুলি বিশেষ ব্যঞ্জন-ধ্বনির আগম-দ্বারা, এই ত্রি-ব্যঞ্জনময় ধাতুর অভ্যন্তরে যে প্রকারের পরিবর্তন ঘটে, তাহাই আরবী হিব্রু প্রভৃতি শেমীয় শ্রেণীর ভাষার বৈশিষ্ট্য ; যথা—ک , ت , ب বা كَتَبَ=k-t-b « ক্-ত্-ব্ » এই তিনটী ধ্বনি মিলিয়া একটী ধাতু, অর্থ « লিখ্ বা লেখা » ; ইহা হইতে, আভ্যন্তর স্বর-পরিবর্তনে, এবং আদিতে, মধ্যে ও অন্তে নানা ব্যঞ্জন-যোগে ও স্বর-যোগে শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে—كَتَبَ kataba « কাতাবা (হ্রস্ব আ) » 'সে লিখিল, লিখিয়াছে, লিখিয়াছিল' ; كُتِبَ kutiba « কুতিবা » 'ইহা লিখিত হইয়াছে' ; يَكْتُبُ ya-ktubu « য়াক্তুবু » 'সে লেখে, লিখিবে' ; كَتَبْتُ katab-tu « কাতাব্-তু » 'আমি লিখিয়াছি' ; كَتَّبَ kattaba « কাত্তাবা » 'সে পুনঃপুনঃ লিখিল' ; كَاتِبٌ kātibun « কাতিবুন » 'যে লেখে, লেখক' ; كِتَابٌ kitābun « কিতাবুন » 'বই, কেতাব' ; كُتُبٌ kutubun « কুতুবুন » 'বইগুলি' ; مَكْتُوبٌ maktūbun « মাক্তুবু » 'লিখিত' ; مَكْتَبٌ maktabun « মাক্তাবুন » 'লিখন-স্থান, বিদ্যালয়, মক্তব' ; ইত্যাদি। তদ্রূপ, ن , ظ , ر = نظر বা n-ðw-r বা n-ẓ-r « ন-ধ্ব্-র্, বা ন্-জ্-র » —এই ত্র্যক্ষর ধাতুর অর্থ « দেখা ; نَظَرَ naẓara « নাজ্বারা » 'সে দেখিল', نَاظِرٌ nāẓirun « নাজ্বিরু » 'যে দেখে, পরিদর্শক, নাজির', نَظْرٌ naẓrun « নাজ্‌রুন » 'দেখন, দর্শন, দৃষ্টি, নজর', مَنْظُورٌ manẓūrun « মান্‌জ্বুরুন » 'দেখা, দৃষ্ট, দৃষ্ট ও অনুমোদিত, মঞ্জুর', ইত্যাদি। আরবী ভাষায় সমস্ত ধাতুতেই একই প্রকারের স্বর-ধ্বনির আগমনে ও একই প্রকারের উপসর্গ-রূপী প্রত্যয় এবং অন্ত প্রত্যয়ের যোগে, ধাতুর রূপের পরিবর্তন ঘটে, ও সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়। একটী স্থির-নির্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতি অথবা আদর্শ-অনুসারে এই পরিবর্তন সব ধাতুতেই হয় ; 'আরবী কায়দা ছোড়ে না' ; সেই আদর্শকে আরবী ব্যাকরণে وزن wazn « ৱজ্‌ন্ » অর্থাৎ 'তৌল' বা 'মান' বলে। 'কর্' বা 'করণ' অর্থে فعل f'l (ف , ع , ل এই তিন ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমাবেশে জাত) « ফ্'ল » ধাতু হইতে গঠিত বিভিন্ন রূপকে, আর সমস্ত ধাতু-সম্পর্কে ওজন বা মান বলিয়া ধরা হয় ; যেমন, « কিতাবু »='কেতাব' শব্দকে বলা হয়, ইহা « কাতাবা »-র « ফি'আলু » ওজনে গঠিত ; « নাজ্বির » 'নাজির' ও « মান্‌জ্বুর » 'মঞ্জুর' শব্দদ্বয়কে তেমনি বলা হইবে, এই দুইটী যথাক্রমে « ফা'ইলু » ও « মাফ্'ঊলু » ওজনে « নাজ্বারা » হইতে গঠিত।

অন্য কতকগুলি আরবী ধাতু চারি ব্যঞ্জনে ও কতকগুলি দুই ব্যঞ্জনে গঠিত হয়।

ব্যাকরণ-ঘটিত এই পার্থক্য ছাড়া-ও, আর্য ও শেমীয় ভাষায় ধাতু ও শব্দের আকার অর্থাৎ ধ্বনিতে খুবই বেশী পার্থক্য আছে—এই দুই শ্রেণীর ভাষায় ধ্বনি মোটেই মিলে না। আরবীর ও অন্য শেমীয় ভাষায় কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনি আছে, সেগুলি আর্য-ভাষায় অজ্ঞাত।

আরবী ধ্বনি—

সাধু অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের আরবীতে আমাদের ভারতীয় ভাষার «শ» ভিন্ন তালব্য বর্গের এবং মূর্ধন্য বর্গের ধ্বনিগুলি নাই; মহাপ্রাণ বর্ণগুলি, যথা—«খ, ঘ, থ, ধ, ফ, ভ» নাই; «ড়, ঢ়» নাই; কণ্ঠ্যবর্গের মধ্যে «গ» ও ওষ্ঠ্য বর্গের মধ্যে «প» নাই। আরবী ج অক্ষরের প্রাচীনতম উচ্চারণ ছিল «গ» বা «গ্য», এখন বিভিন্ন আরব দেশে ইহার নানা উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে; যথা—«j=জ» (আরব-উপদ্বীপে ও ইরাকে), «zh=ঝ়» (শাম বা সিরিয়াতে); কেবল মিসরে পুরাতন «গ» উচ্চারণ বহাল আছে। আরবী ث হইতেছে উষ্ম «থ়», অর্থাৎ ইংরেজী think, three প্রভৃতি শব্দের th; আরবী ذ=উষ্ম «ধ়», ইংরেজী this, that শব্দের th; خ غ হইতেছে উষ্ম «খ়» ও উষ্ম «ঘ়»—পূর্ব-বাঙ্গালার স্থানীয় লোক-ভাষায় মিলে, সাধু ও চলিত বাঙ্গালায় অজ্ঞাত (ফারসীতেও এই দুইটী ধ্বনি আছে); ح ع=ḥ এবং '—আলজীভের নীচে Pharynx বা গলবিলের মধ্যে উচ্চারিত অঘোষ ও ঘোষবৎ উষ্ম দুই ধ্বনি—এই দুইটী বিশেষ-ভাবে শেমীয় ধ্বনি—আর্য-ভাষায় এই দুইটী অজ্ঞাত; ق=q—আলজীভের কাছাকাছি উচ্চারিত «ক» বা «কৃ», ভারতের ভাষায় নাই; এবং ص ض ط ظ—যথাক্রমে ঈষৎ-উ-কার বা অন্তঃস্থ ব-কার-সম্পৃক্ত দন্ত্য বা দন্তমূলীয় «স, দ, ত» এবং উষ্ম «ধ়»-এর ধ্বনি (ص=স়, ض=দ়, ط=ত়, ظ=ধ়)—এগুলিও ভারতের পক্ষে নিতান্ত বিদেশী ধ্বনি; এই কয়টী বর্ণের উচ্চারণের সময়ে, জীভের সামনের দিক্, দাঁত অথবা দন্তমূলের দিকে আসে বা সেখান স্পর্শ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক্-ও কোমল-তালুকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় উত্তোলিত হয়,—তাহাতেই উ-কার বা ব-কারের আমেজ আসে; এই গুণকে আরবী ব্যাকরণকারগণ اطباق «ইত্‌বক» বলেন। আরবীর ء (همزة hamza) হইতেছে, পূর্ব-বঙ্গের হ-কার। আরবী ভাষার এই ২৭টি ব্যঞ্জন-ধ্বনি

আছে—ء, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ک, ل, م, ن, و, ه, ی ; এগুলির মধ্যে ১৪টী সাধু-বাঙ্গালায় ও চলিত-বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। কতকগুলি ধ্বনি বিশেষ-ভাবে শিক্ষা না করিলে, বাঙ্গালীর গ্রাংশু উচ্চারণ করাও কঠিন। ৫৩১ পৃষ্ঠায় আরবীর ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি উচ্চারণ-স্থান-অনুসারে সাজাইয়া দেখানো হইয়াছে।

অপর পক্ষে, আরবীর স্বর-ধ্বনিগুলি খুব-ই সরল—হ্রস্ব « অ, ই, উ », দীর্ঘ « আ, ঈ, ঊ », সংযুক্ত স্বর « আয়্, আব্ » ; আরবীর « অ, আ », উভয়ই উচ্চারণে কতকটা বাঙ্গালার বাঁকা এ-কারের মত, অর্থাৎ আ-কার-ঘেঁষা।

সন্ধি—

আরবীতে সন্ধি আছে, কিন্তু তাহা লেখায় প্রকাশিত হয় না ; যেমন—আরবীর Definite Article বা নির্দেশক উপসর্গ ال 'al- « 'আল্ »-এর « ল্ », কতকগুলি অক্ষরের পূর্বে আসিলে, সেই অক্ষরগুলিকে দ্বিত্ব করিয়া নিজে লুপ্ত হয় (ث, ت, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ل, ن—এই অক্ষরগুলিকে شمسی šamsī « শাম্সী » অর্থাৎ 'সৌর' অক্ষর বলে—এগুলির পূর্বে « ল্ » লুপ্ত হয় ; অন্য বর্ণগুলির পূর্বে « ল্ » বজায় থাকে, সেগুলিকে قمری qamrī « কাম্রী » অর্থাৎ 'চান্দ্র' অক্ষর বলে) ; যথা— عبد الرحيم 'abdu-'al-raḥīm « 'আব্দু-'আল্-রাহ্ঈম্ — আব্দুর্রহীম » ; نظام الدين nizāmu-'al-dīn « নিজামু-'আল্-দীন — নিজামুদ্দীন্ » ইত্যাদি। আরবীতে লেখে نْبْ nb « ন্ব্ », উচ্চারণ করে mb « ম্ব্ » : نبی nabī « নবী » 'প্রেরিত পুরুষ' —বহুবচনে انبيا anbiyā « আন্বিয়া — আম্বিয়া » ; حنبل Ḥanbal « হ্হান্বাল্ — হম্বল্ »। এ ছাড়া অন্য প্রকারের সন্ধিও আছে।

আরবীর Definite Article বা নির্দেশক « 'আল্ » এই ভাষার একটী বিশেষ বস্তু।

শব্দরূপ—

আরবীতে ক্লীব-লিঙ্গ নাই। বিশেষ্যের মধ্যে স্ত্রী-লিঙ্গ পদেরই সংখ্যা সর্বাধিক। আরবীতে তিনটী বচন—এক-বচন, দ্বি-বচন, বহু-বচন। প্রত্যয়-যোগে দ্বি-বচন ও বহু-বচন

আরবী ভাষার ব্যঞ্জন-ধ্বনি

	কণ্ঠনালী (শ্বাসনালীয়)	গলবিল Pharynx	অলিজিহ্বা	কোমল তালু	কঠিন তালু	দন্তমূল	দন্ত	ওষ্ঠ
স্পৃষ্ট	' = ء (hamza)		q ক (ق)	k ক (ک)	g′ = j জ (ج)		t ত (ت) d দ (د)	b ব (ب)
উ-মিশ্র (কণ্ঠীকৃত) স্পৃষ্ট (mutbaq, velarised)						dw দ (ض)	tw ত (ط)	
নাসিক্য				ŋ = ঙ (ن) (ک এর পূর্বে)	ñ = ঞ (ن) (ج এর পূর্বে)		n ন (ن)	m ম (م, ن)
কম্পন-জাত						r র (ر)		
পার্শ্বিক						l ল (ل)		
উষ্ম	h হ (ه)	ḥ হ' (ح) ' (ع)		x খ (خ) g ঘ (غ)	š শ (ش)	s স (س) z জ় (ز)	θ থ (ث) δ ধ (ذ)	f ফ (ف)
উ-মিশ্র (কণ্ঠীকৃত) উষ্ম (mutbaq, velarised)						sw স (ص)	δw ধ (ظ)	
অর্ধস্বর					y য় (ی)			w ব (و)

হয়; যথা—এক-বচনে مَلِكٌ maiikun « মালিকুন্ » 'রাজা'—দ্বি-বচনে مَلِكَانِ malikāni « মালিকানি »—বহু-বচনে مَلِكُونَ malikūna « মালিকূনা »। আবার বিশেষ-বিশেষ 'ওজন্'-এ গঠিত সমষ্টি- বা দল-বাচক নূতন স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ-দ্বারাও বহু-বচন হয়; যথা—مُلُوكٌ mulūkun « মুলূকুন্ » 'রাজগণ'।

বিভক্তি-যোগে তিনটী কারক হয়—কর্তা, কর্ম, সম্বন্ধ: যথাক্রমে—« মালিকুন্, মালিকান্, মালিকিন্ », বা « 'আল্-মালিকু, 'আল্-মালিকা, 'আল্-মালিকি »। কর্ম বা সম্বন্ধের পূর্বে Preposition অথবা কর্ম-প্রবচনীয় উপসর্গ যোগ করিয়া অন্য কারক প্রদর্শিত হয়।

বিশেষণ, বিশেষ্যের পরে বসে। সম্বন্ধ-পদও অন্বিত বিশেষ্যের পরে বসে। বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন ও কারক অনুসারে, প্রাচীন আরবীতে বিশেষণেরও বিভক্তির পরিবর্তন হয়।

তারতম্য—বিভিন্ন ওজনের শব্দ-দ্বারা প্রদর্শিত হয়; যথা—كَبِيرٌ « কাবীরুন্ » = 'মহান্' (কবীর), أَكْبَرُ « 'আক্বারুন্ » = 'মহত্তর' (আক্বর), الْأَكْبَرُ « 'আল্-'আক্বারু » = 'মহত্তম'।

সর্বনাম—

উত্তম-পুরুষ ছাড়া, মধ্যম- ও প্রথম-পুরুষের সর্বনামে লিঙ্গ-ভেদ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) আছে যথা— هُوَ « হুৱা » 'সে' (পুং), هِيَ « হিয়া » (স্ত্রী), বহু-বচনে هُمْ « হুম্ » 'তাহারা' (পুং), هُنَّ « হুন্না » (স্ত্রী)। আরবীর উত্তম-, মধ্যম- ও প্রথম- পুরুষ-বাচক সর্বনামগুলির দুইটী করিয়া রূপ আছে—একটী স্বকীয় বা স্বতন্ত্র, অন্যটী পরতন্ত্র বা পরাশ্রিত, অথবা প্রত্যয়-রূপে ব্যবহৃত। এই পরতন্ত্র রূপটী, সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য-পদে এবং কর্ম বুঝাইবার জন্য ক্রিয়া-পদে যুক্ত হয়; যথা—أَنَا « 'আনা » = 'আমি' (স্বতন্ত্র), ـِي « ঈ » 'আমার', نِي « নী » 'আমাকে' (পরতন্ত্র); যেমন كِتَابٌ « কিতাবুন্ » 'বই'— كِتَابِي « কিতাবী » 'আমার-বই'; ضَرَبَ « দারাবা » 'সে মারিল', ضَرَبَنِي « দারাবানী » 'সে আমাকে-মারিল'। কর্ম-প্রবচনীয় উপসর্গ (Preposition)-এর সঙ্গেও এই প্রকার পরাশ্রিত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়; যথা—

مِنْ 'মিন্'=from, 'হইতে'—مِنِّي « মিন্-নী, মিন্নী » 'আমার-নিকট-হইতে', مِنْهُمْ « মিন্-হুম্ » 'তাহাদের-নিকট-হইতে'; أَنْتَ « 'আন্‌তা » 'তুই, তুমি', কিন্তু لَكَ « লা-কা » 'তোমার-সঙ্গে' (পুং), لَكِ « লা-কি » 'তোমার-সঙ্গে' (স্ত্রী)।

সংখ্যা-বাচক শব্দ—এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষ রূপ আছে। 'এগার' ইত্যাদি সংখ্যা, « দশ+এক, দশ+দুই », রীতিতে গঠিত হয়; তদ্রূপ 'একত্রিশ, বত্রিশ, বাহান্ন, তিয়াত্তর' ইত্যাদি, « ত্রিশ+এক, ত্রিশ+দুই, পঞ্চাশ+দুই, সত্তর+তিন » রূপে গঠিত হয়। সাধারণ গণনার সংখ্যাকে বিশেষ ওজনে রূপান্তরিত করিয়া, ক্রমবাচক-সংখ্যা গঠিত হয়; যথা—ثَلَاثَةٌ « থ়ালাথ়াতুন্ » 'তিন' (পুং), ثَلَاثٌ বা ثَلْثٌ « থ়ালাথ়ুন্ » 'তিন' (স্ত্রী),—ক্রম-বাচক ثَالِثٌ « থ়ালিথ়ুন্ » 'তৃতীয়' (পুং—ইহার অর্থ দাঁড়ায় 'তৃতীয় ব্যক্তি'—তাহা হইতে বাঙ্গালা 'সালিস' ='নিরপেক্ষ ব্যক্তি'), ثَالِثَةٌ « থ়ালিথ়াতুন্ » 'তৃতীয়া' (স্ত্রী); এবং ভগ্নাংশ-বাচক ثُلُثٌ « থ়ুলুথ়ুন্ » 'এক-তৃতীয়াংশ'।

ক্রিয়া-পদ—

আরবী ক্রিয়া-পদ-গঠনের রীতিও সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব—বাঙ্গালা প্রভৃতির সঙ্গে কোনও মিল নাই। আরবীতে দুইটী মাত্র মৌলিক কাল-রূপ আছে—একটী সাধারণ অতীত, অন্যটী aorist বা অনির্দিষ্ট-কাল-বাচক (ভবিষ্যৎ ও বর্তমান)। ত্রি-ব্যঞ্জনময় ধাতুগুলিকে পনের রকমের শ্রেণীতে ফেলা যায়—অবশ্য প্রত্যেক ধাতুই সমস্ত শ্রেণীতে পাওয়া যায় না, কোনও একটী ধাতু আটটী বা দশটী মাত্র শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে। এই পনেরটী শ্রেণীতে, অতীত ও অনির্দিষ্ট দুই রকমই কাল-রূপ আছে, এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিশেষণ- ও বিশেষ্য-ক্রিয়ার রূপ আছে। এই-সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কাল-রূপ এবং বিশেষণ ও ভাব-ক্রিয়ার, তথা কতকগুলি Auxiliary Verb বা সহায়ক-ক্রিয়ার সাহায্যে, আরবীতে ক্রিয়ার অন্য নানা কাল-রূপ ও প্রকার প্রদর্শিত হয়। অস্তি-বাচক ধাতু كَانَ « কানা »-র সাহায্যে, কতকগুলি যৌগিক কাল-রূপ গঠিত হয়।

ধাতু বা ক্রিয়ার বিভিন্ন শ্রেণী, যথা—[১] كَتَبَ « কাতাবা » [নির্দেশক], [২] كَتَّبَ « কাত্তাবা » [পৌনঃপুনিক], [৩] كَاتَبَ « কাতাবা » [পারস্পরিক, ব্যতীহারিক], [৪] أَكْتَبَ « 'আক্তাবা » [প্রযোজক], [৫] تَكَاتَبَ « তাকাত্তাবা » [দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মনেপদ প্রকার], ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্রিয়ার কাল-রূপে, মধ্যম- ও প্রথম-পুরুষে তিন বচন ও দুই লিঙ্গ হয়, এবং কেবল উত্তম-পুরুষে লিঙ্গ-ভেদ নাই ও দ্বি-বচন নাই, ও মধ্যম-পুরুষে দ্বি-বচনে লিঙ্গ-ভেদ নাই। ক্রিয়ার দুই বাচ্য আছে—কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য; বিভিন্ন 'ওজন'-দ্বারা বাচ্য নির্দিষ্ট হয়।

বাক্য-রীতি—

আরবীর বাক্য-রীতি সরল ও যৌগিক—মিশ্র বাক্য-রীতি প্রচলিত নাই। বিভক্তি-বহুল ভাষা বলিয়া, প্রাচীন আরবীতে বাক্যে শব্দের ক্রম বা ধরা-বাঁধা নিয়ম পালন না করিলেও চলে। আরবীতে সমাস হয় না—সম্বন্ধ-পদ পরে বসে; যেমন—বাঙ্গালায় « ঈশ্বর-দাস » (=ঈশ্বরের দাস), আরবীতে عَبْدُ اللّٰهِ « 'আব্দু 'আল্লাহি (='আব্দুল্লাহ্) » (=দাস ঈশ্বরের)। অস্ত্যর্থক ধাতু প্রায়ই উহ্য থাকে। ক্রিয়াকে প্রথমে বসাইয়া বাক্য আরম্ভ করা হয়: قَالَ اللّٰهُ « কালা-ল্লাহু » অর্থাৎ 'বলিলেন ঈশ্বর' ='ঈশ্বর বলিলেন'। ইংরেজীর মত Sequence of Tenses-এর বিধি নাই। আরবী বাক্য-রীতি বহু বিষয়ে অত্যন্ত সরল, প্রত্যক্ষ, এবং আদিম-প্রকৃতিক—চিন্তার জটিলতা-বর্জিত। বাঙ্গালা হইতে এ বিষয়েও অতি লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান।

শব্দাবলী—

আরবী খুবই 'স্বাবলম্বী' ভাষা—নিজ ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে আবশ্যক শব্দ খুব সুন্দর-ভাবে গঠিত করিতে পারে। এ বিষয়ে আরবীকে পৃথিবীর অন্যতম মৌলিক ভাষা বলা যায়—সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন ও চীনার মত। কিন্তু তাহা হইলেও, আরবীতে গৃহীত বাহিরের বিদেশী শব্দ, সংখ্যায় কম নহে। সিরীয়, হিব্রু, গ্রীক, ইরানী প্রভৃতি ভাষা হইতে আরবী ভাষা শব্দ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে—এমন কি দুই-চারিটা ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) শব্দ-ও আরবীতে স্থান লাভ করিয়াছে (যথা—« নারজীল বা

নারগীল » ='নারিকেল', « সুক্কর » ='শর্করা')। মুসলমান ধর্মের ও মধ্য-যুগের মুসলমান সভ্যতার ভাষা বলিয়া, পশ্চিম-আফ্রিকা, উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেন হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং রুষ-দেশ ও সিবেরিয়া হইতে মধ্য-আফ্রিকা ও সিংহল পর্যন্ত বিরাট্ ভূখণ্ডের বহু বহু অসভ্য, অর্ধসভ্য ও সুসভ্য জাতির ভাষাকে আরবী প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ফারসীর মারফৎ, এবং সরাসরি, উর্দু বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যেও শত শত আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে।

॥ সমাপ্ত ॥